মুসলিম যুবসমাজের

ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন

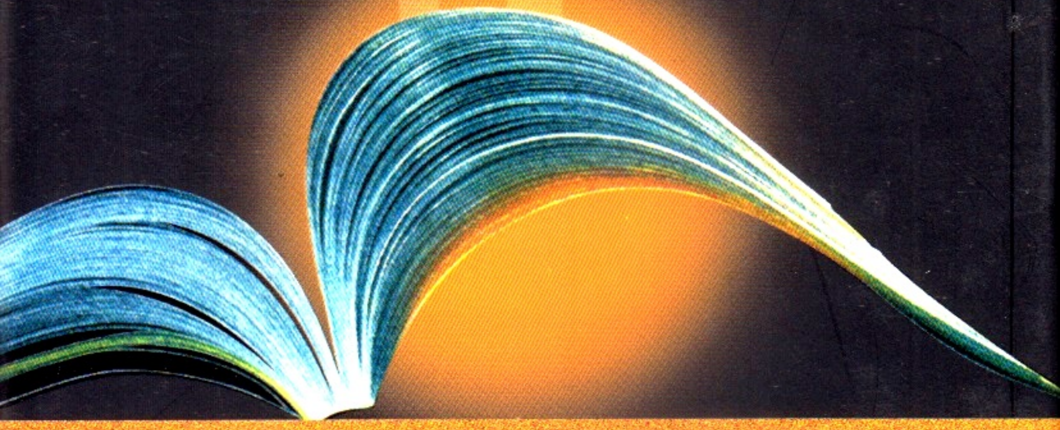

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সবুজপত্র

www.nagorikpathagar.com

মুসলিম যুবসমাজের
ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

মুসলিম যুবসমাজের
ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন

রচনা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা

শাহ আব্দুল হান্নান

ড. আব্দুল বারী

ডা. আমিনুল ইসলাম

ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ

সবুজপত্র

www.nagorikpathagar.com

ISBN 978-984-8927-03-8

প্রকাশক
সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ও সাঈদা বিনতে মাহমুদ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২ (বাংলাবাজার)
০১৭৫০০৩৬৭৯১ (মগবাজার), ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ (কাঁটাবন)
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info_admin@sobujpatro.com
fb.com/sobujpatrobd

স্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
সপ্তম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ: জননী প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০
বাঁধাই: অগ্রণী পুস্তক বাঁধাই কেন্দ্র, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

মূল্য
তিনশত টাকা মাত্র

CAREER FORMATION & SKILL DEVELOPMENT OF
MUSLIM YOUTH SOCIETY (in Bangla)
by Abdud Dayyan Mohammad Younus
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka Three Hundred only

www.nagorikpathagar.com

সালমান, নাসরিন, ইসমাঈল, মাহ্বুব, ইলিয়াস, আইউব, জামিল, আব্দুল হালিম, তাসলিমা, আকলিমা, ফারহানা, সালমা, তামিমা, মর্জিনা, মায়মুনা, মুজাহিদ, নাবীল, মহসীন, তাহসীন, ইহসান, সালেহ, নাঈম, মায়ায, আব্দুল্লাহ, জাহরা, তাহিয়্যা, আয়েশা, আসমা, মারিয়া, মারদিয়া, তাসনু, ওযায়ের, হাসানাত, উসামা, ইবরাহীম, আব্দুর রহমান, উমায়ের, মুহাম্মদ, আহমদ, মাহমুদ ও ইউসুফ আব্দুল্লাহ রাফে'সহ মুসলিম তরুণ-তরুণীদের প্রতি নিবেদিত।

সুন্দর ও শান্তিময় পৃথিবী উপহার দেওয়ার জন্য তোমাদের প্রতিভা বিকশিত হোক।

—আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল ও ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

জনাব ডক্টর আবদুল বারী সাহেবের

মুখবন্ধ

উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার মান উপরে থাকার মূল কারণ হল নার্সারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এদের শিক্ষা বাস্তবধর্মী ও জীবনমুখী। জীবনের উদ্দেশ্য এদের যাই থাকুক না কেন, সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে এরা এদের জাতির ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে বড় করার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের মত মুখস্থ বিদ্যা ও ডিগ্রি অর্জনের গুরুত্ব এদের কাছে নেই। আমরা তো বলতে গেলে ঔপনিবেশিক ম্যাকলে (Macaulay) শিক্ষাব্যবস্থারই সামান্য রদবদল করে এগিয়ে চলেছি অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে।

উন্নত দেশগুলোতে বাধ্যতামূলক প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শিক্ষায় এত গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, স্কুল-শিক্ষকের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকের বেতনের চেয়েও অনেক সময় বেশি হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি যে-কোন শিক্ষাই একটা সার্বজনীন কারিক্যুলাম-এর আওতায় চলে—যার উন্নতির জন্য শিক্ষাবিদরা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন।

এদেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় আরেকটা বিশেষত্ব আছে। তা হল—প্রাইমারি থেকেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত, সামাজিক ও জীবনভিত্তিক উন্নতির সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই ছাত্রছাত্রীদেরকে বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও ক্যারিয়ার নির্বাচনের ব্যাপারে স্কুল থেকেই পরামর্শ দেওয়া হয়। ফলে কেউ একাডেমিক পড়ালেখায় ভালো না হলেও জীবনের জন্য যে-কোন দিকে সে উন্নতি করার চেষ্টা করার সুযোগ পায়। অবশ্য এদেশগুলোর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক ধরনের অতিরিক্ত বিষয় আছে, যা আমাদের দেশে নেই।

তুলনামূলকভাবে, আমাদের দেশে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেভেলের শিক্ষার আনুপাতিক গুরুত্ব কম। স্কুল-শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সচ্ছলতার অভাবের কারণে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-শিক্ষকতার কথা চিন্তাও করে না। জাতীয় শিক্ষার মূল ভিত্তি দুর্বল হওয়ার কারণে আমরা সামনে এগুতে পারছি না। ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও জাতীয়ভাবে এক দৈন্যদশা বিরাজ করছে।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার গঠনের পরামর্শ দেওয়ার কোন System না থাকার কারণে কত প্রতিভার যে অপচয় হচ্ছে, তার কোন হিসাব নেই। যে সমস্ত পরিবারে এ ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার মত সুযোগ রয়েছে, তারাই শুধু পরিকল্পনা করে তাদের ছেলেমেদেরকে বিভিন্ন পেশায় উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনার অভাব থাকার কারণে দেশ চালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মেধার সরবরাহ পাওয়া যায় না। তাছাড়া মেধা পাচার তো বিরাট এক সমস্যাই রয়ে গেছে!

এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার অথবা পরস্পরকে দোষারূপ করে কোন লাভ নেই। কারণ ব্যক্তি মিলেই জাতি, আর সবাই মিলেই আমরা সরকার গঠনে সহায়তা করি।

www.nagorikpathagar.com

সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া এবং চাপ সৃষ্টির সাথে সাথে শিক্ষাদরদি প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সার্বজনীন জাতীয় স্বার্থ ও ধর্মীয় প্রয়োজনকে সামনে রেখে।

এটা ঠিক যে, শিক্ষার সার্বিক মান উন্নত না হলে এবং বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্যারিয়ার গঠনের পরামর্শ দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবহার না থাকলে প্রতিভার অপচয় রোধ করা সম্ভব নয়। তবু কিছু মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং তাদের সীমিত পরিসরে তারা SSC এবং HSC পাস করা কিছু ছাত্রদেরকে পরামর্শ দিয়ে এসেছে। এ কাজটা সারা দেশব্যাপী হওয়া দরকার এবং ছাত্রীদের মধ্যেও পরামর্শের ধারাটা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। জাতিগঠনে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রীদের ভূমিকা ছাত্রদের চেয়েও অনেক বেশি। ক্যারিয়ার গঠনে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিস মনে রাখা দরকার ঃ ১. মেধা, ২. যোগ্যতা, ৩. ছাত্রছাত্রীর পছন্দ, ৪. জাতীয় প্রয়োজন ও ৫. মুসলিম উম্মার যুগোপযোগী প্রয়োজন।

মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে মেধা ও যোগ্যতার কোন কমতি নেই। উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও আমাদের অনেক প্রতিভার উদ্ভব হয়েছে। সঠিক ও সাবলীল পরিবেশ পেলে এর যথেষ্ট উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে নব্য উপনিবেশবাদীদের যাঁতাকলে পিষ্ট মুসলিম দুনিয়ার জন্য আজ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা এবং বলিষ্ঠ সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে আজ মুসলিম যুব সমাজের জাতীয় কল্যাণকামী ক্যারিয়ার গঠনটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সময়ের অপরিহার্য দাবি। আমাদেরকে যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উন্নত দেশগুলোর উপরে উঠতে হবে। অন্যদিকে মানবতা ও ইসলামী কল্যাণকামিতায় দুনিয়ার সামনে আদর্শ হতে হবে। এ জন্য আমাদের যুবসমাজের প্রত্যেককে পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতায় সবার উপরে থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেশির ভাগ মুসলমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে প্রমাণিত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুখের কথার বেশি গুরুত্ব নেই। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রতিটি কাজ ভালোভাবে (দক্ষতার সাথে) সম্পন্ন করতে বলেছেন। যখন তোমরা যুদ্ধ কর, ভালোভাবে কর, যখন তোমরা পশু জবাই করবে, সুচারুভাবে সম্পন্ন কর।

অযোগ্যতা, আধা-যোগ্যতা আর ভাবাবেগ দিয়ে কাজ করার মধ্যে কোন বরকত নেই। ইসলাম ইখলাস আর যোগ্যতার সমন্বয় করতে চায়। মুসলিম যুবসমাজের সামনে তাই আজ বিরাট চ্যালেঞ্জ, তারা কি মুসলিম উম্মার যুগোপযোগী ক্যারিয়ার গঠনে ইখলাস ও যোগ্যতার সমন্বয় ঘটাতে পারবে?

"মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন গাইড" এ চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই বের করা হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম যুবসমাজ এর থেকে উপকার পাবেন—এটাই আমাদের আশা।

www.nagorikpathagar.com

লেখকের কথা

বর্তমান যুগকে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। আমরা আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির অনেক কিছু ব্যবহার করি। টেলিফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনের সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলি।

কম্পিউটারে হাজারো তথ্য সংরক্ষণ করি এবং ই-মেইল-ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত মানুষের সাথে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করি। উড়োজাহাজের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যাই। টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের নানা ঘটনাপ্রবাহের সচিত্র প্রতিবেদন প্রত্যক্ষ করি। এভাবে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার বর্তমান যুগের মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও গতিশীল করে দিয়েছে। আবার পারমাণবিক বোমাসহ বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার অপপ্রয়োগের ফলে বিশ্বে অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। এজন্য প্রযুক্তি দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে প্রযুক্তির অপপ্রয়োগকারীরা।

সচেতন ও সত্যপিয়াসী ব্যক্তিমাত্রই জানে যে, ইসলাম ও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন, সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে আল্লাহর সৃষ্টিনিদর্শন সম্পর্কে আলোচনায় সমৃদ্ধ। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার ও উন্নয়নের সূচনা করেছে মূলত মুসলমানরা। শত শত বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ ছিল। আজকের অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কর্ডোভা, দামেস্ক ও বাগদাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছিল। জ্ঞান আহরণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসু মানুষেরা দলে দলে মুসলিম দেশগুলোতে ভিড় জমাতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ থাকার কারণে রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও সে সময় মুসলমানদের হাতে ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে মুসলমানদের ভূমিকা নিছক অপ্রতুলই নয়; বরং এককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে মুসলমানদের যে একক অবদান ছিল, তা বোঝা-ই বর্তমান প্রজন্মের লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ার ফলে বর্তমানে পাশ্চাত্য বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে, অমুসলিমরাই বিশ্বে কর্তৃত্ব করছে। অথচ মুসলমানরাই 'খায়রু উম্মাহ' তথা শ্রেষ্ঠ জাতি। মুসলমানদের চিন্তা, বিশ্বাস, তাহযীব ও তমদ্দুন অন্যান্য জীবনদর্শনে বিশ্বাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পরোপকার ও মানবতার কল্যাণে মুসলমানদেরই অন্যদের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। ইসলামের শিক্ষানুসারে মুসলমানদের স্বভাব, চরিত্র ও ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হলে মুসলমানরা বিশ্বে কর্তৃত্বের আসনে আসীন থাকতো। বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলমানরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। অথচ সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানরা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

২০০২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ইন্টারনেটে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের জনসংখ্যার ৩৩% খ্রিস্টান, ২২% মুসলমান, ১৫% হিন্দু, ১৪% নাস্তিক, ৬% বৌদ্ধ, ৪% চাইনিজ, ৩% আফ্রিকান ও ৩% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। শতকরা হিসাবে ইহুদিদের সংখ্যা পৃথকভাবে উল্লেখ করার মতো নয়। তাই তাদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ইহুদিদের সংখ্যা ১৪ মিলিয়ন (এক কোটি ৪০ লাখ) আর মুসলমানদের সংখ্যা ১.৩ বিলিয়ন (একশত ত্রিশ কোটি) এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যা ২ বিলিয়ন।

জনসংখ্যার পাশাপাশি মুসলমানদের হাতে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ তেল সম্পদের মালিক মুসলিম বিশ্ব। ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ সালে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত Lan Roberts প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী শুধু ইরাকেই ১১২ বিলিয়ন ব্যারেল তেল রয়েছে। আর এ তেলের জন্যই যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করেছে বলে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক সরাসরি মন্তব্য করেছেন। Lan Roberts যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "The US economy needs oil like a junkie needs heroin."

ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আরেক তথ্যানুসারে বিশ্বের রাবার সম্পদের ৭০%, পাট সম্পদের ৭৫%, মসল্লার ৬৭%, টিন সম্পদের ৪০% মালিকানা মুসলমানদের হাতে। এছাড়া তুলা, চা, কফি, মাছ ও পানিসহ আরও অনেক প্রাকৃতিক সম্পদে মুসলিম বিশ্ব সমৃদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ থাকার পরও কেন মুসলমানরা এত পিছিয়ে আছে? অথচ ইহুদিরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের কথা সকলের কাছে স্পষ্ট। মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে বিশ্বে দাঁড়ানোর মতো তাদের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু সুদূরপ্রসারী ভিশন এবং উক্ত ভিশনের আলোকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার ফলে তারা অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রই শুধু প্রতিষ্ঠা করেনি, বর্তমানে মুসলমানদের তাদের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করছে, শহীদ করছে। তাদের হাতে অনেক মুসলিম শিশু মা-বাবা হারিয়ে ইয়াতীম হচ্ছে, পিতামাতা কোলের সন্তান হারাচ্ছেন, হাসপাতালে আহত মুসলমানদের করুণ আহাজারিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ, অধিকাংশ মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ করছে না, অনেক মুসলিম দেশের সরকার পাশ্চাত্যের হাতের পুতুল। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে আছে। তৃতীয়ত, মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইসলামের সত্যিকার আদর্শ মুসলিম তরুণ সমাজের কাছে অনুপস্থিত। চতুর্থত, বিশ্বে শক্তিশালী মুসলিম ঐক্য নেই।

এমতাবস্থায় আজকের মুসলিম তরুণ সমাজকে হতাশা কিংবা নিছক অপরের সমালোচনার পরিবর্তে মুসলিম উম্মাহর হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারে 'দৃঢ়প্রত্যয়ী' হতে হবে। সুদূরপ্রসারী ভিশন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে ক্যারিয়ার গঠন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, "আল্লাহ শুধু অমুসলিমদের মেধা দান করেননি। আল্লাহ আমাদের খায়রা উম্মাহ বলেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে উক্ত

www.nagorikpathagar.com

দায়িত্ব পালনের উপযোগী মেধাও দান করেছেন।" শুধু প্রয়োজন মেধা বিকাশে সক্রিয় প্রচেষ্টা, আন্তরিক উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম। অবহেলা বা অযত্নে একখণ্ড দামি কাঠ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে অবহেলা বা অলসতায় একজন মেধাবী মানুষের প্রতিভা নষ্ট হতে পারে। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, একখণ্ড কাঠ নষ্ট হলে শুধু কাঠমালিকেরই ক্ষতি হয়। আর একজন মেধাবী মানুষের মেধা নষ্ট বা অপচয় হলে শুধু মেধাবী ব্যক্তিরই ক্ষতি হয় না—দেশ, জাতি, এমনকি গোটা বিশ্বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই মেধা বিকাশে মেধাবীদের যেমন এগিয়ে আসা দরকার তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। আমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে 'প্রতিভা হত্যার' অপরাধে অপরাধী হতে হবে। এজন্য দুনিয়ার আদালতে জবাবদিহি করতে না হলেও 'আল্লাহর আদালতে' জবাবদিহি করতে হবে।

মেধা আল্লাহর দান; দীন ও মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখার জন্যই আল্লাহ আমাদের মেধা দান করেছেন, গর্ব-অহংকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মেধা দান করেননি। তাই যশ, খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে দীন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার টার্গেটে মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রতিভা বিকাশে যারা সচেষ্ট থাকেন তারা দীনের প্রয়োজনে সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন। আত্মপূজা ও স্বার্থলোলুপতা তাদের মধ্যে থাকে না। তারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজ ও মানবতার জন্য কাজ করেন। তারা দুনিয়াপ্রেমিক হন না, তারা হন আল্লাহপ্রেমিক। আল্লাহর মহব্বত পাওয়ার জন্য দুনিয়ার সকল মোহ দ্বিধাহীনচিত্তে ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন। এভাবে উম্মাহর বৃহত্তর প্রয়োজনে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহপ্রেমিক কিছু বান্দাহ সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করলে আল্লাহ তাদের সমাজের পরিচালক করেন। তাদের হাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দেন। কিন্তু দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা ছাড়া নিছক ঈমানদার হওয়ার কারণেই আল্লাহ কাউকে দুনিয়ার পরিচালক করেন না। ঈমানের দাবি পূরণে খুলূসিয়াতের আলোকে কৃত আমলের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। কিন্তু দুনিয়াতে ঈমানের সাথে যোগ্যতা ও দক্ষতা না থাকলে দুনিয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেন না। তাই আজকের মুসলিম তরুণ সমাজকে একদিকে খাঁটি ঈমানদার হতে হবে, অন্যদিকে দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে সমান মেধা ও যোগ্যতা দান করেননি। একটি গাছে যেমন সব ধরনের ফল দান করেন না, তেমনি একজন মানুষের মধ্যে সব ধরনের যোগ্যতা থাকে না। আমরা যাদের 'অল রাউন্ডার' বলি তাদেরও কিছু না কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। দুনিয়ার কোন মানুষ সকল গুণে গুণান্বিত নয়, সব ধরনের যোগ্যতার অধিকারী নয়। তাই আল্লাহ যাকে যে ধরনের মেধা বেশি দিয়েছেন, তাকে তার সেই গুণ বা প্রতিভা বিকাশে যত্নশীল হতে হবে। এজন্য ক্যারিয়ার টার্গেট নির্ধারণ করে প্রতিভা বিকাশে নিরলস চেষ্টা করতে হবে, প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে, এক মুহূর্তও যেন অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

সিরিয়াস চেষ্টা করার পরও কেউ কোন ফিল্ডে খারাপ করলে বুঝতে হবে, তাকে মহান আল্লাহ তাআলা অন্য ফিল্ডে ভূমিকা রাখার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাই মন খারাপ কিংবা হতাশার পরিবর্তে বাস্তবতার নিরিখে মেধা মূল্যায়ন করে ক্যারিয়ার-ফিল্ড বাছাই করতে হবে।

ক্যারিয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাবে অনেক মেধাবী তরুণের মেধা নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সমস্যা কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেক তরুণ মেধার বিকাশ সাধন করতে পারছে না। আর্থিক দীনতা, শিক্ষাঙ্গনে নকল ও সন্ত্রাস মেধা বিকাশে বিরাট প্রতিবন্ধক। তাই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে সমাজ ও সরকারকে নানামুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, সময়-সুযোগ অনুযায়ী আয়-উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা সীমিত, টার্গেটভিত্তিক ও কর্মমুখী করাসহ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন করতে হবে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমিয়ে আনতে আত্মকর্মসংস্থানসহ দেশে নানা ধরনের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে নকল, সন্ত্রাস ও প্রচলিত ছাত্ররাজনীতি বন্ধে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং নোংরা রাজনৈতিক কালচার পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের মনে করতে হবে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কোন দলের নয়, তারা দেশ ও মুসলিম উম্মাহর সম্পদ। তাই দল-মত নির্বিশেষে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে এগিয়ে আসতে হবে।

এই কথা দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, অনেক মেধাবী মুখ জীবদ্দশায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মেধা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারেন না; কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবরে যে পরিমাণ ফুলের তোড়া দেওয়া হয় তার কিঞ্চিৎ অর্থ যদি জীবিত থাকার সময় তাদের পিছনে ব্যয় করা হতো হয়তোবা তারা আরও অনেক বেশি অবদান রাখতে পারতেন। তাই মৃত মেধাবীদের কবরে ফুলের তোড়া নয়; জীবিত মেধাবীদের খুঁজে বের করে তাদের মেধা বিকাশের পথ সুগম করে দেওয়া উচিত।

বইটি কেন লেখা হয়েছে?

প্রথমত, বইটি লেখার মানে এই নয় যে, লেখক উন্নত ক্যারিয়ারসম্পন্ন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ। এ প্রসঙ্গে সবিনয় জানাতে চাই যে, এ ধরনের বই লেখার জন্য যে যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন, তার কোনটাই লেখকের নেই। কেউ ভূগোল অধ্যয়ন করলে কোন দেশের রাজধানী কোথায় তা ঐ দেশে না গিয়েও বলতে পারেন। একজন ব্যক্তি নিজে ভালো রান্না করতে না জানলেও কার রান্না সুস্বাদু তা খাবার মুখে দিলেই অনুভব করতে পারেন। লেখকও অনুরূপ একজন। যারা সফল ক্যারিয়ার গঠন করেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন এমন অনেকের সঙ্গে মেশার এবং উন্নত ক্যারিয়ার গঠন করে যশস্বী হয়েছেন—এমন অনেকের উপর লেখা বইসহ দক্ষতা উন্নয়নের উপর অনেক বই পড়ার সুযোগ হয়েছে। এসব বইয়ের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় লেখা এবং বইগুলো লন্ডনের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে রয়েছে। উক্ত

www.nagorikpathagar.com

বইগুলো পড়ার সময় লেখকের মধ্যে এই অনুভূতি জাগে যে, বইগুলোর সারকথা বাংলা ভাষা-ভাষী ছাত্রছাত্রীদের জানাতে পারলে এবং উক্ত বইগুলোর রেফারেন্স দিলে হয়তোবা পাঠক সংশ্লিষ্ট বই সংগ্রহ করে পড়ে খুব বেশি উপকৃত হবেন এবং অজানা অনেক কথা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে সফলতা লাভের জন্য 'সেলফ্ মোটিভেশন' ও 'সেলফ্ কনফিডেন্স' খুবই প্রয়োজন। খ্যাতিমান কারো সংস্পর্শে এসে বা বক্তব্য শুনে কিংবা কোন বই পড়ে বা শিক্ষক ও অভিভাবকের অনুপ্রেরণায় একজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সেলফ মোটিভেশন ও সেলফ কনফিডেন্স সৃষ্টি হতে পারে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'সেলফ কনফিডেন্স' সৃষ্টি করার জন্যই বইটি লেখা হয়েছে। বইটি লেখার টার্গেট এই নয় যে, বইটি পাঠ করলেই ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নের সব কিছুই জেনে ফেলা যাবে। বইটি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বইটি পাঠ করে পাঠক যেন মনে করেন, "আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়েছেন। প্রতিভা বিকাশে কে কতটুকু চেষ্টা করেছে এবং প্রতিভা কোন কাজে লাগিয়েছে সে সম্পর্কে প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। তাই অবহেলায় মেধা নষ্ট না করে আল্লাহ্প্রদত্ত মেধা দীন ও মানবতার কল্যাণে লাগানো দরকার। কোন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হলে, সে প্রতিভা বিকাশে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে লক্ষ্য অর্জনে সদা তৎপর থাকবে। সে মনে করবে, "আমার একটু লেখনী কিংবা গানের সুর, কবিতার ছন্দ বা বক্তব্যের আবেদন আমার আখিরাতের নাজাতের উসিলা হতে পারে। তাই আখিরাতে নাজাতের জন্যই আমার মেধার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।"

তৃতীয়ত, দুনিয়াতে যেকোনো কাজ করার টেকনিক আছে। কৌশলে কাজ করলে অল্প সময়ে যে ফল পাওয়া যায়, কৌশল ছাড়া তা সম্ভব নয়। মেধা বিকাশ ও মেধা কাজে লাগানোরও কিছু কৌশল আছে তা জানা একান্ত জরুরি।

অনেক জ্ঞানী-গুণী বিভিন্ন ভাষায় ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর অনেক বই লিখেছেন। আমি তাদের অনেকেরই বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। বিশেষত লন্ডনে "Access to Humanities, Social Science and Law" এক বছরের একটি কোর্স করার সময় Academic Skills আমার সাবজেক্ট ছিল। উক্ত বিষয়ে পড়াশুনা করার সময় এমন অনেক বিষয় জানার সুযোগ হয়, যা অপরকে জানানো আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। কেননা নিজে কোন ভালো জিনিস জানলে তা অপরকে জানানো ইসলামের নির্দেশ। আমি এই অনুভূতিতেই এ বইটি লেখার কাজে হাত দিয়েছি। আমি যা জানার চেষ্টা করেছি তা অপরকে জানানো এবং যা শিখেছি তা অপরকে শেখানোর তীব্র অনুভূতিই আমাকে এ বিষয়ে কলম ধরতে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে সফলতা যতটুকু তা একমাত্র আল্লাহর রহমতেই সম্ভব হয়েছে। আর বিষয়ের গভীরতার আলোকে বইতে তথ্যের অপ্রতুলতা ও উপস্থাপনায় যেসব ত্রুটি আছে তা

www.nagorikpathagar.com

আমার অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতার ফলেই রয়ে গেছে। কোন একজন মুসলিম তরুণ-তরুণী বইটি পড়ে সামান্যতম উপকৃত হলে এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য অবদান রাখতে সক্ষম হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বইটি সম্পর্কে ক'টি কথা

১. লেখক বইতে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা মূল্যায়নে কারো ভিন্নমত থাকতে পারে। লেখক যে দৃষ্টিকোণে কোন একটি বিষয় পর্যালোচনা করেছেন, পাঠক তার বিপরীত পর্যালোচনাও করতে পারেন। লেখক ও পাঠকের অভিজ্ঞতা বিপরীতও হতে পারে। কেননা একমাত্র ওহীলব্ধ জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানই ১০০% নির্ভুল নয়। তাই বইটির কোন আলোচনা বা পর্যালোচনায় পাঠকের ভিন্নমত থাকতে পারে। কোন পাঠক তার ভিন্নমত অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে।

২. একথাও বলে নেওয়া দরকার যে, বইতে অভিজ্ঞতালব্ধ যেসব তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে সম্পৃক্ত অনেক বন্ধু-বান্ধব, চেনা-জানা মানুষ আছেন। কাউকে খুশি করা কিংবা কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়নি। পরবর্তী প্রজন্ম এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক কথা লেখা হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কারো নাম নেওয়া হয়নি। কোন ঘটনা বর্ণনার জন্য কেউ যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তার জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর কেউ যদি পুলকিত হন, তার আনন্দে অন্যকেও অংশীদার করার অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতে বইটি আরও সমৃদ্ধ করার জন্য যেকোনো পাঠক-পাঠিকার জীবনের অভিজ্ঞতা লেখককে জানালে কৃতার্থ হব।

৩. বইটিতে ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু উদাহরণ ও পয়েন্ট সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা বিস্তারিত আলোচনা করলে বইয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। বিস্তারিত তথ্য জানতে ইচ্ছুক পাঠক-পাঠিকাকে 'তথ্যপঞ্জিতে' উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বই পড়ার অনুরোধ করছি।

৪. বইটি এইচএসসি/আলিম ও ডিগ্রি লেভেলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। তবে প্রসঙ্গক্রমে ক্যারিয়ার গঠনে পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্র সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে গবেষণা করতে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'গবেষণা-পদ্ধতি' সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে গবেষণা-পদ্ধতির উপর লিখিত বিভিন্ন বই-এ বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৫. একজন ছাত্রকে পড়াশুনার বাইরেও অনেক কাজ করতে হয়। পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ ধরনের বহুমুখী কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। তাই একটি অধ্যায়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনগঠন ও সময়ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

৬. বইতে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কিছু 'কেইস স্টাডি' দেওয়া হয়েছে। পাঠক নিজে অথবা গ্রুপভিত্তিক কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করে সমাধান বের করতে চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ক্যারিয়ার গঠনের উপর বই পড়া কেন দরকার?

ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিভিন্ন ভাষায় অনেক বই আছে। এসব বই পড়া দরকার। এসব বই না পড়েও জীবন সুন্দরভাবে গড়া যায়। কিন্তু এসব বই পড়লে অনেক কিছু সহজে, সুন্দরভাবে করার টেকনিক ও সুবিন্যস্তভাবে পড়াশোনা করার কৌশল জানা যায়। অপরিকল্পিতভাবে পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে যে ফল পাওয়া যায়, পরিকল্পিতভাবে অনেক কম সময় ব্যয় করে এর চেয়ে অধিক ফল পাওয়া যায়।

যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

আমরা জানি কোন বই লেখার আগে প্রথমে 'কনসেপ্ট' মাথায় উঁকি দেয়। সাধারণত কোন কিছু পড়ার সময় বা সমাজে কোন কিছুর অভাব পরিলক্ষিত হলে কিংবা কেউ কোন বিষয়ে লেখার পরামর্শ দিলে মাথায় 'কনসেপ্ট' আসে। কিন্তু কোন একজন মানুষের মনে যত কনসেপ্ট সৃষ্টি হয়, এর সবগুলোই পরিপক্বতা লাভ করে না। অনেক কনসেপ্ট মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন ঘুরপাক খেয়ে হারিয়ে যায়। আবার কোনটি আলোর মুখ দেখে। এ বইটির কনসেপ্ট আমার মনে জাগ্রত হওয়া ও তা বাস্তবায়ন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের ফসল। তাই কায়মনোবাক্যে আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দান করছি ঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন—সমস্ত প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তাআলার, যিনি সমগ্র দুনিয়া জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি একদল সৎ, যোগ্য ও দক্ষ অনুসারী তৈরি করে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ উপহার দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে 'আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল' স্থাপন করেছেন।

কোন কনসেপ্ট মনে আসার পর তা ভালোভাবে মসিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে তিনটি বিষয় দরকার ঃ ১. তথ্য সংগ্রহ, ২. কনসালটেশন বা আলোচনা এবং ৩. লেখার সুযোগ ও সহযোগিতা।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে অনেক লেখকের বই থেকে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া Tower Hamlets College লন্ডনে পড়াশুনার সময় Paul Robert. Dr Johan Bently, Dr. Georgie Wemysess, Rasheed Sadeqh al-Jadeh প্রমুখ শিক্ষকের ক্লাস-নোট থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি এবং এ ধরনের একটি বই লেখার পরিকল্পনা তাঁদের জানালে তাঁরা অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। Special thanks to all of them for their comments, guidance and suggestions on this book.

কনসালটেশন বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন চিন্তা পরিপক্বতা লাভ করে। এই বইটি লেখার সময় অনেকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে অনেক মূল্যবান পরামর্শ

www.nagorikpathagar.com

পেয়েছি। বিশেষত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, জনাব আবূ নাসের মুহাম্মদ আব্দুজ্জাহের, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজনীতিক জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মাওলানা শামসুল ইসলাম, জনাব নাজমুল হাসান টিপু, বন্ধুবর জনাব নজরুল ইসলাম, খন্দকার কবির উদ্দিন, বেলায়েত হোসাইন প্রমুখ বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার জীবনসঙ্গিনী রোজী সাজেদা আউয়াল ও শিশুপুত্র ইবরাহীম জাওয়াদের সহযোগিতা না পেলে বইটি লেখা সম্ভব হতো না। কম্পিউটার ডেস্কে বইটি লেখার সময় শিশুপুত্রের কচি কণ্ঠে উচ্চারিত "আব্বু, তোমার কম্পিউটারে একটু খেলি"– আবদার অনেকবার উপেক্ষিত হয়েছে। তার সাথে খেলাধুলা করার অনেক অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে বইটি লেখার কাজে সময় ব্যয় করতে হয়েছে। শিশুপুত্র ও তার মায়ের সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া বড় বোন তাহেরা আরজু ও মাহেরা রুবিসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্বীকার করতে হয়।

আমার পড়াশুনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মৌলভী মুজাফফার আহমদ, বড় ভাই মাওলানা আবুল খায়ের, মাওলানা ছোলাইমান, মাওলানা ইদ্রিস, মাওলানা মোছলেহুদ্দীন, বড় বোন হালিমা খাতুন, মোসাম্মাত খাদীজা জান্নাত, জান্নাতুল ফেরদাউস, মাসুমা আক্তার প্রমুখের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা এ জন্য সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

কোন বই লেখার পর প্রকাশক ছাড়া তা আলোর মুখ দেখে না। এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব হেলাল উদ্দীনের আন্তরিক উদ্যোগ ও শ্রমের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করতে হয়। এছাড়া আরও যারা প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন- প্রুফ দেখেছেন, প্রিন্ট ও বাইন্ডিং করেছেন, আমি তাঁদের কাছে ঋণী। সবশেষে বইটি অধ্যয়নের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটি পাঠে কেউ সামান্যতম উপকৃত হলেও লেখকের শ্রম সার্থক হবে। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মুদ্রণজনিত বা তত্ত্ব ও তথ্যগত কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি এবং ভবিষ্যতে বইটি আরো পরিমার্জিত ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে পরামর্শ কামনা করছি।

আল্লাহ তাআলা এই বইটির লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সকলের আখিরাতে নাজাতের উসিলা করুন। আমীন!

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

www.nagorikpathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও ক্ষেত্র ২১
যোগ্যতা অর্জন সময়ের দাবি ৩০
কোন্ ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ৩৯
ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্য ৪৪
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা ৬০
ক্যারিয়ারের কয়েকটি ক্ষেত্র ৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের ভূমিকা ৭৩
প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয় ৮৪
পরিবারের ভূমিকা ৮৮
ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ৯২
কমিউনিটি বা স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকা ৯৭
প্রতিভা বিকাশে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৯৮
ক্যারিয়ার ও সংগঠন ১০৪

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত সমস্যা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার ১০৯
সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি কথা ১১০
ব্যক্তিগত কতিপয় সমস্যা ১১৪
ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার ১২৬
বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্ররাজনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য ১২৯
সন্ত্রাস ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ক্যারিয়ার গঠনে মারাত্মক প্রতিবন্ধক ১৩১
ছাত্র-রাজনীতির বিকল্প ধারা তৈরি করতে হবে ১৩২

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে দেশ-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ১৩৫
উচ্চশিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ১৩৮
গ্রাজুয়েশন ১৪০
ক্যারিয়ার গঠন ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা ১৪১

www.nagorikpathagar.com

কীভাবে বিদেশী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খোঁজ-খবর পাবেন ১৪৩
বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ভিসার আবেদনের জন্য যা প্রয়োজন ১৪৪
পঞ্চম অধ্যায়
ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময় ব্যবস্থাপনা ১৪৯
একজন মুসলিম যুবককে যেসব কাজ করতে হয় ১৫৫
সময় ব্যবস্থাপনা ১৬৮
সময়ের সঠিক ব্যবহার ও সময় ব্যবস্থাপনা ১৭৩
সময় ব্যবস্থাপনায় আপনি কি সিরিয়াস ১৭৬
কীভাবে সময় ব্যবস্থাপনা করবেন ১৭৮
সময়সূচি/দৈনিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ১৮০
২৪ ঘন্টার সময়সূচি ১৮১
সময়সূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ১৮৩
সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও কতিপয় বিষয় ১৮৫
সময় অপচয় রোধ করতে কতিপয় পরামর্শ ২৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায়
দক্ষতা উন্নয়ন
স্টাডি, রিডিং, মেমোরাইজিং ও নোট টেকিং ১৯৫
দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব ১৯৫
কোন্ পদ্ধতিতে দক্ষতা উন্নয়ন করবেন তার অ্যাকশন প্ল্যান ১৯৭
দক্ষতা উন্নয়নে কতিপয় পরামর্শ ১৯৮
স্টাডি স্কিলস ২০০
ভালো স্টাডি করার জন্য কতিপয় পরামর্শ ২০১
স্টাডি কৌশল ২০২
আত্মপর্যালোচনার জন্য পরামর্শ ২১৪
লেকচারের সময় করণীয় ২১৬
রিডিং স্কিলস ২১৯
বই পড়ার ক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ ২২২
বই পড়ার বিশেষ টেকনিক (SQ3R) ২২৩
বই পড়ে বোঝার জন্য কয়েকটি পরামর্শ ২২৬
বই পড়তে নিরুৎসাহিত হয় কেন? ২২৮
বই পড়ার আগ্রহ কখন থাকে ২২৮
মুখস্থকরণ বা Memorising ২২৯
আমরা ভুলি কেন ২৩২
স্মরণ রাখার কৌশল ২৩৩
ভালো নোট করার কৌশল ২৩৭

www.nagorikpathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

রাইটিং অ্যান্ড রিসার্চ স্কিলস বা লেখা ও গবেষণার দক্ষতা অর্জন ২৪১
একাডেমিক রাইটিং ২৪৭
লেখার কৌশল ২৪৯
লেখালেখির ক্ষেত্রে আরও কিছু কথা ২৫৪
একাডেমিক রিপোর্ট ২৫৬
বই পর্যালোচনা ২৫৭
সামারাইজিং-সারসংক্ষেপ করা ২৫৮
গবেষণা পদ্ধতি ২৫৯
দীনের গবেষণা বা ইজতিহাদ ২৫৯
সাধারণ গবেষণা ২৬৪
এমফিল ও পিএইচডি করার জন্য প্রস্তুতিমূলক পরামর্শ ২৬৬
তথ্য সংগ্রহ ২৭১
লাইব্রেরিতে কীভাবে বই সন্ধান করবেন ২৭৩
চৌর্যাপরাধ (Plagiarism) ২৭৫
শব্দান্তরমূলক বর্ণনা (Paraphrase) ২৭৫
কোটেশন বা উদ্ধৃতি (Quotation) ২৭৬
রেফারেন্স ২৭৭
তথ্যপঞ্জি ২৮২
নোট, ফুটনোটস ও এন্ডনোটস ২৮৬
গবেষণাকর্ম সম্পাদনে নৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ ২৮৭
গবেষক ছাত্রদের সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা ২৮৯

অষ্টম অধ্যায়

বক্তৃতাদানের কৌশল ২৯১
কুরআন ও হাদীসের আলোকে বক্তৃতাদানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২৯২
বক্তব্যের সাধারণ টেকনিক ২৯৫
প্রোগ্রামে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার প্রসঙ্গে ২৯৬
বক্তৃতা প্রদানের সময় লক্ষণীয় কতিপয় বিষয় ২৯৭

নবম অধ্যায়

পরীক্ষার টেকনিক ৩০০
পরীক্ষার সফলতার জন্য প্রয়োজন ৩০১
রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ ৩০৭
রিভিশন পর্যালোচনা ৩০৭
পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা ৩০৮

www.nagorikpathagar.com

পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কতিপয় পরামর্শ ৩০৮
পরীক্ষার দিন করণীয় ৩০৯
পরীক্ষার হলে করণীয় ৩১০
পরীক্ষার সময়ের আরও কতিপয় পরামর্শ ৩১১
পরীক্ষার পর করণীয় ৩১২
পরীক্ষায় যে ধরনের ভুল হতে পারে ৩১৩
মৌখিক পরীক্ষা (Oral Exam) ৩১৪
পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করলেই ভেঙে পড়া ঠিক নয় ৩১৫
কেন একজন ছাত্র ফেল করে বা খারাপ রেজাল্ট করে ৩২০
পুনঃপরীক্ষা দিতে হলে ৩২৭
পুনঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ ৩২৭

দশম অধ্যায়

ল্যাংগুয়েজ স্কিলস
মাতৃভাষার বাইরে আরও কিছু ভাষা শিখুন ৩২৯
কীভাবে ভাষা শিখবেন ৩৩৩

একাদশ অধ্যায়

কর্মজীবন : ছাত্রজীবনেই প্রস্তুতি নিন ৩৪৩
ব্যক্তিগত বায়োডাটা লেখা ৩৪৬
চাকরির আবেদনপত্র ৩৪৭
ইন্টারভিউ ৩৪৯
ইন্টারভিউ চলাকালীন কতিপয় পরামর্শ ৩৫০

পরিশিষ্ট : ১

Prefixes - Suffixes ৩৫১
পরিশিষ্ট : ২ Linking words বা Phrasal words ৩৫৩
পরিশিষ্ট : ৩ Abbreviation ৩৫৫
পরিশিষ্ট : ৪ Subjective Exam প্রশ্নপত্রে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা ৩৫৬
পরিশিষ্ট : ৫ Punctuation Mark ৩৫৬
Confusaing spelling ৩৬০
American and British English ৩৬৩
Vocabulary ৩৬৪
তথ্যপঞ্জি ৩৬৫

www.nagorikpathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও ক্ষেত্র

ক্যারিয়ার গঠনের গুরুত্ব

আমরা আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিকে তাকালে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি ও নানা ধরনের কীটপতঙ্গ দেখতে পাই। মানবসমাজের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তাআলা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। ফুল বাগানে হরেক রকম ফুল রয়েছে, নদীতে বিভিন্ন স্বাদের মাছ, জমিতে নানা ধরনের শস্য উৎপন্ন হয়। হয়তো এই সবকিছুর কোনো একটি কারো অপছন্দ বা অপ্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু তা অনেকেরই প্রয়োজন বলে আল্লাহ তাআলা সব ধরনের জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো একটি সমাজ পরিচালনার জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ দরকার। এজন্য সমাজের একেকজন মানুষকে একেক ধরনের যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।[১] মানুষের বহুমুখী যোগ্যতার বিকাশ যে সমাজ যত কার্যকরভাবে করতে পারে সে সমাজ তত উন্নত।

বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকা কেন বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে

বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য বিশ্ব দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করছে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষে, তথ্য ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। কেননা তারা তাদের প্রতিভাবানদের মেধা বিকাশে খুবই সহায়ক। তাদের বিজ্ঞানীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন এবং নতুন নতুন আবিষ্কার করছেন। আধুনিক কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিফোন, উড়োজাহাজ প্রভৃতি বিজ্ঞানেরই অবদান। কিন্তু কারা এসব কিছু আবিষ্কার করছেন। ড. জন এটানসফ ১৯৪২ সালে গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য বায়ুশূন্য টিউব ব্যবহার করে ছোট্ট একটি ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। টেলিফোন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেল। উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন রাইট ব্রাদার্স (উইলবার রাইট ও তাঁর ছোট ভাই অরভিল রাইট)। এভাবে আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কারকদের তালিকা তৈরি করলে দেখা যাবে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাই এসব কিছু আবিষ্কার করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কি শুধু

১. সমাজের সব মানুষের মেধা ও যোগ্যতা সমান নয়।

www.nagorikpathagar.com

তাদেরকেই প্রতিভা দান করেছেন? আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে প্রতিভা দান করেছেন। মুসলমানগণ যখন এ প্রতিভা কাজে লাগিয়েছিল তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরাই শীর্ষে ছিল। অমুসলিমরা তখন জ্ঞানের জন্য মুসলমানদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতো। কিন্তু বর্তমানে আমরা ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করছি। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টানদের প্রাক্তন আর্চবিশপ Dr. Lord Carey অতি সম্প্রতি বলেন :

Although we owe much to Islam handing on to the west many of the treasures of Greek thought, the beginning of calculus, aristotelian thought during the period known in the west as the dark ages, it is sad to relate that no great invention has come for many hundred years from Muslim countries. This is a puzzle; because Muslim people are not bereft of brilliant minds. They have much to contribute to the human family and we look forward to the close co-operation that might make this possible.[২]

ড. কেরি মুসলমানদের সমালোচনা করে উপরিউক্ত মন্তব্য করলেও এটা বাস্তব যে, বর্তমানে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এ পিছিয়ে থাকার কারণ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা বর্তমান যুগের মুসলমানদের প্রতিভা দান করেননি, কিংবা অমুসলিমদের চেয়ে কম প্রতিভা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি (খায়রা উম্মাত) বলেছেন এবং মানুষ হিসেবে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা কাউকে যোগ্যতার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। যেহেতু তিনি মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই একথা বলা যায় যে, বর্তমানে মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে তাদের মেধা ও যোগ্যতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই অমুসলিমরা বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অতীতে যখন মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিল তখন বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতেই ছিল। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকার কারণে দুনিয়ার পরিচালক হওয়ার পরিবর্তে পরিচালিত, শাসক হওয়ার পরিবর্তে শাসিত। পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামী নৈতিক চরিত্র না থাকলেও মৌলিক মানবীয় গুণাবলি ও দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি রয়েছে।[৩] তাই তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ্ যদি ইসলামী নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বস্তুগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে দুনিয়ার কর্তৃত্ব

২. Jonathon Petry. 2004. The Daily Telegraph. 26 March, 1 page.

৩. মাওলানা মওদূদী (র) এই বিষয়টি 'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' বইতে চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.com

মুসলমানদের হাতে আসবে ইনশাআল্লাহ। কেননা কোনো একটি সমাজ শুধু বস্তুগত চাকচিক্য দিয়ে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। সমাজের অস্তিত্ব নৈতিক শক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাশ্চাত্যের কাছে বস্তুগত চাকচিক্য আছে। কিন্তু নৈতিক শক্তি নেই। এ কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা একটি ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা। এই সভ্যতা বেশিদিন নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের চেয়ে উন্নত নৈতিকতা ও মানবিক যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ না থাকলে তারাই কর্তৃত্ব করতে থাকবে।[৪]

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার ফল

১. আধুনিক প্রযুক্তি মানবতার অকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে : আধুনিক যুগ হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই তথ্য ও প্রযুক্তি যাদের হাতে রয়েছে তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিল কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণে ব্যবহার করছে। ফলে অনেক জনপদ ধ্বংস হচ্ছে, আশরাফুল মাখলুকাত বনি আদম তার নির্মম শিকার হচ্ছে। জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ এবং আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনে আধুনিক মারণাস্ত্রের নির্মম প্রয়োগ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

২. বিশ্বে অশান্তির আগুন জ্বলছে : বর্তমান বিশ্বে কী দেখা যায়? চারদিকে শুধু অশান্তির দাবানল জ্বলছে। সবল মানুষেরা দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করছে, তাদের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করছে। অনুরূপভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কেননা যাদের হাতে আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে তাদের আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তাদের মতো তথ্য ও প্রযুক্তি না থাকায় তারা শঙ্কাহীনচিত্তে দাপট দেখাচ্ছে, হুমকি-ধমকি দিচ্ছে, আক্রমণ করছে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠন করছে।

৩. বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য নেই : জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দক্ষতায় পাশ্চাত্য অনেক অগ্রসর আর মুসলমানরা তাদের চেয়ে পিছনে থাকার কারণে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য নেই। তাই তারা মুসলিম দেশে আগ্রাসন পরিচালনা করতে দ্বিধা করছে না। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতনের পেছনে মৌলিক কারণ হচ্ছে সমরশক্তিতে মুসলমানরা অমুসলিমদের তুলনায় একেবারেই দুর্বল। মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের সমরশক্তির অনুপাত ৩ ঃ ৯ মাত্রা।[৫] মুসলিম বিশ্ব যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের চেয়ে অগ্রসর হতো তাহলে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল।

---

৪. প্রাগুক্ত।

৫. হারুনুর রশীদ, ২০০৪ তথ্যসন্ত্রাস বাংলাদেশের অবস্থা, সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা, ১৫ থেকে ২১ মার্চ, লন্ডন, পৃ-২১।

www.nagorikpathagar.com

মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে হলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন : কুরআনের ভাষ্য অনুসারে মুসলমানেরা এমন এক আদর্শে বিশ্বাসী, যা বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। ঈমানের সাথে যোগ্যতা থাকলে আল্লাহ মুসলমানদের জাগতিক বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই। কিছুসংখ্যক ইহুদি গোটা বিশ্বে যে দাপট ও প্রভাব বিস্তার করে আছে, তার তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে।[৬] এজন্য দুঃখ কিংবা অনুশোচনায় সময়ক্ষেপণ করার পরিবর্তে আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হবে, আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা কাজে লাগানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমরা যদি নৈতিক শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের হৃতগৌরব ফিরে পাব, ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম উম্মাহর হৃতগৌরব ফিরে পেতে হলে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে ভিশন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকতে হবে। বিশেষত মুসলিম তরুণ সমাজকে প্রতিভার বিকাশ সাধন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

মুসলিম তরুণ সমাজকে ক্যারিয়ার গঠনে এগিয়ে আসতে হবে : যেকোনো সমাজ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে প্রথম পর্যায়ে যাঁরা সাড়া দেন তাঁদের অধিকাংশই যুবক ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর গৌরবজনক অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে অতীতে যুবসমাজই প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ উপহার দিতে হলে বাংলাদেশের যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতন বন্ধ করে সুন্দর শান্তিময় পৃথিবী উপহার দিতে হলে মুসলিম যুবসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। আর এ লক্ষ্যেই মুসলিম তরুণ সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। আজকের মুসলিম তরুণসমাজকে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :

১. জ্ঞান মুসলমানদের হারানো সম্পদ[৭]: খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলমানরা শীর্ষে ছিল।[৮] ইমাম জাফর সাদিক,

---

৬. এর কারণ মুসলিম তরুণ সমাজের কাছে স্পষ্ট।

৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَمَنْ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِي

৮. এজন্য এই সময়কে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের সোনালী যুগ বলা হয়।

www.nagorikpathagar.com

জাবির ইবনে হাইয়ান, ওমর খৈয়াম, আল বিরুনি, ইবনে সিনা, আল খাওয়ারেযমি প্রমুখ বিজ্ঞানীর অবদানের কথা পাশ্চাত্যের লেখকরাও অস্বীকার করতে পারছে না। অবশ্য পাশ্চাত্যের লেখকরা সুপরিকল্পিতভাবে তাঁদের নাম বিকৃত করে উল্লেখ করার কারণে অনেক পাঠকের কাছে তাঁদের আসল পরিচয় অস্পষ্ট।[৯] এর ফলে অনেক মুসলিম পাঠকও বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদেরকে পাশ্চাত্যের মনীষী বলে মনে করেন। কেননা মুসলমানদের অতীত গৌরবজনক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মুসলমানই অবহিত নন। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আশরাফ আলী "Muslim Contribution to Science and Technology' বইয়ের ভূমিকায় যথার্থই লিখেছেন :

"Most of the Muslims, indeed, do not know about the historic and stupendous contributions that the Muslims have made to Science and Technology."[১০]

মুসলিম তরুণ সমাজকে মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে সিনা, জাবির হাসান বিন হাইয়ান, রাযী[১১] প্রমুখের বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানরাই প্রথম রাসায়নিক ওষুধসমূহকে পিল ও মিকশ্চার হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন[১২] এবং বড় বড় মুসলিম শহরে হাসপাতাল গড়ে তোলেন। জাবির বিন হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন। ইবনে আল হাইসাম ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি সর্বপ্রথম জড়তত্ত্ব (Law of inertia), আলোর প্রতিসরণ তত্ত্ব প্রদান করেন, যা পরবর্তীকালে নিউটনের হাতে পুনরাবিষ্কৃত হয়। এ কথা সকলেই জানেন যে, কম্পিউটারের আবিষ্কার অঙ্কশাস্ত্রনির্ভর। আল খাওয়ারেযমী প্রথম বস্তুর 'সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ' প্রণয়ন করেন। প্রখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম নিউটনের বহু আগে 'বাইনোমিয়াল থিউরাম' আবিষ্কার করেন। মুসলিম ভূগোলবিদ ইবনে হাক্কল সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ মানচিত্র প্রণয়ন করেন। আল বিরুনি,[১৩] ইবনে বতুতা প্রমুখ মুসলিম মনীষী ভূবিদ্যার প্রসারে যথেষ্ট অবদান রাখেন। আল ফারাবি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও দার্শনিক। তিনি প্রায় ৭০টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। আল কিন্দি গণিত, ভূগোল,

---

৯. এর ফলে মুসলিম তরুণ সমাজ তাদের অতীত গৌরবজনক ইতিহাস জানে না। তারা মনে করে পাশ্চাত্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনক।

১০. Board of Researchers 1996. Muslim Contribution to Science and Technology. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh. P111.

১১. রাযী মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন।

১২. আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ ২০০২ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান ডায়েরি ২০০২, ঢাকা : বাংলাদেশ১৫. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান।

১৩. তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে কিতাব আল হিন্দ ।

www.nagorikpathagar.com

ইতিহাস চিকিৎসা বিজ্ঞানের ৩৬৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে খালদুনকে ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ইবনে জারির তাবারি বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর 'তারিখ আল রাসূল ওয়া আল মুলুক' গ্রন্থটি বিশ্বের সর্বত্রই রেফারেন্স হিসেবে পঠিত হচ্ছে। শিল্প কল-কারখানাতেও মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য।

মুসলমানরাই চামড়ার কাগজের পরিবর্তে তুলার তৈরি কাগজের প্রচলন করেন। এর ফলেই ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়।[১৪]

মুসলিম শাসকরা অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা মামুন প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাগদাদে 'দারুল হিকমাহ' নামে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলেন। গুস্তাভ লি বোঁ তাঁর ইসলাম ও আরবি সভ্যতার ইতিহাস বইতে লিখেছেন, "ইউরোপে যখন বই ও পাঠাগারের কোনো অস্তিত্ব ছিল না অনেক মুসলিম দেশে তখন প্রচুর বই ও পাঠাগার ছিল। সত্যিকার অর্থে বাগদাদের 'বায়তুল হিকমাহ' চল্লিশ লক্ষ, কায়রোর সুলতানের পাঠাগারে দশ লক্ষ, সিরিয়ার ত্রিপোলী পাঠাগারে তিরিশ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সময়ে কেবল স্পেনে প্রতি বছর ৭০ থেকে ৮০ হাজার বই প্রকাশিত হতো।"[১৫] এ প্রসঙ্গে ড. মরিস বুকাইলী তাঁর গ্রন্থে (The Bible, the Quran and Science) উল্লেখ করেন, "অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরে। যখন খ্রিস্টীয় জগতে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের উপর নিষেধাজ্ঞা চলছিল তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহুসংখ্যক গবেষণা ও অবিষ্কার সাধিত হয়। কর্ডোভার রাজকীয় পাঠাগারে চার লাখ বই ছিল। ইবন রুশদ তখন সেখানে গ্রীক, ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় বিজ্ঞানে পাঠদান করতেন। যার কারণে সারা ইউরোপ থেকে পণ্ডিতরা কর্ডোভায় পড়তে যেতেন, যেমন আজকের দুনিয়ার মানুষ তাদের শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য আমেরিকায় যায়। আমরা আরব সংস্কৃতির কাছে বহুলভাবে ঋণী।"[১৬]

বর্তমান মুসলিম তরুণ সমাজকে অতীত ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে এবং স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে।

মুসলিম তরুণ সমাজকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি প্রথম যে ওহি নাযিল হয় তার প্রথম শব্দ ছিল, 'ইক্বরা' অর্থাৎ 'পড়'। এই 'পড়' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, পড়া ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া আল্লাহকে চেনা যায় না, আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা যায় না অর্থাৎ 'পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– এই বাক্য দ্বারা পড়ার মৌলিক দর্শন বাতলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আল্লাহকে জানা ও তাঁর কুদরত বোঝা-ই মানুষের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে।

---

১৪. আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১৫. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান।

১৬. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহকে জানতে হলে পড়তে হয়, জ্ঞানার্জন করতে হয়। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক জ্ঞানার্জন করা একজন মুসলমানের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা কুরআনের মধ্যেই দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির দিকনির্দেশনা আছে। দ্বিতীয়ত, কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা হিসেবে আল্লাহর রাসূলের সীরাত ও হাদীস পড়তে হবে। তৃতীয়ত, আক্বাইদ ও ফিকহ-এর মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। চতুর্থত, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে। কেননা মুসলমানদের অতীত ইতিহাস জানা না থাকলে ভবিষ্যতের পথ রচনা করা কঠিন। পঞ্চমত, আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। ষষ্ঠত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোনো একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে পারদর্শী হওয়া মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়াহ।

ইসলামের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের যেকোনো শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য যে বিষয়েই পড়াশোনা করা হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সওয়াব দান করবেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা আর দীনের প্রয়োজন পূরণের জন্য পড়াশোনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, দীনের জন্য সাধারণ যেকোনো বিষয় পড়াশোনা করতে যতটুকু সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় আল্লাহপাক তার জন্য প্রতিদান দেন। কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীস পড়লেও সওয়াব মেলে না। যেমন ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন করলে সওয়াব মিলবে না।[১৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, ইলম দুই প্রকার : উপকারী ইলম (অর্জনকারীর জন্য আখিরাতে উপকারী হবে), অনুপকারী ইলম (যা আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না)। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে আখিরাতে উপকারে আসবে এমন ইলম অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

২. প্রতিভা আল্লাহপ্রদত্ত আমানত : আল্লাহ তাআলা পরম অনুগ্রহ করে আমাদের প্রতিভা দিয়েছেন। প্রতিভা আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। এই আমানত যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। অন্যথায় আমাদের মেধা-হত্যা, মেধা-অপচয় ও মেধা-খেয়ানতকারী অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। আল্লাহ কাউকে অর্থ দিয়ে তা ইচ্ছেমতো ব্যবহার কিংবা অপচয় করা বৈধ নয় বলেছেন। তেমনি আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা নষ্ট কিংবা অপব্যবহার করার সুযোগ নেই। আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা আল্লাহর দীনের কাজে লাগানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

---

১৭. উল্লেখ্য, অনেকেই মনে করেন দীনি ইলম তথা কুরআন-হাদীস পড়াই উপকারী ইলম আর সাধারণ বিষয়াদি পড়াতে সওয়াব নেই। বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। সহীহ নিয়তে কুরআন পড়া সওয়াবের কাজ। কুরআনের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতে অন্তত দশটি নেকী আছে। অন্য বিষয়াদির শুধু শাব্দিক উচ্চারণে সওয়াব নেই। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে, কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে কুরআন শেখে তাহলে সে সওয়াব পাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি দীনের প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধারণ বিষয়াদি পড়াশোনা করে সে-ও সওয়াব পাবে। তাই আমাদের দীনের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

৩. প্রতিভা নষ্ট করা অপূরণীয় ক্ষতি : আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা নষ্ট করা শুধু একজন ব্যক্তির ক্ষতি নয়, এটা জাতিরও অপূরণীয় ক্ষতি। মনে করুন, কবি নজরুল ও আল্লামা ইকবাল যদি তাঁদের প্রতিভা বিকাশে সচেষ্ট না হতেন তাতে সমগ্র উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হতো, সমগ্র জাতি তাঁদের মহান অবদান থেকে বঞ্চিত হতো। এখন বলতে পারেন ইচ্ছে করলেই তো ইকবাল, নজরুল, মওদূদী, আলফে সানী, হাসানুল বান্না ও সাইয়েদ কুতুব হওয়া যায় না। হ্যাঁ, ইচ্ছে করলেই যদি নজরুল, ইকবাল হওয়া যেত তাহলে অনেকেই হয়ে যেতেন। এ কথা সত্য যে, আল্লাহ কিছু মানুষকে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশেষ যোগ্যতা দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোনো যোগ্যতাই দেননি, আপনার এ বদ্ধমূল বিশ্বাসের ভিত্তি কী? আল্লাহ তাআলা সকলকেই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অবদান রাখার মতো মেধা দিয়েছেন, আর সকলকেই আপন মেধার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যথায় ব্যক্তি ও উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

৪. মেধাহত্যা অপরাধ : আমরা অন্যায়ভাবে পশু, পাখি ও জীবজন্তু হত্যাকে অপরাধ বলে বিশ্বাস করি। কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে দুনিয়ার আদালতে জবাবদিহি করতে হয়, হত্যাকারীর শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়, সমাবেশ হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যাকারী সাজা পায়। অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণী হত্যা করা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ। অনুরূপভাবে মেধা হত্যা করাও বড় ধরনের অপরাধ। কেননা মেধা কারো ব্যক্তিগত সৃষ্টি নয়। প্রাণ যেমন আল্লাহর দান মেধাও আল্লাহ দান করেছেন। আল্লাহ যাদের বুদ্ধি-বিবেক দান করেননি তাদেরকে আমরা 'পাগল' বলে ডাকি। আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমাকে-আপনাকে পাগল করতে পারতেন। তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন। তাই আল্লাহপ্রদত্ত বুদ্ধি-বিবেক যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, অনেকেই প্রতিভা কাজে না লাগিয়ে প্রতিভা নষ্ট করেন। যারা এভাবে প্রতিভা নষ্ট করেন তারা শুধু "প্রতিভা নষ্টকারী নয়– তারা মেধা হত্যাকারীও"। মেধা হত্যাকারীরা দুনিয়ার আদালতে জিজ্ঞাসিত না হলেও আল্লাহর আদালতে জিজ্ঞাসিত হবে।

৫. প্রতিভা আল্লাহর নেয়ামত, কিয়ামতে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে : প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিভা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ও উম্মাহর প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে মেধা দান করেছেন। মানুষ কোন কাজে তার প্রতিভা ব্যবহার করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন, "এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৮]

আল্লাহ আমাদের হাত, পা, চোখ, কান, নাকসহ কী সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আলো, বাতাস, পানিসহ কত কিছুই দিয়েছেন। পাহাড়, পর্বত, বন-বনানী, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, পশু-পাখি সবই আল্লাহর নেয়ামত।

---

১৮. সূরা আত তাকাসুর ঃ ৮।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদের মেধা দান না করতেন তাহলে এসব কিছু মানবকল্যাণে ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এই কারণে মেধা আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। দুনিয়ার অন্য বস্তুর মতো প্রতিভা সম্পর্কেও আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা আমাদের যাকে যে ধরনের প্রতিভা দান করেছেন তা কাজে লাগানোর জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করা দরকার।

৬. সকলের প্রতিভা সমান নয় : আল্লাহ্ তাআলা সকলকে সমান প্রতিভা দান করেননি। অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ আছেন, যাঁরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে অনেককে সাহিত্য পুরস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীসহ কৃতী মানুষদের স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার প্রদান করেন। কিন্তু তাঁকে সাহিত্য রচনা করতে দিলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলে সাহিত্যচর্চা কিংবা শিক্ষকতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। অথচ রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে পুরস্কার প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন। কিন্তু কবি, সাহিত্যিক হয়ে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা দান করেননি। অনুরূপভাবে অনেক ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা রাজা-বাদশাহদের দোষত্রুটির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করে ইতিহাস লেখেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি ঐতিহাসিক, লেখক বা কলামিস্ট হিসেবে মানুষের আস্থাশীল হতে পারেন; কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর উপর মানুষের আস্থা না-ও থাকতে পারে। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা মূল্যায়ন করলে দেখা যায় আল্লাহ্ তাআলা সকলকে সমান প্রতিভা দান করেননি।

৭. সকলের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে : ইতঃপূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সকলকে সমান যোগ্যতা দান করেননি। তবে কিছু মানুষ আছে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন, রাজনৈতিক ময়দান, বক্তৃতা, লেখনী, শিল্পসাহিত্য সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার মতো যোগ্যতা আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের দান করেছেন। আবার কেউ কেউ আছেন শুধু কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখার মতো যোগ্যতা আছে। যেমন কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনায় রেজাল্ট ভালো করতে পারে না, কিন্তু সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সাংবাদিকতায় ভালো করতে পারে। আবার কেউ মানুষের সাথে মিশতে পারেন, কিন্তু দুই-এক লাইন লেখার যোগ্যতা নেই। আবার কেউ আছেন পড়াশোনায় ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা কিংবা বি.সি.এস দিয়ে সরকারি চাকরিতে ঢোকার মতো প্রতিভা আছে কিন্তু কারো সামনে কিছু বলার যোগ্যতা নেই। আবার কেউ আছেন উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আরও বেশি অবদান রাখার মতো যোগ্যতা আছে; কিন্তু মানুষের সাথে মেশার যোগ্যতা নেই। এই যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বহু ধরনের মানুষ রয়েছে তাদের সকলের প্রতিভার যথাযথ বিকাশের উপরই সমাজের উন্নয়ন নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ্ তাআলা যাকে যে ধরনের যোগ্যতা দিয়েছেন তা বিকশিত করার চেষ্টা করতে হবে। এটা সময়ের দাবি।

www.nagorikpathagar.com

যোগ্যতা অর্জন সময়ের দাবি

এই কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলিম তরুণ সমাজকে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার মতো যোগ্য হতে হবে। শুধু দেশ পরিচালনা নয়, বিশ্ব পরিচালনায় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এটা বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবি। কেননা−

১. যোগ্য লোকেরা ইসলামের উপকার বেশি করতে পারেন : ইসলামের জন্য অবদান রাখতে হলে যোগ্যতা থাকা দরকার। হযরত ওমর ফারুক (রা) ইসলাম কবুল করার পর ইসলামে গতিসঞ্চার হয়। এর কারণ হচ্ছে জাহেলী জমানায় তিনি ছিলেন তাদের যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত হামযা ও খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো যোগ্য এবং সাহসী মুসলমানরাই ইসলামের বিজয় নিশানা উড্ডীন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যোগ্য লোকেরা ইসলামের দাওয়াত কবুল করার পর দাওয়াতের শক্তি বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ -

"জাহেলী যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম প্রমাণিত হবে— যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে।"

মাওলানা আমিন আহসান ইসলামী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন :

"এ হাদীসে সেই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ... ইসলাম হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের মতো লোক পেয়ে গেল। একদিকে তাঁরা নিজেদের প্রতিভাবলে দাওয়াতের প্রাণসত্তাকে নিজেদের মধ্যে এমনভাবে নিলেন যে, তাঁরা নিজেরাই দাওয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকার হয়ে গেলেন। অপরদিকে নিজেদের উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক যোগ্যতার কারণে তাঁরা এতটাই শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, এই দাওয়াতের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ কায়েম করে তা পরিচালনা করেছেন এবং দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম বাস্তব দিক থেকে সবকিছু করতে চায়।"[১৯]

২. অযোগ্য লোকেরাই ইসলামের অপব্যাখ্যা করে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে : ইসলাম সঠিকভাবে বোঝার যাদের যোগ্যতা নেই তারাই ইসলামের অপব্যাখ্যা করে। তারা ইসলামকে সুন্দরভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারে না, তাদের কারণে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী মসনবীতে একটি চমৎকার গল্প তুলে ধরেন। তাঁর গল্পের সারকথা হলো :

এক গ্রামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তার কথা ছিল কর্কশ, উচ্চারণ ছিল ভুল। তিনি প্রতিদিনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আযান দিতেন। তার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে গ্রামের মানুষের

---

১৯. ইসলাহী. আমিন আহসান, ১৯৯২ দাওয়াতে দীন ও তার কর্মপন্থা, অনুবাদ : মুহম্মদ মূসা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী. পৃ-৫৩।

www.nagorikpathagar.com

মধ্যে বিরক্তি আসতো। কিন্তু তিনি আযান দিতেন বলেই কেউ কিছু বলার সাহস পেতো না। গ্রামের সবাই বসে সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে চাঁদা তুলে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাহলে অন্তত কিছু দিন তার কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না। সিদ্ধান্ত অনুসারে চাঁদা তুলে তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এতে লোকটি ভীষণ খুশি হলেন।

মক্কা যাওয়ার পথে লোকটি এক মসজিদে উপস্থিত হন এবং নামাযের ওয়াক্ত হতেই আযান দেন। লোকটি আযান দিয়ে নামাযশেষে মসজিদে বসে আছেন। এমন সময় এক ইহুদি অনেক মিষ্টি নিয়ে হাজির হলো। লোকটি এতো মিষ্টি জীবনে দেখেননি, তাই বেজায় খুশি হল। লোকটি ইহুদিকে মিষ্টি আনার কারণ জিজ্ঞাসা করার পর ইহুদি জানায়, আজ আমার পরিবারের সকলেরই ইসলাম কবুল করার কথা ছিল। কিন্তু আপনার আযানের কর্কশ স্বর শুনে সকলে মত পরিবর্তন করে ফেলে। এর দ্বারা আপনি আমার পরিবারকে রক্ষা করলেন। তাই খুশিতে মিষ্টি এনেছি।"[২০] এই গল্প থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো অযোগ্য লোকেরা দীনের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করে।

৩. সমাজ বিপ্লবের জন্য যোগ্যতা দরকার : কোনো একটি সমাজ পরিবর্তন করতে হলে যোগ্য লোক দরকার। যোগ্য লোকেরা সাধারণ মানুষদের আন্দোলনে সমবেত করতে পারেন, বিভিন্ন সন্দেহ, সংশয় ও প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে পারেন। ট্রেনের একটি ইঞ্জিনের পেছনে যেমন অনেক বগি থাকে, তেমনি একজন যোগ্য মানুষের পেছনে অনেক সাধারণ মানুষ ছুটে চলে। তাই সমাজ বিপ্লবের জন্য যোগ্য ও দক্ষ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন।

৪. সমাজ বিপ্লব টিকিয়ে রাখতে হলে যোগ্য মানুষ দরকার : যেকোনো দেশে সমাজ বিপ্লব সাধন করার চেয়ে বিপ্লব টিকিয়ে রাখা কঠিন। দুনিয়ার অনেক দেশে বিপ্লব সাধনের পরও তা যোগ্য লোকের অভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। মাওলানা ইসলাহী এ প্রসঙ্গে রুশ বিপ্লবের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন, "রুশ বিপ্লব শেষ হওয়ার পর যাদের হাতে ক্ষমতা আসে তারা মোটেই জানত না যে, নিজেদের মতাদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা কীভাবে চালাতে হবে। ফল হলো এই যে, আগুন ও রক্তের হোলিখেলা করে তারা যে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছে তা নিজেরাও সামলাতে পারল না। বরং তা সামলানোর জন্য সেই লোকদের ওপর ন্যস্ত করতে হলো, যাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। এই গ্রুপটি জনতার হট্টগোলে প্রভাবিত হয়ে এই নতুন মতবাদের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেদের মনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণা ও শত্রুতা লুকিয়ে রেখেছিল। এ কারণে তারা এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে মোনাফেকী পন্থায় ব্যবহার করেছিল এবং তাদের হাতে এই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই পরিণতি হলো, যা কোনো মোনাফেকী পন্থা অবলম্বনকারীদের হাতে হয়ে থাকে।"[২১]

---

২০. মাওলানা রুমী, পৃ-১৪।

২১. ইসলাহী পৃ-৫২।

www.nagorikpathagar.com

৫. যোগ্যতা ছাড়া কিছুই করা যায় না : যেকোনো কাজ করতে যোগ্যতার দরকার হয়। ছোটখাটো কোনো কাজও যোগ্যতা অর্জন ছাড়া করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে নামাযের ইমামতির জন্য ব্যক্তিকে কিছু যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়, ইসলামী খেলাফত পরিচালনার জন্য খলীফার কিছু মৌলিক যোগ্যতা থাকতে হয়। বিচার করার জন্য বিচারকের কিছু মৌলিক যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। ফতোয়া দেওয়ার জন্য মুফতীর যোগ্যতা থাকা দরকার।[২২] ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ইজতিহাদ করার জন্য ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা থাকতে হয়। অনুরূপভাবে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা থাকতে হয়। ডাক্তারি করার যোগ্যতা ছাড়া প্রেসক্রিপশান দেওয়া যায় না, প্রকৌশলী হওয়া ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারি করা যায় না। সাংবাদিকতার যোগ্যতা ছাড়া সংবাদপত্রে কাজ করা যায় না। প্রশাসনিক যোগ্যতা ছাড়া প্রশাসন এবং সাংগঠনিক যোগ্যতা ছাড়া সংগঠন চালানো যায় না। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সকল কাজের জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতার দরকার হয়।

৬. অযোগ্য লোকের হাতে কিছুই নিরাপদ নয় : ইমামতির যোগ্যতা ছাড়া কেউ নামায পড়ালে নামায নষ্ট হয়। ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতা ছাড়া শরীআতের কোনো বিষয়ে মতামত দিলে সঠিক ফতোয়া পাওয়া যায় না। ডাক্তারির যোগ্যতা ছাড়া চিকিৎসা করলে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়। ড্রাইভিংয়ের যোগ্যতা ছাড়া গাড়ি চালালে যাত্রীদের জীবন নষ্ট হয়।

অনুরূপভাবে সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা ছাড়া সমাজের নেতৃত্ব কারো উপর অর্পিত হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে, তার পক্ষে সঠিকভাবে সমাজ পরিচালনা সম্ভব হয় না।

একটি বাস্তব উদাহরণ : পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, "একটি বাসের ড্রাইভারের পরিবর্তে হেলপার গাড়ি চালিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে গাড়িটি একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এতে অনেক প্রাণহানি হয়, প্রচুর আহত হয়।" এই দুর্ঘটনার কারণ কী? নিশ্চয়ই সবাই বলবেন চালকের অযোগ্যতা। বাংলাদেশে অযোগ্য ড্রাইভারের কারণে প্রতিনিয়ত এই ধরনের অনেক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে সমাজ পরিচালকদের অযোগ্যতার কারণে সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

আরেকটি উদাহরণ : একটি কম্পিউটারে ভাইরাস দেখা দেওয়ার পর কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা নেই এমন একজন ব্যক্তি কম্পিউটারের বিভিন্ন পার্টস খুলে ভাইরাস চেক করতে আরম্ভ করে। কম্পিউটারের ভাইরাস কীভাবে সারতে হয় তার সেই জ্ঞান না থাকার ফলে কম্পিউটার খুলে পুরো কম্পিউটারই নষ্ট করে ফেলে। এর কারণ কী? নিশ্চয়ই সবাই বলবেন দক্ষতা ছাড়া কম্পিউটার ঠিক করতে চেষ্টা করায় কম্পিউটার নষ্ট হয়েছে।

---

২২. যে কেউ যেকোনো বিষয়ে ফতোয়া দিতে পারে না।

www.nagorikpathagar.com

৭. অযোগ্য ব্যক্তিকে ভালোবাসা যায় কিন্তু দায়িত্ব দেওয়া যায় না : একজন শিশুর নিজের শরীরের যত্ন নেওয়ার যোগ্যতা নেই বলেই অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। তাকে সবাই ভালোবাসে কিন্তু কেউ কোনো দায়িত্ব দেয় না। অনুরূপভাবে একজন সৎ ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভালোবাসে। কিন্তু সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা ছাড়া সামাজিক দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করতে চায় না। এই কারণে দেখা যায় অনেক কবি, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, শিল্পী ও মসজিদের ইমামকে সবাই ভালোবাসেন; কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়ালে ভোট দেন না। কয়েক কোটি ভক্ত আছে এমন ব্যক্তিরা ভোটে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার ভোট পাওয়ার ইতিহাস এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে। ভালোবাসা ও দায়িত্ব দেওয়া এক কথা নয়।

৮. দায়িত্ব দেওয়ার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ খোঁজা হয় ঃ অযোগ্য ব্যক্তিকে কেউ কোনো দায়িত্ব দিতে চায় না। ঘরের ইলেক্ট্রনিক কোনো কিছু নষ্ট হলে মেকারের কাছে নেওয়া হয়। ঘর নির্মাণ, পেইন্টিং, আসবাবপত্র তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিকে খোঁজা হয়। কারো যদি ফুলের বাগান থাকে তবে বাগান পরিচর্যা করার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই মালী নিয়োগ করা হয়।[২৩]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। এই কারণে চাকরির বিজ্ঞাপনে চাকরিপ্রার্থীদের কী ধরনের যোগ্যতা থাকা দরকার তার উল্লেখ থাকে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলে চাকরির আবেদনও করা যায় না। আর স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি বা রাজনৈতিক কারণে অযোগ্য লোককে চাকরি দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কেইস স্টাডি-ক : কোনো একটি ব্যাংকে চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কমার্সের ছাত্রদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন সাবজেক্টে অধ্যয়নকারী অনেকেই আবেদন করেছে। আবেদনপত্র বাছাই করে শর্ট লিস্ট করার দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে। আপনি শর্ট লিস্ট করার সময় কাদের অগ্রাধিকার দেবেন?

কেইস স্টাডি-খ : ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক পদে চাকরির জন্য কলেজের প্রতিষ্ঠাতার একজন নিকটাত্মীয় আবেদন করেন। অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিকটাত্মীয়কে চাকরি দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষের পিতা সুপারিশ করেন। অধ্যক্ষ ইন্টারভিউ নিয়ে দেখলেন যে, তাঁর আত্মীয়ের একাডেমিক যোগ্যতা ভালো নয়। এই কারণে তিনি তাঁর পিতাকে এই কথা জানালেন যে, "আমি তাকে প্রতি মাসে চাকরির অনুরূপ পরিমাণ বেতন দেব; কিন্তু চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বিনা কাজে প্রতি মাসে টাকা দিলে আমার চার হাজার টাকা লোকসান যাবে। তাকে চাকরি দিলে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হবে অনেক বেশি।" আপনি কি মনে করেন অধ্যক্ষ নিকটাত্মীয়কে চাকরি না দিয়ে সঠিক কাজ করেছেন? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে কেন?

---

২৩. এই বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রহ) তার 'ভাঙ্গা ও গড়া ' বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.com

আর যদি উত্তর 'নেতিবাচক' হয় তাহলে কি মনে করেন আত্মীয়তার সূত্র ধরে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলে প্রতিষ্ঠান টেকানো সম্ভব?

কেইস স্টাডি-গ : আপনার বাড়ির পাশে একটি মসজিদ আছে। মসজিদে একজন ইমাম দরকার। আপনার গ্রামে দু'জন ছাত্র আছে। একজন মাদরাসায় কামিল পড়াশোনা শেষ করেছে এবং কুরআন তেলাওয়াত সহীহ্ আছে। আরেকজন কম্পিউটার সাইন্সে মাস্টার্স পড়েছে। এই দুজনের মধ্যে কাকে মসজিদের ইমাম নিয়োগ দেওয়ার কথা ভাববেন এবং কেন?

কেইস স্টাডি-ঘ : আপনার একটি কম্পিউটার আছে। কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কম্পিউটার অন করার পর আর কাজ করে না। কম্পিউটারে আপনার অনেক জরুরি ফাইল আছে। আপনার গ্রামে দু'জন ছাত্র আছে। একজন মাদরাসায় কামিল পড়াশোনা শেষ করেছে। আরেকজন কম্পিউটার সাইন্সে মাস্টার্স পড়েছে। এই দুইজনের মধ্যে কাকে আপনার কম্পিউটার দেখানোর কথা ভাববেন এবং কেন?

কেইস স্টাডি-ঙ : আপনার ছোট ভাই খুব অসুস্থ। অসুস্থতায় কাঁদছে। আপনার গ্রামে একজন ডাক্তার আর একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে। আপনি ছোট ভাইকে নিয়ে কার কাছে যাবেন?

আমরা জানি, রোগী দেখানোর জন্য কেউ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যায় না, ডাক্তারের কাছেই যায়। এর কারণ হলো ইঞ্জিনিয়ারের আরেক ফিল্ডে অনেক যোগ্যতা আছে সত্য কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্সে তাঁর জ্ঞান নেই। তাই মেডিক্যাল সাইন্স পড়াশোনা না করার কারণে অনেক যোগ্যতা থাকার পরও ইঞ্জিনিয়ারের কাছে রোগী দেখানোর জন্য কেউ যায় না। অনুরূপভাবে নির্মাণ কাজের জন্য মানুষ ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছেই যায়। এ থেকে দু'টি বিষয় পরিষ্কার হয় : ১. যেকোনো দায়িত্ব দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালনের উপযোগী যোগ্যতা যার আছে তার কাছেই মানুষ যায় এবং ২. কোনো একজন মানুষ এক ফিল্ডে খুবই যোগ্য আবার আরেক ফিল্ডে অযোগ্য হতে পারেন।

৯. যোগ্য মানুষের কাছে সবাই ছুটে যায় : মানুষ যোগ্য মানুষের কাছেই ছুটে যায়। কারো আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে আইনজীবীর কাছে যায়। ফতোয়ার প্রয়োজন হলে ওলামায়ে কেরামের কাছে যায়। অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যায়। এভাবে যোগ্য মানুষেরা সমাজের প্রয়োজন পূরণে ভূমিকা পালন করে বলেই তাদের কাছে মানুষ ছুটে যায়। আর অযোগ্য মানুষের কাছে কেউ যায় না। তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। আর যোগ্য মানুষেরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকে না, তারা সমাজের অগণিত মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখেন। একজন যোগ্য মানুষকে চাকরি দেওয়ার জন্য চাকরি প্রদানকারী অনেক সংস্থা তার পিছনে ঘোরে। আর অযোগ্য মানুষেরা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরলেও চাকরি পাওয়া দুষ্কর[২৪]। যোগ্য মানুষেরা একসাথে অনেক

---

২৪. বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যোগ্যতার বাছবিচার অনেক সময় করা হয় না। এটা সমাজের জন্য কাম্য নয়।

www.nagorikpathagar.com

চাকুরির অফার পায়, আর অযোগ্য মানুষ যে পদে থাকে তা টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হয়ে পড়ে। যোগ্য মানুষেরা পরোপকার করে, আর অযোগ্য মানুষেরা অন্যের বোঝা হয়ে থাকে।

১০. শুধু যোগ্যতা নয়, সততা ও যোগ্যতার সমন্বয় দরকার : এ কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, অযোগ্য লোককে কোনো ধরনের দায়িত্ব দেওয়া নিরাপদ নয়, দায়িত্ব দিলে তার পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না। আবার সততা ছাড়া শুধু যোগ্যতা থাকলেও লাভ নেই। একজন যোগ্য অসৎ মানুষ যোগ্যতার সাথে অনিয়ম ও দুর্নীতি করে সরকারি বা বেসরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে।

কেইস স্টাডি-ক : একজন বাস ড্রাইভারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। বিজ্ঞাপন অনুসারে দুজন ব্যক্তি আবেদন করে। তাদের একজন অসৎ ও মাদকাসক্ত কিন্তু ড্রাইভিং ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা আছে। আর দ্বিতীয়জন সৎ কিন্তু ড্রাইভিং ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা নেই। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেন ড্রাইভার হয়ে যাত্রীদের জীবন হুমকির সম্মুখীন করতে না পারে এই উদ্দেশ্যেই তিনি ড্রাইভার হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। নির্বাচনী বোর্ড একজন সৎ ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সৎ ব্যক্তির যোগ্যতা নেই। আবার সৎ ব্যক্তিকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করা কিংবা পুনঃবিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় নেই। জরুরি ভিত্তিতেই ড্রাইভার নিয়োগ করতে হবে। এমতাবস্থায় নির্বাচনী বোর্ড কী করবে? সৎ অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলে তার পক্ষে ড্রাইভিং করাই সম্ভব নয়। যোগ্যতাসম্পন্ন অসৎ ব্যক্তিকে ড্রাইভার নিয়োগ করলে গাড়ি চালাতে পারবে কিন্তু তেলের পয়সা চুরি করবে, মাদকাসক্ত হয়ে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে।

উপরিউক্ত কেইস স্টাডি থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, দেশ পরিচালনার জন্য সততা ও যোগ্যতা উভয়ই দরকার। সততা ও যোগ্যতা ছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। যোগ্যতাবিহীন সততা আর সততাবিহীন যোগ্যতার মূল্য নেই। সৎ ও যোগ্য মানুষ পাওয়া গেলে মানুষ তাকেই দায়িত্ব দিতে চায়। কিন্তু এই ধরনের মানুষ পাওয়া না গেলে যার যোগ্যতা আছে তাকেই দায়িত্ব প্রদান করে।

কেইস স্টাডি-খ : একজন সৎ ব্যক্তিকে একটি ইলিশ মাছ কেনার জন্য পাঁচশত টাকা দেওয়া হলো। তিনি বাজারে গিয়ে দোকানদারকে বললেন "একটি ভালো ইলিশ মাছ দাও।" দোকানদার তাজা বলে পচা মাছ দেয়। কিন্তু তিনি ভালোভাবে না দেখে দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করে পচা মাছ নিয়ে আসেন। তিনি কষ্ট করে পায়ে হেঁটে মাছ আনতে যান এবং যত টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে শুধু তারই ভাউচার প্রদান করেন এবং বাকি টাকা ফেরত দিয়ে দেন। আর আরেকজন যোগ্য, অসৎ মানুষকে পাঁচশত টাকা দেওয়া হয়। তিনি বাজারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন কম দামে ভালো মাছ কোথায় পাওয়া যায়। যাচাই-বাছাই করে কম দামে ভালো মাছ কেনার চেষ্টা করেন, ৩৫০ টাকা দিয়ে মাছ খরিদ করেন; কিন্তু পাঁচশত টাকারই ভাউচার প্রদান করেন। প্রথম ব্যক্তি কোনো টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করেননি; কিন্তু তার কেনা মাছ খাওয়া সম্ভব হয়নি, বরং ঘর গন্ধ হয়েছে, পেট খারাপ হয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কেনা মাছ খাওয়া সম্ভব

www.nagorikpathagar.com

হয়েছে। তবে সে টাকা আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু তা প্রমাণ করার সুযোগ নেই। উভয় ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথমজনের কেনা মাছ খাওয়া যায়নি তাই পুরো টাকাই অপচয় হয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা আত্মসাৎ করেছে সত্য, কিন্তু তার কেনা মাছ ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

একজন সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতে কোনো দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কাকে বাছাই করবে? উভয় ধরনের ব্যক্তির মধ্যে কার হাতে অর্থনৈতিক ক্ষতি বেশি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? প্রথমজনের কাছে টাকা-পয়সাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র আমানত রাখা যায়, কিন্তু টাকা খরচ করার দায়িত্ব দেওয়া যায় না। আর দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তির কাছে টাকা-পয়সা আমানত রাখা নিরাপদ নয়, কিন্তু দায়িত্ব দেওয়া যায়। তবে দায়িত্ব পালন করাকালে কৃত অনিয়ম ও দুর্নীতির খেসারত দিতে হয় পুরো জাতিকে। সাধারণ কী চায়? মানুষ সৎ ও যোগ্য লোকের হাতেই দায়িত্ব দিতে চায়। এজন্য বর্তমান তরুণ সমাজকে সততা ও যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে সমাজ পরিচালনার উপযোগী যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

কেইস স্টাডি-গ : বাংলাদেশের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম শমশের আলী ২০০২ সালের ২৮ মার্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে[২৫] বলেন, “আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার কাজে আমরা পৃথিবীর সব জাতির কাছ থেকেই অভূতপূর্ব সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর সারাবিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে যে ৭৫ হাজার কোটি টাকার সাহায্য প্রদান করেছিল, তা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্শাল প্ল্যানের আওতায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠিত করার জন্য যে সাহায্য করা হয়েছিল তারচেয়েও বেশি ছিল। এত টাকা-পয়সা পাওয়ার পরও আমরা দেশটাকে ভালোভাবে গড়তে পারলাম না কেন, এ প্রশ্ন অনেকেরই। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আরেকটি প্রশ্ন করা দরকার। তা হলো, ‘কারা এই টাকাটা হ্যান্ডেল করেছিলেন?’ এই টাকা তো দেশের শ্রমিকরা খরচ করেনি, কৃষকরা খরচ করেনি, জেলে-তাঁতিরা খরচ করেনি, মাঝি-মাল্লারা খরচ করেনি। এই টাকা খরচ করেছিলাম আমরা তথাকথিত ডিগ্রিধারী শিক্ষিত লোকেরাই।”

উপরিউক্ত কেইস স্টাডিকে সামনে রেখে আপনার মন্তব্য বলুন, কেন আমরা এত সাহায্য পাওয়ার পরও আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছি– এর জন্য কারা দায়ী এবং কেন দায়ী?

আমরা উপরিউক্ত কেইস স্টাডির আলোকে এ কথা বলতে পারি, শুধু শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ বেশি হলেই দেশের উন্নয়ন হয় না। দেশের উন্নয়নের জন্য নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত সুশিক্ষিত যোগ্য মানুষের দরকার। আমরা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করার জন্য এত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পরও

---

২৫. ড. এম শমশের আলী ২০০২ ইং সালের ২৮ মার্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য, পৃ-২.

www.nagorikpathagar.com

কেন দেশকে গড়তে পারলাম না– এ প্রসঙ্গে ড. এম শমশের আলী যথার্থই বলেছেন, "আমাদের দেশপ্রেমের অভাবে, আমাদের নৈতিকতার অভাবে, মূল্যবোধের অভাবে আমরা দেশ গড়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারলাম না। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা বিশ্ববাসীর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। এই অবস্থারই প্রতিফলন দেখা যায় পরবর্তীকালের অনেক ঘটনাতেই। উদাহরণস্বরূপ সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিদেশী যেসব সরকার ও সংস্থা বাংলাদেশকে সাহায্য পাঠিয়েছে, তা তারা বাংলাদেশের সরকারকে না দিয়ে তাদের মনোনীত কতগুলো এনজিওর মারফত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। সরকারের জন্য এরচেয়ে বিব্রতকর অবস্থা আর কী হতে পারে? সরকারের প্রশাসনযন্ত্র যেসব শিক্ষিত লোকের দ্বারা পরিচালিত, তারা যে কতটুকু সৎ, সরকার তা ভালোভাবেই জানে। আর জানে বলেই মুখ বুজে অপমান সহ্য করতে বাধ্য হয়। সরকারের মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকতো, তাহলে সরকার মেরুদণ্ড সোজা করেই বলতে পারতো যে, যে সাহায্যের ব্যবস্থাপনায় তোমরা আমাদেরকে বিশ্বাস করো না, সেই সাহায্যের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এসব থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সরকারের মধ্যে যেসব কর্মচারী জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তারা যদি নৈতিকতা বিবর্জিত হন, তাহলে সরকারের পক্ষে শক্ত হাতে বিদেশীদের মোকাবিলা কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, দেশের মানুষের কাছেও সরকারকে হেনস্তা হতে হয়। আমাদেরনেতারা নেত্রীরা প্রায়শই বলেন, আমরা সোনার বাংলা গড়ব। কিন্তু সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার ছেলে দরকার। সেই ছেলে কোথায়?[২৬]

১১. বর্তমান মুসলিম তরুণসমাজকে সৎ ও যোগ্য হতে হবে : আমাদের সমাজে দুর্নীতি আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল যা হয় একটু উপঢৌকন দিলে তা অনেক কমিয়ে আনা যায়। এর ফলে দুর্নীতিবাজ কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কিছুটা আর্থিক লাভ হলেও জাতীয় রাজস্ব ঘাটতি হয়, পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৭] এ থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের অপসারণ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। কারণ একজন কর্মকর্তাকে অপসারণ করলে তার স্থলে আরেকজনকে বসাতে হবে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের চেয়ে বেশি দুর্নীতিবাজ হলে জাতির আরও বেশি ক্ষতি সাধিত হবে। এ থেকে স্পষ্ট যে, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ করলেই দুর্নীতি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না। কারণ আরেকজন সৎ ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করা না গেলে সরকারি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে। তাই এ কথা বলিষ্ঠতার সাথে বলা যায় যে, "দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে হলে দুর্নীতিমুক্ত থেকে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার সাথে প্রশাসন পরিচালনা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদেরই বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত হতে হবে।"[২৮] অতএব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে

---

২৬. ড. এম শমশের আলী, প্রাগুক্ত ২-৩।

২৭. আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতির দুরবস্থার জন্য অনিয়ম ও দুর্নীতি দায়ী। লজ্জার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ কয়েকবার দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান লাভ করে।

২৮. আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

www.nagorikpathagar.com

শুধু মিছিল নয়, দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত থেকে যোগ্যতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন এমন লোক নিয়োগ দেওয়া সময়ের দাবি। কারণ স্লোগান দিয়ে, আন্দোলন করে দুর্নীতিবাজ একজন কর্মকর্তাকে অপসারণ করা যায়, কিন্তু তার স্থলে সৎ ও যোগ্য কাউকে বসাতে না পারলে জাতির লাভ নেই। এর অর্থ এই নয় যে, অনিয়ম ও দুর্নীতি চোখ বন্ধ করে সহ্য করতে হবে। মুনকার তথা অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর হাদীসে বর্ণিত নীতি অনুসারেই একজন মুসলিম তরুণকে ভূমিকা রাখতে হবে।[২৯]

উপসংহারে বলা যায়, আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের যুগে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে হলে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। বৈষয়িক যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতাবিহীন সৎ ব্যক্তি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন; কিন্তু তাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তম নাগরিক হতে পারবেন; কিন্তু উত্তম শাসক বা পরিচালক হতে পারবেন না। মূলত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যাঁরা সামিল হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুবকরের মতো প্রজ্ঞাবান, ওমরের মতো প্রজাবৎসল শাসক, ওসমানের মতো দানশীল বিত্তবান ও আলীর মতো জ্ঞানী ব্যক্তিরা সামনের কাতারে ছিলেন। বর্তমান সময়েও সফল ইসলামী বিপ্লবের জন্য জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, কূটনৈতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজসেবক, প্রশাসক সবই প্রয়োজন। এসব ময়দানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মতো কিছু ব্যক্তি তৈরি না হলে নিছক রুটিন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে সমাজ বিপ্লব আশা করা যায় না। আবার জনগণের সমর্থন অর্জন করতে না পারলে যোগ্য ব্যক্তিরাও সমাজ পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য গণমুখী সামাজিক নেতা ও দক্ষ প্রশাসনিক নেতৃত্ব প্রয়োজন।

---

২৯. অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে উগ্রতা প্রদর্শন করার সুযোগ নেই, আবার চুপ থাকাও যুক্তিযুক্ত নয় । হাদীসে রাসূলের আলোকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে একজন মুমিনের তিনটি পর্যায় উল্লেখ আছে। অন্যায়কে মনে মনে ঘৃণা পোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির কাজটি প্রথম করতে হবে। তারপর শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এবং তা বন্ধের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঈমান- আকীদার পরিপন্থী বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনও প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ইস্যুকে সামনে রেখে, দলমত নির্বিশেষে কমন প্লাটফরম করে ভূমিকা রাখা যায়। যেমন দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নতি প্রতিরোধ কমিটি, ইসলামী আদর্শবিরোধী কিছু হলে 'অনৈসলামিক কার্যকলাপ দমন কমিটি, দেশের জন্য 'দেশ বাঁচাও জাতি বাঁচাও' ইত্যাদি নামে সাময়িক ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কখনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে কিংবা হরতালের রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়া কল্যাণকর নয়। সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে লেখালেখি, জনমত গঠন ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

কোন্ ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে

১. মানবকল্যাণে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে : আল্লাহ পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

"তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন।"[৩০]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল কিছু মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি বাহ্যদৃষ্টিতে ক্ষতিকর প্রাণীও মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩১] এসব কিছু মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হলে ব্যবহার করার মতো যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে।

আল্লাহ পৃথিবীতে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। মুসলিম দেশসমূহেও তেল, খনিজ পদার্থ, তুলা ও স্বর্ণসহ অনেক সম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশেও সম্পদের অভাব নেই। অভাব হচ্ছে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার মতো প্রযুক্তি থাকলে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক উন্নতি লাভ করতে পারতাম। বাংলাদেশের রাঙামাটিতে অনেক ফল পচে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাতকরণ এখনও সম্ভব হয়নি। তেল ও গ্যাস কাজে লাগানোর মতো প্রযুক্তি আমাদের হাতে নেই, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। নদ-নদীতে প্রচুর মাছ আছে। তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্য তাদের সম্পদকে যেভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম, সে তুলনায় আমরা আমাদের মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাতে পারছি না।

লন্ডন শহরের কোথাও কোথাও টেমস নদীর তলদেশে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলপথ আছে। কিছু কিছু স্থানে রাস্তার নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলপথ, উপরে ব্রিজ আর ব্রিজের উপর অফিস ও প্রাসাদ দেখা যায়। অর্থাৎ একটু জায়গা (আন্ডারগ্রাউন্ড, নদী হিসেবে নৌযান চলাচলে ব্যবহার, ব্রিজ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে) নানা কাজে ব্যবহার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। আমাদের দেশেও প্রচুর জায়গা আছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ আছে। আমাদের মানবসম্পদকে বোঝা মনে না করে সৎ, যোগ্য ও দক্ষরূপে গড়ে তুলে আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যেতো। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর মতো যোগ্য হতে হবে। এর জন্য আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক

---

৩০. বাকারা ঃ ২৯।

৩১. সাপের তেল অনেক মূল্যবান। এটা মানুষের অনেক রোগ নিরাময়ে কাজে লাগে।

www.nagorikpathagar.com

সম্পদ নিয়ে গবেষণা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۔ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۔

"পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া-আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন।"[৩২]

২. **ইসলামী সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে :** জ্ঞান ও মৌলিক যোগ্যতা থাকলে সাধারণ সমাজ পরিচালনা করা যায়। কিন্তু ইসলামী সমাজ পরিচালনা করতে হলে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাই একজন মুসলিম তরুণকে শুধু বস্তুগত যোগ্যতার অধিকারী হলেই চলবে না, ইসলামী নৈতিক গুণাবলি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি হতে হবে। সৎ ও যোগ্য লোক ছাড়া ইসলামী সমাজ পরিচালিত হতে পারে না। ইসলামী সমাজের পরিচালকরা শুধু দুনিয়াবী যোগ্যতার অধিকারী হন না, তাঁদের মনের মধ্যে সব সময় আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। আবার শুধু আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকলেই সমাজ পরিচালনা করতে পারেন না, সমাজ পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হয়। উড়োজাহাজ চালানোর ট্রেনিং ছাড়া কারো পক্ষে উড়োজাহাজ চালানো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে সমাজ পরিচালনা করার মতো সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোক থাকলেই ইসলামী সমাজ বিপ্লব সাধিত হবে। বর্তমানে এ ধরনের দক্ষ লোক অন্যদের কাছে বেশি থাকায় তারা সমাজ পরিচালনা করছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ইসলামী নৈতিক গুণাবলি না থাকায় সমাজে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিরাজমান। দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর সমাজ উপহার দিতে হলে সততা ও যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে একদল তরুণকে দেশ পরিচালনার যোগ্য হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তখনই আল্লাহ্ আমাদের হাতে সামাজিক নেতৃত্ব দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۔

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তদানুযায়ী সৎকাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের তিনি পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদের তিনি দান করেছিলেন। আর যে দীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার শিকড় গভীর তলদেশে বদ্ধমূল করে দেবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দেবেন।" (সূরা নূর : ৫৫)

---

৩২. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০।

www.nagorikpathagar.com

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, দীনের বিজয়ের জন্য দীন প্রতিষ্ঠাকর্মীদের সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা থাকতে হবে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ব্যক্ত করলেই সমাজ পরিবর্তন হয়ে যায় না। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন : "যারা সত্যিই একটি ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চান তাদের সর্বপ্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের জাতির মধ্যে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার মোটেই অভাব নেই। আসল অভাব আগ্রহ ও উদ্যোগের এবং তারচেয়েও বেশি অভাব যোগ্যতার। এ কাজের জন্য যে মৌলিক গুণাবলির প্রয়োজন অধিকাংশ লোকের মধ্যে তা অনুপস্থিত।"[৩৩]

ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য এই আন্দোলনের কর্মীদের ইসলামের যথার্থ জ্ঞান থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন :

"এই কাজের জন্য ইসলামের নিছক সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট নয়, বরং কমবেশি বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এর স্বল্পতা ও বিপুলতা মানুষের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এজন্য এ পথের প্রত্যেকটি পথিককে এবং আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে মুফতি বা মুজতাহিদ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই ইসলামী আকাইদ-বিশ্বাসকে জাহেলী চিন্তা-কল্পনা ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের নীতি-পদ্ধতি থেকে আলাদা করে জানতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম মানুষকে কী পথ দেখিয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারে না এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য যথার্থ পথে কোনো কাজ করতেও সক্ষম হয় না। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান এমন পর্যায়ে থাকতে হবে, যার ফলে তারা গ্রাম ও শহরের লোকদের সহজ সোজাভাবে দীনের কথা বোঝাতে সক্ষম হবে। কিন্তু উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান অধিক মাত্রায় থাকতে হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। শিক্ষিত লোকদের সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসন করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে। ইসলামের আলোকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও শিল্পকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে বিন্যস্ত করতে হবে। ইসলামের অনাদি ও চিরন্তন ভিত্তির উপর একটি নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক চিন্তা ও কর্মের ত্রুটিপূর্ণ অংশকে ত্রুটিহীন অংশ থেকে আলাদা করার মতো যোগ্যতা তাদের থাকতে হবে এবং এর সাথে যা কিছু ভাঙ্গার তা ভেঙ্গে ফেলে তদস্থলে উন্নততর বস্তু গড়ার এবং যা কিছু রাখার তা কায়েম রেখে একটি উত্তম ও উন্নততর ব্যবস্থায় তাকে ব্যবহার করার মতো গঠনমূলক যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী তাকে হতে হবে।"[৩৪]

---

৩৩. মওদূদী, সা. আ. আ. (১৯৯৫), ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলি, আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনী. পৃ-৫।

৩৪. প্রাগুক্ত ১০-১১।

www.nagorikpathagar.com

৩. আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে : আধুনিক যুগ হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্য অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের সাথে টেক্কা দিয়ে বিজয় অর্জন করতে হলে মুসলিম উম্মাহকেও তথ্য ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। তাদের কূটকৌশল মোকাবিলা করার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এই কথাই আল্লাহ তাআলা এভাবে ইরশাদ করছেন :

أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۔

"শত্রুর মোকাবিলার জন্য যত বেশি সম্ভব যুদ্ধসরঞ্জাম ও সদা প্রস্তুত অশ্ববাহিনী সংগ্রহ করে রাখো। এসব নিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের এবং তারা ছাড়া আরো কিছু লোককে যাদের তোমরা চেন না, আল্লাহ চেনেন তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিতে পারবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে। তোমাদের উপর কোনোক্রমেই জুলুম করা হবে না।"

(সূরা আনফাল : ৬০)

আল্লাহ এখানে কুওয়াত বা শক্তি অর্জনের কথা বলেছেন। বর্তমানে আধুনিক যে সমরাস্ত্র আছে তার শক্তি, জ্ঞানের শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি সকল ধরনের শক্তি অর্জন এর অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ শক্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর রাসূল (স)-এর যুগে তীর ও অশ্ব যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন ছিল তাই তিনি তা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সময় বৈষয়িক প্রস্তুতি কাফেরদের তুলনায় কম থাকলেও এমনটি কখনো ঘটেনি যে, তিনি আদৌ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি। আজকের যুগে আমাদের শত্রুরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। তারা বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। তাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে হবে। আমাদের আবিষ্কার তাদের আবিষ্কারের চেয়ে উন্নত হলে তারা আমাদের শারীরিক যুদ্ধে যেভাবে কাবু করছে তা করার সাহস পাবে না। আর আমাদের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে সময় দিতে হচ্ছে, সেভাবেই আমাদের শত্রুরা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তাই আমি মনে করি শারীরিক জিহাদে বিজয় লাভ করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে বিজয়ী হওয়াও জরুরি।

মুসলিম তরুণ সমাজকে বর্তমান প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করার জন্য অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে, অনেক শক্তির অধিকারী হতে হবে। কারণ বর্তমান সমাজের শিকড় অনেক গভীরে। এর শাখা-প্রশাখা শিল্প, কলা, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তাই এর শিকড় উৎপাটনের জন্য প্রচণ্ড শক্তির দরকার, অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন। আমরা দেখি সামান্য বাতাসে গাছের পাতা নড়ে কিন্তু গাছ নড়ে

www.nagorikpathagar.com

না। গাছ শিকড়সহ উৎপাটন করার জন্য টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের প্রয়োজন, বিপুল শক্তির দরকার। তেমনি এ সমাজ পরিবর্তন করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের বিপুল শক্তির অধিকারী হতে হবে। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে জাগতিক শক্তির তুলনায় আত্মিক শক্তি অর্জন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়া ছাড়া এক কদম ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। দুনিয়ার সাধারণ সমাজ বিপ্লব শুধু বস্তুগত শক্তির বলে সফল হতে পারে। কিন্তু ইসলামী সমাজ বিপ্লব আত্মিক শক্তি ছাড়া সফল হওয়ার ইতিহাস নেই। আবার বস্তুগত উপায়-উপকরণের প্রয়োজনীয়তা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। আল্লাহর রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে যেসব যুদ্ধ হয়েছে সে ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল (স) সেজদায় অবনত হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছেন। আর মুসলমানরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী দানের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। অতএব মুসলিম তরুণ সমাজকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। যারা বাতিলের বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে চলেন আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। আর আল্লাহ যাদের সাহায্য করেন তাদের রুখে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ -

বর্তমান যুগের মুসলিম তরুণ সমাজ যদি আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্য মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও ইসলামী সমাজ পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলেই মুসলমানদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। বিজয়ের জন্য সংখ্যা বিষয় নয়, ঈমান ও যোগ্যতাই আসল ফ্যাক্টর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ -

"কতই না ছোট দল বিরাট দলের উপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হয়েছে।"

(সূরা বাকারা : ২৪৯)

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল, উপায় উপকরণ কম ছিল, কিন্তু তাঁরাই বিজয় লাভ করেছে। মুহাম্মদ ইবনে কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয় কিংবা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ে সংখ্যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। তাই বর্তমান সময়েও দীনের বিজয়ে জনসংখ্যা খুব জরুরি নয়। সৎ, যোগ্য ও দক্ষ একদল ঈমানদার দীন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেই আল্লাহ দীনের বিজয় দান করবেন। এজন্য মুসলিম তরুণ সমাজকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামাজিক, সাংগঠনিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্য

ক্যারিয়ার কী : 'ক্যারিয়ার' (Career) হচ্ছে যোগ্যতা অর্জনের নাম। অভিধানে 'ক্যারিয়ার' শব্দের একাধিক অর্থ আছে : উন্নতি, জীবিকা অর্জনের উপায়, মনজিলে পৌঁছার মাধ্যম, বৃত্তি, পেশা, জীবনধারা, কর্মজীবনের বৃত্তি নির্ধারণ ইত্যাদি। অন্য কথায় ক্যারিয়ার হচ্ছে :

১. Progress through life—জীবনে উন্নতি লাভ করা
২. Way of making a living—জীবিকার্জনের উপায়,
৩. A swift course—দ্রুতি, বেগ, উন্নতি,
৪. Occupation, Profession—বৃত্তি, পেশা অর্থাৎ পেশাগত জীবনে উন্নততর অবস্থান তৈরি করা।

কেউ কেউ ক্যারিয়ারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : 'ক্যারিয়ার' হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মজীবনের ধারা বা মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া। কারো কারো ভাষায় : জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সামনে রেখে জীবন উন্নত ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকেই 'ক্যারিয়ার' বলে।

একজন মুসলিম তরুণের কাছে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য আখিরাতে সফলতা। তাই মুসলিম তরুণেরা শুধু দুনিয়ায় সফলতা লাভের জন্য ক্যারিয়ার গঠন করে না, আখিরাতে সফলতা লাভের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দুনিয়ায় ক্যারিয়ার গঠনের চেষ্টা করে। তাই মুসলিম তরুণ সমাজের কাছে ক্যারিয়ার হচ্ছে, "দীনের দিক থেকে মানের শীর্ষে পৌঁছার সাথে সাথে নিজের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতার শীর্ষে ওঠার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো।"

ক্যারিয়ার গঠনের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ : একজন মুসলিম তরুণ দুনিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ক্যারিয়ার গঠন করে না। দীন প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে মেধা কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিভা বিকাশে সর্বাত্মক চেষ্টা করে, এই উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-গবেষণায় লিপ্ত থাকে। পেশা নির্বাচনসহ সকল কাজকর্মে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিলকেই প্রাধান্য দেয়। কোনো একজন মুসলমানের জীবন ও মরণ সব কিছু আল্লাহর জন্যই নিবেদিত থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : "(হে মুহাম্মদ) আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।" (সূরা আনআম : ১৬২-৬৩)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশি করার জন্য মুমিন বান্দারা দুনিয়ায় কোনো কাজ করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

www.nagorikpathagar.com

"তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, এটিই সঠিক ধর্ম।"
(সূরা বাইয়িনাহ : ৬)

নিয়তের পরিচ্ছন্নতা ছাড়া আমল করলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান, সদকা, দীনের পথে জিহাদ সব কিছুই বৃথা যাবে। তাই কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় নিয়তের পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ কারণেই বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে নিয়তের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত হাদীসটি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

"হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় প্রত্যেক আমালের সওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যেকোনো ব্যক্তি যা-ই নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে তাহলে তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর কেউ যদি দুনিয়া পেতে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে তাহলে তার হিজরত নারীর জন্যই হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বাহ্যদৃষ্টিতে কোনো কাজ যত চমৎকারই হোক না কেন ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের কারণে তা কোনো কাজে আসে না।

হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ উপরিউক্ত হাদীসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, "উম্মে কায়েস নামক একজন মহিলা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিল। তাকে ভালোবেসে আরেক ব্যক্তি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরত অনেক সওয়াবের কাজ। তাই সাহাবীগণ ঘর-বাড়ি, সম্পদ, আত্মীয়-স্বজনের মায়া ছেড়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যেই হিজরত করেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি একজন নারীকে পাওয়ার জন্য হিজরত করেন। এই কারণে সাহাবীদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে এই ধরনের উদ্দেশ্যে যারা হিজরত করে তারাও কি হিজরতের সওয়াব পাবে? তাঁদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স) বলেছেন, যারা যে উদ্দেশ্যে হিজরত করে তারা তা-ই অর্জন করবে।"

অতএব কেউ ভোগবিলাসের উদ্দেশ্যে ক্যারিয়ার গঠন করলে সে দুনিয়াতে তা পেতে পারে কিন্তু আখেরাতে কোনো কিছুই পাবে না।

ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের পরিণাম : ত্রুটিপূর্ণ নিয়তে কোনো কিছু করলে সওয়াবের পরিবর্তে শাস্তি পেতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের সারকথা উল্লেখ করছি : আখিরাতে কিছু আলেম, শহীদ ও দানশীলকে দোযখে দেওয়া হবে। তখন আলেম বলবে, "ইয়া আল্লাহ! আমি ইলমে দীন শিখেছি তারপরও কেন আমাকে দোযখে দেওয়া হচ্ছে?"

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহ্ জবাব দেবেন, "তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখনি। তুমি ইলম শিখেছ আলেম হিসেবে খ্যাতিলাভের জন্য। দুনিয়াতে তুমি তা পেয়ে গেছ।"

শহীদ বলবে, "হে আল্লাহ! আমি জিহাদ করে শহীদ হলাম তবুও কেন আমাকে দোজখে দেওয়া হলো?"

আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি গনিমতের মাল লাভ কিংবা বীর হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য জিহাদে গিয়েছ। আমার দীন কায়েমের জন্য যাওনি।" অনুরূপভাবে দানশীলকে বলা হবে, "তুমি দানশীল হিসেবে যশখ্যাতি লাভের জন্য দান করেছ। আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করনি। তাই তোমাকে দোযখে দেওয়া হলো।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সকলের কাছেই পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা যশখ্যাতি অর্জনের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই ক্যারিয়ার গঠন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহরই জন্য।" (সূরা যুমার : ২-৩)

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের তাফসীরে লেখেন, এ আয়াতে রাসূলে কারীম (স)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খাঁটিভাবে করুন। যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের গন্ধও না থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (স)-এর কাছে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি মাঝে মধ্যে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়তে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্ তাআলা এমন কোনো বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়।"

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নিয়তের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ার সুখ-শান্তি, বাড়ি, গাড়ি, সুন্দরী নারী, ধনদৌলত, যশ ও খ্যাতি অর্জন যেন কারো ক্যারিয়ার গঠনের মূল টার্গেট না হয়। যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য ক্যারিয়ার গঠনের চেষ্টা করা হয় তাহলে উপরিউক্ত জিনিসগুলো এমনিতেই অর্জিত হয়ে যায়।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনই ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্য : আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ দেখা যায়, কেউ সারাক্ষণ দুনিয়ার সফলতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আর কেউ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দীনদারীর পরিচয় দিতে চান। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দুনিয়াপ্রেমিক হতে বলেননি, কিন্তু দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত থাকতেও নির্দেশ দেননি। দুনিয়ার সার্বিক কাজকর্মের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের পথে চলতে বলেছেন, আখিরাতের সফলতাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করে দুনিয়ার জীবনে বৈধ পন্থায় উন্নতি লাভ করার চেষ্টার কথা বলেছেন।

www.nagorikpathagar.com

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও।"
(সূরা বাকারা : ২০১)

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, দুনিয়াতে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু বৈধ নয়, আল্লাহ্ উভয় ধরনের কল্যাণ লাভের চেষ্টা করতে বলেছেন, দোআ শিখিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, বস্তুগত যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন খারাপ জিনিস নয়, যে তাকে ঘৃণা করতে হবে। মাওলানা ইসলাহীর মতে, "এর মধ্যে যদি কোনো খারাপ দিক থেকে থাকে তাহলে এটা কেবল তখনই হতে পারে যে, যখন তা বাতিলের সমর্থন ও শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়। যদিও বাতিলের শান-শওকত যুলকারনাইনের রাজত্বের মতো বিরাট নিয়ামতে পরিণত হবে। এর ফলে একদিকে যেমন বাতিলের হাত থেকে এক বিরাট শক্তি খসে পড়বে, অন্যদিকে এই শক্তি দীনে হকের হাতে এসে বাতিলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী তরবারিতে পরিণত হবে।"[৩৫]

এই আয়াতে দুনিয়ার কথা আগে উল্লেখ করা হলেও মূলত একজন মুসলমানের কাছে আখিরাতের সফলতাই মূল। তাই আখিরাতের সফলতার পথে প্রতিবন্ধক এমন কিছু কামনা থেকে একজন মুসলিম তরুণকে দূরে থাকতে হবে। দুনিয়ার বড় বড় ডিগ্রি এবং অনেক যশখ্যাতি অর্জন করার পরও আখিরাতে ব্যর্থ হলে একজন ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ।[৩৬] আর দুনিয়াতে কোনো কিছু অর্জন করতে না পারলেও আখিরাতে যদি সফল হয় তাহলে একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে সফল। কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়াতেও সফলতা লাভ করে এবং আখিরাতের সফলতার পথে চলে পরকালীন মুক্তি লাভ করে তাহলে তার চেয়ে সফল ব্যক্তি আর কেউ নেই। যেহেতু একজন মুসলমানের কাছে আখিরাতের সফলতাই চূড়ান্ত কাম্য, তাই সে দুনিয়ার সফলতার জন্য আখিরাতে ব্যর্থ হতে হবে এমন কোনো কাজ না করে, অবৈধ আয়-উপার্জন ও ইসলাম-নিষিদ্ধ কোনো পেশা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, পরীক্ষায় নকল করে ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করে না, কাউকে ঠকিয়ে কিংবা প্রতারণা করে অধিক মুনাফা পেতে চায় না, দুনিয়ার জীবনে কাফেরদের প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেও তার প্রতি লালায়িত হয় না। কারণ একজন মুসলিম দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতে সুখ পাওয়ার প্রত্যাশী।

---

৩৫. ইসলাহী, আমিন আহসান ১৯৯২, দাওয়াতে দীন ও তার কর্মপন্থা, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, -৫৪ পৃ।

৩৬. কখনও কখনও দেখা যায় পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার সুসংবাদ শোনার আগেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী মারা যায়। তাই দুনিয়ার পরীক্ষার ভালো রেজাল্টই একজন মুসলিম ছাত্রছাত্রীর জীবনের সফলতার মানদণ্ড নয়। দুনিয়াতে ভালো রেজাল্ট করে আখিরাতে ব্যর্থ হলে এই ভালো রেজাল্টের কোনো গুরুত্ব নেই।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ -

"আর এই কাফেরদের মধ্যে যেসব লোককে পরীক্ষার সম্মুখীন করার জন্য আমরা বৈষয়িক সম্পদের চাকচিক্য দান করেছি, তুমি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবে না। তোমার প্রভুর রিযিক অধিক উত্তম এবং এর ওপর অবিচল থাকো। আমরা তোমার কাছে রিযিক চাচ্ছি না। আমরাই তোমাকে রিযিক দান করেছি। আর পরিণামে তাকওয়ারই কল্যাণ হয়ে থাকে।" (সূরা তোয়া-হা : ১৩১-১৩২)

উক্ত আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, কোনো মুসলিম যুবক দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য ক্যারিয়ার গঠনের চেষ্টা করে না। কারণ দুনিয়ার সুখ-শান্তির চেয়ে আখিরাতের সুখ-শান্তি অধিক উত্তম ও স্থায়ী (খায়রুন ও আবক্বা)। আর দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর যারা মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা বিচার করে তারা নিশ্চিত ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ -

"আর দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়।"[৩৭]

(সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সূরা আলা : ১৬-১৭)

আল্লাহ আরও বলেন, "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।" (সূরা আনকাবূত : ৬৪)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে চিন্তা করলে দেখা যায়, দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য কোনো মুসলিম তার প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে না। কারণ যারা শুধু দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায় তারা আখিরাতে কিছুই পায় না। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ -

"তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যে বলে, হে আমার রব! আমাদের দুনিয়ায় সব কিছু দিয়ে দাও। এই ধরনের লোকের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নাই।"[৩৮]

আর যারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চায় তারা উভয় স্থানে কল্যাণ পায়।

---

৩৭. আলে ইমরান ঃ ১৮৫।

৩৮. বাকারা ২০০।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ـ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ـ

"আবার কেউ বলে, হে আমার রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এ ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয় স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসাব সম্পন্ন করতে আল্লাহর একটুকুও বিলম্ব হয় না।"[৩৯]

এ কারণে একজন মুসলিম দুনিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করে।

ক্যারিয়ার গঠনের টার্গেট দুনিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা নয় : কেউ কেউ নিছক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ক্যারিয়ার গঠন করেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যারা ক্যারিয়ার গঠন করেন তারা আত্মপূজারী হন। তাদের কাছে নিজের চাহিদা, নিজের প্রয়োজনই বড় হয়ে থাকে। তারা মানবতা ও মুসলিম উম্মাহর জন্য কোনো কিছু করার মানসিকতা রাখেন না। যদি কখনও দেখা যায়, তারা দেশ ও জাতির জন্য কিছু করে তার পেছনেও আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থাকে। এ কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন হলেও নিজ স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারেন। নিজের সুখের জন্য জনগণের সুখের কথা ভুলে যেতে বা উপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণে ভূমিকা পালন : আকাশের চাঁদ ও সূর্যের কিরণ দল-মত নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর। সকলেই চাঁদের আলো উপভোগ করতে পারেন। চাঁদ যেমনভাবে কোনো দলের নয়, তেমনি সমাজের প্রতিভাবান মানুষের প্রতিভা আল্লাহ তাআলা শুধু ব্যক্তি বা দলের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য দান করেননি। আল্লাহ তাআলা সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল ভাষা-ভাষী মানুষের মানবিক কল্যাণ সাধন ও আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিভা দান করেছেন। তাই মেধাবী ব্যক্তিদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করতে হবে এবং নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে, আমার মেধা কি শুধু আমার সুখ-শান্তি, রুটি-রুজির কাজে ব্যয় হচ্ছে, না সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে?

প্রত্যেক মুসলিম তরুণকে মানবতার কল্যাণে অবদান রাখার জন্যই মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ মুসলমানদের আল্লাহ তাআলা বিশ্বমানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

---

৩৯. বাকারা ঃ ২০১-২০২।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ـ

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অন্যায় কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর উপর ঈমান আন।"[৪০]

এই আয়াতে 'নাস' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, একজন মুসলিম তরুণ শুধু নিজের কল্যাণ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না, তাকে মানবতার কল্যাণে ও সমাজ সংস্কারে ভূমিকা পালন করতে হয় এবং উক্ত কাজে মেধা ও যোগ্যতার সর্বোত্তম বিনিয়োগ করতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَثَلُ عِلْمٍ لَا يَنْتَفِعُ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواه احمد ـ

"যে ব্যক্তির ইলম যা (দীন ও মানবতার) কল্যাণে আসে না তা মনে খাজানার মতো, যা থেকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় হয় না।"

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, দীন ও মানবতার কল্যাণে জ্ঞান, যোগ্যতা ও প্রতিভা ব্যয় করা উচিত।

দীন প্রতিষ্ঠা ক্যারিয়ার গঠনের আসল উদ্দেশ্য : ইসলাম দীনে হকের বিজয় চায়। এ বিজয়ের অর্থ হচ্ছে দীনে হক মানবসমাজের নিয়ন্ত্রক হবে। মানবগোষ্ঠী কর্তৃক দীন নিয়ন্ত্রিত হবে না। এক কথায় অন্যকোনো আদর্শ বা জীবন-দর্শন দীনে হককে নিয়ন্ত্রণ করবে না; বরং দীনে হকের নিয়ন্ত্রণে অন্যসব জীবন-দর্শন থাকবে। ইসলামের সাথে মূলত অন্যান্য জীবন দর্শনের বিরোধ এখানেই। তবে এ বিরোধের কারণে ইসলাম প্রথমেই অন্য দর্শনের অনুসারীদের সাথে সংঘাতে যেতে চায় না। ইসলাম চায় ইসলামের সার্বজনীন শান্তির পয়গাম সমস্ত মানবতার কাছে পৌঁছে দিতে। ইসলাম সমস্ত মানবতাকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানায়। যারা এ আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের মাধ্যমে দীনে হকের বিজয় চায়। দীনে হকের এ বিজয়ের জন্য ইসলামের অনুসারীদের নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াতি কাজ করতে হয়। মানুষকে হকের উপদেশ দিতে হয়। যারা দীনে হক কী তা বোঝে না তাদের তা বোঝাতে হয়। এভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলে ধৈর্য ও হিকমাতের মাধ্যমে বাধা অপসারণের চেষ্টা করতে হয়। তারপরও যদি দীনে হকের প্রচারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়, সে বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজনে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।[৪১]

---

৪০. সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০।

৪১. কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে 'জিহাদ' বলতে কিতালকেই বোঝানো হয়। জিহাদ, কিতাল বা হারবকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। অথচ ইসলামের জিহাদ পরিভাষাটি অত্যন্ত ব্যাপক। জিহাদের চূড়ান্ত রূপ কিতাল তথা সশস্ত্র সংগ্রাম হলেও জিহাদের ভেতর আরও অনেক কিছু শামিল।

www.nagorikpathagar.com

ইসলামের বিরোধিতা যেভাবেই করা হোক না কেন তার মোকাবিলায় ভূমিকা পালন করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব। যদি মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করা হয় তাহলে মিডিয়ার মাধ্যমে তার জবাব দিতে হবে। যদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিরোধিতা হয়, সংস্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দিতে হবে। যদি বুদ্ধিবৃত্তিক কূটকৌশলে বিরোধিতা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই তার জবাব দিতে হবে। কলমের মাধ্যমে বিরোধিতা হলে কলমের মাধ্যমে জবাব দিতে হবে। শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধিতা হলে, শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। এভাবে ইসলামবিরোধীদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জন করতে প্রত্যেক মুসলমানকে তার মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধন করতে হবে। আর কেউ যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার টার্গেট নিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে উঁচু মর্যাদা দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ .

"কেউ ইসলামের নবজাগরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে তার ও নবীদের মধ্যে শুধু একটি স্তর পার্থক্য থাকবে।" (দারেমী)

ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক কয়েকটি কথা

১. ক্যারিয়ার যেন দীনের কাজে লাগে, আল্লাহর কাছে দোআ করতে হবে : একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যিনি যত বেশি মেধাবী তার মেধা যেমনি দীনের উপকারে বেশি আসতে পারে, আবার শয়তান তা দীনের ক্ষতির জন্যও কাজে লাগাতে পারে। আপনি যদি কোনো বাগানের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন বিরাট বিরাট গাছ থেকে কাঠ নিয়ে মানুষ ঘরের সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র তৈরি করে আর লতাপাতা কেটে ফেলে। কারণ লতাপাতা ভালো কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। এখন একটু লক্ষ্য করুন, লতাপাতা যদি কারো গায়ে পড়ে, এতে তেমন ক্ষতি হয় না। কষ্ট অনুভূত হয় না। কিন্তু বিরাট একটি গাছ যদি কারো মাথায় পড়ে অনেক সময় মানুষ মারা যায় কিংবা গুরুতর আহত হয়। তেমনিভাবে যেসব মানুষের যোগ্যতা বেশি তারা ইচ্ছা করলে দীনের অনেক বেশি উপকার করতে পারেন। আবার তাদের দ্বারা দীনের ক্ষতিও বেশি হতে পারে। তাই যোগ্যতা, প্রতিভা থাকলেই শুধু হয় না, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে দীনের কাজে লাগানোই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এজন্য ব্যক্তির চেষ্টা, সামষ্টিক উদ্যোগের পাশাপাশি আল্লাহর রহমতের জন্য আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে হবে। কারণ, আল্লাহর রহমত ছাড়া কারো প্রতিভা দীনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত ভাষায় দোআ করতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

"হে আল্লাহ! আমি উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক ও সকল রোগ থেকে আরোগ্য চাই।"

www.nagorikpathagar.com

২. মেধা ও ক্যারিয়ার যেন খারাপ কাজে ব্যয় না হয় : পৃথিবীতে যোগ্যতাসম্পন্ন এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের যোগ্যতা সৎপথে ব্যয় না হয়ে পাপাচারের প্রসারে ব্যয় হচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার পরিবর্তে তাওহীদ সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। ইবলিসের জ্ঞান ও যোগ্যতা কম ছিল না। কিন্তু তার জ্ঞান ও যোগ্যতা আল্লাহর হুকুম পালনের পরিবর্তে আল্লাহর নাফরমানির কাজে ব্যয় হচ্ছে। শুধু নিজেই নাফরমানি করছে না; বরং অন্যদেরও নাফরমানি করতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে মুসলিম নামধারী অনেক জ্ঞানী-গুণীও ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দীনের বিরোধিতা করার জন্য তাদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগাচ্ছেন। এই জন্য একজন মুসলিম যুবককে সবসময় আল্লাহর কাছে দোআ করতে হবে, আল্লাহ যেন দীনের স্বার্থে প্রতিভা কাজে লাগানোর তাওফীক দান করেন। কারণ, দীনের কাজে প্রতিভা ব্যবহার না হলে শয়তান অন্য কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে। অতএব কারো জ্ঞান-গবেষণা তথা ক্যারিয়ার যেন খারাপ কাজে ব্যবহৃত না হয় এজন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস আছে :

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَالِمٌ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ.

"হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কেয়ামতের দিন পজিশনের দিক থেকে সেই আলেমই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী হবেন, যার ইলম কোনো উপকারে আসে না।" (দারেমী)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اِنَّ شَرَّ الشَّرَارِ الْعُلَمَاءُ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ.

"নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট খারাপ হচ্ছে আলেমদের খারাপি। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আলেমদের ভালো কাজ।"

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, জ্ঞানীরা ইচ্ছা করলে সমাজের জন্য সবচেয়ে খারাপ ভূমিকা রাখতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে সবচেয়ে ভালো অবদান রাখতে পারেন।

৩. দুনিয়া পাওয়ার জন্য ক্যারিয়ার গঠনের পরিণাম : যারা দুনিয়া পাওয়ার জন্য ক্যারিয়ার গঠন করে আল্লাহ তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন :

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِى بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ لَايَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا.

"যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয়, যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সে ইলম শেখে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"

(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আরও হাদীস আছে :

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ -

"যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্ক-বাহাস করা অথবা নির্বোধ লোকদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার জন্য কিংবা জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য ইলম হাসিল করলো, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে ঢোকাবেন।" (ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

এই কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপকারী ও ক্ষতিকর ইলম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে বলেছেন :

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ -

"যে শিক্ষায় কোনো উপকার হয় না সে শিক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করো।" (ইবনে মাজাহ)

৪. যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য ক্যারিয়ার গঠন করে তাদের মর্যাদা : যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই শিক্ষালাভ করে, উন্নত ক্যারিয়ার গঠন করে, আল্লাহ তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করবেন। যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই ইলম অর্জন করে তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সওয়াব পান। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ -

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদে) থাকে।" (তিরমিযী)

এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[৪২]

তাদের মর্যাদা সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস আছে,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ -

"ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সামনে ফেরেশতারা নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।" (আবু দাউদ)

---

৪২. বুখারী ও মুসলিম।

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহর রাসূল আলিমদের নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, একজন প্রকৃত আলিমের জন্য আসমান ও জমিনের সকল কিছু এমনকি পানির ভেতরে মাছও আল্লাহর কাছে তার মাগফিরাতের জন্য দোআ করে। তাই আমাদের শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্যই জ্ঞানার্জন করে উন্নত ক্যারিয়ার গঠন করা উচিত।

৫. অন্যদের ক্যারিয়ার গঠনে সহযোগিতা করুন : যারা ক্যারিয়ার গঠন করেছেন তাদেরকে অন্যদের ক্যারিয়ার গঠনে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। যারা অন্যদের ক্যারিয়ার গঠনে প্রশিক্ষণ দেন আল্লাহ তাদের অনেক নেকি দান করেন। রাসূল (স) ইরশাদ করেন : اَلْعَالِمُ وَ الْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانِ فِى الْاَجْرِ

অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ই প্রতিদানের অংশীদার। (ইবনে মাজাহ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : اَلْخَيْرُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ

"কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য সবকিছুই আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে।"

(তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখায় সে ভালো কাজ সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব পথপ্রদর্শনকারীরাও পায়। "(মুসলিম)

ইসলাম একজন ব্যক্তিকে শিক্ষালাভ করার সাথে সাথে অন্যকেও শিক্ষিত করে তুলতে উৎসাহিত করেছে।

এ কারণে রাসূল (স) বলেছেন : تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

"তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও।" (বায়হাকী।)

তিনি আরও বলেছেন :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে জানে, সে বিষয়ে তার নিকট কেউ কোনো কথা জানতে চাইলে যদি সে তা গোপন রাখে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম লাগানো হবে।" (তিরমিযী, আবূ দাঊদ) এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) আরও বলেন :

لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَلَيُعِظُنَّهُمْ وَلَيَامُرُنَّهُمْ وَلَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيَتَفَقَّهُوْنَ اَوْ لَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا ـ

"মানুষ অবশ্যই যেন তার প্রতিবেশীদের শিক্ষাদান করে, তাদের উপদেশ দেয়, তাদের সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। ঠিক অনুরূপভাবে অবশ্যই সবাইকে তাদের প্রতিবেশীদের থেকে ইলম অর্জন করতে হবে, উপদেশাবলি গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে বুঝ-সমঝ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় আমি তাদের দুনিয়াতে অতিসত্বর শাস্তি দেব।" (তিবরানী)

www.nagorikpathagar.com

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, শিক্ষা অর্জন করার পর অপরকে শিক্ষা দেওয়া, ক্যারিয়ার গঠন করার পর অপরকে ক্যারিয়ার গঠনে পরামর্শ ও সহযোগিতা দেওয়া মুমিন জিন্দেগীর বৈশিষ্ট্য।

৬. ক্যারিয়ার গঠন ও ক্যারিয়ার ত্যাগ : আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য যারা ক্যারিয়ার গঠন করতে চেষ্টা করে তারা একই উদ্দেশ্যে ক্যারিয়ার ত্যাগে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু কারো মধ্যে ক্যারিয়ার গঠন করার আগেই ক্যারিয়ার ত্যাগের ঝোঁক দেখা দেয়। তারা মনে করেন দীনের জন্যই ক্যারিয়ার ত্যাগ করছেন। দীনের জন্য তাঁদের আন্তরিকতা, খুলুসিয়াত ও জযবা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু এইক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কারো কাছে টাকা থাকলেই তা অন্যকে দান করতে পারে; কিন্তু টাকা না থাকলে কীভাবে দান করবেন? অনুরূপভাবে কেউ ভালো ক্যারিয়ার অর্জন করলেই তাঁর পক্ষে ক্যারিয়ার ত্যাগ করা সম্ভব।[৪৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গরু বা ছাগল কেনার পর বা কয়েক বছর প্রতিপালন করার পরই কুরবানী দেওয়ার সুযোগ আসে। অন্যথায় কুরবানী বা Sacrifice করার প্রশ্নই ওঠে না।[৪৪]

কেউ কেউ মনে করেন ছাত্রজীবনে বারবার ফেল করার অর্থই হচ্ছে ক্যারিয়ার ত্যাগ (Career Sacrifice)। এটা ক্যারিয়ার ত্যাগ নয় বরং ক্যারিয়ার হত্যা। পড়াশোনা না করে রেজাল্ট খারাপ করাকে ক্যারিয়ার ত্যাগ বলে না। ক্যারিয়ার ত্যাগের অর্থ হচ্ছে "ক্যারিয়ার গঠন করার পর বস্তুগত অধিক সুযোগ-সুবিধার মায়া ত্যাগ করে দীনের প্রয়োজনে অর্জিত যোগ্যতা কাজে লাগানো।"

উদাহরণ : একজন ব্যক্তি সরকারি/বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে মোটা বেতনের চাকরি করছেন। উম্মাহর স্বার্থে উক্ত চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরও কম বেতনে অন্য কোথাও চাকরি করতে তাঁকে বলার পর অর্থের মায়া, পদের মায়া, সুযোগ-সুবিধার মায়া ত্যাগ করার নামই হচ্ছে ক্যারিয়ার ত্যাগ।

একটি বাস্তব উদাহরণ : কিছুদিন আগে বিবিসি বাংলা বিভাগের জনৈক সাংবাদিক কথা প্রসঙ্গে একজন ইহুদি ডাক্তারের ঘটনা বলেন : "তাঁর সাথে উক্ত ডাক্তারের যখন পরিচয় হয় তখন তিনি একটি হাসপাতালে কনসালটেন্ট ছিলেন। কনসালটেন্ট হিসেবে স্বাভাবিকভাবে তিনি প্রচুর অর্থ পেতেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি ডাক্তারি পেশা ছেড়ে দিয়ে আরও কম বেতনে বিবিসিতে চাকরির জন্য আবেদন করেন। বিবিসিতে তাকে দেখে সাংবাদিক সাহেব খুবই অবাক হন। তার মনে প্রশ্ন জাগে কেন তিনি অনেক বেতন ও ভালো অবস্থান ছেড়ে দিয়ে বিবিসিতে কম বেতনে চাকরি করার জন্য এসেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি জানতে পারেন যে উক্ত ডাক্তার একজন ইহুদি।"

---

৪৩. যদি ভালো চাকরি পান কিন্তু দীনের প্রয়োজনে উক্ত চাকরি ছাড়তে হয়, সে সময় চাকরি ছাড়াটাই হচ্ছে ক্যারিয়ার ত্যাগ।

৪৪. কারো পোশাক থাকলেই তা পরিষ্কার করতে হয়। কারো যদি পোশাকই না থাকে আর তিনি যদি বলেন, "আমি পোশাক পরিষ্কার করবো না"– তার কথাটি হাসির খোরাকে পরিণত হবে।

www.nagorikpathagar.com

ইহুদীরা অনেকেই তাদের লক্ষ্যের প্রয়োজনে ক্যারিয়ার গঠন করে ও ক্যারিয়ার ত্যাগ করে। তাই তারা সংখ্যায় কম হলেও বিশ্বে অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় আসহাবে রাসূল (স) ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন।[৪৫] তাই তাঁদের পক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। আমাদের মুসলিম তরুণ সমাজ যদি একটি ভিশন নিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করে তাহলে সেই লক্ষ্য পূরণে ক্যারিয়ার ত্যাগ করতে তারাও দ্বিধাবোধ করবে না। ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য বহন করছে যে, দীন ও মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করে আল্লাহর সন্তোষ লাভের লক্ষ্যে যারা ক্যারিয়ার গঠন করেন তারা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন।[৪৬]

৭. ঈমানবিহীন ক্যারিয়ার মূল্যহীন : আল্লাহর কাছে দুনিয়ার ক্যারিয়ারের চেয়ে ঈমান ও তাকওয়াই গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে অযোগ্য ব্যক্তি যদি ঈমান ও তাকওয়ার মানদণ্ডে উন্নীত হন তাহলে তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে যোগ্য অথচ বেঈমান ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। দুনিয়াপ্রেমিকদের কাছে দুনিয়ার বড় বড় ডিগ্রি, বাড়ি-গাড়ি, যশ-খ্যাতি জাগতিক সফলতার মানদণ্ড হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছে সফলতার মানদণ্ড হচ্ছে 'ঈমান'। এই কথাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ "মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।" (সূরা মুমিনূন : ১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সফলতার মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান। তাই একজন মুসলিম তরুণ ঈমানদার হিসেবে আত্মগঠনের পরিবর্তে শুধু ক্যারিয়ার গঠনের চিন্তায় অস্থির থাকে না। একজন মুসলিম ঈমানের দাবি পূরণ করার জন্যই আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে চেষ্টা চালায়।

---

৪৫. হযরত বেলালের উপর কী অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল! প্রচণ্ড গরম বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। তবু তিনি 'আহাদ আহাদ' বলা বন্ধ করেননি। হযরত আবু যারকে ঈমান আনার কারণেই রক্তাক্ত হতে হয়েছে। সুদর্শন যুবক মাসয়াব বিন উমাইরকে দীনের দাওয়াত কবুল করার পর সকল সহায়-সম্পদ ত্যাগ করতে হয়েছে। বিলাসবহুল জীবনযাপনের পরিবর্তে কষ্টকর জীবনযাপন করতে হয়েছে। হযরত আমের বিন ফাহিরার শরীর কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের নির্যাতনে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। অবশ্য আল্লাহর কুদরতে পরে আবার দৃষ্টি ফিরে পান। হযরত খাব্বাবকে জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা হতো, তার চর্বিতে আগুন নিভে যেতো। হযরত আমেরকে পানিতে ডুবিয়ে নির্যাতন করা হয়। তাঁর মা হযরত সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে শহীদ করে দেওয়া হয়। তাঁর পিতা ইয়াসীর ও ভাই আব্দুল্লাহ নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। হযরত যাবেদ বিন দাসানাকে বলা হয় তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে শূলে চড়ালে তুমি কি সহ্য করবে? তিনি জবাব দেন, তাঁকে শূলে চড়ানো তো দূরের কথা তাঁর পায়ে কাঁটা ফোটাও সহ্য করবো না। এ কথা শোনার পর তাঁর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। হযরত হামজার কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হয়েছে। এভাবে অসংখ্য সাহাবীকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করে দীনের পথে চলতে হয়েছে।

৪৬. এই ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় : ক্যারিয়ার, সহায় সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

৮. ক্যারিয়ার গর্বের বিষয় নয় : ক্যারিয়ার ব্যক্তিগত গর্বের বিষয় হওয়া উচিত নয়। ক্যারিয়ার ও প্রতিভা নিয়ে আত্ম-অহংকার এবং অপরকে হীন জ্ঞান করা উচিত নয়। আল্লাহ কাউকে যোগ্যতা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, আর কাউকে কম যোগ্যতা দানের অর্থ এই নয়, আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। আল্লাহ ধন-দৌলত, মেধাপ্রতিভা সবকিছুই পরীক্ষাস্বরূপ দিয়েছেন। একজন মেধাবী ব্যক্তি নিজ মেধা ও প্রতিভার জন্য গর্বিত না হয়ে তা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য বিনিয়োগ করে, নাকি তা শুধু নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে আল্লাহ তা পরীক্ষা করছেন। তাই যিনি যত বেশি মেধাবী তিনি তত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। এ কারণে প্রতিভার জন্য গর্ব ও অহংকার প্রকাশের পরিবর্তে আল্লাহর শোকরগোজার থাকা এবং তা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করা উচিত।

এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো মেধাবী মানুষই আল্লাহ থেকে মেধা কিনে নেননি। অপরদিকে জন্ম থেকে পাগল ব্যক্তি এমন কোনো অপরাধ করেনি যে, তার বিবেকশক্তি আল্লাহ প্রদান করেননি। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ মেধাবীদের পরীক্ষা করতে চান যে, তারা দীনের প্রয়োজন, দেশ গঠন ও জাতি গঠনে মেধা কাজে লাগান, না নিজের সুখ-শান্তির জন্য মেধা বিকাশে ব্যস্ত থাকেন।

৯. ক্যারিয়ার গঠন খারাপ নয় : কেউ কেউ মনে করেন ক্যারিয়ার গঠন নিছক দুনিয়াদারির কাজ। তাই তারা ক্যারিয়ার অর্জন করা পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ক্যারিয়ার গঠন নিঃসন্দেহে দুনিয়াদারি। কিন্তু দীনের প্রয়োজনে যোগ্য কাজে লাগানোর জন্য তা অর্জন দুনিয়াদারি নয়, এটা সময়ের বাস্তব দাবি। তাই জ্ঞানার্জনে সব সময় লিপ্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত, এটা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য। একজন মুসলিম যতই জ্ঞান লাভ করেন তিনি আরও জ্ঞান লাভ করতে চান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَمْ يَشْبَعِ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ سَمِعَهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ ـ

"মুমিনের পেট ভালো কথা (জ্ঞান) দ্বারা ভরে না। সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তা শুনতে থাকে।" (তিরমিযী)

১০. মেধার আলোকেই ক্যারিয়ার গঠন করতে হয় : কেউ কেউ মনে করেন ক্যারিয়ার গঠন অর্থ হচ্ছে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি প্রশাসনে ঢোকা কিংবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাসহ সমাজের উঁচু পজিশনে আসীন হওয়া। সমাজের উঁচু পজিশনে আসীন হওয়া নিশ্চয় ক্যারিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মেধা অনুযায়ী যেকোনো পেশায় দক্ষতা অর্জন করাই ক্যারিয়ার। আল্লাহ পাক একেকজনকে একেক ধরনের মেধা দিয়েছেন। প্রত্যেকে আপন আপন মেধার বিকাশ ঘটিয়ে স্ব স্ব পেশায় দক্ষতা অর্জন করলেই সমাজ উন্নত হয়।

www.nagorikpathagar.com

১১. ক্যারিয়ার গঠনে নারীদেরও এগিয়ে আসতে হবে : নারীরা পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি। কোনো দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করতে হলে শুধু পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি সাধন করাই যথেষ্ট নয়, নারীদেরও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের পুরুষের অর্ধাঙ্গ বলা হয়। কোনো মানুষের অর্ধাঙ্গ বিকল থাকলে তাকে সুস্থ মানুষ বলা যায় না। অনুরূপভাবে কোনো সমাজের অর্ধেক জনশক্তি অনুন্নত থাকলে ঐ সমাজকে উন্নত সমাজ বলা যায় না। তাই নারীদেরও ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষা-দীক্ষায় নারীরা পিছিয়ে ছিলেন না। যে আটজন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) তৃতীয়। তাঁর কাছে অনেকেই দীন শেখার জন্য যেতেন। এ ছাড়া আরও অনেক মহিলা সাহাবীর নাম এসেছে, যাঁরা হাদীসশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ড. আকরাম নদভী ৩৫ খণ্ডে মহিলা হাদীস রেওয়ায়াতকারীদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

কারো কারো কথা হচ্ছে, নারীদের প্রধান কাজ ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও স্বামীর সংসার দেখাশোনা করা।

কথাটি সত্য যে, নারীদের প্রধান কাজ উপার্জন নয়। স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে উপার্জন ও সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা, আর স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে ঘর-সংসার গুছিয়ে রাখা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম নারীকে উপার্জন করতে নিষেধ করেছে। হযরত খাদিজা (রা) ধনবতী মহিলা ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর সকল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেন। অপরদিকে কোনো হাদীসে এ কথার প্রমাণ নেই যে, আল্লাহর রাসূল কোনো নারীকে শিক্ষালাভ কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে নিষেধ করেছেন।

দীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরয। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ

"দীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর বাধ্যতামূলক।"

(ইবনে মাজাহ)

এই হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেন, দীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরয। আর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়া নারী-পুরুষ সকলের উপরই ফরয আল কিফায়াহ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহিলাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার হওয়া মুসলিম মহিলাদের জন্য ফরযে কিফায়াহ। অতএব কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা ডাক্তার হওয়া প্রয়োজন। কারণ মহিলাদের চিকিৎসার জন্য

৪৭. ড. আকরাম নদভী অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার ইংল্যান্ডের একজন গবেষক।

www.nagorikpathagar.com

পুরুষ ডাক্তারের চেয়ে মহিলা ডাক্তার উত্তম।[৪৮] কিন্তু আমাদের সমাজে মহিলা রোগীর তুলনায় মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা খুবই কম। তাই মুসলিম নারীদেরও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

১২. নারীরা ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ কতটুকু পায় : আমাদের দেশে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ সীমিত। বিশেষত ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেন এমন নারীদের উচ্চশিক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্দা মেনে চলা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে। অপরদিকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসা-যাওয়ার পথও নিরাপদ নয়। বখাটে ছেলেদের জ্বালায় অভিভাবকরা উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো মেয়েকে বাইরে দিতে চান না। এ কারণে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে উচ্চশিক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। নারীদের ক্যারিয়ার গঠনে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে নারীসমাজকে তাদের উপযোগী ক্যারিয়ার বাছাই ও যোগ্যতা বিকাশে সহযোগিতা করা। কারণ নারীরাও সমাজ ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, তাদেরও নানামুখী প্রতিভা রয়েছে। অতএব নারীদের প্রতিভা বিকাশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

১৩. দীনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান-গবেষণায় সময় ব্যয় নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম : দীনের জ্ঞান-গবেষণার জন্য সময় ব্যয় করা নফল ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে উত্তম। কারণ নফল ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি হয় আর জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে সমাজের অনেক মানুষ উপকৃত হয়। অপরদিকে দীনের সহীহ ইলম ছাড়া সঠিকভাবে দীন পালন সম্ভব নয়। তাই ইসলাম দীনের ইলম অর্জন করার প্রতি উৎসাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا .

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাতে এক ঘণ্টা দীন সম্পর্কে অধ্যয়ন সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।" (দারেমী)
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ . رواه التِّرْمِذِى .

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, একজন ফকীহ শয়তানি চক্রান্ত মোকাবিলায় এক হাজার আবেদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১৪. ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ যেখানেই পাওয়া যায় তা কাজে লাগাতে হবে : জ্ঞান, গবেষণা, প্রতিভা বিকাশ ও ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ যেখানেই পাওয়া যায় তা কাজে লাগাতে হবে। এ কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম তরুণ সমাজের একটি অংশকে ছুটে যেতে হবে। কারণ আল্লাহর রাসূল

ড. আকরাম নদভী অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার ইংল্যান্ডের একজন গবেষক।

৪৮. যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসার জন্য পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ আর নারীর জন্য নারী ডাক্তার না

www.nagorikpathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ -

"হেকমত ও বিজ্ঞানের কথা একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো বস্তু। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার অধিক হকদার।" (তিরমিযী)

১৫. জ্ঞান ও অর্জিত ক্যারিয়ার কেউ নিতে পারে না : একজনের সম্পদ আরেকজন চুরি কিংবা আত্মসাৎ করে নিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান ও ক্যারিয়ার এমন জিনিস, যা কেউ কারো কাছ থেকে চুরি করে নিতে পারে না। আর জ্ঞানই এমন বস্তু, যা যত ইচ্ছা বিতরণ করলেও কমে না; বরং বাড়ে। তাই সব সময় জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানার্জনের প্রধান উৎস হচ্ছে বই পড়া। অতএব বেশি বেশি বই কিনুন ও বই পড়ুন। প্রতি মাসে ঝালমুড়ি খেয়ে কত টাকাই আমরা ব্যয় করি। প্রতিদিন বাস, ট্রেন, গাড়িতে চড়ে কত টাকা খরচ করি। আপনার যদি বই কেনার টাকা না থাকে তাহলে হাঁটার অভ্যাস করুন এবং পরিবহন ব্যয় কমিয়ে তা দিয়ে বই কেনার চেষ্টা করুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যতিক্রমধর্মী কৃতী ছাত্র শহীদ আবদুল মালেক রিকসার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনতেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় করতেন।

ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা

ক্যারিয়ার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্য সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় এ কথাও তুলে ধরা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সকলকে সমান মেধা ও প্রতিভা দান করেন না। তবে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সবক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা একেকজন মানুষের মধ্যে একেক ধরনের মেধা দিয়েছেন। তাই প্রত্যেককে আপন আপন মেধার আলোকে ক্যারিয়ার ফিল্ড বাছাই করা দরকার। ক্যারিয়ার ফিল্ড বাছাইয়ের সাথে জীবনের টার্গেট নির্ধারণ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

ক্যারিয়ারের লক্ষ্য ঠিক করুন

আপনি জীবনে কী হতে চান তা প্রথমেই ঠিক করা উচিত। জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য না থাকলে অপরিকল্পিতভাবেই ছাত্রজীবনে বিষয় ও কর্মজীবনে পেশা নির্বাচন করা হয়। তাই জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। প্রত্যেককে আপন মেধা, যোগ্যতা ও সুযোগ-সুবিধার আলোকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে ১, ২, ৩ এইভাবে বিকল্প টার্গেট নির্ধারণ করা ভালো।

জীবনের ক্যারিয়ার লক্ষ্য	সময় পরিকল্পনা কত বছর	লক্ষ্যের ইতিবাচক দিকসমূহ	লক্ষ্যের নেতিবাচক দিকসমূহ

www.nagorikpathagar.com

ক্যারিয়ারের লক্ষ্য নির্ধারণকেন্দ্রিক কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :

১. **লক্ষ্য বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার :** আকাশ কুসুম কল্পনা করা যেতে পারে; কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। এই ধরনের কল্পনা করতে যে সময় ব্যয় হয়, তা-ও অপচয় হয়। বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা না হলে প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হয়।

২. **লক্ষ্য সহজে পরিবর্তন না করা :** বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর তা পূরণে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। একটু হতাশা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে জীবনের লক্ষ্য সহজেই পরিবর্তন করা ঠিক নয়।

৩. **যে লক্ষ্য সহজেই হাসিল হবে তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া :** মানুষের জীবনে এমন অনেক টার্গেট থাকে, যা সহজেই পূরণ হতে পারে। এই ধরনের টার্গেট পূরণের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

৪. **মাঝে মধ্যে অগ্রগতি পর্যালোচনা :** টার্গেট নির্ধারণ করার পর টার্গেট অর্জনে যে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে তার অগ্রগতি মাঝে মধ্যে পর্যালোচনা করা জরুরি।

৫. সংশ্লিষ্ট পেশায় প্রতিষ্ঠিত একজন হিতাকাঙ্ক্ষী (Mentor) থাকা খুবই জরুরি। না থাকলে একজন তৈরি করে তার কাছ থেকে উপদেশ নিতে হবে।

৬. পিতা, মাতা, পরিবার, নিকটাত্মীয়, শিক্ষক ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ গ্রহণ।

৭. সকলের পরামর্শ গভীর চিন্তা করে ইস্তেখারার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

জীবনের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করুন : জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। মনে করুন আপনার দীর্ঘমেয়াদি টার্গেট হচ্ছে আপনি একজন আইনজীবী হবেন, তাহলে ছাত্রজীবনে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে। আপনি সময়-সুযোগ পেলে কোর্টে চলে যান, আইনজীবীদের সাথে মেলামেশা করুন। দক্ষ আইনজীবীরা কীভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে তা প্রত্যক্ষ করুন এবং বিচারক কীভাবে রায় প্রদান করেন তা দেখুন।

আপনি যদি ব্যবসায়ী হতে চান তাহলে আপনার কাঙিক্ষত ব্যবসা পরিচালনায় সহায়ক হবে এমন বিষয় পছন্দ করতে হবে এবং ছাত্রজীবনে অবসর সময় পেলেই সংশ্লিষ্ট সফল ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করতে হবে। যারা ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে পারেননি তাদের অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করতে হবে।

আপনি যদি ভবিষ্যতে কোনো পত্রিকা বের করতে চান তাহলে ছাত্রজীবনে 'মিডিয়া স্টাডিজ' পড়া উত্তম এবং কোনো পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করা দরকার। কর্মজীবনের শুরুতে কোনো পত্রিকায় চাকরি পান কি না তার সন্ধান করতে হবে। তারপর অভিজ্ঞতা নিয়ে পত্রিকা বের করার চেষ্টা করতে হবে।

আপনি যদি শিক্ষক হতে চান তাহলে ছাত্রজীবনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করা দরকার এবং সময় ও সুযোগ পেলে ছাত্র পড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলা ভালো। সময় পেলেই বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করুন, ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অভিজ্ঞতা নিন। ভালো শিক্ষকদের উপস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে সাপ্লাই টিচার হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করুন।

www.nagorikpathagar.com

আপনি যদি ভবিষ্যতে শিশুসাহিত্য চর্চা করতে চান তাহলে ছাত্রজীবন থেকেই শিশুসাহিত্য বেশি বেশি পড়ুন। আর যদি গবেষক-লেখক হতে চান তাহলে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও বই বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতে যেসব বিষয়ে লিখতে চান তার জন্য অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন, প্রবন্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করুন, পত্রপত্রিকার কাটিং রাখুন, অভিজ্ঞ কারো সাথে মতবিনিময় করুন। ভবিষ্যতে কবে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ বা বই লিখবেন তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিন। সময় পেলেই সংগৃহীত তথ্য পড়ুন এবং প্রবন্ধ লেখার সময় নির্ধারণ করুন। এভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে ছাত্রজীবনে বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে।

আপনার জীবনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ঃ এবার আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে নিরিবিলি একটু ভাবুন এবং জীবনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিন। আপনার চিন্তার জন্য নিম্নের একটি ছকে তা দেখানো হলো :

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়নে যা দরকার		
লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ		
প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়		
স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য		
টার্গেট বাস্তবায়নে যা করা দরকার		
লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ		
প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়		

ক্যারিয়ারের লক্ষ্য ও বিষয় নির্বাচন ঃ ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, আপনার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার। উক্ত লক্ষ্যের আলোকেই ছাত্রজীবনের পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ : কোন বিষয়ে পড়াশোনা করা উত্তম তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় :

১. মেধা, যোগ্যতা ও ঝোঁক বা প্রবণতা : প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু যোগ্যতা থাকে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্যতাও থাকে। সকল মানুষ সব বিষয়ে যোগ্য হয় না, আবার সকল বিষয়ে অযোগ্য থাকেন না। হয়ত দেখা যায়, একজন মানুষ এক বিষয়ে খুব ভালো আর আরেক বিষয়ে খুবই খারাপ। তাই আপনি কী পড়বেন তা ঠিক করার আগে গভীরভাবে ভাবা দরকার কোন বিষয়ে আপনি ভালো। কোন বিষয় পড়তে আপনি খুব বেশি আগ্রহী? আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় ঠিক করা দরকার। অভিভাবক বা অন্য কারো জোর করে কোনো বিষয় নির্বাচন করার জন্য বাধ্য করা ঠিক নয়।

www.nagorikpathagar.com

২. পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের ফলাফল : এইচএসসি/এ লেভেলের রেজাল্টের সাথে পরবর্তীতে কোন বিষয়ে গ্রাজুয়েশান করা হবে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন মেডিসিন বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য এ লেভেলে ভালো রেজাল্ট না হলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই এ লেভেলে কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পেলে কেউ কেউ দ্বিতীয়বার এ লেভেল পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করে।

৩. আর্থিক অবস্থা : ক্যারিয়ার পছন্দ করার সময় ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। আর্থিক দীনতার কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রচুর অর্থ খরচ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে না।

৪. ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র : পড়াশোনা করে বেকার থাকলে হতাশার জন্ম নেয়। তাই পড়াশোনার বিষয় নির্ধারণের সময় ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে পড়তে গিয়ে কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন এবং সম্ভাবনা কী আছে। সমস্যা ও সম্ভাবনা পরিষ্কার থাকলে সমস্যা এলে কেউ ভেঙে পড়ে না। এছাড়া ধারণার বাইরেও হঠাৎ করে বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার।

আপনি কোন বিষয় পড়বেন : উপরিউক্ত বিষয়াবলির প্রতি খেয়াল রেখে নিরিবিলি চিন্তাভাবনার পর আপনার বিষয় চূড়ান্ত করুন।

সাবজেক্ট	ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের সুযোগসমূহ	সমস্যা ও সম্ভাবনা
Biology		
Chemistry		
Computer Science		
Law		
Medical Science		
Engineering		
English		
Political Science		
Media Studies		
Islamic Studies		
Others		

পড়াশোনার বিষয় নির্বাচন সঠিক না হলে ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের পেশার সাথে মিল থাকে না। তাই সঠিক বিষয় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেইস স্টাডি-ক : ইংল্যান্ডে একজন ছাত্র 'বার-এট-ল' সম্পন্ন করার পর অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে আইন প্র্যাক্টিস করার পরিবর্তে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে আরবী ও শরীআতের উপর পড়াশোনা করে। খুবই মেধাবী ছাত্রটি বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের আরবী কোর্স করাচ্ছে এবং আরবী গ্রামার লিখছে। উক্ত ছাত্র 'বার-এট-ল' করার পর আরবী ও শরীআহ শেখা ও শেখানোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কী?

www.nagorikpathagar.com

কেইস স্টাডি-খ : একজন ছাত্র মেডিক্যাল সায়েন্সে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পর বর্তমানে সাংবাদিক হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি একজন ভালো লেখক ও কলামিস্ট। তিনি ডাক্তারি করার চেয়ে সংবাদপত্রে কাজ করতে অধিক আগ্রহী কেন?

ক্যারিয়ারের কয়েকটি ক্ষেত্র

এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলিম তরুণ সমাজকে আপন আপন মেধানুযায়ী বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিম্নে কতিপয় ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হলো :

১. ইলমে দীনের চর্চা ও ইসলামের উপর গবেষণা : ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে দীনের ইলম জরুরি। দীনের ইলম হাসিলের দু'টি পর্যায় রয়েছে : ১. মৌলিক জ্ঞান অর্জন এবং ২. বিশেষজ্ঞ হওয়া। দীনের মৌলিক জ্ঞানার্জন সকল মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। কিন্তু কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরযে কিফায়াহ। তাই মুসলিম তরুণদের একটি অংশকে ভালো আলেম, ফকীহ, মুফাসসির ও শরীআতের বিভিন্ন দিকের গভীর জ্ঞানের অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ হতে হবে। কারণ দীনের গভীর ইলম না থাকলে ইসলামের আলোকে যুগসমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দীনের গভীর ইলম অর্জন করার জন্য মাদরাসায় পড়া জরুরি নয়। তবে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, উসুল, আকাইদ, বালাগাত, মানতিক, আরবী সাহিত্য, নাহু, ছরফ প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। যেমন মেডিক্যাল সাইন্স না পড়ে ডাক্তারি করা যায় না। অনুরূপভাবে উল্লিখিত জ্ঞান ছাড়া কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়া শরীআতের মৌলিক কোনো বিষয়ে অভিমত দিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা এই যে, দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের প্রতি অনেক প্রতিভাবান তরুণ এই কারণে আকৃষ্ট হয় না যে, দীনি ইলম চর্চা করলে অর্থ উপার্জন হয় না। আলেমদের চাকরির সুযোগ সীমিত। মসজিদ, মাদরাসাসহ সীমিত কিছু জায়গা ছাড়া তারা চাকরি করতে পারে, না। উক্ত বাস্তবতার কারণে মেধাবী ছাত্ররা অন্য বিষয়ের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হয়, সে তুলনায় ফিকহ, তাফসীর, হাদীস পড়ার জন্য আকৃষ্ট হয় না। সত্যিকার আলেম তৈরি না হলে ইলমে দ্বীনের সঠিক চর্চার পরিবর্তে সমাজে শিরক, বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটবে। দীনের গভীর জ্ঞান ছাড়া যুগসমস্যার ইসলামী সমাধান সম্ভব হবে না। অতএব সরকার ও সমাজের চালিকাশক্তি যাদের হাতে রয়েছে তাদের ইলমে দীনের চর্চা ও গবেষণার প্রতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। একজন ছাত্র মেডিক্যাল সায়েন্স পড়ার পর মেডিক্যাল সায়েন্সের বিভিন্ন দিকে স্পেশালিস্ট হওয়ার সুযোগ আছে। এমবিবিএস পাস করে কেউ চক্ষু বিশেষজ্ঞ, কেউ নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ, কেউ শিশু বিশেষজ্ঞ হন। এভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে পড়াশোনা করে স্পেশালিস্ট হওয়ার সুযোগ আছে। যারা আইনে পড়াশোনা করেন তারা আইনের কোনো একটি দিকে স্পেশালিস্ট হন। কিন্তু যারা মাদরাসায় পড়াশোনা করেন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইনসহ সকল বিষয় তাদের একজনের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই।

www.nagorikpathagar.com

এটা বাস্তব যে, একজন ডাক্তার চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের উপর মৌলিক জ্ঞানার্জন করার পর কোনো একটা দিকে স্পেশালিস্ট হওয়ার পর তার দ্বারা সমাজ ও মানবতা বেশি উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে একজন আলেম শরীআতের বিভিন্ন দিকের উপর মৌলিক ধারণা অর্জনের পর কোনো একটি দিকে স্পেশালিষ্ট হলে তাঁর কাছ থেকে সমাজ বেশি উপকৃত হবে। তাই শরীআতের বিভিন্ন দিকের উপর স্পেশালিস্ট তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

শরীআতের বিভিন্ন দিকের উপর স্পেশালিস্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভালো ডাক্তার না হলে মানুষের ভালো চিকিৎসা সম্ভব নয়। আর ভালো চিকিৎসক না থাকলে অসুস্থ মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই আমরা ভালো ডাক্তার তৈরির জন্য চেষ্টা করি। অনুরূপভাবে ভালো আলেম না হলে শরীআতের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া সম্ভব নয়। আর শরীআতের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সঠিকভাবে তুলে ধরার মতো ভাল আলেম না থাকলে শরীআতের অপব্যাখ্যা হতে পারে। এমনকি মানুষের ঈমান আকীদা নষ্ট হতে পারে। তাই শারীরিক চিকিৎসার জন্য আমরা যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করি আত্মিক চিকিৎসার জন্য তারচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই শরীআতের গভীর জ্ঞানার্জনে আগ্রহী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী শুধু ভবিষ্যৎ উপার্জনের কথা চিন্তা করে শরীআতের জ্ঞান-গবেষণার পথ ছেড়ে অন্য পথে যাওয়া উচিত নয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রিযিক আল্লাহর হাতে, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির জন্য অর্থ আসল মানদণ্ড নয়। তাই উপার্জনের কথা বিবেচনা করে শরীআতের উপর গবেষণার মেধা ও সুযোগ থাকার পরও অন্য দিকে যাওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, কারো যদি শরীআতের তুলনায় অন্য ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মতো যোগ্যতা বেশি থাকে তার জন্য সেই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়া 'ফরয আল কিফায়াহ'।

২. সিভিল সার্ভিস : সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রশাসনই দেশ পরিচালনা করে। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা তাদের ভূমিকার উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সৎ হলে দেশে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি থাকে না। সাধারণ মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা অসৎ ও অযোগ্য হলে দেশ দুর্নীতিতে এক নম্বর হয়, সামান্য কাজেও মানুষকে ঘুষ দিতে হয়। পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের প্রচুর অর্থ লোকসান হয়। প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারে না। সরকারের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রশাসনের সর্বস্তরের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রশাসনের অসহযোগিতার ফলে যেকোনো জনপ্রিয় সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। অতএব যাদের মেধা ও যোগ্যতা আছে তাদের একটি অংশ সরকারি প্রশাসনে যাওয়া দরকার।

www.nagorikpathagar.com

৩. শিক্ষকতা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। দেশের নতুন প্রজন্মকে গড়তে হলে ভালো শিক্ষক প্রয়োজন। একজন ভালো শিক্ষকের সংস্পর্শে দুষ্ট ছেলেরাও ভালো হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। কারণ, সত্যিকার শিক্ষা ছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমাদের সমাজকাঠামোর পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষিত মানুষের মন ও মননের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মন ও মননের পরিবর্তন সাধনে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই যাদের শিক্ষকতার প্রতি আকর্ষণ আছে, মেধা ও যোগ্যতা আছে, তাদের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনের চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য পিটিআই, বিএড ও এমএডসহ বিভিন্ন ধরনের কোর্স করা যেতে পারে।

৪. প্রতিরক্ষা বাহিনী : প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। কোনো দেশের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হলে সেনাবাহিনীই জীবনবাজি রেখে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসে। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ ও সংকটে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৪৯] তাই মুসলিম তরুণদের একটি অংশের সামরিক বাহিনীতে যোগদান এবং মুসলমানদের সমরশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

৫. মিডিয়া : মিডিয়া দুই ধরনের– প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, লিফলেট, পোস্টার, ওয়েবসাইট, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খবর জানা যায়। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যেকোনো সংবাদ বিশ্বের আনাচে-কানাচে অতি দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। মিডিয়া বর্তমান বিশ্বকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন ভালো মানুষও মিডিয়ার অব্যাহত অপপ্রচারের ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে খারাপ মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি মিডিয়ার কভারেজ পেয়ে বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে পারে। মিডিয়ার প্রচারণার ফলেই অল্প সময়ে মানুষের মধ্যে

---

৪৯. সেনাবাহিনীর সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া সরকার চলতে পারে না। তুরস্কে বর্তমানে ইসলামপন্থী একটি দল ক্ষমতায় থাকার পরও এখনও সরকারিভাবে হিজাব নিষিদ্ধ। কারণ ইতঃপূর্বে সেনাবাহিনীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতাবলে সেনাবাহিনী সরকার পরিবর্তন করতে পারে। বর্তমান তুরস্ক সরকার সমাজসংস্কারে 'ধীরে চলো নীতি' গ্রহণ করেছে। ইতঃপূর্বে নাজিমুদ্দিন আরবাকানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে একই কারণে পদত্যাগ করতে হয়েছে। আলজেরিয়াতে ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও পাশ্চাত্যের ইঙ্গিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেনি। সেখানে ইসলামী দলগুলোর উপর এখনও নির্মম নির্যাতন চলছে। অথচ ইসলামী দলগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থন রয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

কোনো আদর্শ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। আবার কোনো আদর্শ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে বিশ্বজনমত গঠনে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংস্থাগুলো ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। রয়টারের ৮০ শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী ইহুদি। এসোসিয়েট প্রেস (এপি)-এর ৯০ শতাংশ পুঁজিই ইহুদিদের। আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি), ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম (এনবিএস), ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সিএনএন), ফ্রান্স নিউজ এজেন্সী, বিবিসি প্রভৃতি সংবাদ সংস্থা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান, অবজারভার ওয়াশিংটন পোস্ট প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাও ইহুদি নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহুদিরা মুসলমানদের প্রধান শত্রু। তাই তারা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে মুসলমানদের মৌলবাদী (Fundamentalist), সাম্প্রদায়িক (Communal), সন্ত্রাসী (Terrorist) হিসেবে চিত্রিত করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবজাগরণ ঠেকাতে চায়।[৫০] মুসলিম দেশগুলোতেও তাদের দালালরা একই পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে। পাশ্চাত্যের মিথ্যা প্রচারণায় মুসলমানরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েও উল্টো 'টেরোরিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

মুসলমানদের হাতে প্রচুর সম্পদ আছে, কিন্তু বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাকে মোকাবিলা করার মতো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নেই। দি টাইমস, দি গার্ডিয়ান, দি ইন্ডিপেন্ডেন্টের মতো আন্তর্জাতিক মানের কোনো পত্রিকা নেই। তাই মুসলমানরা পাশ্চাত্যে মিডিয়ার আক্রমণ ও অপপ্রচারের শিকার। কারণ অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার মতো কোনো শক্তিশালী মাধ্যম মুসলমানদের হাতে নেই। এমতাবস্থায় মুসলিম তরুণ সমাজের যাদের মিডিয়া স্টাডিজ পড়ার আগ্রহ আছে তাদেরকে মিডিয়াকর্মী হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। রেডিও, টিভি ও পত্র-পত্রিকা মুসলিম তরুণ সমাজের একটি অংশের কাজের ক্ষেত্র হওয়া উচিত।

৬. ব্যবসা : অর্থনীতি হলো বিশ্বের অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের অনেক সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, গোটা বিশ্বের অর্থনীতির ওপর মুসলিম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ৫ শতাংশের বেশি নয়।[৫১] অথচ ব্যবসার প্রতি কুরআন ও হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কারণ একটি জাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া জরুরি। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মুসলমানরা অতীতে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিল। আরব বণিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়ের সুবাদে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,

---

৫০. হারুনুর রশীদ, তথ্যসন্ত্রাস বাংলাদেশের অবস্থা, পৃ-২১।

৫১. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.com

নবী-রাসূলদের অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত হযরত খাদিজার ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। হযরত ওসমান তদানীন্তন সময়ের বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন। ইমাম আবু হানিফারও বিরাট ব্যবসা ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণের সুবিধা হচ্ছে, এতে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে না। তাই অনেকেই ব্যবসাকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু কেউ কেউ ব্যবসা শুরু করে ব্যর্থতার নজির স্থাপন করেছেন। অতএব ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে :

১. সফল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।
২. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট পড়াশোনা করতে হবে।
৩. একসাথে অনেক ব্যবসায় জড়িত হয়ে সব ব্যবসায়ে লোকসান দেওয়ার পরিবর্তে কোনো একটি ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করার পর অন্য ব্যবসা শুরু করা ভালো।
৪. ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রাখতে হবে। ভেজাল দ্রব্য আমদানি ও চোরাচালানি থেকে বিরত থাকতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের কথা ক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়াসহ ব্যবসায়ে নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে।
৫. কোম্পানি করে কোনো ব্যবসা শুরু করলে আমানতদারি রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বন্ধুত্ব ও ব্যবসা এক কথা নয়। কেউ কারো উত্তম বন্ধু হতে পারে কিন্তু উত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে অফিসিয়াল ডকুমেন্টসহ সকল কাগজপত্র ঠিকমতো রাখা প্রয়োজন। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে এমন সব ছিদ্রপথ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অমুসলিমরা অংশীদারিত্ব ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু তাদের মোকাবিলা করার মতো বিশ্বে মুসলিম ব্যবসায়ী বা কোম্পানির সংখ্যা খুবই সীমিত। মুসলিম কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠার পরপরই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে যায়। অথচ মুসলিম কোম্পানিগুলোই অধিক সততা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করে বিশ্বে ব্যবসায়িক সফলতার নজির স্থাপন করার কথা ছিল। তাই মুসলিম তরুণ সমাজের একটি অংশকে বিবিএ, এমবিএ এ ধরনের বিষয়ে পড়াশোনা করা এবং ব্যবসায়িক সফলতার নজির স্থাপন করা সময়ের দাবি।

৭. ব্যাংকিং : কোনো দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে অর্থনৈতিক উন্নতি পূর্বশর্ত। একটি দেশকে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি প্রশাসনের স্বচ্ছতার পাশাপশি ব্যাংকিং সেক্টরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুদি ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানুষের শোষণের হাতিয়ার– এ কথা একসময় বিশ্বাস করতে কষ্টকর হলেও আজ অনেকেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। বর্তমান সময়ে ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব কি না এটা দু'দশক আগে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল। কিন্তু 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' পরপর কয়েক বছর বেসরকারি ব্যাংকিং সেক্টরে মুনাফা অর্জনে শ্রেষ্ঠ হয়ে অনেকেরই ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যাংকিং সেক্টরে ভূমিকা রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.com

৮. সাহিত্যচর্চা : সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস অনেক মানুষের খুব প্রিয়। অনেকেই গল্প, উপন্যাস পড়ার জন্য রাতের ঘুম পর্যন্ত ত্যাগ করেন। গল্প, উপন্যাস ও কাব্য পড়া অনেকেরই নেশা। তারা সাহিত্য পড়েই আনন্দ পান। কিন্তু সাহিত্য শুধু মানুষকে আনন্দ দেয় না, নির্দিষ্ট দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআন দিয়েছেন, উক্ত কিতাব পড়ে মানুষ যেন কুরআনের নির্দেশিত পথে চলে। আফসোস হচ্ছে এমন অনেক মুসলমান আছেন, জীবনে একবারও কুরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। কিন্তু কয়েক শত নাটক, নভেল, গল্প, কবিতার বই খতম করে ফেলেছেন।[৫২] এ ধরনের ব্যক্তিদের মন-মননের উপর সাহিত্যের বিরাট প্রভাব রয়েছে। তারা সাহিত্যপাগল, কবি, সাহিত্যিককে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করে। তাদের কাছে রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শিক বক্তব্যের চেয়ে কবি সাহিত্যিকদের লেখার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই কোনো একটি সমাজ পরিবর্তন করতে হলে সমাজের মানুষের মন ও মননে নাড়া দিতে পারে এ ধরনের সাহিত্য প্রয়োজন। অতএব যাদের সাহিত্যচর্চার ঝোঁক আছে, মেধা, প্রতিভা ও সুযোগ আছে তারা সাহিত্যচর্চাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে বাছাই করতে পারেন।

৯. গান ও সংস্কৃতিচর্চা : সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেই তৃপ্তি পায়। গানের একটি কলি তাদের উজ্জীবিত করে। ইংরেজ শাসনামলে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা সকলকে আলোড়িত করেছিল। আল্লামা ইকবাল, মাওলানা রুমী, কবি হালি, ফররুখ, আল মাহমুদ ও মতিউর রহমান মল্লিক এঁদের কবিতা ও গানের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যেও লক্ষণীয়। তাই যাদের মাঝে আল্লাহ তাআলা এ ধরনের যোগ্যতা দিয়েছেন তারা সুস্থ সংস্কৃতিচর্চায় অবদান রাখতে পারেন।

১০. বিজ্ঞান ও গবেষণা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। মানব সভ্যতার অন্যতম চালিকাশক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে মুসলিম বিশ্ব শুধু পিছিয়েই নয়; বরং প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইহুদি-খ্রিস্টান বিশ্বের উপর নির্ভরশীল। অথচ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সৃষ্টিনৈপুণ্য নিয়ে জ্ঞান-গবেষণা বা তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর করার কথা বলেছেন। তাই মুসলিম তরুণ সমাজের যাদের যোগ্যতা আছে, বিজ্ঞানচর্চাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এ কারণে পদার্থবিদ্যা, প্রাণরসায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন। আমরা যদি বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের তালিকা সামনে নিয়ে হিসাব করি তাহলে দেখতে পাবো যে, কয়েক শত নতুন আবিষ্কারের মধ্যে কয়জন মুসলিম বিজ্ঞানী আছেন? অতএব মুসলিম তরুণ সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, "একবিংশ শতাব্দীতে নতুন নতুন আবিষ্কারে আমরা পাশ্চাত্যের চেয়ে পিছিয়ে থাকবো না। আমরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দেব।"

---

৫২. যদিও মৌলিক ইসলামী সাহিত্য পড়ার তুলনায় নাটক, নভেল পড়াকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়, কিন্তু যেসব তরুণ ইসলামী সাহিত্য পড়তে অভ্যস্ত নয়; বরং কাব্য, উপন্যাসের প্রতি আসক্ত, তাদের চিন্তার মোহ ভাঙতে হলে অনুরূপ সাহিত্য দরকার।

www.nagorikpathagar.com

অতএব একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম যুবসমাজকে ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে অমুসলিম বিজ্ঞানীদের চেয়ে আরও উন্নত নতুন নতুন আবিষ্কার করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং বিজ্ঞানচর্চাকেই ক্যারিয়ার ফিল্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১১. তথ্যপ্রযুক্তি ঃ বর্তমান পৃথিবী তথ্যপ্রযুক্তির দিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। উন্নত বিশ্বে গৃহস্থালী থেকে শুরু করে অবসর, বিনোদন, অফিস-আদালত, প্রতিরক্ষা, গবেষণা, এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারের উপর ন্যস্ত বলা যায়। সবকিছু কম্পিউটারাইজড হতে চলেছে, ছেলে-মেয়েরা কম্পিউটার বিনোদনের মধ্যেই অনেক কিছু শেখে, ঘরে বসে কম্পিউটারের মাধ্যমেই শপিং করে, বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে ইন্টারনেট থেকে জানার চেষ্টা করে।[৫৩] লন্ডনের 'ডকল্যান্ড রেল' চালক ছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাস, ট্রেন বা বিমান অফিসে কিংবা কোনো ট্রাভেলস, এজেন্সিতে যাওয়া ছাড়াই ইন্টারনেট ব্যবহার করে টিকেট কেটে চলে যাওয়া যায়। কম্পিউটারে ইন্টারনেট অনুসন্ধান করলে মনে হয়, এ যেন জ্ঞানের এক মহাসাগর।

এ কথা ঠিক যে, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফিসহ চরিত্রবিধ্বংসী অনেক কিছুই বিদ্যমান। এসব কিছু থাকার কারণে 'কম্পিউটার' থেকে বিমুখ থাকার সুযোগ নেই। এ ধরনের ক্ষতিকর জিনিস যেন কোমলমতি ছেলে-মেয়েরা দেখতে না পারে সেজন্য সজাগ ও সচেতন থেকেই কম্পিউটারের শিক্ষা বাড়াতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো তথ্যপ্রযুক্তিতেও মুসলিম দেশগুলো খুবই পিছিয়ে আছে। কোনো জাতি পিছিয়ে থাকলে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার। কারণ চলমান বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে না পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাবো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দু'জন প্রতিযোগীর উভয়ে যদি পায়ে হেঁটে চলে, তাদের মধ্যে ব্যবধান যত থাকবে, তাদের একজন বাই-সাইকেলে আরেকজন হেঁটে চললে উভয়ের ব্যবধান আরও বেশি হবে। কিন্তু একজন হেঁটে আরেকজন মোটরযানে চললে উভয় প্রতিযোগীর মধ্যে ব্যবধান কতটুকু হবে তা হিসাব ছাড়াই কল্পনা করা যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র একটি আরেকটির জন্য যেমন সহযোগী, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগীও বটে। এই প্রতিযোগিতায় সেই রাষ্ট্রই সামনে চলে যায়, যে রাষ্ট্র আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অগ্রসর। এজন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি মুসলিম তরুণ সমাজের ব্যক্তিগত আগ্রহ, উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। যুবসমাজ খেলাধুলায় যেমনভাবে আগ্রহী, তেমনিভাবে ১০/১৫ জন মিলে চাঁদা তুলে 'কম্পিউটার ক্লাব' গড়ে তুলতে পারে, আর মুসলিম তরুণ সমাজের একটি অংশকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ব্যাপক তথ্যপ্রযুক্তিতে গবেষণাকে ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ

---

৫৩. আফসোসের কথা, কিছুদিন আগে আমাদের দেশের শীর্ষ পর্যায়ের একজন পদস্থ ব্যক্তি আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলনে যান। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব ডেলিগেট যান তারা তার ই-মেইল জানতে চান। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'আমার কোনো ই-মেইল নেই। অথচ ই-মেইল হচ্ছে বর্তমানে যোগাযোগের মাধ্যম।

www.nagorikpathagar.com

করতে হবে। তাহলেই একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তিতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবো।[৫৪]

১২. চিকিৎসাবিজ্ঞান : স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। এটা শুধু একটি প্রবাদ নয়, এ বাস্তব সত্য। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সকলেই খুব বেশি পেরেশান থাকে। আফসোসের বিষয় বর্তমানে মুসলমানরা জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানেও অনেক পেছনে রয়েছে। কোনো মুসলিম মারাত্মক অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য অমুসলিম দেশসমূহে ছুটতে হয়। চিকিৎসার জন্য অমুসলিম ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া বৈধ হলেও বর্তমান মুসলিম তরুণ সমাজকে বিশ্বের সেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাই এমবিবিএস পাস করার পর যাদের যোগ্যতা আছে তাদের এফআরসিএসসহ মেডিক্যাল সায়েন্সের উপর উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া প্রয়োজন।

১৩. আইন : কোনো দেশে আইনের শাসন রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচারক ও আইনজীবীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী আদালত ও বর্তমানে প্রচলিত আদালত ব্যবস্থায় মৌলিক পার্থক্য থাকলেও সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে যোগ্য ও দক্ষ আইনজীবী দরকার। এ কারণে তরুণ সমাজের একাংশকে আইন বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য দেশে আইন বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি যাদের মেধা ও সামর্থ্য আছে তারা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারেন।

১৪. ইঞ্জিনিয়ারিং : দেশের স্থাপত্যশিল্পে উন্নতি লাভ করতে হলে যোগ্য প্রকৌশলীর প্রয়োজন। অতএব তরুণ সমাজের একটি অংশকে প্রকৌশলবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

১৫. কৃষিকাজ : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি খাত থেকেই বাংলাদেশের সর্বাধিক রাজস্ব আসে। তাই কৃষি উন্নয়নের সাথে দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। অতএব তরুণ সমাজের একটি অংশের কৃষিবিদ হয়ে দেশের কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখার যোগ্যতা অর্জন করা দরকার।

---

৫৪. আমাদের দেশে অনেক ধরনের ক্লাব আছে– ফুটবল ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, গলফ ক্লাব, টেবিল টেনিস ক্লাব ইত্যাদি। এসব ক্লাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিনোদনের জন্য যান। এসব ক্লাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমাজের বিত্তবান মানুষের সাহায্য ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা চাঁদা তুলে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে চাঁদা তুলে কম্পিউটার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা, ক্রিকেট ম্যাচের মতো মাঝে মধ্যে নিজেদের মধ্যে কম্পিউটার প্রতিযোগিতা হতে পারে। যেমন, কে কত অল্প সময়ে বিশুদ্ধ কম্পোজ করতে পারে, গ্রাফিকস, ডিজাইন, ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কে কতটুকু পারদর্শী তা প্রতিযোগিতার বিষয় হতে পারে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ক্রিকেট খেলায় দর্শকের অভাব হয় না। কিন্তু কম্পিউটার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিরও অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে জনগণকে বিশেষত যুবসমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রচারণা চালাতে হবে। কেউ কেউ বলতে পারেন কম্পিউটার তো অনেক দামি, ইচ্ছা করলেই তা কেনা যায় না। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, যেমনভাবে ইচ্ছা করলেই ফুটবল কেনা যায় কিন্তু ইচ্ছা করলেই কম্পিউটার কেনা যায় না। তবে এ কথাও ঠিক যে, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। এটা একদিনেই সম্ভব নয়, এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.com

১৬. এনজিও : বাংলাদেশে প্রচুর বেসরকারি সামাজিক সংগঠন বা এনজিও রয়েছে। অধিকাংশ এনজিও বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর এবং বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। অতএব মুসলিম তরুণ সমাজের একাংশকে গ্রামেগঞ্জে বেসরকারি উদ্যোগে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১৭. প্রকাশনা : প্রকাশনা শিল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ। যারা সাহিত্যচর্চা করেন তাদের লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রকাশকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই যেসব মুসলিম তরুণের প্রকাশনা শিল্পের প্রতি আকর্ষণ আছে, তাদের এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে প্রকাশনাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

১৮. আত্মকর্মসংস্থান : উন্নত বিশ্বে সেল্‌ফ এমপ্লয়মেন্ট পরিভাষাটি সকলের কাছে পরিচিত। কেননা, শিক্ষিত তরুণ সমাজের বিরাট অংশ আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা করে। আমাদের দেশে পড়াশোনা করে সরকারি চাকরি না পেলে অনেককেই হতাশ হয়ে ঘরে বসে থাকতে দেখা যায়। অথচ গার্মেন্টিস শিল্প, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগির খামার, বাগানসহ বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট গ্রহণ করে আয় উপার্জন করলে শুধু নিজের কর্মসংস্থান হয় না, আরও অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

এরকম আরও অনেক ফিল্ড রয়েছে। একজন মুসলিম তরুণ আপন মেধা মূল্যায়ন করে যেকোনো একটি ক্ষেত্র বাছাই করে উক্ত দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করলে মেধার বিকাশ হয়। সমাজে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে সাফল্যের জন্য খুব বেশি শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। গ্রামেগঞ্জে অল্পশিক্ষিত অনেক মানুষ আপন আপন পেশায় খ্যাতি অর্জন করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। একজন ভালো কাঠমিস্ত্রি যে অর্থ উপার্জন করে মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করেও অনেকে তার অর্ধেক উপার্জন করতে পারে না। একজন ভালো টেইলরের কাছে জামা-কাপড় তৈরি করার জন্য সব সময় মানুষের ভিড় থাকে। একজন দক্ষ রঙমিস্ত্রীর হাতে ঘর রং করার জন্য মানুষ তার কাছে ছুটে যায়। তার টাকা-পয়সার অভাব হয় না। কোনো কোনো রাজমিস্ত্রির পারিশ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের সমান। এভাবে সমাজে এমন অনেক পেশা আছে, যাতে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর পড়াশোনার প্রয়োজন নেই।

যেকোনো একটি পেশার প্রতি ব্যক্তির আগ্রহ ও ঝোঁক থাকলে চেষ্টা করলে সময়ের ব্যবধানে ঐ পেশায় খ্যাতি অর্জন করা সম্ভব হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শুধু ছবি এঁকেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দিন গানের সুরের জন্যই এত প্রসিদ্ধ। ওয়াসিম আকরাম, সাঈদ আনোয়ার, সৌরভ গাঙ্গুলী, শোয়েব আখতার, ইমরান খান, শচীন টেন্ডুলকার, ইনজামাম উল হক প্রমুখ ক্রিকেট খেলেই বিশ্বে এত পরিচিত ও সমাদৃত।

www.nagorikpathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তিকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। তবে ব্যক্তির সাথে পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। তবে সমাজ বা রাষ্ট্র মেধা বিকাশের পথ সুগম করে দিতে পারে, মেধার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করতে পারে না। মেধা বিকাশের মূল দায়িত্ব ব্যক্তিকেই পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন, কোনো একটি ফুলবাগানের মালী পানি ঢেলে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু মালী ইচ্ছা করলেই ফুল ফোটাতে পারে না। আবার মালীর পরিচর্যার অভাবে অনেক ফুল অকালেই ঝরে পড়ে যায়। তেমনিভাবে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই কারো মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে না। রাষ্ট্র বা সমাজ মেধা বিকাশের পথ সহজ করে দিতে পারে। ব্যক্তি মেধা বিকাশে আন্তরিক হলে সমাজ বা রাষ্ট্রের সহযোগিতা তার মেধা বিকাশে সহায়ক হয়।

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মেধা বিকাশের চারটি স্তর রয়েছে :

১. শৈশব ও কৈশোর : শিশু বয়স থেকে উত্তমভাবে তত্ত্বাবধান না করার কারণে অনেক শিশুর মেধা বিকশিত হতে পারে না। শিশুদের মেধা বিকাশে পিতা-মাতা ও রাষ্ট্রের ভূমিকাই বেশি। কারণ সে বয়সে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ বোঝার বয়স শিশুর হয় না। এই সময় স্কুল শিশুর প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে কোনো শিশুর কী ধরনের মেধা আছে তা অনুসন্ধান করতে হয়।

২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর :এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মেধা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে উদ্দীপনা দিতে হয় এবং সহযোগিতা করতে হয়।

৩. গ্রাজুয়েশান/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় : এই পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও ঝোঁকপ্রবণতার আলোকে পড়ার সুযোগ দিতে হয়।

৪. ছাত্রজীবন শেষে কর্মজীবনের সূচনা : এই স্তরে মেধার আলোকে চাকরি/পেশা গ্রহণের সুযোগসহ সার্বিক সহযোগিতা করতে হয়। এক্ষেত্রে একেক স্তরে একেক ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

www.nagorikpathagar.com

প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তির ভূমিকা

প্রতিভা কী : বৈজ্ঞানিক এডিসনের মতে, প্রতিভা হচ্ছে এক ভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম ও সাধনা। এ কারণে সেপলার বলেন, প্রতিভা বলতে কিছু নেই। সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ একদিন হবেই। তাই প্রতিভা মানে অপরিসীম পরিশ্রম।

সবাই সুপ্ত প্রতিভার অধিকারী : প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মেধা লুক্কায়িত আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ـ

"মানুষ স্বর্ণ ও রূপার খনির মতো।"

তবে স্বর্ণ ও রূপার খনির মধ্যে যেমন তারতম্য আছে অনুরূপভাবে সকল মানুষের প্রতিভার মধ্যেও তারতম্য আছে। এ কারণে সকলের সৃজনক্ষমতা সমান নয়। স্বর্ণ ও রূপার খনি কাজে না লাগিয়ে মাটিচাপা দিয়ে রাখলে খনির অস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝা যায় না। যারা প্রতিভা কাজে লাগান তারাই প্রতিভাধর হিসেবে যশস্বী হন।

প্রত্যেকের মধ্যে যে রত্নতুল্য প্রতিভা রয়েছে তা হচ্ছে :

১. চিন্তাশক্তি (Thinking power), ২. ইচ্ছাশক্তি (Will power) ৩. মননশক্তি (Power of your soul) ৪. কর্মশক্তি (Physical strength or working capacity)। এসব প্রতিভা মূলত লুক্কায়িত আছে— ক. মস্তিষ্কে (In the brain) খ. মনে (In the mind), গ. আত্মায় (In the soul), ঘ. দেহে (In the body)।

যিনি উপরিউক্ত প্রতিভাসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগান তিনিই জগতে যশস্বী হতে পারেন।

প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র বিস্তৃত—যেকোনোটি বেছে নিন : পৃথিবীতে প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র অনেক। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর প্রমুখ তাফসীরশাস্ত্রে অবদান রেখে বিশ্বে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ফিকহশাস্ত্রে অবদান রেখেছেন বলে বিশ্বে এত বেশি পরিচিত। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রে অবদান রেখে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মুজাদ্দেদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মাওলানা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, হাসান আল বান্না প্রমুখ ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন করে বিশ্বের সর্বত্র আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। শেক্সপিয়র, আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল, ফররুখ আহমদ ও আল মাহমুদ সাহিত্য রচনা করে এত সুপরিচিত। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ও মুহাম্মদ বিন কাশিম রাজ্য জয় করে ইতিহাসে বরেণ্য হয়ে আছেন। পেলে, ম্যারাডোনা ফুটবল খেলে, ইমরান খান ও শচীন টেন্ডুলকার প্রমুখ ক্রিকেট খেলেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এভাবে একেকজন একেক ক্ষেত্রে অবদান রেখে বিশ্বে বরণীয় হয়েছেন। আপনাকেও আপনার মেধা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে এবং মেধা বিকাশে চেষ্টা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তিকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে : প্রত্যেকের মেধা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত। এই আমানতের সঠিক ব্যবহার করার প্রধান দায়িত্ব ব্যক্তির উপর। ব্যক্তি আগ্রহী ও কমিটেড না হলে অন্য কেউ তার মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দিতে পারে না। ব্যক্তির মধ্যে যদি এই অনুভূতি থাকে যে, আমাকে মেধা বিকশিত করতেই হবে তাহলে অন্যদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। আর ব্যক্তি নিজেই উদাসীন হলে কেউ তার প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে না।

সমালোচনায় সময় অপচয় না করে প্রতিভা বিকাশে মনোযোগী হোন : কোনো কোনো মানুষের স্বভাব অন্যের সমালোচনা করা, নিজের সমালোচনা সহ্য না করা। কিন্তু আপনি নিজের সমালোচনা নিজে করুন, অন্য থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক মুসলিম তরুণ সব সময় সমালোচনায় লিপ্ত থাকেন। কখনও মুসলিম বিশ্বের আর কখনও নিজ পরিবার, সমাজ, সংগঠন বা রাষ্ট্রের সমালোচনায় লিপ্ত থাকেন। তাদের সমালোচনার ভাষা নিম্নরূপ : মুসলিম বিশ্বে বড় কোনো বিজ্ঞানী নেই, সাহিত্যিক-গবেষক কিছুই নেই।

সংগঠনের সমালোচনা করে বলেন, সংগঠনের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নেই। প্রশাসন, মিডিয়া, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রভাব নেই ইত্যাদি।

তাদের সমালোচনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতা নিয়ে আমার মন্তব্য নেই। মুসলিম বিশ্ব কিংবা সংগঠনের প্রতি তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন মেধাবী অনেক মুসলিম তরুণকে মুসলিম বিশ্ব কিংবা সংগঠনের নেতৃত্বের সমালোচনায় সময় অপচয় করতে দেখি অথচ নিজের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে উদাসীন তখন খারাপ লাগে।

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, "আমি ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাংগঠনিকভাবে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসলিম উম্মাহর জন্য কতটুকু অবদান রেখেছি তা-ই আমার আত্মপর্যালোচনার বিষয় হওয়া উচিত। অন্যরা কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে সে সম্পর্কে ইতিবাচক আগ্রহ থাকা ভালো। কিন্তু অন্যদের সমালোচনা করলেই নিজ দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।"

বেদনার সাথে লক্ষ্য করি, অনেক মুসলিম তরুণ সমালোচনায় যত সময় অপচয় করেন সেই সময় যদি নিজের জীবনের টার্গেট নির্ধারণ করে কাজে লাগাতেন তাহলে অন্তত যেকোনো একটি ক্ষেত্রে একজন লোক তৈরি হতো। তিনি যে ঘাটতির কথা বলছেন কিছুটা হলেও সে ঘাটতি পূরণ হতো। কারণ প্রত্যেক মুসলিম তরুণ যদি একেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করেন তাহলেই হয়তো মুসলিম উম্মাহর যোগ্য লোকের ঘাটতি পূরণ হবে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, সমালোচনা করে সময় অপচয় করা যায়, যোগ্য লোক তৈরি হয় না। তাই প্রত্যেককে অপরের সমালোচনার পরিবর্তে নিজের জীবন গঠন করার জন্য দায়িত্বশীল হতে হবে এবং প্রতিভা বিকাশে নিজেকে নিজে তত্ত্বাবধান করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

মনে করুন আপনার দৃষ্টিতে প্রচার মাধ্যমে আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। পত্রিকার অভাব, সাংবাদিকের অভাব আপনি অনুভব করছেন। আপনার সাংবাদিকতার যোগ্যতা আছে। এখন আপনি যদি একজন ভালো সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করেন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন, তাহলে দশ বছর পর আপনার পরিকল্পনায় কমপক্ষে আরও দশজন সাংবাদিক তৈরি হয়ে যাবে। তখন আপনারাই একটা পত্রিকা বের করে পত্রিকার অভাব মোচনে কিছুটা ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

কেউ দেখলেন এনজিওগুলো যেভাবে কাজ করছে তার মোকাবিলায় একটা কিছু করা দরকার। এখন কেউ যদি ১০-১৫ বছরের একটা বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নেন, আর প্রচেষ্টা চালান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, তাহলে একটা এনজিও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

কেউ দেখলেন আমাদের আরও ভালো আলেম দরকার। তাঁরা যদি মাদরাসার ছাত্রদের একটা অংশকে টার্গেট নিয়ে ভালো আলেম বানাবার চেষ্টা করেন তাহলে কিছু আলেম তৈরি হবে।

কারো দৃষ্টিতে আমাদের এখনও অনেক সাহিত্য দরকার। শিশুসাহিত্য, সাধারণ মানুষের উপযোগী সাহিত্যের অভাব আপনি উপলব্ধি করছেন। আপনার যদি প্রকাশনার অভিজ্ঞতা থাকে, ভালো প্রকাশনা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য প্রকাশে হাত দিতে পারেন।

কারো দৃষ্টিতে সরকারি প্রশাসনে ঢোকা জরুরি। আপনার যোগ্যতা থাকলে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসনে ঢোকার চেষ্টা করুন এবং আপনার জানামতে যাদের এ ধরনের যোগ্যতা আছে তাদের উৎসাহিত করুন, সহযোগিতা করুন। এভাবে যাদের যোগ্যতা আছে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নেওয়া এবং নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

আমাদেরকে অন্যের সমালোচনার পরিবর্তে নিজের ভূমিকা নিয়ে আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। হতাশায় বা সমালোচনায় সময় অপচয় না করে প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি নিছক সমালোচক হবো না, সময়ের দাবি পূরণে নিজের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধন করবো এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দীনের প্রয়োজনে তা কাজে লাগাব।

ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে অন্যের উপদেশ গ্রহণ : আপনি ভবিষ্যতে কী করতে এবং কোন ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠন করতে চান– সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা, ঝোঁক ও চিন্তা-চেতনার পাশাপাশি আপনার অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতিজনদের উপদেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِكِتَابِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

www.nagorikpathagar.com

"দীন হচ্ছে উত্তম উপদেশ। আমরা প্রশ্ন করলাম, কার জন্য (উপদেশ)? রাসূলে কারীম (স) বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলমানদের নেতাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য।"[১]

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় একে অপরকে উত্তম উপদেশ দান করা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য। একজন মুসলিম অপর মুসলিম ভাই-বোনের ক্যারিয়ার গঠন সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া নেকীর কাজ। ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহী ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও উপদেশ নিতে পারে। উপদেশদাতাদেরও ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করেই উপদেশ দেওয়া দরকার। কেউ উপদেশ চাইলেই তাকে উপদেশ দিতে হবে, বিষয়টি এমন নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভালো। উপদেশ গ্রহণকারী নানা জন থেকে নানা ধরনের উপদেশ পেতে পারেন। সকলের পরামর্শ গুরুত্বের সাথে শোনা দরকার। কোনো উপদেশ অবাস্তব মনে হলেও উপদেশদাতার প্রতি ক্ষেপে না গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আবার বেশি উপদেশ গ্রহণ করে নানা মুনির নানা মত শুনে একেকবার একেক ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠনের চেষ্টা করা উচিত নয়। সকলের পরামর্শ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে জীবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিভা বিকাশে আগ্রহী ব্যক্তিকে যেসব গুণের অধিকারী হতে হয় : প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তিকে নিম্নে বর্ণিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে :

১. দায়িত্বানুভূতি ও সেলফ মোটিভেশন : ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব। এই অনুভূতি কারো মধ্যে থাকলে তার প্রতিভা বিকশিত হবেই। কারণ এ ধরনের ব্যক্তি অন্য কারো চাপে কাজ করে না, নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই কাজ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[২]

একজন ব্যক্তি যদি মনে করে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে মেধা দিয়েছেন তা বিকশিত করা আমারই দায়িত্ব—এই ধরনের অনুভূতি কারো মনে সৃষ্টি হলে তিনি তার মেধা বিকাশের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান এবং সেলফ মোটিভেটেড থাকেন। যারা নিজের দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করেন তারা অন্য কারো মোটিভেশন ছাড়াই আত্মা গঠনের চেষ্টা করেন। তারা নিজের ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে বেশ আগ্রহী থাকে। কোনো মানুষ যদি নিজের প্রতিভা বিকাশে নিজে আগ্রহী না হয় তাহলে অন্য কারো অনুপ্রেরণায় প্রতিভা বিকাশ সম্ভব হয় না।

---

১. সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম।

২. সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম।

www.nagorikpathagar.com

২. **কমিটমেন্ট :** কেউ কোনো কাজ করতে খুব বেশি আগ্রহী হলে উক্ত কাজ করার জন্য তার কমিটমেন্ট থাকে। সিরিয়াস কমিটমেন্ট ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করা কঠিন। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের স্বপ্নদ্রষ্টা রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪)-এর কথা জানি। তিনি অসম্ভব রকমের মেধাবী ও প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এমনসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা তখনকার লোকেরা কল্পনাও করতে পারত না। ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ ক্লিমেন্টেসের মৃত্যুর পর তিনি গ্রেফতার হয়ে ১৪ বছর জেলে ছিলেন। তবে জেলেও তিনি বসে ছিলেন না। জেলে বসেও তিনি জ্ঞানগর্ভ অনেক বই লিখেছেন।

৩. **প্রবল ইচ্ছাশক্তি :** জীবন গড়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রবল ইচ্ছাশক্তি অপরাজেয় বীরের মতো। যার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল তার পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও তদনুযায়ী চেষ্টার ফলেই পৃথিবীতে অনেকেই বরেণ্য হয়েছেন। হিটলার ঠেলাগাড়ির চালক ছিলেন, স্টালিন জুতোর মুচি ছিলেন, মুসোলিনি মুদির দোকানে কাজ করতেন। তারা সকলে পরবর্তী সময়ে নিজ নিজ দেশের কর্তা হয়েছেন। জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। 'জর্জ বার্নার্ড শ'র নাম আমরা সকলেই জানি। তিনি একটি অফিসের ক্যাশিয়ার ছিলেন। হঠাৎ ভাবলেন, এভাবেই কি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে? পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকরি ছেড়ে দিলেন এবং নিজেকে শেক্সপিয়রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সাহিত্যচর্চা শুরু করে দিলেন। সময়ের ব্যবধানে শেক্সপিয়রের মতো তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ কারণে মালয়েশিয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম বলতেন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি লৌহদণ্ডের চেয়েও শক্তিশালী।

তাই আমাদের চিন্তাশক্তির বিকাশে সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা অনেক শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই নিজের প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন নয়। অনেকে শক্তি ও যোগ্যতা বলতে শুধু দৈহিক শক্তি বুঝি। কিন্তু দৈহিক শক্তি সাময়িক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আরেকটি উহ্য শক্তি আছে আর তা হচ্ছে চিন্তাশক্তি। এটা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এটার শক্তি অনেক বেশি। চিন্তাশক্তিই মূলত শারীরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন ব্যক্তির মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সর্বোত্তম প্রয়োগ করেই চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো হয়। যেকোনো মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত চিন্তাশক্তি সর্বোত্তম কাজে লাগালেই পৃথিবীতে বড় বড় অবদান রাখতে পারেন। ইমাম বুখারীসহ হাদীসশাস্ত্রবিশারদদের অবদান, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার তাদের চিন্তাশক্তির সর্বোত্তম প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আসমান জমিনে আমরা যা কিছু দেখি তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন। যারা এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কুরআনের ভাষায় তারা উলিল আলবাব—বুদ্ধিজীবী। আর তারাই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী, যারা আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে গবেষণা করে। আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য একজন বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী যেভাবে দেখেন ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন আর একজন সাধারণ মানুষের দেখা

www.nagorikpathagar.com

এক নয়। তাই একজন সাধারণ মানুষ গাছগাছালির পাতা ঝরার দৃশ্য দেখে চলে যান, কিন্তু একজন কবি তা নিয়ে কবিতা রচনা করেন। মানুষের চিন্তাশক্তি কাজে লাগানোর ফলেই কেউ কোনো জিনিস দেখে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারেন, আর কেউ নতুন কিছু খুঁজে পান না।

৪. আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস : আমরা যখন দেখি একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ডিঙ্গিয়ে উপরে ওঠে তখন বলে থাকি অমুক অধিক মেধাবী। কিন্তু যিনি পেছনে পড়ে আছেন তার মেধা হয়তো আরও অনেক বেশি। কিন্তু তার নিজের মেধা নিজে উপলব্ধি না করার কারণেই মেধার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি। এই কারণে বলা হয়, "যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারলো সে যেন তার প্রভুকেও চিনতে পারলো।"

সক্রেটিস তার শিষ্যদের বলতেন Know they self নিজেকে জানো। বস্তুত প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রতিভা লুক্কায়িত আছে তা উপলব্ধি করলেই বিকাশ ঘটানো সম্ভব। আর প্রত্যেকের যোগ্যতা আছে, মেধা আছে, প্রতিভা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে।

[illegible]নকেই আছেন, যারা বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, তাদের অনেক মেধা আছে। [illegible] নিজেকে নিজে অবমূল্যায়ন করেন। নিজের মেধাকে নিজে স্বীকৃতি না দেওয়ার [illegible] তার পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব হয় না। জীবনে সফলতার জন্য প্রয়োজন [illegible] পর নিজের বিশ্বাস। কেউ কেউ যখন দেখেন তার আশপাশের সকলেই [illegible] কিছু হচ্ছেন অথচ তিনি নিজে কিছুই করতে পারছেন না, হতাশ হয়ে মনে [illegible]আমি অকর্মণ্য। আমার দ্বারা কিছুই হবে না।" এভাবে নিজেকে নিজে অকর্মণ্য [illegible] উচিত নয়। আপনি যদি নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন তাহলে সত্যিই আপনা[illegible] পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব হবে না। তাই কখনও নিজের উপর আস্থা হারাবেন [illegible] যোগ্যতা নেই এমন কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখা যেমন ঠিক নয়, তেমনি [illegible] মূল্যায়ন না করাও উচিত নয়।

৫. [illegible] : রাত-দিন পরিশ্রমের মানসিকতা থাকতে হবে। আজ ক্লান্ত, কাল [illegible] মানসিকতা দূর করতে হবে। অবশ্য অধিক ক্লান্তির সময় বিশ্রাম নি[illegible] ভালো থাকলে পরিশ্রম করার মানসিকতা রাখতে হবে। তাহলেই জী[illegible] করা সম্ভব। ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফ সংকলন করার জন্য এ[illegible] হাদীস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তিনশ মাইল হেঁটেছেন। এর ফলেই তাঁর পক্ষে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। তাই আমাদের মধ্যে উচ্চাশা থাকতে হবে। কারণ উচ্চাশা না থাকলে কোনো কিছুর উচ্চশিখরে পৌছা সম্ভব হয় না। আর উচ্চাশার কারণেই অনেকে পৃথিবীতে সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। এ কারণেই বলা হয় Ambition makes people diligent—উচ্চাশা না থাকলে জীবন সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ কারণে বলা হয়, জীবন হচ্ছে একটি গাড়ি, আর উচ্চাশা হচ্ছে তার ইঞ্জিন। যে গাড়ির ইঞ্জিন যত শক্তিশালী, সে গাড়ি তত বেশি দ্রুতগামী। অনুরূপভাবে যার জীবনে উচ্চাশা থাকে, তিনি আশা বাস্তবায়নে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেন।

www.nagorikpathagar.com

তবে উচ্চাশা ও অতিরিক্ত আশা এক কথা নয়। জীবনে উচ্চাশা থাকা ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত আশা কিংবা নিরাশা থাকা ঠিক নয়। অতিরিক্ত আশাবাদীরা স্বপ্নে বিভোর থাকেন। আর নৈরাশ্যবাদীরা জীবনে কোনো কিছু করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, "ভাই, আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি না করে একটা কলাগাছ বানালে মানুষ খেতে পারতো। মানুষের উপকার হতো।"

রসিকতা করে এ ধরনের কথা যারা বলেন তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। যারা নিজের জীবন নিয়ে হতাশ তাদের কাছে জাতি কী আশা করবে? আর এ ধরনের হতাশ ব্যক্তিরা বিশ্বকে নতুন কিছু দিতে পারবে না। কারণ হতাশা মানুষের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাই করে দেয়।

৬. কঠোর পরিশ্রম : কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কেউ জগতে উন্নতি করতে পারেনি। একজন পরিশ্রমী ব্যবসায়ী অল্প মূলধন নিয়ে ব্যবসায় সফলতা লাভ করেন। আবার আরেকজন প্রচুর মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেও মূলধন হারিয়ে ফেলেন। এর পেছনে অনেক কারণ থাকলেও পরিশ্রম নিঃসন্দেহে অন্যতম। কারণ পরিশ্রম ছাড়া কেউ কোনো কি অর্জন করতে পারে না।[৩] যারা অতীতে যশস্বী হয়েছেন তারা কঠোর পরিশ্রমী ছি মাওলানা রুমীর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। তিনি ২৬ হাজার কবিতা 'মসনবী' রচনা করেন। মাওলানা রুমীর জীবনচরিত রচয়িতা সিপাহসালা আমি তাঁকে দিনে বা রাতেও বিছানায় ঘুমোতে দেখিনি। কারণ শোবার জ তাঁর কোনো বিছানা এবং শিথান দেওয়ার জন্য ছিল না বালিশ। হাজার পরিশ্র তিনি শয়ন করতেন না। তবে খুব বেশি ভাব হলে তিনি বসে বসেই ঘুমোতে খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন যে, মানুষ অভ্যাসের দাস এবং মানুষ সাধনা করলে যে কোনো জিনিস আয়ত্ত করতে পারে।[৪]

এ কথা মনে রাখা দরকার, যাদের অধিক পরিশ্রম করার মতো শারীরিক শক্তি আছে তাদের সাধ্যমতো কঠোর পরিশ্রম করা দরকার। কারণ শারীরিক শক্তি সব সময় সমান থাকে না। কঠোর পরিশ্রমের ইচ্ছা থাকলেও একসময় তা সম্ভব হয় না। শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা মনের ইচ্ছাকেও দুর্বল করে দেয়।

৭. প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে উন্নত করার চেষ্টা : আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী একজন মুমিনের জীবন প্রতিদিন উন্নত হওয়া দরকার।

---

৩. একজন ব্যক্তিকে কোনো কিছু খেতে হলেও কিছু পরিশ্রম করতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি শুধু ডাল রান্না করে, তার পক্ষে মাছ-গোশত খাওয়া সম্ভব নয়। মাছ-গোশত খেতে হলে তাকে পরিশ্রম করতে হবে। অনুরূপভাবে জীবনে অনেক কিছু পেতে হলে বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

৪. আব্দুস সাত্তার, ১৯৮০, মাওলানা রুমী, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃ. ১৫

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (স) ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ فَجْرٍ يَوْمٍ يَنْشَقُّ إِلَّا وَ يُنَادِي مَلَكَانِ ، يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا يَوْمٌ جَدِيدٌ ، وَعَلَى عَمَلِكَ شَهِيدٌ ، فَتَزَوَّدْ مِنِّي فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

"দু'জন ফেরেশতার নিম্নরূপ আহ্বান ব্যতীত একটি প্রভাতও আসে না : হে আদম সন্তান! আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার কাজের সাক্ষী। সুতরাং আমার সর্বোত্তম ব্যবহার করো। শেষ বিচার দিনের আগে আমি আর কখনও ফিরে আসবো না।"[৫]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

مَنْ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ ـ

"যার দু'টি দিন একই রকম যায়, নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬]

৮. সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় না করা : সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় না করা সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন : তোমরা অপচয় করো না। যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।

আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"একজন ইসলামী ব্যক্তির অন্যতম গুণ হচ্ছে সে বেহুদা জিনিস পরিত্যাগ করে।"[৭]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"কোনো ক্ষতির কাজ করা উচিত নয় এবং প্রতিশোধমূলক ক্ষতির কাজও অনুচিত।"[৮]

অতএব অপচয় হয় বা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক এমন কোনো কাজে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। একজন মুমিন সমুদ্রে অযু করার সময়ও যতটুকু প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। তাই যেকোনো কাজ করার সময় চিন্তা করা দরকার, উক্ত কাজে কতটুকু সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা উচিত।

৯. প্রতিযোগিতা : প্রতিযোগিতার সময় সকলে তার মেধার সর্বোত্তম বিকাশ সাধনের চেষ্টা করে। স্কুল, কলেজ, মাদরাসায় যখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তখন একজন প্রতিযোগী আরেকজন প্রতিযোগীর চেয়ে ভালো করার চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে পড়াশোনাসহ বিভিন্ন কাজ করার সময় প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করা দরকার। ইসলামের দৃষ্টিতে হিংসা-বিদ্বেষ দোষণীয়। কিন্তু প্রতিযোগিতাকে ইসলাম শুধু অনুমোদনই দান করেনি, উৎসাহিতও করেছে।

---

৫. আল মা'ছার নবী (স)।

৬. সুনান আল দাইলামী।

৭. সুনান আল তিরমিযী।

৮. সুনান ইবনে মাজাহ।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ـ

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য।"

(সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

এ আয়াতে 'সারিয়ূ' শব্দটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছুটে চলোর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তাআলা নেক কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বলেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানলাভ ও নেক কাজে ব্যয় করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়াকে উৎসাহিত করেছেন।

১০. সর্বোত্তমভাবে কাজ করার চেষ্টা : উত্তমভাবে কাজ করলে উত্তম প্রতিফল পাওয়া যায়। একজন ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি সব কিছুই উত্তমভাবে করার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ـ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ـ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ـ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ـ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সর্বোত্তম পন্থা লিখে দিয়েছেন। যখন তোমরা যুদ্ধে কাউকে হত্যা করবে তখন উত্তমভাবে হত্যা করবে, আর যখন কোনো পশু কুরবানী করবে তখন উত্তম পন্থায় করবে। সুতরাং প্রত্যেকেই তার তলোয়ার বা ছুরি খুব ধার দিয়ে রাখবে, যাতে জবাইকৃত পশু আরামে মৃত্যুবরণ করতে পারে।"[৯]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়–দুনিয়ার জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে সর্বোত্তমভাবে সকল কাজ করার চেষ্টা করা উচিত।

১১. লক্ষ্য অর্জনে অবিরাম চেষ্টা : দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য ঠিক করুন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে অবিরাম চেষ্টা করতে থাকুন। এটাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "ওরা আমার এক হাতে চন্দ্র এবং আরেক হাতে যদি সূর্যকেও এনে দেয় তবু আমার পথ থেকে আমি এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হব না।" এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে হবে।

একটি উদাহরণ : আপনি হয় তো দেখছেন ফুটবল খেলার মাঠে একজন খেলোয়াড় সারা মাঠেই খেলে। কিন্তু তার লক্ষ্য সারা মাঠে খেলা নয়। তার লক্ষ্য হচ্ছে গোলপোস্ট। গোলপোস্টের কাছে বলটি নেয়ার জন্য সে নানাভাবে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষের বাধাকে শক্তি দিয়ে নয়, কৌশলে মোকাবিলা করছে। শক্তি প্রদর্শন করলে রেফারি হলুদ কার্ড বা লাল কার্ড প্রদর্শন করেন।

---

৯. সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান আত তিরমিযী, সুনান আদ দারিমী, সুনান ইবনে মাজাহ ও সুনান ইবনে নাসাঈ।

www.nagorikpathagar.com

অনুরূপভাবে আপনাকে মনে করতে হবে, আপনার জীবনটা একটা খেলার মাঠ। এই খেলার মাঠে আপনার টার্গেট হচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, ডক্টর বা অন্য কোনো কিছু হওয়া। আপনার উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধা আসবে। এসব বাধাবিপত্তি কৌশলে মোকাবিলা করতে হবে। একজন খেলোয়াড় গোলপোস্টে বল ছোড়ার পরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে কিংবা গোলরক্ষকের সময়োচিত ভূমিকার কারণে গোল দিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই ব্যর্থতাকে হতাশায় রূপ না দিয়ে লক্ষ্য অর্জনে আবারও মাঠে আপ্রাণ চেষ্টা করে। হয়তোবা দেখা যায় চেষ্টা করার ফলে নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তেও গোল দেওয়া সম্ভব হয়। আপনাকেও চেষ্টা করতে হবে। আপনার চেষ্টার ফল একেবারে বৃথা যাবে না। চেষ্টা করলে অধিকাংশ সময়ই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব কিংবা তার কাছাকাছি পৌঁছা যায়।

বাস্তব ঘটনা : প্রায় এক হাজার নতুন বিষয়ের উদ্ভাবক বিজ্ঞানী এডিসন দুই বছরে তিন হাজার বার ব্যর্থ চেষ্টা চালানোর পর বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে সক্ষম হন।

১২. অভ্যাসে পরিণত করা : যারা চা পান করেন তারা চা পান না করে থাকতে পারেন না। যারা পান খান তারা পান না খেয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারেন না। পান খেতে অভ্যস্ত অনেককে বলতে শোনা যায়, "ভাত না খেয়ে বাঁচতে পারবো; কিন্তু পান না খেয়ে বাঁচতে পারবো না।" এমনকি যারা বিভিন্ন ধরনের মাদকে আসক্ত তারা ড্রাগ গ্রহণ না করে থাকতে পারে না। এ কারণে মাদকে আসক্ত কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও ডাক্তারের পরামর্শে আস্তে আস্তে তার ড্রাগের পরিমাণ কমানো হয়। একদিনেই ড্রাগ বন্ধ করে দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে আপনি যদি জীবনে সফলতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনি যা করতে চান সেক্ষেত্রে আসক্ত হতে হবে।

১৩. ভালো বন্ধু : একজন মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করছি :

عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً ـ

"হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে কারীম (স) বলেছেন : সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে মেশক আম্বরের বাহক এবং কামারের উত্তাপক যন্ত্রের ন্যায়। মেশক আম্বরের বাহক হয়তো তোমাদের কিছু দেবে অথবা তোমরা তার থেকে খরিদ করবে অথবা অন্তত তোমরা তার থেকে সুঘ্রাণ পাবে। কিন্তু কামারের উত্তাপক যন্ত্র হয়তো তোমাদের কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, নয়তো নোংরা গন্ধে মেজাজ খারাপ করে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.com

অনেক মানুষ ভাল বন্ধুর সংশ্রবে এসে ভাল হয়ে যায়। আর অনেকেই খারাপ বন্ধুর সংশ্রবে এসে মদ খেয়ে, জুয়া খেলে সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়।

১৪. মেধা সঠিক কাজে লাগানো : আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে কম-বেশি মেধা দিয়েছেন। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে উক্ত মেধা কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটা ধারালো ছুরি দীর্ঘ দিন যদি ফেলে রাখা হয় তাতে মরিচা পড়ে যায়, তা দিয়ে কিছুই কাটা সম্ভব হয় না। তেমনি আপনার মেধা যদি কাজে না লাগান তাহলে একসময় ভোঁতা ছুরির মতো অকেজো হয়ে যাবে, কোনো ভালো কাজে প্রতিভা ব্যয় হবে না। তাই প্রত্যেকের মেধা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। মেধা যেকোন কাজে লাগালেই প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটে না। সঠিক কাজে মেধা ব্যবহার করতে হবে। মনে করুন একটা টেপরেকর্ডার অন আছে। সেখানে যদি কোনো শিশু কাঁদে তাহলে টেপে কান্নার আওয়াজই উঠবে। আর যদি কারও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে, তাহলে সে আলোচনাই উঠবে। অনুরূপভাবে মেধা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সতর্ক না হলে অনেক সময় সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না; বরং এমন কাজে ব্যয় হয়, যা ব্যক্তির কিংবা সমাজের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণে ব্যয় হয়।

প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়

১. লক্ষ্য নির্ধারণ : প্রত্যেক ব্যক্তির মেধা, যোগ্যতা, ঝোঁকপ্রবণতা ও সুযোগ-সুবিধা এক ধরনের নয়। একজন ব্যক্তি ভালো শিল্পী হতে পারেন কিন্তু ভালো লেখক হতে পারেন না। আবার আরেকজন ব্যক্তি ভালো প্রশাসক হতে পারেন কিন্তু ভালো সমাজসেবক হতে পারেন না। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে অনেক বিজ্ঞানীর ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, তারা পরীক্ষা কয়েকবার দিয়ে পাস করেছেন। কিন্তু তারা জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে কঠোর সাধনা করেছেন বলে তাদের পক্ষে অবাক করার মতো অনেক কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আপনি কখনো কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন কিংবা অন্য কিছু করার চেষ্টা করেছেন। আপনার অনেক স্বপ্ন ছিল, উচ্চাশা ছিল; কিন্তু জীবনের টার্গেট নির্ধারণ না করার কারণে পরিণত বয়সে আপনার শিশুবেলার সব আবেগ-উচ্ছ্বাস কঠিন বাস্তবতায় হারিয়ে যাচ্ছে। তাই জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা প্রতিভা বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

২. সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি : প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবন গড়ার জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। অনেক মেধাবী মানুষ সঠিক পথে জীবন পরিচালিত না করার কারণে শিক্ষা, ব্যবসা কোনোক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করতে পারেন না। তাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সঠিক পথে জীবন পরিচালিত করা দরকার। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন,

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।

www.nagorikpathagar.com

তিনি পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এ থেকে বোঝা যায়, প্রতিভা বিকাশের জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সকলকে সমান প্রতিভা দান করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যোগ্য একজন পাইলট গাড়ির ড্রাইভার হওয়ার অযোগ্য হতে পারেন, বড় একজন শিক্ষাবিদ ভালো শিল্পী না-ও হতে পারেন, আবার একজন ভালো গবেষক ভালো সমাজসেবক না-ও হতে পারেন।

৩. অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করা : যার যতটুকু কর্মক্ষমতা আছে তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অহেতুক দ্বিধা-সংশয়ে সময় অপচয় করা ঠিক নয়। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে এবং গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবন গড়ার চেষ্টা করতে হবে। রাস্তায় চলার সময় গাড়ির ড্রাইভার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকলে দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। একখণ্ড লৌহ কোন কাজে লাগানো হবে এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকলে তা কোনো কাজেই আসে না। অনুরূপভাবে কারো জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে জীবন পরিচালিত হয় না। ফলে জীবনে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয় না।

৪. অতীতের পর্যালোচনা, বর্তমানের করণীয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে ব্যক্তিগত জীবনে অতীত সফলতা ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করতে হবে। অতীতে কোন ক্ষেত্রে সফলতা এবং ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করে বর্তমানের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। বর্তমান কর্মপন্থা গ্রহণের সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সামনে রাখতে হবে।

অতীতের সফলতা-ব্যর্থতা পর্যালোচনার সময় সফলতার জন্য গর্ব, অহংকার আর ব্যর্থতার জন্য অধিক হতাশা ব্যক্ত করা ঠিক নয়। যারা শুধু অতীতমুখী তারা ভবিষ্যতের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিতে পারেন না। ফলে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণের মতো যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হয় না। অতীত আঁকড়ে থাকলে ভবিষ্যতের সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া যায় না। আবার কোনো বাস্তব পরিকল্পনা ছাড়া ভবিষ্যৎ নিয়ে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা কিংবা ভবিষ্যতে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়–এ ধরনের নৈরাশ্যে থাকা ঠিক নয়। ভবিষ্যতের অবাস্তব স্বপ্ন সময় অপচয় বৈ কিছুই নয়। নৈরাশ্য মানুষের ইতিবাচক যোগ্যতাকেও নষ্ট করে দেয়। আবার কেউ কেউ বলেন, অতীত চলে গেছে। অতীত নিয়ে ভাবার দরকার কি? আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা জানি না। তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে সময় নষ্ট করাতে লাভ নেই। বর্তমানে সুখে থাকলেই চলে। অতীত নিয়ে হতাশা বা গর্ব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্য বা রঙিন স্বপ্ন যেমন ঠিক নয় অনুরূপভাবে শুধু বর্তমান নিয়ে পড়ে থাকা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অতীত ইতিহাসই শুধু বলেননি, অতীতের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্যস্থানসমূহ দেখার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ - فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ -

www.nagorikpathagar.com

"তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে? এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী।"

(সূরা আলে ইমরান : ১৩৭-১৩৮)

আল্লাহ্ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۔

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।" (সূরা হজ্জ : ৪৬)

এই আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফী (র) লেখেন : "অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষাগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে।

ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত্তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি করো এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা করো যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙে যায় (রুহুল মায়ানী)। এই রেওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ কিছু নয়।"[১০]

৫. সফলতার জন্য চেষ্টার বিকল্প নেই : কোনো কাজে সফলতা লাভ করার জন্য লেগে থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোকাকোলা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। বিশ্বের ১৬০টিরও অধিক দেশে প্রতি বছর ১.৬ বিলিয়ন গ্যালন বিক্রি হয়। কিন্তু একদিনেই কোকাকোলা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেনি। ১৮৮৬ সালের ৮ মে ড. জন পেমবারটন প্রথম যখন কোকাকোলা আবিষ্কার করেন তখন প্রথম বছর গড়ে প্রতি দিন মাত্র নয় বোতল বিক্রি হতো। পরবর্তী সময়ে প্রচারণা ও ব্যবসায়িক পলিসির কারণে আজ সারাবিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়তে পরিণত হয়েছে।[১১]

৬. স্ট্যাটেজিক পরিকল্পনা : আপনি অনেক কিছু করতে চান কিন্তু কোনো বাস্তব পরিকল্পনা নেই। তাহলে আপনার সব আশা সময়ের ব্যবধানে হতাশায় পরিণত হবে। জীবনে সফলতা লাভের জন্য যা হতে চান তা হওয়ার শুধু আশা করলেই পাওয়া যায় না। লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাস্তব কর্মপরিকল্পনা দরকার।

---

১০. মুফতী শফী, মাআরেফ আল কুরআন, সূরা হজ্জের ৪৬ নম্বর আয়াতের তাফসীর।

১১. Things go better with Coca-Cola.

www.nagorikpathagar.com

৭. সময় যথাযথ কাজে লাগানো/প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো : আপনার কাছে প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে সময়টা চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে পাবেন না। যে সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে তাতে আপনি যা করতে পারতেন তা না করার কারণে আপনার জীবন থেকে সে সময়টুকু চলে গেল। একজন তরুণ যেমনিভাবে কৈশোর ফিরে পায় না, একজন বৃদ্ধও তেমনি তারুণ্য ফিরে পায় না। তাই আপনার সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়কে 'গনীমত' মনে করতে বলেছেন। অতএব যখন যতটুকু সময়-সুযোগ পাওয়া যায় তা কাজে লাগানো উচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

وَإِنْ قَامَتْ سَاعَةٌ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا -

"যদি জীবনে শেষ ঘণ্টা বেজে ওঠার মূহূর্তেও তোমাদের কেউ বাগানে একটি গাছের চারা রোপণের ইচ্ছা করে, তাহলে সে যেন এগিয়ে যায় এবং তা রোপণ করে।"[১২]

মানুষ যদি একবার আল্লাহু আকবর বলে যিকির করার সময় পায় তা করাতেই তার কল্যাণ নিহিত। কোনো ছাত্র যদি একটি শব্দার্থ শেখার সময় পায় তা শেখার মধ্যে তার জীবনের উন্নতি নিহিত। এত অল্প সময়ে বেশি কিছু করা যাবে না, তাই কোনো কিছু না করে বসে থাকা উচিত নয়।

৮. অন্যের গঠনমূলক সমালোচনা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করা : প্রত্যেক মানুষেরই কমবেশি দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেউ হয়তো ভালো জানেন কিন্তু ভালো বলতে পারেন না। কারো লেখনী বা বক্তব্যের স্টাইল কিংবা পড়াশোনার টেকনিক সম্পর্কে কারো কাছে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নির্দ্বিধায় বলা উচিত এবং তা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করা উচিত। কারণ নিজের দোষ-ত্রুটি নিজের চেয়ে অন্যের কাছে ধরা পড়ে বেশি। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ। "মুমিনরা হচ্ছে পরস্পরের আয়না।"[১৩]

৯. প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ : আমরা ছোটবেলায় আরবী সাহিত্যে একটি গল্প পড়েছিলাম। যতটুকু মনে পড়ে গল্পের নাম ছিল 'মাযা নাতাআল্লামু মিনাল হাইওয়ানাত' অর্থাৎ আমরা প্রাণীজগৎ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করি। আমরা প্রতিনিয়ত অনেক প্রাণী দেখি। যেমন পিঁপড়া একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। একটি পিঁপড়া পথ চলার সময় সামান্য কোনো জিনিসের সন্ধান পেলে অন্যদের সংবাদ দেওয়ার জন্য ছুটে যায়। ঝড়বৃষ্টি তথা বিপদ-আপদে পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। এ থেকে মানুষের জন্য শিক্ষা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ কোনো ভালো কিছুর সংবাদ পেলে অপরকে জানানো উচিত। বিপদে-আপদে পরস্পরকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। এছাড়া একটি পিঁপড়া তার ওজনের চেয়ে বিশগুণ ভারি জিনিস বহন করতে পারে। এ থেকে শিক্ষা হচ্ছে, একজন মানুষ চেষ্টা করলে বাহ্যদৃষ্টিতে অর্জন করা কঠিন মনে হলেও অনেক কিছু করতে পারে।

---

১২. সুনান আহমদ ইবনে হাম্বল।

১৩. সুনান আবু দাউদ ও সুনান আত তিরমিযী।

www.nagorikpathagar.com

১০. জীবন থেকে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা : ছাত্র মানেই পরিবার, সমাজ ও বন্ধু-বান্ধব আছে। কোনো ছাত্রই সমাজবিচ্যুত নয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে মিলেই একটি সমাজ। ছাত্ররাও ঐ সমাজের একজন সচেতন নাগরিক। তাই তারা পরিবার ও সমাজকে উপেক্ষা করতে পারে না। একজন প্রতিভাবান ছাত্র পরিবার, সমাজ ও পড়াশোনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করে এবং পাঠ্য বই থেকে জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করার সময়ও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে এবং এসব জ্ঞান জীবন গঠন ও প্রতিভা বিকাশে কাজে লাগায়।

১১. আল্লাহর সাহায্য কামনা : আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। জীবনের লক্ষ্য পূরণে বিনীত আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে দোআ করতেন, "হে আল্লাহ, আমার বক্ষ সম্প্রসারিত করো, আমার কাজ সহজ করে দাও।" হযরত ইব্রাহীম (আ) দোআ করতেন : "হে আল্লাহ ! আমার পরিজনদেরকে মুত্তাকীনদের ইমাম বানিয়ে দাও"।

আল্লাহ আমাদেরকে "রাব্বি যিদনী ইলমা- হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও"-এই দোয়া শিখিয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের দোয়ার বরকতেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তারজুমান আল কুরআন বা কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই আমাদেরকে সব সময় আল্লাহর কাছে প্রতিভা বিকাশের জন্য দোয়া করতে হবে।

পরিবারের ভূমিকা

সন্তানের প্রতিভা বিকাশ ও তাকে সুশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব সমাজের অন্যদের চেয়ে বেশি। পিতা-মাতাকে অনুসরণ করে ছেলে-মেয়েরা জীবন গঠন করে। তাই অনেক সময় দেখা যায় পিতা-মাতা যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আইনজীবী হন তাহলে ছেলে-মেয়েরাও তা হতে চায়। পিতা-মাতার একই পেশা গ্রহণ করতে তারা উৎসুক থাকে।[১৪] অবশ্য এর ব্যতিক্রমও অনেক আছে। পিতা-মাতাকে নিজ পেশায় অধিক ব্যস্ত থাকতে দেখে উক্ত পেশা গ্রহণ করতে অনীহাও অনেকের মনে সৃষ্টি হয়।

পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও কথাবার্তার ধরন সব কিছুই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একটি ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক অ্যাসেম্বলিতে হেড টিচার ছাত্রদের প্রশ্ন করেন, "আজ ফজরের নামায সূর্য ওঠার আগে কে কে পড়েছ?"

---

১৪. যার উদারহণ হচ্ছে, অনেক ব্যবসায়ীর সন্তান ব্যবসায়ী, শিক্ষকের সন্তান শিক্ষক, ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের সন্তান ইঞ্জিনিয়ার আছে।

www.nagorikpathagar.com

মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র হাত উঠিয়ে ইতিবাচক জবাব দেয়। যেসব ছাত্র ঠিকমতো নামায পড়েনি তাদের 'না পড়ার কারণ' জিজ্ঞাসা করা হলে অনেকেই জবাব দেয়, "আমার আব্বা-আম্মা অনেক দেরিতে ঘুম থেকে ওঠেন। তারা ফজরের নামায পড়েন না। আমাকেও পড়তে বলেন না। তাই আমি পড়ি নাই।"

এই ঘটনা থেকে জানা গেল, অনেক সময় পিতা-মাতার অভ্যাস সন্তানের অভ্যাসে পরিণত হয়।

সন্তানের পড়াশোনার জন্য পিতা-মাতা কী করতে পারেন : এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাসহ পরিবারের সদস্যদের বিরাট প্রভাব রয়েছে। পিতা-মাতা বিভিন্নভাবে সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন :

উৎসাহ প্রদান ও মোটিভেশন : পিতা-মাতা সন্তানকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায়, অল্পশিক্ষিত অভিভাবকের ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে অনেক বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করে। অথচ অনেক উচ্চশিক্ষিত পিতা-মাতার ছেলে-মেয়ে মাতা-পিতার কাছ থেকে উৎসাহ না পাওয়ার কারণে পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগী থাকে। সন্তানের সফলতার জন্য প্রশংসা ও পুরস্কার তাদের মনে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারে।

ভালো স্কুল নির্বাচন করা : ভালো সেলাই মেশিন ও দক্ষ কারিগর না হলে ভালো কাপড়ও নষ্ট হতে পারে, তেমনি ভালো প্রতিষ্ঠান ও ভালো শিক্ষক না হলে অনেক মেধাবী ছাত্রের মেধা কাজে না লাগতে পারে। এই কারণে শিশুদের পড়াশোনার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা জরুরি। প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়– স্কুলের অতীত রেজাল্ট, শিক্ষক-স্টাফ, পড়াশোনা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণ, একাডেমিক কার্যক্রম, ছেলে-মেয়েদের সহ-শিক্ষা না পৃথক শিক্ষা, স্কুলের ইউনিফর্ম আছে কি না, ছাত্রছাত্রীদের রেকর্ড বই আছে কি না এবং শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি তদারকি : নিয়মিত উপস্থিতি জরুরি। কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে স্কুলে না গিয়ে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়, খেলাধুলা করে। স্কুল ছুটি হলে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর সাথে বাড়ি ফেরে। তাই অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হয়। তাহলে ছেলে-মেয়েরা স্কুল ফাঁকি দিতে পারে না।

বিশেষ শিক্ষা সহযোগিতা : সকল ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় আগ্রহ, মেধা ও যোগ্যতা সমান নয়। কোনো পরিবারে তিনজন ছেলে থাকলে দেখা যায় একজন এত বেশি মেধাবী যে, কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই ভালো রেজাল্ট করতে পারে। আরেকজনের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক রাখার পরও ভালো করা কষ্টকর হয়। তাই ছেলে-মেয়েদের কার কী ধরনের বিশেষ সহযোগিতা দরকার সেদিকে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

তত্ত্বাবধান : পিতা-মাতা সন্তানদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে নানাভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারেন। এজন্য পিতা-মাতা খুব উচ্চ শিক্ষিত হওয়া জরুরি নয়। পিতা-মাতা মাঝে মধ্যে ছেলে-মেয়েকে ডেকে কোন বিষয়ে কী হোমওয়ার্ক আছে এবং তা কতটুকু সম্পাদন করা হয়েছে এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এজন্য মাঝে মধ্যে প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখতে হয় এবং তা দেখে ছেলে-মেয়ের অগ্রগতির জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও অভিভাবকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অভিভাবক এক্ষেত্রে সচেতন থাকলেই ছোট ছেলে-মেয়েরা সচেতন থাকে।

শিক্ষকের সাথে কথা বলা : মাঝে মধ্যে শিক্ষকের সাথে কথা বলা এবং সন্তানের পড়াশোনার খোঁজ-খবর নেয়া উচিত। অল্পশিক্ষিত এক অভিভাবকের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি। তার বাড়ি কুষ্টিয়ায়। তার ছেলেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের সাথে ছেলেকে পরিচিত করানোর জন্য কয়েকবার ঢাকা যান এবং বিভিন্নজনের কাছে ধরনা দিয়ে শিক্ষকদের সাথে কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করেন। পিতা-মাতা শিক্ষকের সাথে মাঝে মধ্যে যোগাযোগ রাখলে শিক্ষকরা তত্ত্বাবধান বেশি করেন এবং ছেলে-মেয়েরাও পড়াশোনার প্রতি অধিক সচেতন থাকে।

সঠিক কোর্স পছন্দ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং জোর করে কিছু চাপিয়ে না দেওয়া : কোনো কোনো অভিভাবক ছেলে-মেয়ের আগ্রহ ও মেধার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের পছন্দমতো বিষয় পছন্দ করতে পীড়াপীড়ি করেন। ছেলে-মেয়েদের পছন্দের বাইরে জোর করে বিবাহ দেওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার বিষয় নির্ধারণ করা উচিত নয়। জোর করে কোনো বিষয়ে ভর্তি করে দিলে ছেলে-মেয়ের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয় না।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী জিনিস সরিয়ে ফেলা : অনেক কারণে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। যেমন পিতা-মাতা যদি ঘরে বসে টিভি দেখেন ছেলে-মেয়েরাও টিভি দেখার জন্য পাগল হয়ে যায়। তাই পিতা-মাতাকে এমন কিছু করা উচিত নয়, যার কারণে সন্তানের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়।

পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা : পিতা-মাতা যদি সময় পেলেই ছেলে-মেয়েদের সামনে পড়াশোনা করেন তাহলে ছেলে-মেয়েরাও পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পিতা-মাতা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হলে সন্তানও শিখতে চায়।

পারিবারিক রুটিন : পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সাথে সঙ্গতি রেখে পারিবারিক কাজ, কোথাও বেড়াতে যাওয়া প্রভৃতির রুটিন করতে পারেন। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সময় দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত নয়। আমার জানা মতে অনেক পরিবারের অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা, খাওয়া, গোসল, ঘুমানো ও আনন্দ-উপভোগের সময়সূচি তৈরি করে রাখেন। এর ফলে ছোট থেকেই তারা পরিচ্ছন্ন ও সাজানো-গোছানো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী সময়ে তাদের উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হয়।

www.nagorikpathagar.com

ভালো ছাত্রছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ : ভালো ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে অনেক খারাপ ছাত্রছাত্রী ভালো হয়ে যায়। আবার খারাপ ছাত্রছাত্রীদের সাথে মেলামেশা করতে করতে অনেক ভালো ছাত্রছাত্রীও খারাপ হয়ে যায়। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের সাথে ভালো ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ সৃষ্টি করা এবং ভালো ছাত্রছাত্রীদের ঘরে নিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা।

অর্থ খরচ করার মানসিকতা : অনেক পিতা-মাতা প্রচুর উপার্জন করেন কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে খরচ করতে কষ্ট হয়। এটা ঠিক নয়। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে খরচ করা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা-পয়সা বিনিয়োগ করার চেয়ে অনেক উত্তম। তাই ছেলে-মেয়েদের উত্তম পড়াশোনার জন্য যে ধরনের শিক্ষা-উপকরণ দরকার তা ঠিকমতো দেওয়া দরকার। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ভালো ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরা প্রয়োজনীয় বই কিনে দিতে বা বিশেষ টিউশন দরকার হলে তার ব্যবস্থা করতে গড়িমসি করেন। এতে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনায় অফুরন্ত ক্ষতি হয়।

মাতা-পিতার সুসম্পর্ক : পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি থাকলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। ইংল্যান্ডে একবার একজন কিশোরকে রাস্তায় রাত কাটাতে দেখে প্রশ্ন করা হলো, তুমি রাস্তায় কেন রাত কাটাচ্ছ?[১৫] সে জবাব দেয়, আমার পিতামাতার ঝগড়া শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে গেছি। তাই ঘরে থাকতে মন চায় না।"

এই ঘটনায় দেখা গেল পিতা-মাতার সম্পর্কের অবনতির কারণে অনেক কিশোর ঘরে থাকতে চায় না। যেসব পরিবারে অশান্তি বিদ্যমান সেসব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা লাগামহীন চলাফেরা করে। তারা পড়াশোনা করছে কি না পিতা-মাতা খবর না নেওয়ার কারণে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্পগুজব করে সময় অপচয় করে। এর ফলে অনেক প্রতিভাবান ছাত্রের প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে।

সন্তানের জন্য দোয়া করা : পিতা-মাতা সন্তানের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করেন। কুরআন ও হাদীসে অনেক দোয়া শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রভু! আমার প্রার্থনা কবুল কর।"

(সূরা ইবরাহীম : ৪০)

অনুরূপভাবে সন্তানের মেধা ও প্রতিভা যেন বিকশিত হয় এবং তা যেন দীনের কাজে লাগে এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা প্রয়োজন।

---

১৫. ইংল্যান্ডে সাধারণত ফুটপাতে থাকতে হয় না। কারণ সেখানে যাদের নিজস্ব ঘর নেই তাদের কাউন্সিল থেকে ঘর দেওয়া হয়। যাদের নিজস্ব আয় নেই তাদের ভাতা দেওয়া হয়। যাদের আয় কম তাদেরকে ইনকাম সাপোর্ট দেওয়া হয়। তারপরও মাঝে মধ্যে রাস্তার ধারে কিছু ব্যক্তিকে দেখা যায়, যারা কনকনে শীতের মধ্যেও রাস্তায় ঘুমায়। পথে রাত কাটায়। মানুষের কাছে সাহায্য চায়। এ ধরনের মানুষের মধ্যে কখনও কখনও অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদেরও দেখা যায়। এদের অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে রাস্তায় রাত কাটায়। আর কেউ কেউ আছে, যারা পারিবারিক অশান্তির জন্য ঘর ছেড়ে রাস্তায় সময় কাটায়।

www.nagorikpathagar.com

ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে মেধাবী ছাত্রছাত্রীর অভাব নেই, অভাব হচ্ছে মেধা বিকাশে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি :

পড়াশোনার পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ : উন্নত বিশ্বে নার্সারির একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য যত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের একই বয়সী ছাত্রছাত্রী তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পায়। ফলে তার মেধা বিকাশের গতি শ্লথ হয়। উন্নত বিশ্বের শিশুরা নার্সারিতে কম্পিউটারের সাথে পরিচিত হয় আর তৃতীয় বিশ্বের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও কম্পিউটার ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নত বিশ্বের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে না। কোনো রাজনৈতিক দলই ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে না। ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশনজট, ছাত্রহত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হয় না। আর বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার রাতেও হল পাহারা দিতে হয় প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। তাদের পকেটে কলমের পরিবর্তে রিভলবার পাওয়া যায়। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী এই ধরনের নোংরা ছাত্ররাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে মেধার বিকাশ করতে পারে না। অপরদিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধাকে মূল্যায়ন করা হয়। পরীক্ষায় নম্বর দান, স্কলারশিপ ও চাকরি সকল ক্ষেত্রেই মেধার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মেধা বিকাশের পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের তোষণ করার চেষ্টা করে। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার না করে দেশ পরিচালনার যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নোংরা রাজনীতির চর্চা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দলীয় রাজনৈতিক চর্চার পরিবর্তে ছাত্রদের একাডেমিক ও কো-একাডেমিক ক্যারিকুলামের চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষা সংস্কার : সংস্কার সাধন করে জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে শিক্ষার দর্শন ঠিক করতে হবে। সার্বজনীন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, মেধার আলোকে উচ্চশিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিক্ষার বর্তমান সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনা করে আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস যুগোপযোগী করতে হবে এবং 'বিশ সালা জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা' করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি আদি ও পুরনো। এখনো যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে অনেকবার শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে।[১৬] কিন্তু শিক্ষার দর্শনের মতো মৌলিক বিষয়ে আজ পর্যন্ত জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাপদ্ধতি ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা দরকার। ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে শুধু ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের পরিবর্তে পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের ফলাফল এবং ছাত্রছাত্রীর ঝোঁকপ্রবণতাকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে Break of Study কথাটি উঠিয়ে দেওয়া দরকার। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আর্থিক/স্বাস্থ্য বা অন্য সমস্যার কারণে পড়াশোনায় বিরতি দিতে পারে। উন্নত বিশ্বে বুড়ো হয়েও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে। এমনকি কোনো বিষয়ে পিএইচডি করার সময় আরেক সাবজেক্টে 'ও লেভেল' এবং অন্য বিষয়ে 'এ লেভেল' করার সুযোগ রয়েছে। এর ফলে মেধাবীদের মেধা বিকাশের পথ সব সময় উন্মুক্ত থাকে।

মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে অসমতা দূর করা : আমাদের দেশে দুই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালু রয়েছে : মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। উভয় ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু দর্শনের পার্থক্য নেই, সুযোগ-সুবিধারও পার্থক্য রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও চিন্তা-দর্শনের যে পার্থক্য রয়েছে তা দূর করা দরকার। একই পরিবারের দুই ভাই স্কুল ও মাদরাসায় পড়ে দুই ধরনের চিন্তা, দুই ধরনের পোশাক, দুই ধরনের চাকরির সুযোগ লাভ করার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির পরিবর্তে জাতির মধ্যে চিন্তা ও দর্শনের বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ উন্নত বিশ্বের সকল ছাত্রছাত্রী একই ধরনের জাতীয় আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বড় হয়। তারপর তাদের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে তারা পড়াশোনা করে।

পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি : আমাদের দেশে কারিগরি জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে। ফলে সকল ছাত্রছাত্রীই মাস্টার্স পাস করতে চায়। এর ফলে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই গ্রাজুয়েশান দেশের প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে শুধু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য হওয়া উচিত এবং উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ, পড়াশোনা ও জ্ঞান-গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

---

১৬. বইটির লেখা যখন শেষ হয় সে সময় বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে অনেক সুপারিশ করা হয়েছে। সরকার শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সুপারিশমালা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি : World Conference on Education 1990[১৭] -এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ/তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে শিক্ষা সহযোগিতা ও শিক্ষা ঋণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল/তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহও শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। দারিদ্র্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য বিরাট সমস্যা। এই দারিদ্র্য সত্ত্বেও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাজেট কমিয়ে শিক্ষার জন্য বাজেট বৃদ্ধি করা যায়। এখনও সেশনের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে সমস্যা হয়। প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক, শিক্ষা-উপকরণ ও ক্লাস রুমের সংকট রয়েছে। শিক্ষক ট্রেনিং ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধ্য বিকাশে কো-একাডেমিক কারিকুলামের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

প্রাইমারি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া : প্রাইমারি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। প্রাথমিক স্তর থেকে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব না হলে বড় হলে তার মেধার বিকাশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রাইমারি লেবেলে ভাল শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করতে হবে। উন্নত বিশ্বে প্রাইমারি পর্যায়ে ভাল শিক্ষকদের আকৃষ্ট করার জন্য বেতন-ভাতাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ প্রাইমারি লেবেলে ভাল শিক্ষক না থাকলে শিশুকে ভালভাবে গড়া যায় না। তাই শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরে ভালো শিক্ষকদের আকৃষ্ট করার প্রতি সরকারের নজর দেওয়া উচিত।

সার্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি : কোনো শিশুই শিক্ষাবহির্ভূত থাকবে না। সরকার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দরিদ্র ছেলেমেয়ে ও তাদের পরিবারকে সহযোগিতা করবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তাদের কত শতাংশ প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করে হাইস্কুলে যেতে পারে? প্রাইমারী শিক্ষা যারা শেষ করতে পারে না তার কারণ নির্ণয় করে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংকের এক পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশের প্রাইমারী স্কুলের প্রতি পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে চারজনই শিক্ষার ন্যূনতম মান অর্জন করতে পারে না।

নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহ : নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নারীশিক্ষা উৎসাহিত করতে নৈতিক পরিবেশে নারীদের পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু ছেলেদের ওপর পড়াশোনা ফরয নয়, নারী-পুরুষ সকলের উপর ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ফরয।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতায় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং উন্নত বিশ্বের কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

---

১৭. Watkings. K. 2000. The Oxfam Education Report. UK : Oxfam P5-15

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষাঋণ কর্মসূচি : বাংলাদেশ এডুকেশন এইড, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষাঋণের কর্মসূচি নিয়েছে। এই ধরনের কর্মসূচি বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিও হাতে নিতে পারে। বিশেষত বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের এগিয়ে আসা উচিত।

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট সাপোর্ট সেন্টার ও হার্ডশিপ ফান্ড : অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আর্থিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা করতে পারে না। তাদের জন্য স্কলারশিপ ও হার্ডশিপ ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা প্রয়োজন। সরকারকে মনে রাখতে হবে অর্থের অভাবে মেধাবী কোনো ছাত্রছাত্রী মেধার বিকাশ ঘটাতে না পারলে শুধু সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে।

চাইল্ড কেয়ার ও নার্সারি : বিবাহিত যেসব ছাত্রছাত্রীর ছেলেমেয়ে হয় তারা সন্তানকে রেখে যাওয়ার মতো কাউকে না পেয়ে অনেক সময় ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হতে পারে না। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী রেজাল্ট খারাপ করে। এই ধরনের ছাত্রছাত্রীর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে চাইল্ড কেয়ার ও নার্সারির ব্যবস্থা থাকা জরুরি। উন্নত বিশ্বে এই ধরনের সুযোগ থাকার ফলে বৃদ্ধ বয়সেও পড়াশোনা করতে সমস্যা হয় না।

ডিস-অ্যাবল্ড স্টুডেন্ট ও ক্যারিয়ার : শারীরিক প্রতিবন্ধী মেধাবী অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। যেমন–মিল্টন অন্ধ থাকার পরও বিশ্ববিখ্যাত কবি হয়েছিলেন। অন্ধ, বোবা ও বধির মেয়ে হেলেন কিলার চব্বিশ বছর বয়সে তার কলেজের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বি এ পাস করেন এবং পরবর্তী সময়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ইয়াসিন বারো বছর বয়সে হামলায় আহত হয়ে প্যারালাইজড হয়ে যান। হুইল চেয়ারে বসেই তিনি ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০০৪ সালের ২২ মার্চ ফজরের নামাযশেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় ইসরাইলী হামলায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। চলাফেরা করতে অক্ষম একজন ব্যক্তি আপন মেধার কারণে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। শেখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ অন্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ব্লাংকেট অন্ধ। তারপরও তিনি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একটি দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। এভাবে আরও অনেক উদাহরণ আছে। এসব উদাহরণ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও আপন প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে বিশ্বে বিরাট অবদান রাখতে পারেন। অতএব আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন।

জব সেন্টার ও জব সিকার্স অ্যালাউন্স : দেশের অনেক প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে ছাত্রজীবন শেষ করে বেকারত্বের অভিশাপে হতাশায় ভোগে। হতাশায় ছাত্রজীবনের অনেক স্বপ্ন ধুলোয় মিশে যায়। অথচ ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরপরই তাদের মেধা অনুযায়ী দেশের কাজে লাগাতে পারলে তারা অনেক অবদান রাখতে সক্ষম হতো।

www.nagorikpathagar.com

একথা ঠিক যে, পাস করা সকল ছাত্রছাত্রীকে সাথে সাথেই মেধা অনুযায়ী চাকরি দেওয়া কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কারণে উন্নত বিশ্বে চাকরিসন্ধানী ছেলেমেয়েদের বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়। চাকরির সন্ধান করতে যে সময় ব্যয় হয় উক্ত সময় তারা ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু কোর্স করে।

কম্পিউটার ট্রেনিং : বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ। এ দেশে প্রচুর জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। আমেরিকাসহ অনেক দেশ আছে যাদের অনেক ভূমি আছে কিন্তু ভূমি আবাদ করার মতো মানবসম্পদ নেই। তাই তারা 'ডিভির' মাধ্যমে লোক নেয়ার চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের মানবসম্পদকে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের মানবসম্পদ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে চাকরি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। তাই আমাদের মানবসম্পদ, বিশেষত তরুণ সমাজকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারের বহুমুখী পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের রাস্তার মোড়ে মোড়ে কম্পিউটার সেন্টার দেখা যায়। সরকারি উদ্যোগে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীদের গাড়ি ভাড়া ও ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার খরচও দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে রাজধানী ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথমত একটি শহরকে 'কম্পিউটার সিটি' ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। উক্ত সিটিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য দেশী-বিদেশী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। মনে করুন, সিলেটকে 'কম্পিউটার সিটি' ঘোষণা দেওয়া হলো। তখন সিলেট শহরের বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ এবং যারা বিদেশে আছেন তারা উক্ত শহরকে কম্পিউটার সিটি বানানোর ক্ষেত্রে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। দেশের প্রতিটি জেলা শহর এবং এরপর উপজেলা শহরে কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার ব্যাপকভাবে করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি মারাত্মক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তার করে কিছুদিন জেলখানায় রেখে আবার ছেড়ে দিলেই সন্ত্রাস বন্ধ হয় না। সন্ত্রাস যারা করে তাদের একটি অংশ রাজনৈতিক ইন্ধনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। আরেক অংশ বেকারত্বের কারণে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও হতাশায় ভাড়াটে সন্ত্রাসী হিসেবে কাজ করে। যদি এ ধরনের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করে জেলখানায় বেড়ি পরিয়ে রাখার পরিবর্তে তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জেলখানার ভেতরেও কম্পিউটারসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে যেসব দেশে জনশক্তি রপ্তানি করার সুযোগ আছে সেখানে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে রপ্তানি করা যেতো।

www.nagorikpathagar.com

কমিউনিটি বা স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকা

ছাত্রছাত্রীর প্রতিভা বিকাশে সমাজের বিত্তবান নাগরিকদের দায়িত্বও কম নয়। বিত্তবান নাগরিকরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহিত করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রথমত ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার মানসিকতা সর্বসাধারণের খরচের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে তালিকা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী খরচ করতে হবে। বাংলাদেশে ১৪ কোটি মানুষের বাস। মাসে যদি গড়ে এক টাকা কম ব্যয় করা হয় তাহলে ১৪ কোটি টাকা সঞ্চয় হবে। বছরে ১৬৮ কোটি টাকা এভাবে সঞ্চয় করা সম্ভব। এজন্য জাতির সর্ব পর্যায়ে মিতব্যয়িতা ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠা প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহদান : স্থানীয় জনগণই স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদরাসায় গভর্নিং বডির সদস্য হন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্টাফ নিয়োগ, স্কুলের বাজেট অনুমোদন, ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান হচ্ছে কি না এই সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করা গভর্নিং বডির কাজ। গভর্নিং বডির সদস্যরা বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তাদের পরিদর্শনের সময় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে পারেন।

যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ : প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, যোগ্যতা ও দক্ষতাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট কিংবা আত্মীয়তা বা আঞ্চলিকতার বন্ধনকে উপেক্ষা করে যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে পারলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়।

ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার জন্য বিশেষ ফান্ড : প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার মান উন্নয়ন। বিশেষত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করা জরুরি। গরিব-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ফান্ড সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নশীল থাকা দরকার।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক : অভিভাবক, স্থানীয় কমিউনিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে সকলের যুগপৎ ভূমিকা পালন প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.com

প্রতিভা বিকাশে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

পড়াশোনার জন্য আজকাল যেভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অতীতে তা ছিল না। আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূলের কাছেই শিখেছেন। তিনি চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, খেতে, পান করতে, ঘুমাতে, ঘুম থেকে উঠতে, যুদ্ধের ময়দানে, বিচারের মজলিস, বিবাহ ও খাবার অনুষ্ঠানে তথা সবখানেই তাঁর সঙ্গীসাথীদের শেখাতেন। যখনই কারো মধ্যে কোনো দুর্বলতা দেখতেন বা জাহেলী রুসম-রেওয়াজের প্রচলন দেখতেন তখনই তা সংশোধন করে দিতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আসহাবে রাসূলের সার্বক্ষণিক শিক্ষক এবং তাঁর সাহাবীরা ছিলেন বিশ্বনবীর সার্বক্ষণিক ছাত্র।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যায়েদ ইবনে আরকামের ঘরে দীনের প্রশিক্ষণ দিতেন। দারুল আরকামই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী (রা) প্রমুখ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। হযরত ওমর (রা) এ বাড়িতেই ঈমান কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল মদীনায় হিজরত করার পর মসজিদে নববীর একটি অংশ পাঠশালা হিসেবে ব্যবহার করেন। সেখানে যাঁরা দীন শেখার জন্য বিশ্বনবীর সান্নিধ্যে থাকতেন তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফফা' বলা হয়। আসহাবে সুফফার পাঠ্যক্রম ছিল কুরআন ও হাদীস। এছাড়া বিদেশী ভাষা শেখাও তাঁদের কারো কারো পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮] যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে সুরিয়ানী ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। এ ভাষায় আল্লাহর রাসূলের কাছে কোনো চিঠি এলে তিনি অনুবাদ করে শোনাতেন।[১৯] আসহাবে সুফফার সদস্যদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাদানের জন্যও পাঠাতেন।

আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম আরবীভাষী হলেও কুরআন বোঝা ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সকলের যোগ্যতা সমান ছিল না।[২০] একজনের কাছে যা অস্পষ্ট ছিল আরেকজনের কাছে তা স্পষ্ট ছিল। তাই তাঁরা পরস্পরের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করতেন।[২১] তাবেয়ীদের যুগ থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ব্যাপকতা লাভ করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বাড়তে থাকে।

---

১৮. কিন্তু এটা সকলের জন্য ছিল না।

১৯. এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ভাষা শেখাও সওয়াবের কাজ।

২০. গোলাম আহমদ হারিরী, তারিখ তাফসীর ওয়া মুফাসসিরীন, পৃ-৩৮। তারা আরবীভাষী হলেও সকল শব্দের সঠিক অর্থ সবাই সমানভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন না।

২১. আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৫-৩৬

www.nagorikpathagar.com

অতীতে শিক্ষককেন্দ্রিক পড়াশোনার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে শিক্ষক কর্তৃক বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন খুব একটা নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েই সাধারণত পড়াশোনা করতে হয়। ছাত্রছাত্রীর প্রতিভা বিকাশে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিভা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড ঠিক রাখার মহান পেশায় যারা নিয়োজিত তারা হচ্ছেন শিক্ষক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে ইরশাদ করেছেন, 'আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।' শিক্ষকগণই হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকের চলাফেরা, উঠা-বসা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সকল কিছু একজন ছাত্রের উপর প্রভাব ফেলে, তাই শিক্ষককে সদা সতর্ক থাকতে হয় এবং ছাত্রের প্রতিভা বিকাশে যত্নশীল ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ একটি ফুলের বাগান তত্ত্বাবধায়কের অবহেলা কিংবা অযত্নের কারণে অনেক ফুলের কলি ঝরে যেতে পারে। তেমনি শিক্ষকের যথাযথ ভূমিকা, সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিনষ্ট হতে পারে। অপরদিকে একজন শিক্ষকের একটু উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দিকনির্দেশনার ফলে একজন ছাত্রছাত্রী নিজের জীবন গঠন করে শুধু দেশের নয়, সমগ্র মানবতার কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষকের উৎসাহের পরিবর্তে নেতিবাচক মন্তব্যের কারণে অনেক প্রতিভাবান ছাত্রেরই প্রতিভা বিকশিত হয় না। দু'জন কাঠমিস্ত্রিকে একখণ্ড কাঠ দিয়ে একই ধরনের আসবাব তৈরি করতে দেওয়া হলে একজনের চেয়ে আরেকজনেরটা অধিক সুন্দর হয়, উভয়ের আসবাব সমান সুন্দর হয় না। উভয়ের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মকৌশলের পার্থক্যের কারণে এটা হয়। অনুরূপভাবে একজন মেধাবী ছাত্র কোনো শিক্ষকের উত্তম তত্ত্বাবধানের ফলে জীবনে বেশ ভালো করতে পারে। আর আরেকজন শিক্ষকের আচরণে পড়াশোনাই ত্যাগ করতে পারে। যে শিক্ষকের সংস্পর্শে একজন ছাত্রছাত্রীর মেধার বিকাশ ঘটে, তিনিই আদর্শ শিক্ষক। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর মেধার বিকাশে কয়েক ধরনের ভূমিকা রাখেন :

১. জানার আগ্রহ সৃষ্টি : শিক্ষক একজন ছাত্রকে সবকিছু শিখিয়ে দিতে পারেন না। তবে তিনি শেখার আগ্রহ সৃষ্টি এবং ছাত্রের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করতে পারেন। কোনো শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই লিখে নেয়। এতে ছাত্রছাত্রীর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং একাডেমিক সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকের অপেক্ষা করে না; বরং নিজেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে শিক্ষককে সহজ ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন,

عَلِّمُوا وَلَا تُعَنِّفُوا فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنِّفِ .

"ইলম শিক্ষা দাও, কঠোরতা করো না, কারণ শিক্ষক কঠোরতাকারীর চেয়ে উত্তম।" (বায়হাকী)

শিক্ষককে ছাত্রদের সব সময় উৎসাহিত করা ভালো। ছাত্র মানেই শেখার বয়স। একজন সবকিছু জানলে প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসতো না। তাই ছাত্রদের সামান্য ভুল ভ্রান্তির জন্য তিরস্কার না করে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়া উচিত এবং ছাত্রছাত্রীদের ভালো কাজের প্রশংসা ও পুরস্কার দান করা দরকার। পুরস্কারের জন্য সব সময় অর্থ খরচ করতে হয় না। অনুপ্রেরণাদায়ক সুন্দর একটি মন্তব্য একজন ছাত্রের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ : ইংল্যান্ডে জনৈক ছাত্র ক্লাসে ভুল উত্তর দেয়। উত্তরে শিক্ষক সরাসরি বলেননি যে, তুমি ভুল বলেছ। এর পরিবর্তে ছাত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "তুমি খুবই দারুণ কথা বলেছ এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবে আমার মনে হয় এইভাবে আরও চমৎকার হয়।"

কোনো প্রশ্নের ভুল উত্তর বলা হলেও ছাত্রছাত্রীকে লজ্জিত না করে সঠিক উত্তর বলে দেওয়া হলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

২. মেধার মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা : ছাত্রের প্রতিভা শিক্ষকের কাছে স্পষ্ট থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় একজন ছাত্র সব বিষয়ে ভালো কিন্তু অংকে কাঁচা। আবার কোনো ছাত্র অংকে ভালো কিন্তু ইংরেজিতে কাঁচা। আবার কোনো ছাত্র কোনো বিষয়ই পড়তে আগ্রহী নয় তবে কারিগরি কাজ করতে পছন্দ করে। তাই শিক্ষক শুধু শ্রেণীকক্ষে পাঠদানই করেন না, পাঠদানের সাথে ছাত্রের ঝোঁকপ্রবণতা ও প্রতিভা মূল্যায়ন করেন এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৩. প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান : কখনও কখনও দেখা যায় শিক্ষক পাঠদানের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। তারপরেও ক্লাসে যান, কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকার কারণে ছাত্রদের ভালোভাবে পড়াতে সক্ষম হন না। ফলে ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পড়ার বিষয় আগেই ছাত্রছাত্রীদেরকে জানিয়ে দেওয়া ভালো, তাহলে তারা পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসতে পারে।

৪. ইতিবাচক মনোভাব পোষণ : ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উত্তম। ছাত্রছাত্রীদের নেতিবাচক সমালোচনা করলে তারা পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো একজন ছাত্র কোনো প্রশ্নের ভুল উত্তর লিখলে সেটা দুইভাবে বলা যায় : যেমন–

www.nagorikpathagar.com

ক. তুমি একটি বোকা ছেলে। তোমার মেধা বলতে কিছুই নেই। সামান্য একটি বিষয়ও বুঝতে পারো না।

খ. তুমি একজন মেধাবী ছেলে। সব বিষয় যেভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করো আমি আশা করেছিলাম এই প্রশ্নের উত্তর আরও চমৎকারভাবে লিখবে।

প্রথম উপস্থাপনায় ছাত্রের মনে তার মেধা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় উপস্থাপনায় ছাত্রটি আরও সুন্দরভাবে লেখার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে।

বাস্তব ঘটনা : জনৈক ছাত্র বাংলাদেশের একটি মাদরাসায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার সময় বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে আরবীতে বক্তব্য প্রদান করে। জীবনে প্রথমবারের মতো হলভর্তি শ্রোতার উপস্থিতিতে ৫-৬ মিনিট আরবীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাহু ছরফে কিছু ভুলত্রুটি হয়। অনুষ্ঠান শেষ হলে মাদরাসার উপাধ্যক্ষ অন্যান্য শিক্ষকের সামনে এই ভাষায় তিরস্কার করেন যে, "নাহু ছরফে ভুল করে তোমাকে আরবীতে বক্তব্য দিতে বলেছে কে?"

ছাত্রটি আরবীতে বক্তব্য দেওয়ায় তাকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে নেতিবাচক মন্তব্যের কারণে উক্ত ছাত্রের মধ্যে আরবীতে কথা বলার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সেই ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী মাধ্যমে মাস্টার্স পর্যন্ত লেখাপড়া করে ভালো রেজাল্ট করলেও জীবনে আর কখনও আরবীতে বক্তব্য প্রদান করেনি। কিন্তু যদি ছাত্রটি আরবীতে কথা বলার চর্চা অব্যাহত রাখতো, তাহলে পরবর্তী সময়ে নাহু ছরফের ত্রুটি দূর হতো এবং আরবীতেও অনর্গল কথা বলতে পারতো।

৫. স্টাডি গ্রুপ : শিক্ষক দুই-তিনজন ছাত্রছাত্রীর সমন্বয়ে 'স্টাডি গ্রুপ' করতে পারেন। স্টাডি গ্রুপের সদস্যরা একে অপরের ভুল সংশোধন করবে, পরস্পর আলোচনা করবে।

উদাহরণ : বাংলাদেশের পাটশিল্প বিষয়ে রচনা লেখার জন্য শিক্ষক কয়েকটি গ্রুপ করতে পারেন। গ্রুপ ক : পাটশিল্পের গুরুত্ব; গ্রুপ খ. পাটশিল্পের সমস্যা; গ্রুপ গ. সমস্যা উত্তরণের উপায়; গ্রুপ ঘ. পাটশিল্প সম্পর্কে সুপারিশমালা ইত্যাদি।

প্রত্যেক গ্রুপ নির্দিষ্ট সময় আলোচনা করে গ্রুপের মতামত ক্লাসে উপস্থাপন করবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের জানার আগ্রহ ও বোঝার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৬. স্টাডি ট্যুরের ব্যবস্থা করা : প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় 'স্টাডি ট্যুর' বা শিক্ষা সফর হয়। এ সকল শিক্ষা সফরও ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশ ও চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে। স্ট্যাডি ট্যুরের জন্য দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানের পাশাপাশি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভ্রমণের কর্মসূচিও রাখা দরকার।

ইংল্যান্ডে ক্যাম্ব্রিজ ইংলিশ সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের কোর্স শুরুর সাথে সাথে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্সটি ছিল উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। কোর্সের সূচনায় ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রমণের কর্মসূচি রাখার কারণ ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা যে, তারাও

www.nagorikpathagar.com

ভবিষ্যতে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে। কোর্সের সূচনায় ছাত্রছাত্রীদের মনে এই ধরনের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হয়। উচ্চশিক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হয়। আমাদের দেশে প্রাইমারি স্কুলে যারা পড়ে তাদেরকে মাঝে মধ্যে সেরা সেরা হাইস্কুল ও কলেজ ভ্রমণে নিয়ে গেলে তাদের চিন্তার রাজ্য প্রসারিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টাডি ট্যুরে নিয়ে তাদের মনে এই ধারণা দিতে হবে যে, ভবিষ্যতে তারা হাইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পদার্পণ করবে। আর কলেজজীবনশেষে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা নেবে।

৭. যশস্বী ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ট্যুরের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে যশস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান, সংবর্ধনাসভা, আলোচনাসভার আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একেক সময় একেক পেশার যশস্বীদের আমন্ত্রণ জানানো ভালো। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বক্তব্য শুনে আপন আপন ক্যারিয়ার গঠনে সচেষ্ট হবে।

৮. ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা : প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অনেক মেধা ও দক্ষতা আছে। ছাত্রদের সুপ্ত মেধা অংকুরিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে ডুবুরীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন ডুবুরী পাতালপুরীতে গিয়ে জিনিস অনুসন্ধান করে। অনুরূপভাবে একজন শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীর ভেতরে প্রবেশ করে তার প্রতিভা খুঁজে বের করতে হয়।

৯. হতাশ ছাত্রছাত্রীর সাথে পৃথকভাবে আলোচনা : কিছু ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় দুর্বল থাকে। তারা জীবন সম্পর্কে হতাশায় ভোগে। এই ধরনের ছাত্রছাত্রীর সাথে একান্তে আলোচনা করে তাদের সমস্যা উপলব্ধি করে এবং বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হলে তারা হতাশার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আশার আলো দেখতে পায়। হতাশ ছাত্রছাত্রীদের সামনে আল্লাহর বাণী তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

وَلَا تَيْئَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ -

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তার রহমত থেকে একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়ে থাকে।"

১০. ছাত্রছাত্রীদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করা : ছাত্রছাত্রী নির্ভয়ে একাডেমিক সমস্যার কথা শিক্ষকদের সামনে বলতে পারলে তাদের মেধা বিকাশে যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তা সহজেই দূর করা সম্ভব হয়। এজন্য শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

১১. ছাত্রদের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা : অনেক সময় ছাত্ররাও একাডেমিক বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পরমার্শ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করা উচিত।

১২. ক্লাসের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া : শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সম্পর্ক শুধু ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ক্লাসের বাইরেও ছাত্রছাত্রীর সাথে দেখা হলে পড়াশোনা ও ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেয়া যায়। এতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৩. স্টুডেন্ট মেন্টরিং : ইংল্যান্ডে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্টুডেন্ট মেন্টর করা হয়। তাদের কাজ হচ্ছে নিচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করা। এজন্য প্রত্যেক স্টুডেন্ট মেন্টরকে দুই-তিনজন ছাত্রছাত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়, দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ছাত্রছাত্রীদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বাড়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার গুণগত মান উন্নত হয়।

ছাত্রজীবন শেষ হলেও শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক বহাল থাকে : শিক্ষক আমরণ শ্রদ্ধার পাত্র। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হলেও শিক্ষকের কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ পাওয়া যায়। তাই শিক্ষকদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। তবে সময়-অসময়ে যোগাযোগ করে মূল্যবান সময় যেন নষ্ট করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যোগাযোগের পরিমাণ এতটুকু হওয়া দরকার, যেন শিক্ষক আপনাকে সময় দিতে আন্তরিক থাকেন।

ছাত্রজীবন শেষ হলে চাকরির আবেদনপত্রে রেফারি হিসেবে শিক্ষকের নাম দেওয়া যায়। তবে কারো নাম রেফারি হিসেবে ব্যবহার করার আগে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। কোনো চাকরিতে রেফারেন্স দিলে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত এবং রেফারেন্সের ফলাফল অবহিত করা উত্তম। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ভালো কর্মসংস্থানের সংবাদ শুনলে শিক্ষকরা খুশি হন এবং অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য গর্বের সাথে বলেন।

www.nagorikpathagar.com

ক্যারিয়ার ও সংগঠন

সংগঠনের গুরুত্ব : আখিরাতে মুক্তি ও দুনিয়াতে উন্নতি সাধনের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ার নামই হচ্ছে উত্তম ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার অর্থ শুধু দুনিয়াতে বড় ডিগ্রি, ভালো চাকরি কিংবা ভালো রেজাল্ট করা নয়। দুনিয়ার যে ডিগ্রি বা ভালো রেজাল্ট আখিরাতে নাজাতের জন্য কাজে আসে না কিংবা নাজাতের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, উক্ত ডিগ্রি দুনিয়া পূজারীদের দৃষ্টিতে উত্তম ক্যারিয়ার হতে পারে; কিন্তু আল্লাহপ্রেমিক বান্দাদের কাছে ঐ ধরনের ডিগ্রি মূল্যহীন। আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই দুনিয়াতে কাজ করে। তাদের ক্যারিয়ার গঠনের পেছনে দুনিয়ার সুখ-শান্তি, বাড়ি-ঘর, গাড়ি, বিত্তবৈভব, যশ-খ্যাতি অর্জন থাকে না। আল্লাহকে খুশি করার জন্যই আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা ক্যারিয়ার গঠন করতে চায়।

আল্লাহ পৃথিবীতে সকলকে সমান মেধা দান করেননি। আবার মেধাহীন কোনো মানুষ নেই। একেকজন ব্যক্তিকে একেক ধরনের মেধা দিয়েছেন। প্রত্যেকের মেধার সমন্বিত বিকাশের মাধ্যমেই একটি সমাজ উন্নত হতে পারে। তাই যাকে যতটুকু মেধা দেওয়া হয়েছে তা আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দীন প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে লাগাতে হবে। এই জন্য মেধাবীদের দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িত হওয়া এবং এই আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো উচিত। দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা সুন্নাত বা নফল কোনো কাজ নয়। এটা একজন মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। আর এ দাবি পূরণে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে হয়। কারণ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে এমন সংগঠনে সম্পৃক্ত হতে হবে : সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়ার পর সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। তাই এমন সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত, যে সংগঠন ছাত্রদের মেধা বিকাশে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে এবং কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির পরিবর্তে যোগ্য, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আমার জানা মতে এমন কিছু ছাত্রসংগঠন আছে যারা মূল রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফলে পড়াশোনা ও ছাত্রসমস্যার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নই তাদের মূল কর্মসূচি থাকে। এর বিপরীত এমন ছাত্রসংগঠনও আছে, যার কর্মসূচিই হচ্ছে ছাত্রদের মেধা বিকাশ। সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবেই জনশক্তির ব্যক্তিগত পড়াশোনার খোঁজ-খবর নেয়া হয়। পাঠ্যপুস্তক, ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা পাঠের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ব্যায়ামের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করা হয়। কুরআন, হাদীস অধ্যয়ন ও জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের খোঁজ-খবর নিয়ে একজন আদর্শ মুসলিম হতে তত্ত্বাবধান করা হয়।

www.nagorikpathagar.com

ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলদের কাছে জনশক্তির মেধা আমানত : জনশক্তির ইসলামী চরিত্র গঠন ও পড়াশোনার তত্ত্বাবধান করার জন্য সংগঠনের দায়িত্বশীলরা সব সময় সচেতন থাকেন। কারণ তাঁরা মনে করেন জনশক্তির মেধা আমানত। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলরা দীন প্রতিষ্ঠার জন্যই জনশক্তির প্রতিভা বিকাশের জন্য এত বেশি সচেতন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন, ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তি যারা আছেন, কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মতো মেধা তাদের আছে। প্রত্যেকের মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা সংগঠনের কাছে আমানত। দায়িত্বশীলরা এ আমানতের যথাযথ তত্ত্বাবধান করার চেষ্টা করেন। কারণ তাদের সামনে রয়েছে কুরআনের আয়াত, যেখানে মুমিনের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যারা–আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে।" (সূরা মুমিনূন ঃ ৮)

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, 'আমানত' শব্দটি আরবী 'আমেনুন' শব্দ থেকে উৎপত্তি হলে এর অর্থ আশ্রয়প্রার্থী, আর 'আমানুন' শব্দ হতে উৎপত্তি হলে এর অর্থ ভয়-ভীতিহীন, নিরাপদ। শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ এখানে মুখ্য নয়, তাই সেদিকে আলোচনা করা সমীচীন নয়। তবে আভিধানিক অর্থ হতে যতটুকু জানা যায়, এ থেকে বোঝা যায় যে, যার কাছে যে জিনিস আমানত রাখা হয় তা নিরাপদ থাকে, এ সম্পর্কে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি বা শংকা আমানত রাখার সময় থাকে না। তাই মক্কার কাফের-মুশরিকরা তাদের নেতাদের কাছে তাদের জিনিস আমানত না রেখে মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আমানত রাখতো। কারণ তাদের ধারণা ছিল তাঁর কাছে জিনিস নিরাপদ থাকবে।

'আমানত' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। শুধু টাকা-পয়সা নয়, কারো গোপন কথা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা সাংগঠনিক দায়িত্ব, আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা সবই আমানত। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মেধা ও যোগ্যতাকে সুদূরপ্রসারী, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের কাজে সর্বোত্তম ব্যবহার করার জন্য দায়িত্বশীলরা চেষ্টা করেন। কারণ আমানতের খেয়ানতকারী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা তার কাছে পরিষ্কার। তাদের এ চেষ্টা সাময়িক নয়, এটা সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের অংশ। কেননা আল্লাহ তাআলা এখানে আমানত সংরক্ষণের জন্য 'রাউন' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আরবী ভাষায় এটি ইসমে ফায়েল বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য। যার বিশেষত্ব হচ্ছে ইস্তেমার অর্থাৎ যা সব সময় অব্যাহত থাকে। তাই জনশক্তির মেধা কাজে লাগানো এবং তত্ত্বাবধানের বিষয়টি দায়িত্বশীলদের সার্বক্ষণিক কর্তব্যের অংশ।

দায়িত্বশীলরা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে তত্ত্বাবধান করেন : দায়িত্বশীলরা মনে করেন সকল কিছুর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী সংগঠনের কর্মীগণ দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার তথা জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুত থাকে। তাই তারা আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়েই জনশক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। কারণ তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহর রাসূলের বাণী, "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" তাই প্রত্যেক জনশক্তিকে সংগঠনের দায়িত্বশীল সম্পর্কে আস্থাশীল থাকতে হবে যে, তারা জনশক্তির ক্যারিয়ার গঠনে আন্তরিক।

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলরা জনশক্তির মঙ্গলকামী : ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ অনুকরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। রাসূল (স)-এর গুণাবলি সম্পর্কে কুরআনে এভাবে উল্লেখ আছে ঃ "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"

(সূরা তাওবা ঃ ১২৮)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, রাসূলে কারীম (স)-এর আদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে গভীরভাবে চিন্তা করেন যে, এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জনশক্তির কী ধরনের সমস্যা হতে পারে। জনশক্তির কল্যাণের কথা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলরা ইহসান বা অনুগ্রহকারী

সংগঠনের দায়িত্বশীলরা জনশক্তির প্রতিভা কাজে লাগানোর জন্য যতটুকু চেষ্টা করেন সেটা জনশক্তির প্রতি তাদের ইহসান। প্রত্যেক জনশক্তিকে মনে রাখতে হবে, একজন দায়িত্বশীলকে অনেক কাজে সময় দিতে হয়। মনে করুন, তার দশটি দায়িত্ব রয়েছে। আর এই দশটি দায়িত্বের মধ্যে জনশক্তির ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান একটি। এবার একটু ভাবুন, আপনিই শুধু একজন জনশক্তি নন। অনেক জনশক্তির মধ্যে আপনি একজন। নেতৃত্বের দায়িত্বে যারা আছেন মানুষ হিসেবে তাদেরকে ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। এবার বলুন, এত ব্যস্ততার মধ্যে তারা আমাদের জন্য যতটুকু চিন্তা করেন, এটা কি আমাদের জন্য ইহসান নয়?

সংগঠন জনশক্তির ক্যারিয়ার গঠনে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে

১. ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস সেন্টার : সংগঠনের ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস সেন্টার থাকা দরকার। ব্যক্তির ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও মুসলিম উম্মাহর চাহিদার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটি ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস সেন্টার করতে পারে। প্রত্যেক জনশক্তির ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা জানা ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা দানই ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস সেন্টারের মূল কাজ হবে। ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস সেন্টার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহীদের উপদেশ দিতে পারে এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। প্রত্যেক জনশক্তি ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার পরিকল্পনা উক্ত সেন্টারে পেশ করবে। সেন্টার ক্যারিয়ার গঠনে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দিক-নির্দেশনা দান করবে। উল্লেখ্য ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস সেন্টার সংগঠনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকা জরুরি নয়। এটা সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংগঠনের পেশাদার কিছু ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠন হতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

২. মেধা অনুযায়ী দায়িত্ব দেওয়া : দায়িত্বশীলদের মেধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই জনশক্তির দায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একটি সংগঠনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বহু ধরনের জনশক্তি থাকে। একজন ভালো গায়ক হতে পারেন কিন্তু ভালো লেখক হতে পারেন না। আরেকজন ভালো প্রশাসক হতে পারেন কিন্তু ভালো সমাজসেবক হতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জনশক্তির মেধা অনুযায়ী ক্যারিয়ার পরিকল্পনা করা ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক– এমন দায়িত্ব দেওয়া উত্তম।

৩. অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা না চাপানো : আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করবেন। কোনো একজন জনশক্তি একসাথে তিন-চারটি কাজ করতে পারে। আর আরেকজন জনশক্তিকে একটি কাজ দেওয়া হলেই দায়িত্ব পালনে হিমশিম খেতে হয়। দায়িত্বের বোঝা তাকে অস্থির করে তোলে। এমন ধরনের জনশক্তিকে ধারণক্ষমতার আলোকেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

৪. ক্যারিয়ার উইক সাবজেক্ট চুজিং ডে : এইচএসসি/আলিম/এ লেভেল পরীক্ষার পর ক্যারিয়ার উইক পালন করা যেতে পারে। উক্ত সপ্তাহে ফলপ্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি রাখা যায়। ক্যারিয়ার পছন্দ করার জন্য বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সরবরাহ, প্রদর্শনী, আলোচনাসভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। আর পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর 'ক্যারিয়ার ডে' পালন করে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণে সহযোগিতা করা যায়।

৫. জব ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং : 'জব ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং' দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব। এক্ষেত্রে একটি সংগঠন তার জনশক্তির পরিকল্পিত ছাত্রজীবনশেষে কর্মসংস্থান যোগাড়ের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান করতে পারে। জনশক্তির পড়াশোনার শেষ লগ্নে তাদের জন্য জব ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারণ অনেক জনশক্তি ছাত্রজীবন শেষ করে হতাশায় ভোগে। তাই ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম নেয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যারা ভবিষ্যতে আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা, মিডিয়া, প্রশাসন, সমাজসেবা, ব্যবসা বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানে আগ্রহী, তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট পেশার উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া ভালো। এসব ট্রেনিং-এ ব্যক্তিগত বয়োডাটা তৈরি, চাকরির আবেদনপত্র পূরণ ও ইন্টারভিউ-কৌশল সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

৬. স্কলারশিপ : অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আর্থিক সমস্যার কারণে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। তাদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা উচিত। এই ধরনের জনশক্তির বায়োডাটা তৈরি করে ধনী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। একজন ধনী ব্যক্তি একজন গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মেধা বিকাশে এগিয়ে আসলে দেশের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মেধা বিকাশের পথ সুগম হয়।

www.nagorikpathagar.com

৭. উচ্চশিক্ষার প্রতি উৎসাহ : প্রতিভাবান জনশক্তিকে উচ্চশিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়া উচিত। একটু উৎসাহ বা উদ্দীপনায় জনশক্তির মেধার পরিস্ফুটন ঘটে। গ্রাজুয়েশান বা মাস্টার্স করার পরও উচ্চশিক্ষা আছে–এ কথা অনেকেই মনে রাখেন না। দায়িত্বশীলরা জনশক্তির চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ক্যারিয়ার গঠনকেন্দ্রিক জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির কারণ : দায়িত্বশীলরা জনশক্তির প্রতিভা বিকাশে আন্তরিক থাকার পরও কয়েকটি কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় :

১. ক্যারিয়ার সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাব : জনশক্তি ও দায়িত্বশীলের কাছে ক্যারিয়ার সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আর ভুল বোঝাবুঝির কারণে অনেক জনশক্তি মান উন্নয়নে আগ্রহী হয় না। কেউ কেউ ক্যারিয়ার নিয়ে অতিরিক্ত টেনশনে ভোগেন। তারা 'ক্যারিয়ার' বলতে শুধু ভালো রেজাল্ট করাকেই বোঝে। আবার কেউ কেউ উন্নত ক্যারিয়ারের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করতে চায়। উভয় ধরনের প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা দরকার।

২. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও চিন্তার সমন্বয়ের অভাব : জনশক্তি সম্পর্কে দায়িত্বশীলের এবং সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে জনশক্তির সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাবে মাঝে মধ্যে জনশক্তি ও দায়িত্বশীলের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সংগঠন ও জনশক্তির পরিকল্পনা পরস্পরের কাছে পরিষ্কার থাকলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না।

এছাড়া আরও অনেক কারণে দায়িত্বশীল ও জনশক্তির মধ্যে ক্যারিয়ার গঠন নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত সমস্যা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

একজন ছাত্র বা ছাত্রী ব্যক্তিগত, একাডেমিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। একাডেমিক সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত। আর পারিপার্শ্বিক সমস্যা পড়াশোনার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। এসব সমস্যার কারণে একজন ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না কিংবা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। তাই ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে।

সমস্যা সমাধানে কতিপয় পরামর্শ

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনেই কমবেশি সমস্যা থাকে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের নানামুখী সমস্যা সমাধানে নিচে কতিপয় পরামর্শ দেওয়া হল :

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ : সমস্যা সমাধানে প্রথমেই সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ জরুরি। একজন ব্যক্তির সমস্যা কী তা চিহ্নিত করতে না পারলে তার পক্ষে সমাধান বের করা কঠিন। অতএব আপনার শিক্ষাজীবনের, সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন, তারপর সমাধানের উদ্যোগ নিন। একাডেমিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যা চিহ্নিত করা ও তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তার জন্য কতিপয় পয়েন্ট দেওয়া হল :

২. সমস্যার কারণ অনুধাবন ও নিজেই সমাধানের চেষ্টা করা : কোনো ডাক্তার যত ভালো হোন না কেন, রোগীর রোগ নির্ণয় করতে না পারলে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আপনার সমস্যা সমাধানের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমত, আপনার প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করতে হবে। এরপর কী কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে হবে। তারপরই সমস্যা সমাধানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়। প্রথমত নিজেকেই উদ্যোগ নিতে হয়। মনে করুন, কোনো শিক্ষকের লেকচার বুঝতে পারেননি কিংবা ক্লাস লেকচারের নোট-খাতা হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা নিতে পারেন। এর জন্য নিজ থেকেই ছাত্রছাত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

৩. স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার ও স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসের সাথে কথা বলুন

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার থাকেন। স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের কাজ হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উপদেশ দান। আপনি আপনার সমস্যা চিহ্নিত করার পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-উপদেষ্টা ও স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসের সাথে আলাপ করতে পারেন। উন্নত বিশ্বে স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস আছে। আমাদের দেশে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার থাকলেও সামগ্রিকভাবে স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস গড়ে ওঠেনি। তাই শিক্ষা অধিদপ্তরের এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

৪. স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং : উন্নত বিশ্বে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত সমস্যা শোনা ও তার প্রতিকারের জন্য স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা আছে। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সাপোর্টদানে স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. কারো সাথে সমস্যা নিয়ে কথা বলা : সমস্যার সম্মুখীন হলে কাউকে না বলে সমাধান করতে পারলে ভালো। কিন্তু এমন অনেক সমস্যা আছে, যা নিজের মনের মধ্যে লালন করতে গেলে তীব্র মানসিক যাতনায় ভুগতে হয়। এই ধরনের সমস্যার কথা আপনার বিশ্বস্ত কারো কাছে খুলে বলুন। তিনি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে না পারলেও দু'টি উপকার হবে। প্রথমত, অপরের কাছে বলার পর আপনার মন কিছুটা হালকা হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি কিছু পরামর্শ দিতে পারবেন এবং আল্লাহর কাছে দোআ করতে পারবেন। কারো সাথে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলার আগে খোঁজ নেওয়া দরকার তিনি আরও বেশি সমস্যাগ্রস্ত কিনা, আপনার সমস্যার কথা তার কাছে বলার কারণে তার সমস্যার তালিকা আরও বাড়বে কি না, আপনার সমস্যা সমাধানের তার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা।

সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী এমন ব্যক্তির সাথে আলাপ করা দরকার, যিনি এই ক্ষেত্রে বাস্তব পরামর্শ দিতে পারবেন। আমার এক বন্ধু ইমিগ্রেশন সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত জনৈক শিক্ষাবিদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য যান।

সমস্যার কথা শুনে শিক্ষাবিদ বললেন, এই ক্ষেত্রে আমার কোনো ধারণা নেই।

বন্ধু তাঁর কাছ থেকে কোনো উপদেশ না পেয়ে অল্পশিক্ষিত এক ভদ্রলোককে ঘটনাটি বললেন। লোকটি ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন বিষয় ভালোভাবে জানতেন। তিনি তাকে তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরামর্শ দিয়ে দেন।

সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

১. সমস্যাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা : এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র সমস্যাগ্রস্ত মানুষ আর সকলেই মহাসুখে আছে। আপনাকে মনে করতে হবে, আল্লাহ আপনাকে যেই অবস্থায় রেখেছেন তারচেয়ে খারাপ অবস্থায় আরও অনেক মানুষ আছেন। সমস্যার সম্মুখীন হলে এই কথা ভাববেন না যে, অলৌকিকভাবে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সমস্যা সমাধানের জন্য

www.nagorikpathagar.com

আপনাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোগ গ্রহণ করার পরও সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কিছু সমস্যা আছে যার ত্বরিত সমাধান সম্ভব। আর কিছু সমস্যা আছে যার সমাধানের সাথে শুধু আপনার ইচ্ছা ও উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, আরও অনেকেরই সম্পৃক্ততার প্রশ্ন রয়েছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সময় লাগে। আর কিছু সমস্যা আছে, তার সমাধান হওয়া অনিশ্চিত। এই ধরনের সমস্যাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেই সব কিছু করতে হবে। আপনাকে এই কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি সমস্যার সাথেই সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে। হয়তবা আপনার কাছে সমস্যা খুব জটিল মনে হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাবে এই জটিল সমস্যার মধ্যেই বড় ধরনের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত আছে। মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কল্যাণের দিকগুলো স্পষ্ট না থাকার কারণেই সমস্যাটা চোখে পড়ে। তাই সমস্যাকে কল্যাণের বার্তাবহ মনে করে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে।

কোনো সমস্যাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিলে মনের উপর নেতিবাচক প্রভাবই পড়ে। সমস্যায় ভেঙ্গে পড়লে সেই সমস্যা সমাধান হয় না; বরং তা আরও বাড়ে। তাই মনে করা দরকার ভালো-মন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর এর মধ্যে আল্লাহ নিশ্চয়ই কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। আরবীতে একটি কথা আছে, "আল্লাহ যা করেন মানুষের ভালোর জন্যই করেন।" হয়তবা দুনিয়ার দৃষ্টিকোণে আমাদের কাছে কোনো বিষয় খারাপ মনে হতে পারে, কিন্তু এর ভেতরে আখিরাতের কল্যাণ লুক্কায়িত থাকতে পারে। একথাই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তোমরা অনেক জিনিস অপছন্দ কর কিন্তু তাতে তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে। আর অনেক জিনিস আছে যা তোমরা পছন্দ কর কিন্তু তাতে তোমাদের জন্য অকল্যাণ নিহিত আছে।" তাই পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হোক, কিংবা কোথাও চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার পর চাকরি না হলে বা কোথাও বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার পর বিয়ে না হলে অথবা কোনো কিছু পেতে চেষ্টা করার পর না পেলে মন খারাপ করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" (সূরা বাকারা : ১৫৬)

২. সমস্যা সমাধানে তিনটি বিকল্প ভাবুন : সমস্যা কেন সৃষ্টি হয়েছে তা উপলব্ধি করার পর উক্ত সমস্যা সমাধানের উপায় কী এ সম্পর্কে নিজে নিজে ভাবুন এবং তিনটি উপায় বের করার চেষ্টা করুন। এই কথা মনে রাখতে হবে যে, যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের না করলে সমস্যা খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে পড়ে। তাই সমস্যার শুরুতেই সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উত্তম। আর এক্ষেত্রে সমাধানের শুধু একটি উপায় চিন্তা করা ঠিক নয়, একাধিক পথ চিন্তা করা ভালো।

৩. সালাত আদায় ও আল্লাহর কাছে মুনাজাত : এই কথা ভালোভাবে মনে রাখা দরকার যে, কোনো মানুষই অপর মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। সমস্যার সমাধান আল্লাহরই হাতে। তাই আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে হবে। সালাত আদায় এবং বিভিন্ন মাসনূন দোআ পড়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। কারণ

www.nagorikpathagar.com

আমরা আমাদের সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করতে এবং সমাধান করতে অক্ষম। আল্লাহর কাছে সমস্যার কারণ ও সমাধানের পথ সুস্পষ্ট। তার সাহায্য ছাড়া আমরা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি না। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন নামায পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে দোআ করতেন। বিজ্ঞানী অ্যালেক্সি কমরেড রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন :

"প্রার্থনা একজন মানুষকে সবচেয়ে বড় শক্তি দান করতে পারে। এই শক্তি কাল্পনিক শক্তি নয়, মাধ্যাকর্ষণের মতোই তা অত্যন্ত বাস্তব। একজন ডাক্তার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো সমস্ত ওষুধ এবং চিকিৎসা যেখানে ব্যর্থ সেখানে প্রার্থনার জোরে মানুষ নবজীবন লাভ করেছেন। রেডিয়ামের মতোই আলো এবং শক্তি ছড়ায় প্রার্থনা। মানুষের শক্তি সীমিত, কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা সে অসীম শক্তিকে ডাকতে পারে নিজের শক্তি বাড়াবার জন্য। যে অসীম সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন প্রার্থনার মাধ্যমে সেই শক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকি আমরা এবং সাহায্য পাই প্রচুর পরিমাণে। সাহায্য চাওয়ামাত্র আমাদের মানসিক সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যায়। প্রার্থনা এমন এক শক্তি যার দ্বারা মানুষ উপকার পায়ই।"[১]

অতএব, দুশ্চিন্তা ও যেকোনো সমস্যার কথা গভীর রাতে আল্লাহকে খুলে বলুন। এতে লজ্জার কিছুই নেই। মনে মনে সব সময় দুশ্চিন্তা ও সমস্যা লাঘবের জন্য দোআ পড়ুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দোআ শিখিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।"

সত্যিই বিপদ মসিবতে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নেগি যথার্থই বলেছেন, "বিপদে পড়লেই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করি আমরা। অথচ শুধু বিপদের সময় নয়, সব সময় যদি সৃষ্টিকর্তাকে ডাকার মতো ডাকতে পারি তাহলে জীবনটা সর্বদিক থেকে শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে—এতে কোনো সন্দেহ বা ভুলের অবকাশ নেই।"[২]

অতএব সকল কাজে আল্লাহকে স্মরণ করার চেষ্টা করা উচিত। তাহলে মন ভালো থাকবে। এছাড়াও মনে মনে যিকির-আযকার, দোআ-দরূদ ও তাসবীহ-তাহলীল পড়লে দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

---

১. ডেল কার্নেগি ১৯৯৮, বড় যদি হতে চান, অনুবাদ : তারিকুল ইসলাম, বাংলাবাজার, ঢাকা; বিউটি বুক হাউস, পৃ-৮৩।

২. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.com

৪. ধৈর্য ধারণ করা : আল্লাহ তাআলা কুরআনে ধৈর্য অবলম্বন ও নামাযের মাধ্যমে বিপদ-মসিবতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। বিপদে ভেঙ্গে না পড়ে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাআলা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। বিপদ-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। একবার রাসূলে কারীম (স) একজন মহিলার জ্বর ওঠার পর তাকে কাঁদতে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে মহিলা জবাব দিলেন, আমার জ্বর উঠছে, আল্লাহ তাকে বুঝুক। তার কথা শোনার পর রাসূলে কারীম (স) বললেন, জ্বরকে মন্দ বোল না। জ্বর মানুষের পাপরাশিকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দেয়– যেমন আগুন লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (মুসলিম)

অনেক ছাত্রছাত্রী আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে খুব বেশি ভেঙ্গে পড়েন। আমাদের মনে রাখতে হবে মৃত্যু সকলেরই জন্য অবধারিত। শুধু মানুষ নয়, গাছগাছালি, পাখপাখালিসহ সকল প্রাণীই মৃত্যুবরণ করে। তাই কারো মৃত্যুর কথা শুনে বুক চাপড়ানো বা হাউমাউ করে কাঁদার চেয়ে ধৈর্য ধারণ করা ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ করাই উত্তম। আল্লাহ এটার পুরস্কার দেবেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন, যখন কোনো বান্দার সন্তানের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তিনি আবার তাদেরকে প্রশ্ন করেন, এ বিপদের সময় আমার বান্দা কী বললো? ফেরেশতারা জবাবে বলে, এ বিপদের সময়ও সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেন, আমার ঐ বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো। আর ঐ ঘরের নাম রাখো 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)। (তিরমিযী)

আত্মীয়স্বজন বা ছেলেসন্তানের মৃত্যুর পর শোকাহত হওয়া স্বাভাবিক। তবে এ সময় ধৈর্য ধারণ করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রীর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু তালহার ছেলে অসুস্থ ছিল। তিনি জরুরি কাজে ঘরের বাইরে গেলে ছেলে মারা যায়। আবু তালহার স্ত্রী অন্যদের বলে রাখলো আবু তালহাকে যেন এ সংবাদ কেউ না বলে। আবু তালহা সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, ছেলে কেমন আছে? স্ত্রী জবাব দিল, আগের চেয়ে শান্ত আছে। এ কথা বলে তিনি তার জন্য রাতের খাবার নিয়ে এলেন। তিনি শান্তিতে খানা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ভোরে স্ত্রী তাঁকে হেকমতের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ যদি কাউকে কোনো বস্তু ধার দিয়ে আবার ফেরত চায় তাহলে ঐ বস্তু আটকিয়ে রাখার কোনো অধিকার কি কারো আছে? আবু তালহা বললেন, আচ্ছা এ হক কীভাবে অর্জন করা যাবে? তখন স্ত্রী বললো, নিজের ছেলের উপর ধৈর্য ধারণ করো।

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কীভাবে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং অপরের কাছে তা পেশ করতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুখ-দুঃখ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান কত গভীর তা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ মানুষকে বিপদ-মসিবত দিয়ে থাকেন। তাই বিপদ-মসিবতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়।

৫. সমস্যার সম্মুখীন হতে যেন না হয় তার জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা : কোনো সমস্যার কারণে আপনার পড়াশোনা যেন বন্ধ না হয় তার জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। কারণ কিছু সমস্যা আছে আগে থেকে সতর্ক থাকলে এড়ানো যায়। আর এমন কিছু সমস্যা আছে, যা এড়ানো সম্ভব নয়। আপনি আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থার আলোকে কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তা চিন্তা করে অগ্রিম পরিকল্পনা নেওয়ার পরও যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবেন তা সহজভাবে গ্রহণ করুন এবং সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করুন।

ব্যক্তিগত কতিপয় সমস্যা

প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীই কমবেশি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। অনেক ছাত্রছাত্রী সমস্যা কাটিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে আর পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে না। নিচে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ব্যক্তিগত কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে অনেকেই পড়তে পারেন না : হযরত আলী ইবনে আব্বাস ১০০০ বছর আগে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন[৩] ইবনে আলী নাফীস ৭০০ বছর আগে বলেন,

Health is[৪] a state of the body in which functions are normal, while disease.

কেউ অসুস্থ হলে তার শরীর ঠিকমতো কাজ করে না। আর কারো শরীর ঠিকমতো কাজ না করলে তার পক্ষে পড়াশোনাসহ কোনো কাজই করা সম্ভব হয় না।

আমাদের সমাজে আজন্ম রোগগ্রস্ত কিছু মানুষ আছে সুস্থ মানুষের শিক্ষার জন্য। কিন্তু কিছু মানুষ হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এভাবে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারে না কিংবা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলেও আগের মতো শ্রম দিতে পারে না, তাই রেজাল্ট খারাপ করে। ইচ্ছা করে কেউ অসুস্থ হয় না। মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা আল্লাহর হাতে। তবু শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ শরীরের জন্য দোআ করেছেন। অতএব শারীরিক সুস্থতার প্রতি খেয়াল রাখা অপরিহার্য। কেননা–

ক. স্বাস্থ্য আল্লাহর বিরাট নেয়ামত : এই কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে গনীমত মনে কর।"

---

৩. ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল, ২০০৩, HEALTHY LIVING-লন্ডনে একটি শিক্ষা শিবিরে উপস্থাপিত আলোচনা।

৪. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.com

কোনো একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে ইচ্ছা করলেও জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গমন ও গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়াসহ বিভিন্ন ধরনের নফল ইবাদত, নফল রোযা পালন করা সম্ভব হয় না। চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে ইচ্ছা থাকলেও কুরআন তিলাওয়াত করা যায় না। এই কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের সুস্থতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "ওয়া ইন্না লিজাসাদিকা আলাইকা হাক্কুন" অর্থাৎ তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, "দুর্বল মুমিনের চেয়ে সবল মুমিন উত্তম।"

আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তারাই সুস্থতার গুরুত্ব বোঝেন। আল্লাহ তাআলা যাদের হাত, পা, কানসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে দিয়েছেন তাদের তুলনায় তারাই এসব অঙ্গের মর্যাদা বেশি বোঝেন, যাদের সকল অঙ্গ ঠিকমতো নেই বা থাকলেও ত্রুটি আছে।

খ. ভালোভাবে পড়াশোনার পূর্ব শর্ত হচ্ছে প্রফুল্ল মন ও সুস্থ শরীর : ক্যারিয়ার গঠন করতে হলে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে হয়। একজন ব্যক্তিকে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে হলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন। উত্তমভাবে ক্যারিয়ার গঠন করার যেমন টেকনিক আছে, তেমনি শরীর ও মনকে সুন্দর রাখারও কৌশল আছে। যিনি যত বেশি কৌশলী তিনি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তত বেশি শক্তিশালী।[৫]

স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য কতিপয় পরামর্শ

১. স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে : ভালোভাবে পড়াশোনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া প্রয়োজন।[৬]

এ প্রসঙ্গে Virginia Woolf বলেন, "One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well."

খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ

ক. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর রাসূলের হাদীস অনুযায়ী পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাবার এক ভাগ পানি আর এক ভাগ খালি রাখলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ইসলাম অতিরিক্ত ভোজন নিষিদ্ধ করেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেলেই রোগ হয়। ডাক্তারদের মতে দু'বেলা খাওয়ার মাঝখানে অন্তত তিন ঘণ্টার বিরতি দেওয়া ভালো যেন খাদ্য ভালোভাবে হজম হতে পারে। এছাড়া খুব ভালোভাবে ক্ষুধা পেলে খানা খাওয়া এবং কিছু ক্ষুধা বাকি থাকতে খাওয়া শেষ করা উত্তম।

---

৫. আপনি যদি এমন কোনো চাকরি করেন যা আপনার শরীরকে দুর্বল করে দেয়, তাহলে কাজশেষে পড়াশোনা শুরু করার আগে এমন কিছু করা দরকার, যার ফলে আপনার শারীরিক দুর্বলতা চলে যায় এবং মনের প্রফুল্লতা নিয়ে আপনি পড়তে পারেন।

৬. যে সকল খাবারের Low nutritional value বেশি তা না খাওয়া। এর পরিবর্তে Healthy natural diet খাওয়া প্রয়োজন। খুব বেশি কফি খাবেন না। কারণ বেশি কফি পানে high amout of caffeine থাকে।

www.nagorikpathagar.com

খ. ইসলাম মদ ও শূকরের মাংসসহ অনেক খাবার হারাম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে অনেকেই চিপস, কেক, বিস্কুট, কাবাব, চকলেট, আইসক্রিম, বারগার, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি খেতে পছন্দ করেন। এ জাতীয় খাবার মাঝে মধ্যে খুব অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে।[৭]

গ. ব্যালেন্সড ডায়েট (Balanced Diet) গ্রহণ করতে হবে। 'ব্যালেন্সড ডায়েট' বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে সুষম খাবার খেতে হবে। সুষম খাবার দেহে শক্তি যোগায় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা সৃষ্টি করে। এজন্য এমন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, যাতে শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট), তেল, প্রোটিন, লবণ, পানি ও ভিটামিন থাকে। মনে রাখতে হবে Balanced Diet মানে দামি খাবার নয়। গোশত ও দুধের মতো ছোট-বড় মাছ এবং ছোলা, শিমের বিচি ও বিভিন্ন ধরনের ডালে প্রচুর প্রোটিন আছে। এ প্রসঙ্গে ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল[৮] ব্যালেন্সড ডায়েটের নিম্নোক্ত আনুপাতিক হার উপস্থাপন করেছেন :

Food Type	Recommended proportion
Rice, bread, potato, cereal	35%
Fruit and vegetables	35%
Milk and dairy products	12%
Fish, meat, lentils and beans	12%
Fat and sugar	6%
Water (fluids)	8 cups

৭. জাংক ফুডের ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. Weakened immunity from allergies and infections : Junk food is high in toxins and antibiotics, containing herbicides, pesticides and artificial additives that give it colour, flavour and shelf.

২. Increased susceptibility to serious conditions such as are due to overabsorption of antibiotics contained in junk food, or antibiotics taken on prescription to fight recurrent illness.

৩. Poor concentration and recall : The widespread flavouring monsodium glutamate

৪. Hyperactivity : Additives such as amaranth and sunset yello.

৮. ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল, ২০০৩, HEALTHY LIVING-লন্ডনে একটি শিক্ষা শিবিরে উপস্থাপিত আলোচনা।

www.nagorikpathagar.com

২. ব্যায়াম ও খেলাধুলা : ব্যায়াম ও বৈধ খেলাধুলার মাধ্যমে টেনশন লাঘব হয়, ঘুম ভালো হয়, ব্রেনে অক্সিজেন সরবরাহ বেশি হয়। ক্লাসের লেকচার, পরীক্ষার রিভিশান, রচনা লেখার চাপ লাঘব হয়। এজন্য প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা ভালো। বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম আছে।[৯] আপনি আপনার উপযোগী ব্যায়াম করতে অভ্যস্ত হোন। তবে এমন ব্যায়াম করা উচিত, যা শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত। এমনকি মনেরও ব্যায়াম ও পড়াশোনা একটা আরেকটার সহযোগী। এমন ভাবা উচিত নয় যে, ব্যায়াম করতে যে সময় ব্যয় হয় তা সময় অপচয় বৈ কিছুই নয়। আপনার উত্তম পড়াশোনার জন্য শারীরিক সুস্থতা দরকার। আর শারীরিক সুস্থতার জন্য ব্যায়াম খুবই উপকারী।

৩. পরিমিত ঘুম : স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে গভীর নিদ্রা প্রয়োজন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইন্না লিজাসাদিকা আলাইকা হাক্কুন" অর্থাৎ তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক আছে।

শরীরের হক আদায়ের জন্য পরিমিত ঘুম দরকার। না ঘুমিয়ে সারা রাত ইবাদত করা আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের খেলাপ। ভালো পড়াশোনার জন্যও পরিমিত ঘুম দরকার।

১৯৯৫ সালে ইংল্যান্ডে এক জরিপ হয়েছিল। উক্ত জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী মানুষ রাতে গড়ে ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট ঘুমায়। তবে অনেকের মতে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

ঘুমানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ :

ক. মধ্যরাতের আগে ঘুমানো বেশি উপকারী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন। মধ্যরাতের পরে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।

অনেক ছাত্রকে দেখা যায়, রাতে খুবই বিলম্বে ঘুমায়। কেউ কেউ তো টেলিভিশন দেখে, গল্প করে মধ্যরাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকে, তারপর ঘুমাতে যায়। এর ফলে ফজরের সময় ঠিকমতো ওঠা কষ্টকর হয়। কোনো রকম ফজরে নামায আদায় করলেও ফজরশেষে দ্বিতীয়বার ঘুমাতে হয়। কেউ গভীর রাত জেগে ফজরের পরে ঘুমাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার পক্ষে ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া ও অধ্যয়ন করা কষ্টকর। কিন্তু এভাবে অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো।

খ. রাতে ঘুমানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় করা ভালো। কখনও যদি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো সম্ভব না হয় আর ঘুম থেকে ওঠার নির্দিষ্ট সময়ে জাগ্রত হওয়া কষ্টকর হয় তাহলেও অভ্যাস পরিবর্তন করা ঠিক নয়। ঘুম থেকে ওঠার সময় ঠিক রাখার চেষ্টা করা ভালো। প্রয়োজনে পরে 'ঘুমের কাযা' করে নেবেন। একবার সময়সূচির পরিবর্তন হলে পরের কয়েকদিনও তার প্রভাব থাকে।

---

৯. যেমন—ফ্লোরে শুয়ে বা আরামদায়ক কোনো চেয়ারে বসে কয়েকবার শ্বাস নিঃশ্বাস নেওয়া।

www.nagorikpathagar.com

গ. ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগ থেকেই ঘুমের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। এই সময় হালকা কাজ করা ভালো, কোনো ধরনের কঠিন কাজে লিপ্ত থাকা ঠিক নয়।

ঘ. ঘুমানোর আগে চা, কফি ও ড্রিংকস না খাওয়া ভালো। রাতে ব্যালান্সড খাবার নেওয়া দরকার। ভিটামিন বি ও ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবারে ভালো ঘুম হয়।

ঙ. ঘুমানোর আগে মাথার সকল চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখুন। কোনো কিছু মাথায় ঘুরপাক খেলে তা কোনো নোটবইতে লিখে রাখুন। তারপর ভালোভাবে ঘুমান।

চ. টেনশনে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীর ঘুম আসে না। তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে বিছানায় শুয়ে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে ভালোভাবে শারীরিক ব্যায়াম করে শরীর ও মনকে রিলাক্স করুন। এর ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানেই ঘুম আসতে পারে। যদি তারপরও ঘুম না আসে তাহলে বিছানায় শুয়ে দুশ্চিন্তা করার পরিবর্তে উঠে কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

ছ. ঘুমানোর সময় লেপ, তোষক ও বালিশ ব্যবহারের আগে দেখে নিন। কারণ এর ভেতর পোকামাকড় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই শোয়ার আগে বিছানা ঝেড়ে নিন। তারপর ঘুমের দোআ পড়ে যিকির করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনি যদি আল্লাহর যিকির করা অবস্থায় ঘুমান তাহলে সারারাত জেগে যিকির করলে যে সওয়াব হতো ঘুমের ভেতরও সেই সওয়াব পাবেন।

জ. ঘুমানোর আগে অজু করে পবিত্র হয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। এই ঘুমই আপনার জীবনের সর্বশেষ ঘুম হতে পারে। অনেক মানুষ ঘুমের ভেতর মারা যায়। তাই ঘুমানোর আগে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে পাক-পবিত্র হয়ে ঘুমানো দরকার।

৪. প্রয়োজনমাফিক পরিষ্কার পানি পান করা : শরীর সুস্থ রাখতে হলে প্রতিদিন প্রয়োজনমাফিক পরিষ্কার পানি পান করতে হবে। পানির সাহায্যে শরীরের রক্তপ্রবাহ চালু থাকে, খাদ্য সহজেই হজম হয়, দেহের ভেতরের আবর্জনা, পেশাব, থুথু, কফ ইত্যাদির মাধ্যমে চলে যায়। তাই সব সময় পানি পান করা দরকার। বিশেষত গরমকালে বেশি বেশি পানি পান করতে হয়। এজন্য পানির ছোট কোনো বোতল সাথে রাখা ভালো। তবে অপরিষ্কার পানি পান করা উচিত নয়। কারণ অপরিচ্ছন্ন পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে ডায়রিয়াসহ যেকোনো ধরনের অসুখ হতে পারে।

৫. স্ট্রেস না থাকা, বেশি চাপ অনুভব না করা : কোনো কাজ করার সময় বেশি চাপ অনুভব করা ঠিক নয়। বিভিন্ন কারণে অধিক চাপ অনুভূত হয়। যতটুকু কাজ করা সম্ভব তারচেয়ে বেশি দায়িত্ব নেওয়ার ফলে অনেকে মানসিক চাপ অনুভব করেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "মানুষের সাধ্যাতীত কোনো বিষয় তিনি কাউকে চাপিয়ে দেন না।" তাই নিজের পক্ষ থেকে সাধ্যাতীত কোনো চাপ নেওয়া উচিত নয়। আবার কখনও কাউকে কাউকে দেখা যায় অলসতায় সময় নষ্ট করে কোনো কিছুর ডেডলাইনের আগমুহূর্তে বাড়তি চাপ অনুভব করে। আমাদের মনে রাখা দরকার,

www.nagorikpathagar.com

অলসতায় সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহর কাছে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। কোনো সময় নষ্ট করলে সে সময়ের হিসাব কীভাবে দেবো? কেউ কেউ কোনো কাজ করার সময় ভুল হয়ে গেলে এজন্য মানসিক অশান্তিতে ভোগেন। এটা ঠিক নয়, কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভুলবশত কোনো কিছু করে ফেললে তার জন্য আল্লাহ্ পাকড়াও করবেন না। যেমন রোযা রাখার পর ভুলে কেউ কিছু খেলে বা পান করলে রোযা নষ্ট হয় না। অতএব আপনি ভুলে কিছু করলে তার জন্য পেরেশান হবেন না। ভুল থেকেই সঠিক কাজ করার শিক্ষা নেওয়া উচিত।

আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো সমস্যার কারণে মানসিক অশান্তিতে ভোগেন। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারেঃ[১০] ১. শ্বাসাঘাত-হার্টবিট দ্রুততর হয়, ২. রক্তপ্রবাহে সমস্যা হয়, ৩. ব্লাডপ্রেসার হতে পারে, ৪. লিভার স্টোরড সুগার রিলিজ করে। এছাড়া শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অশান্তি, মানসিক উত্তেজনাসহ আরও নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে।[১১] তাই আমাদের স্ট্রেসমুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য কতিপয় পরামর্শ দেওয়া হল ঃ

১. **কারো সাথে কথা বলুন :** কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করে মন হালকা করা দরকার। একা একা বসে অধিক চিন্তা করা ঠিক নয়। মন প্রফুল্ল রাখতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন দুশ্চিন্তার কথা বন্ধুদের বলে তাদের দুশ্চিন্তায় ফেলা ঠিক নয়। কেউ কেউ বন্ধুবান্ধবের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ বলতে লজ্জাবোধ করেন। এ কথা ঠিক যে, বন্ধু বান্ধব কেউ-ই মনের অশান্তি দূর করতে পারে না। তারা আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারে এবং আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করতে পারে।

২. **আনন্দে থাকুন :** আনন্দ উপভোগ করলে অনেক স্ট্রেস দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সবাই আনন্দ উপভোগ করতে জানে না। আনন্দে থাকার জন্য প্রচুর অর্থের মালিক হতে হবে কিংবা সব সময় পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে হবে বিষয়টি এমন নয়। অনেক সময় দরিদ্র কৃষকের মুখেও যে ধরনের হাসি দেখা যায়, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের

---

১০. Blood flow is instantly directed away from the skin, digestive tract, kidney, liver and immune system, towards the brain, heart and muscles.
The liver released stored sugar-levels of sugar, fat and cholesterol rise in the bloodstream, providing extra energy.
Levels of platelets and blood clotting agensts increase in the blood, to protect from excess bleeding in case of injury.

১১. Other effects of stress : Performance blow parmuddleheadedness : exhaustion; depression; aggression; agitation; disorganisation; procastination; forgetfulness; being persistently late; making up excuses; missing lectures, tutorials and deadlines; socialising too much
Athma; skin complains, recouring bouts of ill health; frequent accidents; vomiting; stomach problems; muscular pains; muscular pains such as back pain, eating disorders; overleeping, insomnia; panic attacks.

www.nagorikpathagar.com

মালিক, পুঁজিপতি, শিল্পপতির মুখেও সেই ধরনের হাসি দেখা যায় না। অনেক গরিব মানুষের তুলনায় ধনী মানুষের স্ট্রেস বেশি দেখা যায়। এর ফলে তারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তাই মনকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করুন। মন আনন্দে থাকলে রোগ কম হয়, রোগ নিরাময় হয়। এটা বড় ডাক্তারদের কথা। তাই বৈধ সীমার মধ্যে আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করুন।

৬. পরিমিত আলো : সূর্যের আলো স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। তাই থাকার ঘরে রোদ প্রবেশের সুযোগ থাকা চাই। যেসব ঘরে রোদ প্রবেশ করতে পারে না, সেসব ঘরে অনেক জীবাণু প্রতিপালিত হয়। আর পড়াশোনার টেবিলেও পরিমিত আলো থাকা দরকার। অল্প আলোতে পড়াশোনা করলে চোখের সমস্যা হতে পারে। তবে আলো যেন সরাসরি চোখে পড়তে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পেছন কিংবা উপরের দিক থেকে আলো এলে চোখের সমস্যা হয় না।

৭. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ স্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে দেহ, পোশাক, বাসস্থান, ব্যবহার্য আসবাবপত্র ও চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি। দেহ পরিচ্ছন্ন না থাকলে দেহে নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়। আর পোশাক পরিচ্ছন্ন না থাকলে চামড়া ময়লাযুক্ত হয়। ফলে চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি হতে পারে। তাই ইসলাম পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতিদিন অযু, মেসওয়াক, নাকে পানি দিয়ে শরীর কয়েকবার পরিষ্কার করতে হয়। জুমাবারে চুল ও নখ কাটা এবং গোসল করার মাধ্যমে শরীর আবর্জনামুক্ত রাখতে হয়।

৮. পরিচ্ছন্ন বায়ু : স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে পরিষ্কার পানির মতো পরিচ্ছন্ন বায়ু খুবই জরুরি। বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে। অক্সিজেন দেহের তাপ, রক্ত ও কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং দেহের অভ্যন্তরের বিষাক্ত পদার্থ গ্যাস হয়ে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। দেহে পরিমিত অক্সিজেন না থাকলে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়। তাই বিশুদ্ধ বায়ু পেতে বাসস্থান খোলামেলা হওয়া ভালো। আর মাঝে মধ্যে গাছগাছালির মাঝে, সূর্যের আলো কিংবা বৃষ্টির ভেতর চলাফেরা করা দরকার। বায়ু দূষিত হয় এমন কোনো আবর্জনার স্থানে চলাফেরা করা উচিত নয়। নিজের বাসস্থান আবর্জনামুক্ত রাখা উচিত।

৯. পড়াশুনার সময় দেহ সোজা রেখে বসা উচিত : একেকজন ছাত্রছাত্রী একেকভাবে পড়াশোনা করে। কেউ কুঁজো হয়ে বসে টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে পড়াশোনা করে, আর কেউ শিড়দাঁড়া সোজা রেখে বসে। কেউ মাদুরে বসে উঁচু টুলে বই-খাতা রেখে লেখাপড়া করে। আর কেউ টেবিল-চেয়ারে বসে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারদের মতামত অনুযায়ী শিরদাঁড়া কখনো বেঁকিয়ে বসা উচিত নয়। এতে শরীরে রক্ত চলাচল করতে পারে না। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্তি আসে, পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। আবার কেউ বিছানায় শুয়ে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়ে। এভাবে শুয়ে পড়া উচিত নয়। পিঠ সোজা রেখে উঁচু জায়গায় বই-খাতা রেখে পড়াশুনা করা ভালো। টেবিল-চেয়ার থাকলে ভালো, আর তা না হলে মেঝেতে বসে ছোট টুলের উপর

www.nagorikpathagar.com

বই-খাতা রাখা দরকার। শুধু পড়াশোনার সময় নয়, চলাফেরার সময়ও কুঁজো হয়ে চলাফেরা করলে ঘাড় ও শিরদাঁড়ার অসুখ হতে পারে।[১২]

১০. চিকিৎসা নেওয়া : অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মৃত্যু ও বার্ধক্য ছাড়া প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা আছে।

তবে চিকিৎসা নিলেই মানুষ ভালো হয়ে যাবে এমন গ্যারান্টি নেই। ভালো হওয়া না হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে চিকিৎসা নেওয়া সুন্নাত, তাই চিকিৎসা নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের সারাংশ উল্লেখযোগ্য। একবার আল্লাহর রাসূল (স)-কে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ওষুধ সেবন করব না? তখন আল্লাহর রাসূল (স) জবাব দেন, তোমরা ওষুধ সেবন করবে। এ থেকে বোঝা যায়, ওষুধ সেবন করা সুন্নাত। তবে ওষুধ কাউকে ভালো করতে পারে না, ভালো হয় আল্লাহর ইচ্ছায়।

মন ভালো না থাকলে পড়তে মন চায় না

শরীর ও মনের সমন্বয়েই একজন মানুষ।[১৩] তাই মানসিকভাবে অসুস্থ হলে অনেকের পক্ষে পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব শারীরিক অসুস্থতার মতো মানসিক অসুস্থতাকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই, অনুরূপ মানসিক অসুস্থতার জন্যও কারো না কারো সাথে আলাপ করতে হয়। একজন মানুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে অনেক সময় ঘুম হয় না, খেতে পারে না, মেজাজে ভারসাম্য থাকে না। মানসিক অসুস্থতার কারণেও অনুরূপ বা তারচেয়ে খারাপ অবস্থা হতে পারে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে শারীরিক অসুস্থতার কারণে একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ, খুনখারাবি হওয়ার তেমন নজির নেই। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার কারণে আত্মহত্যা, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীসহ সমাজের একে অপরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এমনকি খুনের ঘটনাও দেখা যায়। তাই একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের সুস্থতা নিশ্চিত করা দরকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী স্বাস্থ্য হচ্ছে :

"Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing".

এ সংজ্ঞানুসারে কোনো একজন মানুষের শরীর ও মন উভয়টা ভালো থাকলেই তাকে সুস্থ বলা যায়। পৃথিবীতে শারীরিক অসুস্থ মানুষের তুলনায় মানসিক অসুস্থ মানুষের সংখ্যা বেশি। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে গড়ে ১ : ৪ (অপর

---

১২. সিকদার আবুল বাশার, ১৯৯৪, ছোটদের বিজ্ঞানের বর্ণমালা, ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, পৃ-৯৭

১৩. পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ আছে ঃ শারীরিক-মানসিক উভয় দিক থেকে অসুস্থ, শারীরিক সুস্থ কিন্তু মানসিক অসুস্থ, মানসিক সুস্থ কিন্তু শারীরিক অসুস্থ;, শারীরিক-মানসিক উভয়ভাবে সুস্থ।

www.nagorikpathagar.com

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১ : ৬) মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ। তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, শারীরিক অসুস্থতার জন্য Pathological treatment-এর যে ধরনের ব্যবস্থা আছে, সে তুলনায় Psychological treatment-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। অথচ অনেক সময় দেখা যায় একজন মানুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও মানসিক শক্তির কারণে তাকে অসুস্থই মনে হয় না। এর কারণ তিনি অসুস্থতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন। অপরদিকে কেউ কেউ শারীরিকভাবে সুস্থ হলেও মানসিক অসুস্থতার কারণে সময়ের ব্যবধানে শারীরিকভাবেও মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জেনে রাখো! তোমাদের শরীরের ভেতর এমন একটি অংশ আছে, যা সুস্থ থাকলে সারা শরীর সুস্থ থাকে, আর তা অসুস্থ হলে সারা শরীর অসুস্থ হয়। আর তা হচ্ছে ক্বালব।"

পৃথিবীতে এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক, কিন্তু বিভিন্ন কারণে মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। ঠিকমতো খেতে পারছেন না। এমনকি ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়া ছাড়া ঘুমোতে পারেন না। তাদের চেহারায় অশান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। কেউ তাদের ক্লান্ত-শ্রান্ত দেখে যদি প্রশ্ন করেন, ভাই, আপনি কি অসুস্থ?

তিনি জবাবে বলেন, না। তখন প্রশ্ন করা হয় তাহলে এত বিষণ্ন মনে হচ্ছে কেন? তখন জবাবে বলেন, 'মন ভালো নেই'।

মন ভালো না থাকলে একজন মানুষ কাজের শক্তি পায় না; ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। তাই উত্তম পড়াশোনার জন্য শুধু শরীর ভালো থাকলেই যথেষ্ট নয়, মনও ভালো থাকা জরুরি।

একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। যেমন–

১. দরিদ্রতার কারণে তৃতীয় বিশ্বের গরিব অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার টিউশন ফিসহ প্রয়োজনীয় খরচ দিতে পারে না। এ কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী দুশ্চিন্তায় ভোগে।

২. পড়াশোনার চাপ কিংবা পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে কোনো কোনো ছাত্র মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

৩. কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী নির্যাতন বা নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়ে মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

৪. বিবাহিক অশান্তি ও জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার কারণে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীর মন খারাপ থাকে।

৫. পড়াশোনাশেষে বেকারত্বের কথা চিন্তা করে অনেকেই দুশ্চিন্তায় ভোগে।

৬. যারা ধর্মীয় পরিবেশে বড় হতে চায় তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রেডিও, টিভিতে অশ্লীল প্রচারণায় মানসিকভাবে আহত হয়।

www.nagorikpathagar.com

৭. অনেক পরিবারকে ছোট্ট একটি ঘরে একসাথে থাকতে হয়। ফলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও পৃথক রুমে থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। আবার কখনও কখনও হোস্টেলে সিট কিংবা থাকার ভালো জায়গা না পেয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

৮. অনেক ছাত্রছাত্রী বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকার কারণে একাকীত্ব অনুভব করে, যা অনেকেরই মানসিক যাতনার কারণ। বিশেষত যেসব ছাত্রছাত্রী একদেশ থেকে আরেক দেশে যায় কিংবা এক জেলা থেকে আরেক জেলায় পড়াশোনা করতে যায়, তাদের অনেকেই পরিচিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সন্ধান করতে থাকে। এ ধরনের মুহূর্তে সিনিয়র ছাত্রদের বন্ধুর মতো সঙ্গ দেওয়া উচিত।

৯. পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোনসহ নিকটজনদের মৃত্যুতে কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

১০. বন্ধুবান্ধব বা নিকটজনদের কথাবার্তা কিংবা আচরণে কেউ কেউ মানসিক কষ্ট পান।

১১. পাপরাশিতে ডুবে থাকার পর কেউ কেউ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে মানসিক যাতনায় ভোগে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একজন ছাত্র বা ছাত্রী বিভিন্ন কারণে মানসিক অশান্তিতে সময় কাটায়। এই ধরনের মুহূর্তে তাদের মানসিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে Dr. Nigel Copsy তাঁর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য বহুমুখী Holistic Support প্রয়োজন। তিনি যথার্থই বলেছেন :

The Mental Health Care can only be truly holistic when the religious, spiritual and cultural needs of people are fully understood." (Forward in Faith)

এ কথা ঠিক যে, মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলতে হলে আত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা ধরনের পদক্ষেপ দরকার। ছাত্রছাত্রীদেরও একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে কেউ যদি দুনিয়াতে কারো সমস্যা লাঘব করেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মসিবত লাঘব করবেন।

আর্থিক সমস্যা ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধক

অনেক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করার পর বিভিন্ন কারণে আর্থিক সংকটে পড়ে যায়। তাই অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা শেষ না করেই চাকরি-জীবনে পদার্পণ করে। আর কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশোনার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে না। এ কারণে তীব্র মানসিক যাতনায় ভোগে।

www.nagorikpathagar.com

এ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে :

১. আর্থিক সমস্যার কারণে মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়ে আর্থিক দীনতাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া এবং অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকেই খরচের বাজেট করা উচিত।

২. আর্থিক সমস্যাকে বড় করে না দেখে পরিশ্রম ও সাধনা অব্যাহত রাখা দরকার। তাহলে আর্থিক দৈন্য প্রতিভা বিকাশে অন্তরায় হয়ে থাকে না।

আমেরিকার প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একজন কাঠুরিয়ার ছেলে ছিলেন। কিন্তু তার অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে আমেরিকার প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। টিউশনি, পার্ট টাইম চাকরি, স্কলারশিপ ও হার্ডশিপ ফান্ড থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করা যেতে পারে।

যে সকল ছাত্রছাত্রী ইংল্যান্ডে পড়তে আসে তাদের টিউশন ফি ও থাকা খাওয়ার খরচ বহনের জন্য প্রায় দশ লাখ টাকার মতো বছরে উপার্জন করতে হয় বা পড়াশোনার চাপ অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করে। আর বাংলাদেশে দরিদ্র অভিভাবককে হালের গরু, ভিটামাটি বিক্রি করে পয়সা দিতে হয়। তাই ছাত্রদের পড়াশোনার সময় কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করার চেষ্টা করতে হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও সে ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত হলেই পড়াশোনা ছেড়ে না দিয়ে মেধা বিকাশে সিরিয়াস হতে হবে। ব্যক্তি সিরিয়াস হলে আর্থিক সমস্যা থাকার পরও মেধা বিকাশ সম্ভব। তার প্রমাণ হচ্ছে, ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বে মেধা বিকাশে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে সে তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে মেধা বিকাশের সুযোগ নেই। তারপরও তৃতীয় বিশ্বের অনেক প্রতিভাবান মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যম, কর্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে শুধু নিজ দেশে নয়, বরং সারা বিশ্বেই যশস্বী হয়েছেন।

পারিবারিক সমস্যা

অনেক ছাত্রছাত্রী পারিবারিক সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। আপনিও আপনার পরিবারের সদস্যদের কোনো সমস্যা দেখে নীরব থাকতে পারবেন না। কারণ, পরিবারের সদস্যদের সমস্যা মানে আপনার সমস্যা। এ কারণে আপনার মা, বাবা, ছেলেমেয়ে, ভাই, বোন বা অন্য আত্মীয়-স্বজন কারো সমস্যা দেখলে আপনার চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়ে। শুধু পরিবারের সদস্য কেন, মুসলিম উম্মাহর যেকোনো একজন সদস্যের সমস্যা মানে আপনার সমস্যা। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের মুসলমানদের একই দেহের অংশবিশেষ বলেছেন। এই ধরনের সমস্যাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারেন। এক ধরনের সমস্যা আছে যাতে আপনার সম্পৃক্ততা ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়; কিংবা আপনি একটু ভূমিকা রাখলে সমাধান সম্ভব। ঐ ধরনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। আরেক ধরনের সমস্যা আছে, যে সমস্যা সমাধানের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা জরুরি নয়। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে আপনার খুব বেশি দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। ঐ

www.nagorikpathagar.com

ধরনের সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে আপনার মতামত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতে পারেন। তারপর আপনি আপনার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করুন। এই ক্ষেত্রে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনে কমবেশি সমস্যা আসবেই। সকল সমস্যাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করে আরেকটি সমস্যা তৈরি করার যৌক্তিকতা নেই। কিছু সমস্যা আপন গতিতে আসে, আবার আপন গতিতে চলে যায়। আবার কিছু সমস্যা নিয়ে সব সময় চলতে হয়। আর কিছু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হয়।

বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনের সমস্যাও পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায়

অন্যকোনো মানুষের সমস্যা দেখে আবেগতাড়িত হওয়া স্বাভাবিক। এর ফলে অনেক সময় পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাধ্যমতো মানুষের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা ভালো। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্য মানুষের সমস্যা সমাধান করবেন আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার সমস্যা সমাধান করবেন।"

তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আপনার সাধ্যাতীত কোনো কিছু করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এর জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাকড়াও করবেন না। আপনার সাধ্যমতো মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার পরও অনেকের সমস্যা চোখের সামনে ভাসবে। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করবেন। কিন্তু অন্যের সমস্যা দেখে অধিক পেরেশান হয়ে নিজের জন্য আরেকটি সমস্যা তৈরি করে ফেলা উচিত নয়।

অতি আবেগ ক্যারিয়ার গঠনে বিরাট বাধা

অনেক মানুষ আছেন যারা খুবই আবেগপ্রবণ। অধিক আবেগপ্রবণতার কারণে কোনো কিছুতে অল্পতেই ভেঙে পড়েন। অতি আবেগপ্রবণতা ভালো নয়। এতে পড়াশোনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। আপনি কোনো কারণে আবেগতাড়িত হয়ে পড়লে নিরিবিলি বসে আপনার আবেগ ও বাস্তবতা নিয়ে ভাবুন। বাস্তবতার আলোকে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আপনি যদি কোনো কারণে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তাহলে আপনার বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কারো সাথে দেখা করতে যান। অন্যের সাথে কথা বলুন। আপনার মন ও চিন্তাভাবনাকে অন্যদিকে ধাবিত করুন।

দুশ্চিন্তা ক্যারিয়ার হত্যা করে

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুশ্চিন্তা ক্যারিয়ার গঠনে বিরাট প্রতিবন্ধক। দুশ্চিন্তার কারণে অনেকেই পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারেন না। তাই দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। দুশ্চিন্তার কারণে মস্তিষ্ক থেকে কর্টিসল নামক এক প্রকার হরমোন বেরিয়ে আসে, যা মস্তিষ্কের স্মৃতিকেন্দ্রের জন্য বিষস্বরূপ। এর ফলে পড়লেও পড়াশোনায় মন বসে না। দুশ্চিন্তার কারণে পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটে। ডেল কার্নেগির মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যত লোক মারা গেছে তার তিনগুণ বেশি মারা গেছে হৃদরোগে। এক পরিসংখ্যান অনুসারে, সেই সময় হৃদরোগে বিশ লাখ লোক মারা যায়। আর এই বিশ লাখের মধ্যে দশ লাখের হৃদরোগ হয়েছিল দুশ্চিন্তা থেকে।

www.nagorikpathagar.com

আরেক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, আমেরিকায় প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক মারা যায় আত্মহত্যা করে। আর আত্মহত্যার অন্যতম কারণ দুশ্চিন্তা। এ কারণে ডেল কার্নেগি যথার্থই বলেছেন, "দুশ্চিন্তাকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোনো ওষুধ যদি আবিষ্কার হয় রাতারাতি শতকরা নিরানব্বইটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটবে না।"[১৪] তাই দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, বরং ক্ষতিই বেশি।

উইনস্টন চার্চিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। একবার তাকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, আপনার কাঁধে এত দায়িত্ব রয়েছে, এজন্য আপনি দুশ্চিন্তা করেন কি না?"

উত্তরে চার্চিল বলেন, "এত ব্যস্ততার মধ্যে দুশ্চিন্তা করব কখন? দুশ্চিন্তা করার মত সময় আমার নেই।"

এজন্য ডেল কার্নেগি মনে করেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে দুশ্চিন্তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করুন। আপনি যদি অতিরিক্ত কাজের কারণে দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ অনুভব করেন, তাহলে কীভাবে কাজের চাপ কমানো যায় তা নিয়ে ভাবুন। সব কাজের দায়িত্ব নিজের উপর না রেখে সম্ভব হলে যেসব কাজ অন্যের মাধ্যমে সমাধা করা যায় তা অন্যকে দিয়ে দিন। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ইবাদত ও মেডিটেশন করুন এবং অহেতুক দুশ্চিন্তায় না থেকে বাস্তবতাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন।

ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

আমাদের সমাজে ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক অনুকূল পরিবেশের অভাবে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী প্রতিভা বিকাশ করতে পারছে না। সামাজিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে : ১. দারিদ্র্য, ২. বেকারত্ব, ৩. নকল, ৪. নোংরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ৫. সন্ত্রাস।

১. দারিদ্র্য : আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান অনুসারে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ১৯৯০-এর দশকে দারিদ্র্য দূরীকরণে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। ১৮৪ মিলিয়ন মানুষ এই সময়ে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং দারিদ্র্যসীমা ২৭ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নেমে এসেছে।[১৫] উপরিউক্ত তথ্য আশাব্যঞ্জক। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রদত্ত রিপোর্ট হতাশাব্যঞ্জক। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের তুলনায় উন্নত বিশ্বের শিশুদের শিক্ষার হার অনেক বেশি। যুক্তরাজ্যে গ্রাজুয়েশান পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া এবং পড়াশোনার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নেওয়ার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার একটু বাড়লেও এই কর্মসূচির

---

১৪. ডেল কার্নেগি, পৃ-৭৬

১৫. Ibid 22

www.nagorikpathagar.com

আওতায় সকল ছাত্রছাত্রী না থাকায় এখনও অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েকে স্কুলের পরিবর্তে উপার্জনের জন্য গার্মেন্টস বা অন্য কাজে পাঠায়। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মেধা বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যের কারণে মেধাবী কোনো ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় আঘাত যেন না ঘটে সেজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. বেকারত্ব : শিক্ষাশেষে বেকারত্বের অভিশাপ শিক্ষার প্রতি তৃতীয় বিশ্বের ছাত্রছাত্রীদের অনীহার আরেকটি কারণ। উন্নত বিশ্বে পড়াশোনা শেষে যে ধরনের চাকরি পাওয়া যায় তৃতীয় বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীরা তা পায় না। এ কারণে তাদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে। তাই পড়াশোনাশেষে শিক্ষিত যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

৩. ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে নকল একটি মারাত্মক সমস্যা : নকলের কারণে অনেক ভালো ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেও ভালো ফল করতে পারে না। কিছু ছাত্রছাত্রী কম পড়াশোনা করে নকলের মাধ্যমে ভালো রেজাল্ট করে। এর ফলে অনেক ভালো ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এমনকি তারাও নকল করা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের মেধা বিকশিত হয় না এবং নকল করে পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে বহিষ্কৃত হয়।[১৬] পরবর্তী সময়ে অনেকের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে নকল মহামারীর রূপ নিয়েছে। আশার দিক হচ্ছে, বর্তমানে (২০০২-২০০৪) সরকারের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে নকল অনেকটা কমেছে কিন্তু, তবে এখনও ১০০ শতাংশ নকলমুক্ত পরীক্ষা হয় না।[১৭] নকল করে যারা পাস করে তাদের যোগ্যতা বিকশিত হয় না। তাই সবাই নকল করলেও আপনি করবেন না। কোনো ভালো ছাত্রকে যখন প্রশ্ন করা হয়, "তুমি কেন নকল করছ?" সে জবাবে বলে, "পরীক্ষায় সবাই যখন নকল করে আমি ভুলে যাই কী লিখতে হবে? আমার চারপাশে সবাই যখন দেখে দেখে লেখে আমার পক্ষে মুখস্থ লেখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আমিও নকল করা শুরু করে দিই।" এই যুক্তিতে অন্যদের মত নকল করে লেখা অনুচিত। কেননা নকল করা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গর্হিত কাজ। কেউ প্রথম শ্রেণী পাওয়ার মতো পড়াশোনা না করে নকল করে সে শ্রেণী পাওয়ার অর্থই হচ্ছে সে প্রথম শ্রেণী পাওয়ার উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, এতে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। একজন ছাত্র

---

১৬. অন্যরা নকল লুকাতে হয় তা জানে। আর সে নতুন নকল হাতে নেওয়ার কারণে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। এজন্য পরিদর্শক সহজেই অনুমান করতে পারে যে তার কাছে নকল আছে। ফলে সে-ই বহিষ্কৃত হয়ে যায়। আবার কখনও দেখা যায়, একজন ভালো ছাত্র লেখার দিকে মনোযোগী, পরিদর্শক আসতে দেখে পেছন থেকে কোনো দুষ্ট ছেলে ঐ ভালো ছাত্রটির সামনে নকল ফেলে দেয়। এভাবে নকলের কারণে ভালো ছাত্ররা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৭. কিছুদিন আগে তো কোথাও কোথাও নকল ছাড়া পরীক্ষা দেওয়ার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। এমনও কথা শোনা গেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার পর ছাত্ররা পরীক্ষার খাতা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর খাতা জমা দেওয়ার জন্য মাইকে ডাকা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত আরেক খবর অনুসারে, পরীক্ষার উত্তরপত্রের সাথে মোমবাতিও পাওয়া গেছে। এর অর্থ হচ্ছে দিনের পরীক্ষা রাতেও চলেছে।

www.nagorikpathagar.com

সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে যে রেজাল্ট করার কথা ছিল আরেকজন নকল করে তার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফলে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়।[১৮] তৃতীয়ত, কর্মজীবনে লজ্জিত হতে হয়।[১৯] চতুর্থত, নকল করে ডিগ্রি নেওয়ার পর সারাজীবন যে চাকরি করা হয় তার বৈধতা কোথায়? পঞ্চমত, যারা নকল করে তারা না বুঝেই লেখে।[২০] নকল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ায়। নকলের কারণে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সকলকে সমান যোগ্যতা দান করেননি। যারা নকল ছাড়া পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারে না, বুঝতে হবে আল্লাহ তাআলা তাদের সমাজের অন্য ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ একটি সমাজ পরিচালনার জন্য অনেক পেশার লোকের প্রয়োজন হয়। সকল পেশার জন্য বিএ কিংবা এমএ পাস করার দরকার নেই।

৪. নোংরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি : একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে অনেক সময় রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে মেধার বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে সিট প্রদান, পরীক্ষায় আনুকূল্য, বিদেশে স্কলারশিপ, চাকরি প্রদানে মেধার চেয়ে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট বড় করে দেখা হয়। এমনকি দেশের বিভিন্ন পদক প্রদান ও গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করার ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় খোঁজ করা হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট দলের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করার চেষ্টা করেন। দলীয় স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষতি হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তার বিশ্বাস হচ্ছে, রাজনৈতিক কমিটমেন্টই তাকে উক্ত পদে আসীন করেছে। তাই উক্ত পদে বহাল থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনুকূলে ভূমিকা রাখা জরুরি। রাজনৈতিক দল ও আদর্শের পার্থক্যের কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মেধা বিকাশের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয় কিংবা তাদের মেধা বিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করা হয়। এটা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।

৫. সন্ত্রাস ক্যারিয়ার গঠনে বিরাট অন্তরায় : বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত থাকলেও বর্তমানে ছাত্ররাজনীতিতে অসুস্থ হাওয়া বিরাজমান। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, '৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও এখন ছাত্ররাজনীতি

---

১৮. একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের অধিকার খর্ব করে তাহলে সে মাফ না করলে আল্লাহও মাফ করবেন না।

১৯. বাস্তব ঘটনা : কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখেছিলাম, বাংলায় ৯ লাইনের একটি অফিসিয়াল চিঠিতে ২৭টি বানান ভুল রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে পরীক্ষায় নকল করে পাস করার ফলে শুদ্ধ করে লেখার যোগ্যতা অর্জিত হয়নি।

২০. একটি কৌতুক ঃ নকল করে যারা পরীক্ষা দেয় তারা নিজেরাও জানে না যে, তারা কী লিখছে? এ প্রসঙ্গে অনেক আগে একটি কৌতুক শুনেছিলাম। কৌতুকটি হচ্ছে : ছোট ভাই ও স্ত্রী একই সাথে পরীক্ষা দেওয়ার সময় নকল সাপ্লাই দেওয়ার সময় লিখে দেওয়া হলো 'তুই লিখে তোর ভাবীকে দিস।' উভয়েই হুবহু নকল করতে গিয়ে লিখে দিয়েছে 'তুই লিখে তোর ভাবীকে দিস।' এর ফলে পরীক্ষক বুঝে নিলেন ভাবী ও দেবর একসাথে পরীক্ষা দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

কলুষিত হয়ে পড়েছে। বর্তমান ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায়ই অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করে। 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় মানুষ ঘুরতে যেত। কিন্তু এখন মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে অনেক দূর দিয়ে চলাফেরার চেষ্টা করে। কারণ প্রতিনিয়তই বন্দুকযুদ্ধে ছাত্র মারা যায়। এ কারণে কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়া যেন ফ্যাকাল্টি অব বোম্বিং।" কারণ এখানে প্রায়ই বোমাবাজি হয়। কবি আল মাহমুদ ইতঃপূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনে রণাঙ্গনের চিত্র দেখে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ডাকাতদের গ্রাম?" অন্য আরেকজন কলামিস্ট লিখেছিলেন, "Education of Bangladesh harmonious development of muscle, arms and violence"

এ উক্তির বাস্তবতা হচ্ছে অতি সাম্প্রতিককালের ছাত্র সংঘর্ষসমূহ। দুঃখজনক হলেও সত্য ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের কোথাও জাতীয় রাজনীতির সাথে ছাত্ররাজনীতির কোন সম্পর্ক না থাকলেও বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। পৃথিবীর কোনো দেশেই বাংলাদেশের মতো লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি আছে বলে জানা নেই। পাকিস্তান ছাড়া পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্য কোথাও বাংলাদেশ স্টাইলে ছাত্ররাজনীতি করার নজির নেই।

বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্ররাজনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য

একসময় ভালো ছাত্ররা রাজনীতি করলেও বর্তমানে তারা শুধু রাজনীতিবিমুখই নয়, বরং সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতিকে মন থেকে ঘৃণা করে। কিন্তু তারা ছাত্ররাজনীতির কাছে বন্দী। কতিপয় পেশাদার সন্ত্রাসীর কাছে ছাত্রদের শিক্ষাজীবন যেন ইজারা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হতে পারে না। নকলের দাবিতে শিক্ষক প্রহারের ঘটনাও ঘটে। পড়াশোনা না করলেও মার্ক কিংবা জোর করে ভালো রেজাল্ট আদায় করারও নজির দেখা যায়। ব্যাক বেঞ্চের ছাত্ররাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতা বা হর্তাকর্তা। ভিসির কথায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে না, ছাত্র নেতৃবৃন্দের কথায়ই বিশ্ববিদ্যালয় চলে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগেও ছাত্রদের ভূমিকা থাকে। বই আর খাতার পরিবর্তে মারণাস্ত্রই কিছুসংখ্যক ছাত্রের হাতে দেখা যায়। আর তাদের হাতেই তাদের সহপাঠী খুন হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের অনেকেই ছাত্রজীবনে বাড়ি-গাড়ির মালিক হচ্ছে। তারা টেন্ডার, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত হতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী একটি ছাত্রসংগঠনের নেতা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপন করেছে। রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছেন। সংক্ষেপে বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্ররাজনীতিকে বলা যায় লেজুড়বৃত্তিক ও সন্ত্রাসনির্ভর।[২১] ছাত্রনেতৃত্ব পড়াশোনার চেয়ে ছাত্র সংগঠন নিয়েই বেশি ব্যস্ত। ফলে দেশ পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি হচ্ছে না।

---

২১. কিছু দিন পূর্বে একটি ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলের সময় অনেকের কোমর থেকে রিভলবার পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।

www.nagorikpathagar.com

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বে অনেক জটিল রোগেরও চিকিৎসা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস কি মারণব্যাধি এইডস থেকেও মারাত্মক যে, এর কোনো প্রতিকার নেই? সন্ত্রাসের প্রতিকার সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। এক্ষেত্রে আশার দিক হচ্ছে, ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানগণের কাছ থেকেও ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারা বন্ধের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো একমত না হওয়ার কারণেই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি ও জনমত তৈরির চেষ্টা করা প্রয়োজন।

সন্ত্রাস নির্মূলে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন :

১. সরকারকে মনে করতে হবে অবৈধ অস্ত্রধারীরা কোনো দলের নয়, তারা দেশের শত্রু। তাই সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, উপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে হবে।

২. রাজনৈতিক দলগুলোকে সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কার করা, গ্রেফতার হলে তদবির না করা ও লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি বন্ধে একমত হতে হবে।

৩. প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৮৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতি, টিউটরিয়ালসহ পড়াশোনার চাপ বৃদ্ধি করা দরকার।

৪. শিক্ষকরাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ছাত্রদের কাজ হচ্ছে পড়াশোনা। এ সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া তারা মেধার ভিত্তিতে গঠিত ছাত্রসংসদের মাধ্যমে পেশ করবে।

৬. প্রচার মাধ্যমে উস্কানিমূলক সংবাদ পরিবেশন করে সংঘাত সৃষ্টির পরিবর্তে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করবে।

৭. সর্বস্তরের জনগণ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট গড়ে তুলবে।

ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারার পরিবর্তন চাই

বাংলাদেশের মানুষ ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারাকে ঘৃণা করে। তাই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে ছাত্রদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে তাদের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধন করে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ইউরোপ-আমেরিকায় ছাত্ররা পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। উন্নত বিশ্বের কোথাও রাজনৈতিক কারণে ছাত্রসংঘর্ষ নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লিফলেট-পোস্টার আর মিছিলের পর মিছিল নেই। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দিনও ছাত্ররা লেখাপড়া করে। ক্লাস পরীক্ষা ঠিকমতো হয়। অতএব, বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারা পরিবর্তন সময়ের অনিবার্য দাবি। রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিবর্তে ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মসূচি হওয়া উচিত পড়াশোনার

www.nagorikpathagar.com

উন্নয়ন, সহপাঠীকে পড়াশোনায় সহযোগিতা দান এবং মানবতার সেবা। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে কোনো দলকে ক্ষমতায় বসানো আর কোনো দলকে ক্ষমতা থেকে নামানো ছাত্রদের প্রধান দায়িত্ব নয়। ছাত্রদের পছন্দের রাজনৈতিক দল থাকা সচেতন নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় স্বার্থে সন্ত্রাসে জড়িত হওয়ার চেয়ে দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে সৎ, দক্ষ, যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়া সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

সন্ত্রাস ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ক্যারিয়ার গঠনে মারাত্মক প্রতিবন্ধক

বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রআন্দোলন আশির দশকে শুরু হয়। দাওয়াত ইলাল্লাহ, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদেরকে সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দান, ইসলামী শিক্ষাআন্দোলন এবং মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামী বিপ্লব সাধনের কর্মসূচি সারাদেশে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদে একটি ইসলামী ছাত্রসংগঠনের একক বিজয় তারই প্রমাণ। এছাড়া বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে প্রভাব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে ঃ

১. আদর্শিক কর্মসূচি। অন্যরা মানবরচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে আর ইসলামী ছাত্রআন্দোলন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।
২. চারিত্রিক মাধুর্য। যারা ইসলামী ছাত্রআন্দোলনকে পছন্দ করেন না তাদের বাসায় মেয়ে থাকলে লজিং কিংবা বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্রদের নিজের বাসায় পড়ানো কিংবা বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য পছন্দ করার নজির দেখা যায়। তারা শুধু চারিত্রিক দিক থেকে ভালো নয়, পড়াশোনায়ও ভালো।
৩. বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীরসহ মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে এবং আর্তমানবতার সেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা সাধারণ মানুষ পছন্দ করে। মুসলিম উম্মাহর জন্য অন্যকোনো সংগঠনের এ ধরনের ভূমিকা দেখা যায় না।
৪. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা। কোনো পদের জন্য গ্রুপিং, লবিং মারামারি দেখা যায় না।
৫. ছাত্রদের সহযোগিতা। লজিং, ভর্তি গাইড, টিউশন ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছাত্রদের সহযোগিতার প্রশংসীয় নজির অন্যকোনো সংগঠনের নেই।
৬. চরিত্র গঠনের কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ। এজন্য অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেকে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।
৭. পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসার মধুর সম্পর্ক। নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দানের মানসিকতা, একে অপরকে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসা অনেককে আকৃষ্ট করেছে।

ইসলামী ছাত্রআন্দোলন সন্ত্রাসের শিকার : ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের প্রতি ছাত্রদের ব্যাপক আকর্ষণের ফলেই বিরোধী শক্তি আন্দোলনের অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে নানা কৌশল অবলম্বন করে। সংক্ষেপে তা হচ্ছে :

www.nagorikpathagar.com

১. হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন। বিভিন্ন সময় হামলায় শতাধিক ছাত্র শাহাদাত বরণ করেছে। হাত, পা, চোখ হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করার সংখ্যা অনেক। ছাত্রত্ব হারিয়েছে অনেকেই। তারা বর্তমানে সন্ত্রাসের শিকার। সন্ত্রাস এড়ানোর জন্য ধৈর্য অবলম্বন করার পর উত্তেজনাকর স্লোগান দিয়ে মারামারি লাগানোর চেষ্টা করা হয়, অতর্কিত হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। ফলে পরীক্ষার সময়ও রাত জেগে পড়াশোনার পরিবর্তে হল পাহারা দিয়ে জীবনবাজি রেখে পরীক্ষা দিতে হয়। ইচ্ছা থাকার পরও অনেকের পক্ষে পড়াশোনার টেবিলে বসা সম্ভব হয় না।

২. অপপ্রচার বা মিডিয়া সন্ত্রাস। তাদের উপর হামলা করা হয় অথচ মিডিয়ায় তাদের রগ কাটা হিসেবে প্রচার করা হয়।

৩. মামলা সন্ত্রাস। অনেকেরই বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকে দিয়ে হয়রানি করা হয়। কোনো কোনো ছাত্রের বিরুদ্ধে দশটির উপরও মামলা আছে। মিথ্যা মামলায় কারাবরণ করতে হচ্ছে অনেককে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন শিক্ষক হতে না পারে তার জন্য পরিকল্পিতভাবে নম্বর কম দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরিতে নিয়োগ না দিয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ছাত্ররাজনীতির বিকল্প ধারা তৈরি করতে হবে : ইসলামী ছাত্রআন্দোলন বর্তমানে হত্যা-সন্ত্রাস ও নির্যাতনের শিকার। এই কারণে আদর্শিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেয়ে সন্ত্রাস মোকাবিলাতেই অধিক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বর্তমান ধারায় ছাত্ররাজনীতির বিকল্প ধারা খুঁজে বের করা দরকার। এক্ষেত্রে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনকে ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারার পরিবর্তনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য কয়েকটি পরামর্শ পেশ করছি :

১. ছাত্রদের চরিত্র গঠন, দীনের প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক সহযোগিতার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে এবং এ ধরনের কর্মসূচি বেশি নিতে হবে।

২. ছাত্রসংসদ নির্বাচনসহ সন্ত্রাসের সকল ক্ষেত্র এড়িয়ে চলতে হবে।[২২]

---

২২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংঘাত যেসব কারণে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ১. শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক মূল্যবোধের অভাব। আমাদের দেশের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতা এবং ভ্রাতৃত্ব-ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই একজন ছাত্র আরেকজন ছাত্রকে খুন করতে দ্বিধা করছে না। ২. রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। তারা ক্ষমতারোহণ বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিপক্ষের উপর সশস্ত্র হামলার ইন্ধন যোগায়। ৩. অবৈধভাবে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা : আদর্শ প্রচারের তুলনায় পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দলীয় প্রভাব সৃষ্টি করার মানসিকতা। ৪. হলে অবৈধ সিট দখলের প্রবণতা (১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যসেন হলের ১০৮ নম্বর কক্ষ দখল নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘাত হয়)। ৫. প্রশাসন কর্তৃক সন্ত্রাসীদের বিচার না হওয়ার কারণে উপরন্তু রাজনৈতিক আশ্রয়ে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করছে। ৬. বিদেশী শক্তির ইন্ধন : বিদেশী শক্তি চায় না বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ তৈরি হোক। এ ধরনের সন্ত্রাসের কারণে অর্থশালী, মেধাবী ছাত্রদের অনেকেই বিদেশমুখী হচ্ছে এবং তাদের অনেককে ব্রেইন ওয়াশ করা হচ্ছে। ফলে অনেকেই উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পর দেশে ফিরে সংশ্লিষ্ট দেশের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ৭. শিক্ষকদের নোংরা রাজনীতি, প্রচার মাধ্যমের উস্কানি, রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি ও বিদেশী শক্তির চক্রান্ত শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ।

www.nagorikpathagar.com

৩. ছোটখাটো ইস্যু এড়িয়ে চলতে হবে। অনেক সময় ছোটখাটো ইস্যু নিয়েই বড় বড় সংঘাত সৃষ্টি হয়।[২৩]

৪. জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. ইসলামী আন্দোলনের সামগ্রিক কর্মকৌশল নিয়ে ভাবতে হবে।

৬. বিশ-পঁচিশ বছরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী জনশক্তির মধ্যে প্রচারনা চালাতে হবে।

৭. বৃহত্তর স্বার্থে রাজপথের মিছিলের পরিবর্তে লোক তৈরির কাজেই মনোনিবেশ করতে হবে।[২৪]

৮. ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে অরাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা।[২৫] এ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুসলিম, সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক বানানোই লক্ষ্য থাকবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, একজন কৃষক অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে যে ফলন বোনে তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়, আর কিছু গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি খায়। কিছু অন্য মানুষও চুরি করে নিয়ে যায়। তাই বলে কোনো কৃষক ফসল বোনা বন্ধ করে দেয় না।

৯. অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে উগ্রতা প্রদর্শন করার সুযোগ নেই। আবার চুপ থাকাও যুক্তিযুক্ত নয়। হাদীসে রাসূলের আলোকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে একজন মুমিনের তিনটি পর্যায় উল্লেখ আছে। অন্যায়কে মনে মনে ঘৃণা পোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির কাজটি প্রথম করতে হবে। তারপর শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এবং তা বন্ধের জন্য

---

২৩. ছাত্রদের পারস্পরিক তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। দেয়াল লিখন, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, উত্তেজেনাকর স্লোগান, সমাবেশে হামলা ইত্যাদি কারণে সংঘাত সৃষ্টি হয়। আরেক সংঘাতের কারণ হচ্ছে, এক ছেলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিল, আরেকজন ছাত্র তা দেখে তাকে বসে প্রস্রাব করতে বলে– এ নিয়ে তর্কবিতর্কের জের ধরে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

২৪. রাজপথের মিছিল-সংঘাতের মাধ্যমে লোক তৈরি হয় সে কথা অস্বীকার না করে বলতে হয়, সংঘাত- সংঘর্ষের মাধ্যমে লোক তৈরি মক্কী যুগে ছিল না। আমাদের সামগ্রিক শক্তি বিবেচনা করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমানে লোক তৈরি করে প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে ঢোকানোকেই লোক তৈরির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম বলে আমি মনে করি। এ কথা খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের দায়িত্ব খেলাফত পরিচালনা করার মতো লোক তৈরি করা এবং মানুষের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা। এ ক্ষেত্রে সফল হলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী আমাদেরকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনই আমাদের দায়িত্ব, খেলাফত প্রতিষ্ঠা আমাদের দায়িত্ব নয়। খেলাফত পরিচালনার মতো সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি হলে খেলাফত দান করা আল্লাহর ওয়াদা।

২৫. উপরিউক্ত সামাজিক সংগঠনগুলোর মৌলিক কর্মসূচি হবে : ১. তাযকিয়া ও তারবিয়াত বা চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণ; কুরআন-হাদীস জানা ও মানা, ফরয-ওয়াজিব পালন ও শেরক-বিদআত থেকে দূরে থাকা উসওয়ায়ে হাসানা প্রোগ্রাম, শরীআহ কোর্স; কুরআন তালিম কোর্স। ২. তালীম বা পড়াশোনা : পড়ি-লিখি নিজেকে গড়ি; পাঠ্যপুস্তক স্টাডি গ্রুপ; পরস্পরকে সহযোগিতা, কম্পিউটার কোর্স বা আইটি কোর্স, ল্যাংগুয়েজ ক্লাব (সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় প্রত্যেকে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে আরবি বা ইংরেজি ভাষায় কথোপকথন), রাইটার্স ফোরাম, জার্নালিজম ফোরাম, শিক্ষা সংসদ ইত্যাদি। ৩. উখওয়াহ ও খিদমতে খালক বা ভ্রাতৃত্ব ও মানব সেবা, মিলেমিশে থাকা-সন্ত্রাসমুক্ত জনপদ গড়া, দেশ গড়ি-জনগণের সেবা করি; ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও সহযোগিতা; আর্তমানবতার সম্ভাব্য সেবা, সেবা সপ্তাহ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি। ৪. দাওয়াত, ইসলামের প্রচার ও প্রসার।

www.nagorikpathagar.com

চেষ্টা করতে হবে। ঈমান-আকীদার পরিপন্থী বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনও প্রয়োজন হলেও সংশ্লিষ্ট ইস্যুকে সামনে রেখে দলমত নির্বিশেষে কমন প্ল্যাটফরম করে ভূমিকা রাখা যায়। যেমন দুর্নীতি দমনের জন্য 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি,' ইসলামী আদর্শবিরোধী কিছু হলে 'অনৈসলামিক কার্যকলাপ দমন কমিটি', দেশের জন্য 'দেশ বাঁচাও জাতি বাঁচাও' ইত্যাদি নামে সাময়িক ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কখনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে কিংবা হরতালের রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়া ঠিক হবে না। সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে লেখালেখি, জনমত গঠন ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

১০. মুসলিম তরুণ সমাজকে ভাবতে হবে যে, মুসলিম তরুণ সমাজ একে অপরের শত্রু নয় বরং বন্ধু। মুসলমানদের আসল দুশমন যারা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবি। মুসলমানদের পরস্পরের চিন্তার পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু চিন্তার পার্থক্য যেন পরস্পর সংঘাতের দিকে চলে না যায় সেদিকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। মুসলিম তরুণ সমাজ শিক্ষাঙ্গনে একে অপরকে বন্ধুর মতো সহযোগিতা করা দরকার। রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থে কোন মুসলিম তরুণের অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সংঘাতে জড়ানো উচিত নয়।

ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের জনশক্তির সংখ্যা বাংলাদেশের জন্য মোটেও কম নয়।[২৬] কিন্তু কোনো দেশের সমাজ বিপ্লবের জন্য শুধু অধিক কর্মী নয়, বরং সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি প্রয়োজন। কিছু ছাত্রসংসদে বিজয়ী হলেই সমাজে বিপ্লব সাধন সম্ভব নয়, সমাজ বিপ্লবের জন্য সমাজের চালিকাশক্তিকে নিজেদের হাতে নিতে হবে। এজন্য সমাজের বিভিন্ন পেশায় ঢুকতে হবে। বিভিন্ন পেশার নেতৃত্ব হাতে নিতে হবে। সেহেতু যোগ্যতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্রসংগঠনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বৃহত্তর আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য ছাত্রদেরকে মিছিল সমাবেশ করতে হয়। এটাও বাস্তব যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হলে সিট বণ্টন, ছাত্র ভর্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করলে দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবে কে?

উপরিউক্ত সামাজিক বাস্তবতার সাথে এটাও বাস্তব যে, বর্তমানে দুর্নীতিপরায়ণ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে অপসারিত করার পর আরেকজন মহাদুর্নীতিপরায়ণই আসে। কারণ দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি-অনিয়ম ছেয়ে গেছে। তাই দুর্নীতি বন্ধের জন্য প্রয়োজন সমাজে এমন লোক বেশি সরবরাহ করা, যারা দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত থেকেই দেশের খিদমত করবেন। অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠনমূলক ও আবেগপ্রবণ ভূমিকা এক কথা নয়।[২৭] এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের মক্কী ও মাদানী জীবনের কৌশল ভালোভাবে উপলব্ধি করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে ভূমিকা রাখা উচিত।

---

২৬. ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে অনেক। এজন্য তৃপ্তিবোধ করার কারণ নেই। অমাদেরকে ভাবতে হবে বাংলাদেশে মোট ছাত্রসংখ্যা কত? বাংলাদেশের ছাত্রসংখ্যার আলোকে আমাদের সাথে শতকরা কতজন সম্পৃক্ত।

২৭. অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় জিহাদী স্পিরিটের নামে কারো মধ্যে অতিমাত্রায় আবেগ বা জজবা কাজ করে কি না তা-ও দেখতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে দেশ-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা নেওয়ার গুরুত্ব : আপনি বাংলাদেশে অনার্স/মাস্টার্স কিংবা এইচএসসি / এ লেভেল শেষ করেছেন? এখন উচ্চশিক্ষা নিতে চান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান, তাই না? আপনি ভাবছেন কোথায় ভর্তি হবেন? আপনি কি এইচএসসি পাস করে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্ন দেখছেন? অথবা মাস্টার্স শেষ করে আরও উচ্চশিক্ষার কথা ভাবছেন? নিশ্চয় ছোটবেলা থেকেই আপনার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন আছে। থাকবে না কেন? আপনার মেধা আছে, প্রতিভা আছে। আপনার মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগালে আপনি অর্জন করতে পারেন অনেক ডিগ্রি। ডক্টরেট ডিগ্রি, বার-এট-ল, এমবিএ কিংবা মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর উচ্চশিক্ষা নিয়ে আপনার প্রতিভা কাজে লাগাতে পারেন। এখন প্রয়োজন তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর অধ্যবসায়।

এখন আপনাকে ভাবতে হবে, কোথায় উচ্চশিক্ষা নেবেন। দেশে না বিদেশে? দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও মান বৃদ্ধির জন্য দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারেন। আপনি বিদেশে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবলে অনেক দেশে যেতে পারেন। স্কলারশিপ নিয়ে যেতে পারেন কিংবা নিজ খরচে পড়তে পারেন। আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করে লিখুন। স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা করুন। যদি একাধিক দেশে বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়ে যান তাহলে সিদ্ধান্ত নিন কোথায় ভর্তি হবেন।

দেশে-বিদেশে যেখানেই উচ্চশিক্ষা নিতে চান নিতে পারেন। তবে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার আগে কেন আপনি উচ্চশিক্ষা নিতে চান তা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। কারণ, কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য ঢালাওভাবে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে সুস্পষ্ট টার্গেটভিত্তিক উচ্চশিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য সরকার ও ব্যক্তির উচ্চশিক্ষা টার্গেটের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

আপনি কেন উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন : আপনি কেন উচ্চশিক্ষা নেওয়ার কথা ভাবছেন তা আপনার কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত। কারণ লক্ষ্য সমান না হওয়ার কারণে শ্রম ও সময় ব্যয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কারণে মানুষ পড়াশোনা করে। আপনি কেন করছেন তা নিজে নিজে ভাবুন এবং নিচের কারণগুলোর মধ্যে যেটা আপনার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাতে টিক চিহ্ন দিন।

www.nagorikpathagar.com

পড়াশোনার কারণ	পুরাপুরি সত্য	আংশিক সত্য	মিথ্যা	প্রযোজ্য নয়
আমি শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের জন্যই পড়াশোনা করছি				
আমি শুধু চাকরি লাভ করার জন্যই পড়াশোনা করছি				
যে বিষয় পড়াশোনা করছি তা চাকরির পদোন্নতির জন্য সহায়ক হবে				
পড়াশোনার প্রতি আমার আকর্ষণের কারণেই পড়ছি				
আমি আমার পরিবার/ বন্ধুবান্ধবদের মাঝে প্রমাণ করতে চাই যে আমার যোগ্যতা আছে				
আমি কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই				
আমি একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চাই।				
পড়াশোনার সুযোগ পেলেই পড়তে আগ্রহী। সুযোগ পেয়েছি তাই পড়ছি				
ছোটবেলায় পড়ার সুযোগ পাইনি। এখন সুযোগ হয়েছে				
শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের সাথে জীবন উপভোগ করতে পড়াশোনা করছি				
পড়াশোনা করলে ভালো জায়গায় চাকরি হবে তাই উচ্চশিক্ষা নিতে চাই				
অভিভাবকরা পড়াশোনা করতে পীড়াপীড়ি করছে তাই পড়াশোনা করছি				
অন্য কোনো কারণ থাকলে তা উল্লেখ করুন				

উচ্চশিক্ষা নিয়ে আপনি কী অর্জন করতে চান তা পরিষ্কার না থাকলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেই উচ্চশিক্ষা নেওয়া হয় না। সার্টিফিকেট লাভ ও জ্ঞানলাভ এক কথা নয়। আপনাকে উচ্চশিক্ষা নিতে হবে জ্ঞানলাভের জন্য, নিছক সার্টিফিকেট লাভের জন্য নয়।

আপনি কী অর্জন করতে চান : কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আপনি কী অর্জন করতে চান তা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শুরুতেই আপনার কাছে পরিষ্কার থাকা জরুরি। তাহলেই আপনার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ভালো করা সম্ভব হবে। নিচে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো আপনার গুরুত্বানুসারে নম্বর দিন এবং নিজের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য পর্যালোচনা করুন।

www.nagorikpathagar.com

লক্ষ্য	১	২	৩	৪
আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে চাই				
চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করতে চাই				
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নতুন কিছু শিখতে চাই				
উচ্চশিক্ষার সনদ অর্জন করতে চাই				
আমার পরিচিতদের কাছে মেধার স্বাক্ষর রাখতে চাই				
নতুন কিছু বন্ধু যোগাড় করতে চাই				
বিভিন্ন ধরনের গবেষণাকর্মের সাথে পরিচিত হতে চাই				
শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই				
প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে চাই				
আমার ক্যারিয়ার উন্নত করতে চাই				
বর্তমান চাকরি থেকে আরও ভাল চাকরি পেতে চাই যোগ্যতা অর্জন করতে চাই				

১ কম গুরুত্বপূর্ণ, ৪ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাকটিভ শিক্ষার্থী প্যাসিভ শিক্ষার্থী : উচ্চ শিক্ষা নিতে হলে আপনাকে অ্যাকটিভ শিক্ষার্থী হতে হবে। প্যাসিভ (নিষ্ক্রিয়) শিক্ষার্থীদের চেয়ে অ্যাকটিভ শিক্ষার্থীরাই তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। নিচে অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ শিক্ষার্থীর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। আপনি আপনার নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করুন এবং অ্যাকটিভ শিক্ষার্থী হওয়ার চেষ্টা করুন।

অ্যাকটিভ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য	প্যাসিভ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য
যা শেখা দরকার তা জানার জন্য নিজের পক্ষ থেকেই বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করে	শেখার জন্য অপর কারো দিকনির্দেশনার অপেক্ষা করে
পড়া ও কারো কথা শোনার উপর ভিত্তি করে বিষয়টির উপর আরও গভীর চিন্তা-ভাবনা করে	যা বলা হয় শুধু তা-ই করে এবং যা পড়ে শুধু তা-ই ভাবে
বিভিন্ন তথ্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করে	যা পড়ে বা শোনে তা পৃথক পৃথক বিষয় মনে করে
বুঝেই কোনো কিছু আয়ত্ত করে	কিছু না বুঝে শুধু মুখস্থ করে
পড়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে	পড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো পর্যালোচনা করতে পারে না
দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না এবং পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে না। পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ থাকে।	কিছুক্ষণ পড়াশোনা করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ নেই।

www.nagorikpathagar.com

যা পড়ে তা দীর্ঘদিন মুখস্থ রাখতে পারে	যা পড়ে তা অল্প সময়ের ব্যবধানে ভুলে যায়
যা শেখে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে	যা শেখে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে না
যা প্রয়োজন তা-ই শেখে	অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও শেখে
পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে	যা মুখস্থ থাকে তাই লেখে- কোনটা প্রয়োজন আর কোনটা অপ্রয়োজনীয় তা বাছাই করতে পারে না।
কোনো বই থেকে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারে	বই পড়ে তথ্য পেতে কষ্ট হয়
ক্লাসে লেকচার শুনে পয়েন্টভিত্তিক নোট করতে পারে	যা শোনে সবই লেখে/আদৌ লিখতে পারে না
ক্লাসনোট স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আবার পড়ে সুন্দর করে লিখে রাখে	ক্লাসের নোট দ্বিতীয়বার দেখার চেষ্টা করে না
কোনো কিছুর সারাংশ অল্প শব্দে সুন্দরভাবে করতে পারে	সারমর্ম যথাযথ হয় না
স্টাডি প্ল্যান ও অ্যাকশান প্লান থাকে	স্টাডির জন্য কোনো পরিকল্পনা থাকে না
নিজের পড়াশোনা উন্নত করার জন্য অন্যদের সাথে আলোচনা করে	নিজের উদ্যোগে কারো সাথে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না
ব্যক্তিগতভাবে মোটিভেটেড। তাকে দেখে অন্যরা পড়তে উৎসাহী হয়	পড়াশোনার জন্য অন্যদের উৎসাহ দিতে হয়
জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে	জীবনের সুস্পষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই
কোনো ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করলে অন্যদের সাথে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করে	পড়াশোনায় সফলতা-ব্যর্থতা জীবনে কোনো ছাপ ফেলে না

উচ্চশিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং

উচ্চশিক্ষা নিতে সবাই আগ্রহী। দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য কিছুসংখ্যক মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। উচ্চশিক্ষা নিছক শখের বিষয় নয়। এটা ব্যক্তির যোগ্যতার বিকাশ ও দেশের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। উন্নত বিশ্বের কোথাও শখ করে কেউ উচ্চশিক্ষা নেয় না। কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা কারো কারো জন্য শখের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আর কারো যোগ্যতা থাকার পরও নানা ধরনের সমস্যার কারণে তার পক্ষে উচ্চশিক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তার প্রতিভা বিকশিত হয় না। দেশ ও জাতি তার যোগ্যতার আলোকে তার কাছ থেকে সেবা পায় না। আর যারা শখের বশবর্তী হয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে শুরু করে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আর্থিক দীনতা না থাকলেও পড়াশোনার প্রতি মন না বসার কারণে পরীক্ষায়

www.nagorikpathagar.com

ভালো করতে পারে না। কোনো রকমে গ্রাজুয়েশান করলেও তা পরে কোনো কাজে আসে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা মেধা ও কর্মসংস্থানমুখী নয়। অনেক ধনী পরিবারের সন্তান শুধু মাতা-পিতার আর্থিক সচ্ছলতার কারণেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তারা সত্যিকার অর্থে পড়াশোনার প্রতি সিরিয়াস নয়। আমার মনে হয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা ঠিক না। এর ফলে উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে সত্য কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ে না। অথচ একটি দেশের উন্নয়নের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

এইচএসসি পাস করার পর উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সময়টা আপনার জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অতীত যোগ্যতা, দক্ষতা ও ঝোঁকপ্রবণতার আলোকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য যে ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভা থাকা দরকার তা সত্যিই কি আপনার আছে? যদি থাকে তাহলে কোন বিষয়ের প্রতি আপনার আকর্ষণ বেশি এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র হিসেবে আপনি কোন ক্ষেত্র বাছাই করতে চান? যদি আপনার যোগ্যতা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার উচ্চশিক্ষা নেওয়া দরকার। আর যদি যোগ্যতার ব্যাপারে আপনি সন্দিহান থাকেন তাহলে শখের বশবর্তী হয়ে কিংবা আপনার সহপাঠীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারলে লজ্জার ব্যাপার এই কারণে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে আপনার অতীত রেজাল্ট মূল্যায়ন করে আপনার ঝোঁক অনুযায়ী ভোকেশনাল কোনো ট্রেনিং নিয়ে কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়াই উত্তম।

বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করা যাক। যে ছাত্রছাত্রী প্রাইমারি স্কুল থেকে এইচএসসি পর্যন্ত ক্লাসে বরাবরই প্রথম হয়েছে কিংবা প্রথম বিভাগ পেয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্ক পেয়েছে কিংবা ভালো রেজাল্ট করেছে এ ধরনের ছাত্রছাত্রীর অবশ্যই উচ্চশিক্ষা নেওয়া দরকার। তার মেধার আলোকে তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া ও প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেওয়া রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব। সে যদি গরিব পরিবারের সন্তান হয় তাহলে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে হলেও তার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা দেশের স্বার্থে প্রয়োজন। আর যে ছাত্রছাত্রী প্রাইমারি স্কুল থেকেই কোনো রকম পাস করেছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায়ও কোনোভাবে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে পাস করেছে, এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর হয়তবা একাডেমিক যোগ্যতা কম, অন্য ক্ষেত্রে তার নিশ্চয় যোগ্যতা আছে। মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষেত্রে পদার্পণের ব্যবস্থা করা দরকার। এই ক্ষেত্রে তার পিতামাতা উচ্চশিক্ষার খরচ বহনে অক্ষম কি সক্ষম নয়, তা বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে সকল ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় দুর্বল তারা অন্য ক্ষেত্রে বেশ ভালো। যেমন– কাউকে কাউকে দেখা যায় পড়াশোনায় ভালো নয় তবে তার সাংস্কৃতিক প্রতিভা বেশ ভালো। কাব্যচর্চা ও লেখালেখির হাত আছে। আপনি আপনার উচ্চশিক্ষা শুরুর আগে সিদ্ধান্ত নিন আপনার জন্য উচ্চশিক্ষা কিংবা ভোকেশনাল ট্রেনিং নেওয়ার মধ্যে কোনটা বেশি উপযোগী।

www.nagorikpathagar.com

উচ্চশিক্ষা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে যারা উচ্চশিক্ষা নিতে চান তাদের কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপদ্ধতির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির গুণগত ও মানগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই স্তরে শিক্ষকের ক্লাসলেকচার ভালোভাবে শুনতে হয়। ক্লাসলেকচার ভালোভাবে না শুনলে শুধু বই পড়ে ভালো রেজাল্ট করা যায় না। দ্বিতীয়ত, উচ্চশিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের মতো নয়। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্বাধীন। এ স্তরে পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মোটিভেশন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শুধু পাঠ্যবই নির্ভর নয়। এখানে শিক্ষকের ক্লাসলেকচারের আলোকে প্রচুর রেফারেন্স বই পড়তে হয়। পঞ্চমত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের রুটিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ক্লাসের মতো নয়। এখানে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার সময় থাকে। ষষ্ঠত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় প্রচুর টিউটরিয়ালসহ একাডেমিক প্রবন্ধ লিখতে হয়, যা ইতঃপূর্বে লিখতে হয়নি। সপ্তমত, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতিতেও পার্থক্য আছে। এই স্তরে শুধু বছরের শেষে পরীক্ষা দিতে হয় না, সারা বছরই অ্যাসাইনমেন্ট, টিউটোরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। অষ্টমত, ব্যক্তিগত পড়াশোনার পাশাপাশি এই স্তরে গ্রুপ টিউটরিয়াল করতে হয়। নবমত, রাইটিং ও রিডিং স্কিলস অর্জন করতে হয়।

গ্রাজুয়েশন

সাধারণত এইচএসসি বা এ লেভেল পাস করার পরই অনার্স/ডিগ্রি লেবেলে ভর্তি হতে হয়। অনার্স/ডিগ্রি লেবেলে কোথায় ও কোন সাবজেক্টে পড়াশোনা করবেন, সেটা আপনার জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।[১] অনেক ছাত্রছাত্রী প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করার পর থেকেই ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে পড়বে তা মোটামুটি চিন্তা করে রাখে। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকরা তত্ত্বাবধান করেন। তাই তারা এ লেভেল পাস করার আগে থেকেই ডিগ্রি লেভেলে যে বিষয়ে পড়াশোনা করবেন তার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী এ লেভেল পাস করার পরই কোন বিষয়ে গ্রাজুয়েশন করবেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডি

পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডি হচ্ছে ডিগ্রি লেবেল শেষ করার পরবর্তী উচ্চশিক্ষা। পোস্টগ্রাজুয়েট কয়েক ধরনের হতে পারে ঃ ১. মাস্টার্স সাধারণত যা দুই বছরের কোর্স। ২. পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সাধারণত এক বছরের কোর্স। ৩. এম ফিল পি.এইচ.ডি বিষয়ে এতে অনেক সময় লাগে; এটা রিসার্চ ডিগ্রি। এছাড়া মেডিকেল সায়েন্স, আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডি করা যায়। আপনি আপনার পড়াশোনার ডিসিপ্লিন, যোগ্যতা ও সুযোগের আলোকে পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডির পরিকল্পনা করুন।

---

১. ডিগ্রি স্তরে পড়াশোনার জন্য বিষয় নির্বাচন একটি মৌলিক বিষয়। অনেক সময় সঠিক বিষয় নির্বাচনের অভাবে ভালো রেজাল্ট করা যায় না। বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

ক্যারিয়ার গঠন ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা

ছাত্ররা কেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যায়? বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রীর সাথে কথা বলে জানা যায়, অনেক কারণে তারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যায় :

১. বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা-তদবির করে স্কলারশিপ পাওয়ার কারণে কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান।
২. বিদেশী ডিগ্রি থাকলে দেশে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ জন্য কেউ কেউ বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যান।
৩. বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদেশে ভালো চাকরি করার জন্য কেউ কেউ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যান।
৪. পড়তে গেলে পড়ার চেয়ে আয় বেশি করা সম্ভব। উচ্চশিক্ষার জন্য ভিসা পাওয়া সহজ বলে উপার্জন করার টার্গেট নিয়ে কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি জমায়।
৫. কোনো বিশেষ বিষয়ে পড়ার জন্য বিদেশে যাওয়ার বিকল্প নেই। যেমন বার-এট-ল করতে হলে লন্ডনে যাওয়ার বিকল্প নেই।
৬. অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য ভিন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া হয়।
৭. নিজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেয়ে অনেক ধনী পরিবারের ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়তে যান।
৮. দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেশনজটের কারণে কেউ কেউ বিদেশে পড়তে যান।
৯. কোনো কোনো ছাত্রদের ভ্রমণ করতে ভালো লাগে। তাই ভিন দেশে পড়তে যান।
১০. ইংরেজি শেখার জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যান।
১১. সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য।
১২. অনেক ধনী অভিভাবক মনে করেন, তার বন্ধুর ছেলে বিদেশে পড়ে তাই তাদের ছেলে-মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে না পারলে প্রেস্টিজ রক্ষা করা কঠিন। তাই পিতা-মাতার প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য কেউ কেউ বিদেশে পড়তে আসেন।

আপনি কেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যাবেন : আপনি কোনো বিশেষ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্যই বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যান। নিছক আপনার স্বপ্ন কিংবা অভিভাবকের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে লাভ নেই। বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মুসলিম উম্মাহ ও নিজ দেশের কল্যাণে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই আপনি বিদেশে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার চেষ্ট করুন।

উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক দেশে যেতে পারেন– আপনি কোন দেশে যাবেন : আপনি মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে ইচ্ছা করলে মুসলিম দেশগুলোর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে

www.nagorikpathagar.com

ইউরোপ-আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশেও উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে পারেন।[২] কিন্তু অনেকেই ইউরোপে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেন। কারণ বর্তমানে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যদিও একসময় ইউরোপের জ্ঞানীরা শিক্ষার জন্য কর্ডোভা, বাগদাদ, দামেস্কসহ মুসলিম দেশগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণে মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা পাশ্চাত্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমাচ্ছে। এ কারণে মুসলিম সরকার ও শিক্ষাবিদগণকে মুসলিম দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মেধাবী তরুণদের একটি অংশকে বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে হবে।

এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোন দেশে যাবেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে :

১. **বিষয় :** আপনি যে বিষয়ে পড়তে চান উক্ত বিষয়ে কোন দেশ বা কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় উত্তম তা চিন্তা করতে হবে। কারণ বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব বিষয়ের জন্য সেরা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থনীতি বিষয়ের জন্য লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অক্সফোর্ড প্রতিষ্ঠানটি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো।

২. **খরচ :** কোনো দেশে পড়তে গেলে কী পরিমাণ খরচ হবে তা জানা প্রয়োজন। কারণ আর্থিক সঙ্গতি ছাড়া বিদেশে পড়া যায় না। অবশ্য ইউরোপ-আমেরিকাসহ অনেক দেশেই ছাত্ররা পার্টটাইম কাজ করে টিউশন ফি ও থাকা-খাওয়ার অর্থ যোগাড় করে। কিন্তু সব দেশে এভাবে কাজ করার সুযোগ নেই।

৩. **সহযোগিতা :** আপনার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের কেউ বিদেশে থাকলে আপনি সেদেশে ভর্তির চেষ্টা করতে পারেন। তাহলে হয়ত তাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পাবেন। ভর্তি ও সুযোগ পেলে সুখে-দুঃখে তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন।

৪. **ভিসা পাওয়ার সুযোগ :** ভিসা পাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো দেশে সহজেই ভিসা পাওয়া যায়। আর কোনো দেশে ভিসা পাওয়া কঠিন। তাই কিছু ছাত্র-ছাত্রী যেদেশে সহজেই ভিসা পাওয়া যায় সেদেশেই যাওয়ার চেষ্টা করে।

৫. **ভর্তির অফার :** কলেজে ভর্তির আসন শূন্য থাকা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আসন অনুপাতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। তাই কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আসন খালি আছে– এ কথা জানার সাথে সাথেই আবেদন করার চেষ্টা করুন। তাহলে সহজেই অফার লেটার পেতে পারেন। বিদেশের কোনো কোনো কলেজ সহজেই ভর্তির অফার দেয় আর কোনো কোনো কলেজ ভর্তির অফার লেটার সহজে দিতে চায় না। তাই বিদেশে পড়াশোনার জন্য কলেজের অফার লেটার পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

২. মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া শুধু বৈধ নয়, সময়ের অনিবার্য প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.com

৬. ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা : সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা সমান নয়। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গ্রেডে ছাত্রছাত্রী নেয় আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তারচেয়ে কম গ্রেড হলেও চলে।

এক কথায় আপনার বিষয়, সেদেশের পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও তুলনামূলক শিক্ষার মান যাচাই করে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন দেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করবেন।

একাধিক দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করুন : শুধু বিশেষ কোনো দেশ বা বিশ্ববিদ্যালয় সিলেক্ট করে আবেদন করার পরিবর্তে অনেক দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করুন। কারণ কখনও কখনও দেখা যায়, আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আপনার আবেদন গ্রহণ না- ও করতে পারে কিন্তু সেই দেশের আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। তাই একাধিক দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করুন। কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে ব্যর্থ হলে মন খারাপ করবেন না। আপনি আবেদন করতে থাকুন, সময়ের ব্যবধানে সুযোগ পেয়ে যাবেন। তবে এক্ষেত্রে বাস্তবমুখী হওয়া দরকার। আপনার স্বপ্ন হচ্ছে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আপনার রেজাল্ট ভালো নয়। তাহলে আপনাকে বাস্তবমুখী হয়ে যেখানে আবেদন করলে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করা উচিত।

কীভাবে বিদেশী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খোঁজ-খবর পাবেন

ইন্টারনেট থেকে তথ্য নিন : আপনার বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কারো কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি না? ছোট একটি কম্পিউটার একটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। আপনি ইউকে বা অন্য কোনো দেশে যেতে চাইলে ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট দেশের নাম ক্লিক করুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্য খোঁজ করুন। সহজেই তথ্য পেয়ে যাবেন। কীভাবে দরখাস্ত করতে হবে সে ব্যাপারে ঘরে বসেই আপনি সব তথ্য জানবেন। এ জন্য শুধু প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা।

উদাহরণ :

১. আপনি ইন্টারনেটে নিচের ওয়েবসাইট সার্চ করে ব্রিটেনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য জানতে পারেন :
   www.unoPfJficial-guides.com

   আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য নিচের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন : www.iiswinprod03.petersons.com/ugchannel

   অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য জানতে নিচের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন : www.thegoodguides.com.au

www.nagorikpathagar.com

কোনো ওয়েবসাইট জানা না থাকলেও ইন্টারনেটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের নাম লিখে সার্চ করুন। ঐ দেশের ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লিখে সার্চ করতে পারেন। নিম্নের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যেকোনো তথ্য জানার চেষ্টা করতে পারেন : www.google.com

২. যারা ইতঃপূর্বে বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরেছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেও তথ্য জানার চেষ্টা করতে পারেন।

৩. বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন কেউ বিদেশে থাকলে তাদের কাছে ফোন-ফ্যাক্স/চিঠি-ই-মেইল পাঠিয়েও তথ্য জানতে পারেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, বিদেশে যারা থাকেন তাদের খুবই ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। তাই আপনার চাহিদার আলোকে হয়ত উত্তর না-ও পেতে পারেন। এজন্য হতাশ হবেন না।

৪. সংশ্লিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখলে তারা প্রসপেক্টাস পাঠিয়ে দেবে। উক্ত প্রসপেক্টাস পড়ে আপনি প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন।

৫. বিদেশী অনেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এজেন্ট বিভিন্ন দেশে থাকে। এ ধরনের এজেন্সী থেকেও তথ্য জানা যায়। তবে এক্ষেত্রে অগ্রিম টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতারিত হবেন না।

৬. সংশ্লিষ্ট দেশের হাইকমিশন বা দূতাবাস থেকেও তথ্য জানতে পারেন। আপনি যদি যুক্তরাজ্যে যেতে চান তাহলে ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিস আছে। আপনি তাদের কাছে লিখুন। আপনার ঠিকানায় তারা জবাব পাঠাবে। আপনি তাদের সাথে ফোনে কথা বলুন, তথ্য নিন।

৭. **বিভিন্ন গাইড থেকে তথ্য নিন :** আপনার বাসা ঢাকায় নয়, গ্রামে। তাই আপনি চিন্তিত। আপনার কম্পিউটার নেই, থাকলেও ইন্টারনেট নেই। আপনার ফোন নেই। ঢাকা আসতে অনেক খরচ। কিন্তু আপনি বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঠিকানা জানা নেই। শুধু ঠিকানার অভাবে আপনি লিখতে পারছেন না। আপনার মন খারাপের কারণ নেই। ইউকেসহ বিভিন্ন দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানাসহ বাজারে অনেক গাইড আছে। কারো মাধ্যমে Study Abroad - A guide for Bangladeshi Student's' গাইডটি সংগ্রহ করুন। গাইড থেকে ঠিকানা নিয়ে ইংরেজিতে তাদের কাছে লিখুন। আর জবাবের জন্য অপেক্ষা করুন।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ভিসার আবেদনের জন্য যা প্রয়োজন

আপনি এখন দরখাস্ত করার জন্য প্রস্তুতি নিন। আপনার সার্টিফিকেট, মার্কশিটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিন (যদি ইংরেজিতে না থাকে), কিংবা আরবীতে অনুবাদ করান যদি মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও দরখাস্ত করতে চান। ঢাকার মতিঝিলে দৈনিক বাংলার মোড়ে সরকার অনুমোদিত অনেক অনুবাদ সংস্থা আছে। ইচ্ছা করলে তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন। তারপর অনূদিত কাগজপত্র সত্যায়িত করার

www.nagorikpathagar.com

জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে। আপনি মূল কপি ও দুই কপি ফটোকপি (সত্যায়িতসহ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সরাসরি জমা দিতে পারেন কিংবা অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্যায়নের কাজটি করতে পারেন। অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে সত্যায়ন করালে তাদেরকে ফি দিতে হয়। আর সরাসরি সত্যায়িত করার জন্য ফি দেওয়া লাগে না। সকাল কিংবা দুপুরবেলা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে কাগজপত্র জমা দিয়ে আসতে হবে। কাগজপত্র জমা দিয়ে ফাঁকে অন্য কাজ করতে পারেন, এরপর এসে কাগজপত্র নিয়ে নিন।

এখন বিদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা নিয়ে লিখুন। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হলে নিচের তথ্যগুলো আপনার সংগ্রহে রাখতে হবে :

১. পাসপোর্ট ও বার্থ সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি, ২. ডিগ্রি লেভেলের সার্টিফিকেটসমূহের সত্যায়িত কপি, ৩. ট্রান্সক্রিপ্ট, ৪. Test of English as a Foreign Languarge (TOEFL)-এর স্কোর, ৫. এম.ফিল ও পিএইচডির জন্য রিসার্চ সিনপসিস।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখার পর তারা ভর্তি ফরম পাঠাবে। ভর্তি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে পাঠাতে হবে। ভর্তি ফরম পূরণ করে পাঠানোর পর অফার লেটারের জন্য অপেক্ষা করুন। অফার লেটার পেলে ভিসার জন্য আবেদন করুন। ভিসা পাওয়ার জন্য নিচের তথ্যগুলো থাকা জরুরি :

১. কলেজের অফার লেটার, ২. স্কলারশিপ লেটার বা স্পন্সরের লেটার। স্কলারশিপ লেটার না থাকলে স্পন্সরের লেটারের সাথে ছয় মাসের আয়-ব্যয়ের ডকুমেন্ট, স্পন্সরের এফিডেভিট ও ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৩. কনফার্মেশান অফ একুমেডেশন লেটার এবং ৪. সার্টিফিকেটসমূহ ও ইংরেজি প্রফিসেন্সি সার্টিফিকেটসহ অন্যান্য কাগজপত্র।

ইংরেজি কোর্স : বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে হলে ইংরেজিতে দক্ষতা প্রয়োজন। তাই আপনি ভালোভাবে ইংরেজি শিখুন। IELTS (International English Language Testing Syestem) বা TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Course করে নিন। ঢাকা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কোর্স করতে পারেন। ফার্মগেট CDC (Career Design Centre)-এর সাথে যোগাযোগ করুন। তাদের সহযোগিতা নিন। বাসায় বসে ইংরেজি প্রয়োজনে সিডি বা ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনুন। বিবিসির ইংরেজি সংবাদ শোনার চেষ্টা করুন। প্রতিদিন ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করুন।

সাধারণত IELTS ৬.৫ স্কোর লাগে। কোনো কোনো বিষয়ের জন্য তারচেয়ে বেশিও লাগে। বিশেষত মেডিক্যাল পড়ার জন্য ৭ স্কোরের চেয়েও বেশি চায়। আবার কোনো কলেজ ৫.৫ হলেই নেয়। তবে ৬.৫ হলে ভালো। তাই আপনি এক্ষেত্রে ভালো করার

www.nagorikpathagar.com

চেষ্টা করুন। এবং যেন কাঙ্ক্ষিত মানের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। আপনার ইংরেজির স্টান্ডার্ড সম্পর্কে আপনিই ভালো বলতে পারবেন। তাই নিজেই নিজের সম্পর্কে ধারণা করুন :

	খুবই ভাল	ভাল	কোনো রকম	খুবই খারাপ
একাডেমিক ইংলিশ (Academic English)				
গ্রামার (Grammar)				
লিসনিং (Listening)				
উচ্চারণ (Pronunciation)				
পড়া (Reading)				
বলা (Speaking)				
শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)				
বানান (Spelling)				
লেখা (Writing)				

স্কলারশিপের জন্য আবেদন : বিদেশে নিজ খরচে পড়ার মতো ছাত্র হাতে গোনা কয়েকজন পাওয়া যায়। প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীই স্কলারশিপ কিংবা নিজে উপার্জন করে টিউশন ফি ও আনুষঙ্গিক খরচ বহন করে। কেউ কেউ টিউশন ফি, থাকা ও খাওয়ার খরচ, ট্রাভেল খরচ এবং রিসার্চসহ আনুষঙ্গিক সকল খরচের জন্য স্কলারশিপ পায়। আর কেউ কেউ শুধু টিউশন ফি পায় আর বাকি সকল খরচ নিজকেই বহন করতে হয়। স্কলারশিপ পেলে পড়াশোনা করতে সুবিধা হয়। কারণ স্কলারশিপ না পেলে সব সময় উপার্জনের চিন্তায় অস্থির থাকতে হয়। তাই স্কলারশিপসহ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার চেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় স্কলারশিপ পাওয়া যায়? সাধারণত উল্লিখিত সংস্থাসমূহ থেকে স্কলারশিপ পাওয়া যায় : ১. সরকারি স্কলারশিপ– প্রত্যেক দেশে সরকারিভাবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেয়। আপনি নিজ দেশের বা অন্য দেশের সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা করতে পারেন। ২. কখনও কখনও বড় ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক আনার জন্য স্কলারশিপ দিয়ে থাকেন। তাদের সাথে এই চুক্তি থাকে যে, পড়াশোনা শেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাকরি করবেন। ৩. বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ– বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কলারশিপের অনেক সুযোগ থাকে। এছাড়াও যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারে। ৪. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাও স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। যেমন– ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কমনওয়েলথ ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.com

স্কলারশিপ সম্পর্কে বিদেশী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস পড়লেই অনেক তথ্য জানতে পারবেন। নিচের ওয়েবসাইটে গিয়েও স্কলারশিপের তথ্য জানতে পারেন : www.iefa.com

বিভিন্ন দেশের দূতাবাসেও স্কলারশিপ সম্পর্কে তথ্য জানা যায়। তাই মাঝে মধ্যে দূতাবাসগুলোতে খোঁজ-খবর নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া কমনওয়েলথ স্কলারশিপের জন্য কমওয়েলথ অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো কোনো দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিনদেশী ছাত্রদের জন্যও টিউশন ফি লাগে না—সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ফান্ড দিয়ে থাকে। যেমন জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়া সরকার (IT, Electronics etc) সকল ছাত্রছাত্রীকে সরকারি বৃত্তি দিয়ে থাকে।

স্কলারশিপ যারা পায় না : স্কলারশিপ না পেলে মন খারাপ করবেন না, উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বাদ দেবেন না। কষ্ট করে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। অনেকেই শুধু উপার্জনের জন্য কত কষ্ট করে বিদেশে আসে! আপনি কি উচ্চশিক্ষার জন্য একটু কষ্ট করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। আল্লাহ্ আপনাকে শক্তি দিয়েছেন। আপনার শক্তি কাজে লাগানোর জন্য তীব্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন। ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে অতীতে অনেকেই অনেক বড় বড় ডিগ্রি নিয়েছেন। আপনিও পরিশ্রম করে কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রি নিতে পারেন। এজন্য বিদেশে গিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম কাজ করতে হবে। কারণ স্কলারশিপ যারা পায় না তাদের নিজ খরচেই পড়তে হয়। দেশ থেকে টাকা নিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রীই বিদেশে পড়াশোনা করে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই পার্ট টাইম কাজ করে উচ্চশিক্ষার খরচ যোগায়। ইংল্যান্ডে ছাত্রদের জন্য সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি রয়েছে। কাজের ধরন ও কোম্পানিভেদে বেতনের তারতম্য হয়। সাধারণত ঘণ্টায় ৪ পাউন্ডের কম দেওয়া হয় না।

বিদেশে যেকোনো ধরনের কাজ করাকে কেউ অপছন্দ করে না। যে ছাত্র দেশে নিজের ব্যাগ কখনও নিজে গাড়িতে উঠায়নি তারাও বিদেশে গিয়ে কাজ করে, কঠোর পরিশ্রম করে এবং কেউ কেউ কাজ শুরু করে দেওয়ার পর টাকা-পয়সার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়াশোনা ত্যাগ করে। তারা অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয় সত্য, কিন্তু বড় কোনো ডিগ্রি অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই বিদেশে গিয়ে টাকার পিছু না হয়ে জ্ঞানের পিছু হওয়ার চেষ্টা করবেন।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন : বিদেশে উচ্চশিক্ষা শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আল্লাহ্ যাকে যেদেশে পয়দা করেছেন সেদেশের জনগণের কষ্টার্জিত করের অর্থ খরচ করে শিক্ষালাভ করে দেশে না ফিরে ভিনদেশীদের কল্যাণে কিংবা নিছক অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা উচিত নয়। একমাত্র দাওয়াত ইলাল্লাহর দায়িত্ব ও সাময়িক চাকরি করার উদ্দেশ্যে কিছুদিন অবস্থান করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার পর আর

www.nagorikpathagar.com

দেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করেন না। কারণ তারা বিদেশে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পান দেশে তা পান না। বিদেশে আয়-উপার্জনের সুযোগ বেশি, সামাজিক নিরাপত্তা বেশি অনুভব করেন।

ছেলেসন্তানের উচ্চশিক্ষার সুন্দর সুযোগ কাজে লাগানোর অজুহাতেও অনেকেই দেশে ফিরেন না।[৩] যারা এভাবে থেকে যান তারা সময়ের ব্যবধানে হতাশায় ভোগেন। কারণ দেশে ফিরলে যে ধরনের পজিশনে চাকরি করার সুযোগ পেতেন বিদেশে তা কল্পনাও করতে পারেন না। অপরদিকে তাদেরকে সারাজীবন ভিনদেশীদের চোখে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হয়। উপরন্তু তাদের মেধা পাশ্চাত্যের সেবায় ব্যয় হয়। অথচ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল।[৪]

যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরেন তারা বিদেশে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের জন্য অনেক অবদান রাখতে পারেন। দেশের মানুষ তাদের সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে।

হোম রিটার্ন ও সাপোর্ট সেন্টার ঃ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়ার পর প্রত্যেকেরই দেশে ফেরার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত। উক্ত পরিকল্পনার আলোকে উচ্চশিক্ষাশেষে দেশে ফিরে এলে হতাশায় জীবন কাটাতে হয় না। কিন্তু অনেকেই পরিকল্পনাবিহীনভাবে দেশে ফিরে এসে হতাশায় ভোগেন। কিছুদিন দেশে অবস্থান করে আবার বিদেশে পাড়ি জমান। এভাবে বিদেশে যারা চলে যান তারা আর দেশে ফেরেন না।

আবার কেউ কেউ দেশে ফেরার পর প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা না পেয়ে বিদেশে ফেরত যান। আর যারা দেশে থাকেন তাদেরও একই অবস্থা, বিদেশে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ পান না। তাই উচ্চশিক্ষাশেষে বিদেশ থেকে যারা দেশে ফেরত আসেন তাদের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে 'হোম রিটার্ন' ও 'সাপোর্ট সেন্টার' করা যেতে পারে। উক্ত সেন্টারের কাজ থাকবে বিদেশফেরত ছাত্রছাত্রীদের দেশে স্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া ও সহযোগিতা করা।

---

৪. তাদের সাথে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী সেকেন্ড জেনারেশনের মধ্যে আস্তে আস্তে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সেকেন্ড জেনারেশান দেশের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে থাকে।

৫. Dr. Abdul Bari, Vision for Bangladeshi Students who Come to the West for Higher Education.

www.nagorikpathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময় ব্যবস্থাপনা

ইসলামের বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। দুনিয়ার অপর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শে এমন ভারসাম্য নেই। অন্যান্য জীবনদর্শনের কোথাও দুনিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর কোথাও শুধু আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয়বিধ কল্যাণের সমন্বয় সাধন করেছে। পবিত্র কুরআনে আমাদের দোআ শেখানো হয়েছে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

“হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও।”

পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর ৯-১০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে “হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ।” এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যসব কাজ বাদ দিয়ে সারাক্ষণ মসজিদে বসে থাকার কথা আল্লাহ তাআলা বলেননি। তিনি পরের আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে লিপ্ত থাকতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ প্রদান করেননি; বরং জমিনে বৈধ পন্থায় রুজির সন্ধানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা ও হালাল পন্থায় রুজি করা উভয়ই ফরয। একজন মুসলমানকে উভয় ফরয আদায়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

আল্লাহ ভারসাম্যপূর্ণভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন : ইসলামে প্রদর্শিত সকল কিছুই স্বভাবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকালে খুব সহজেই অনুভূত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটির সাথে আরেকটির সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কী অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। একটি হাত বা পা খুব লম্বা আরেকটি খুব ছোট করেননি। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যা নজরে পড়ে তা মানুষের শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -

"আমি তো মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।"

কোনো মানুষের শরীরের কাঠামোতে ভারসাম্য না থাকলে তাকে অসুস্থ মানুষ বলা হয়। অনুরূপভাবে কোনো একজন মানুষের জীবনে ভারসাম্য না থাকলে অসুস্থ জীবনের অধিকারী হয়। প্রাকৃতিক জগতে ভারসাম্য না থাকলে অর্থাৎ মানুষের জন্য যতটুকু আলো, বাতাস ও পানি প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি বা কম হলে প্রাকৃতিক পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, হ্যারিকেন, ভূমিকম্প হয়ে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এক কথায় মানুষের জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কোথাও ভারসাম্য নষ্ট হলে বিপর্যয় দেখা দেয়।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদেও আল্লাহ্ ভারসাম্য রক্ষা করেছেন : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ তাআলা এমনভাবে দিয়েছেন যে, একটি দেশ তেলসম্পদে সমৃদ্ধ এবং আরেকটি দেশ সোনার খনিতে ভরপুর। কোথাও গ্যাস আর কোথাও অন্য খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। কোনো দেশে প্রচুর চা আর কোথাও পাট, আর কোথাও তুলা, কোথাও গম এভাবে একেক দেশে একেক জিনিসের উৎপাদন বেশি হয়। কোনো দেশই এমন নেই, যেখানে সকল সম্পদই মওজুদ রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের উপর, প্রত্যেকটি দেশ একেকটি আরেকটির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিকৌশল নির্ধারণ না করলে পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় থাকতো না। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বজগতের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ভূ-ভাগে পাহাড় ও বন-বনানীর পাশাপাশি জলরাশিতে ভরপুর নদ-নদী, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর দিয়েছেন। মানবজীবন রক্ষা করার জন্য পানি ও বায়ু দিয়েছেন। শুধু পানি কিংবা বায়ুর উপর নির্ভরশীল হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।

ভারসাম্য মানবজীবনে উন্নতির সোপান : কোনো একজন মানুষকে জীবনে উন্নতি সাধন করতে হলে বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। একজন মানুষকে প্রতিনিয়ত অনেক কাজ করতে হয়। এই অনেক কাজের মধ্য দিয়েই নিজের মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে হয়। যারা অনেক কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় না, তাদের পক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ উপহার দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত যারা ইসলামী সমাজবিপ্লবের স্লোগান দেয় তাদেরকে সৎ, যোগ্য, দক্ষ, সমাজসচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের জীবন গঠন করতে হবে। যারা সুন্দর জীবন গঠন করার ক্ষেত্রে উদাসীন তাদের পক্ষে সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। সুন্দর জীবন এবং সুন্দর সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখাই ইসলামের শিক্ষা।

দান-সদকা করার মধ্যেও ভারসাম্য দরকার : ইসলাম দান-সদকা করতে উৎসাহিত করেছে। তবে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি উদাসীন থেকে সকল কিছু খরচ করতে বলেনি। এই কারণে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত না করার কথা বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

আয়-ব্যয়ে মধ্যমপন্থা ইসলামের শিক্ষা : ইসলামের দৃষ্টিতে আয়-উপার্জন করা ফরয। তেমনি উপার্জিত ধন-সম্পদ অপচয় করা থেকে বিরত থাকাও ফরয। আল্লাহ্ তাআলা কৃপণতা করতে নিষেধ করেছেন আবার অযথা সম্পদ ব্যয়কারীদের ভর্ৎসনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা একজন মুমিনের গুণাবলির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন : "তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা করে না, কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" (সূরা ফুরক্বান : ৬৭)

চিন্তা ও বিশ্বাসে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে : আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের 'উম্মাতে ওয়াসাত' তথা মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

"আর এইভাবেই আমরা তোমাদের একটি মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার। আর রাসূল সাক্ষ্য হবেন তোমাদের উপর।"
(সূরা বাকারা : ১৪৩)

এ আয়াত থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানরা হচ্ছে মধ্যমপন্থী জাতি। তাদের চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্ম সকল ক্ষেত্রে এর ছাপ ফুটে ওঠে। চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলমানরা উগ্র নয় কিংবা ইসলামের স্পিরিটশূন্য নয়। আবার কর্মের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। এক কথায় বন্দেগী, আয়-উপার্জন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আর যিনি এই সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন তিনিই মুমিনে কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মুমিন।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন : ইসলামের দৃষ্টিতে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও শত্রুতার মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য :

عَنْ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَلَا بُغْضُكَ تَلَفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اِذَا اَحْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِيِّ وَاِذَا اَبْغَضْتَ اَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ ـ

"ওমর (রা) বলেছেন, তোমাদের মহব্বত ভালোবাসা যেন 'কলফ' না হয় এবং তোমাদের দুশমনী যেন তলফ না হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কেমন? তিনি বললেন, যেমন কাউকে যখন মহব্বত করবে তখন ছেলেমি আচরণ করলে এবং কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে– তখন তার জান মাল পর্যন্ত ধ্বংস করার চিন্তা করবে।"
(আদাবুল মুফরাদ)

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অপর কোনো মানুষকে চরম ভালোবাসা কিংবা চরম ঘৃণা করা উচিত নয়।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا - عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا - وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا - عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا -

"বন্ধুত্বের খাতিরে অতিউৎসাহী হয়ো না, সে-ও একদিন তোমার শত্রু হতে পারে। শত্রুর প্রতি ঘৃণার উচ্ছ্বাস করো না, সেও একদিন তোমার বন্ধু হতে পারে।"

(সুনানে তিরমিযী)

ইবাদত ও বন্দেগীতে ভারসাম্য : ইবাদত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস বিন মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তিনজন সাহাবী নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের বেগমদের ঘরে উপস্থিত হলেন। আগত সাহাবীদের যখন আল্লাহর রাসূলের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন তারা একে অতি অল্প মনে করলেন। তাঁরা বললেন, আমরা কি তাঁর মতো হতে পারি! আল্লাহর রাসূলের তো পূর্বের ও পরের সকল কিছুই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের একজন বললেন, আমি সারা রাত নামাযের মধ্যে কাটাব। অন্যজন বললো, আমি স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবো, কখনও বিয়ে করবো না। রাসূলুলাহ (স) এসব কথা শুনে তথায় পদার্পণ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এসব কথা বলেছ? আরও বললেন, আমি কি আল্লাহর নাফরমানীকে তোমাদের চেয়ে অধিক ভয় করে চলি না! কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখ, আমি রোযা রাখি, আবার ভাঙ্গি। আমি নামায পড়ি আবার ঘুমাই, বিশ্রাম করি। স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার পরিবর্তে বিয়ে করি। আর এটাই হচ্ছে আমার নীতি আমার আদর্শ। কাজেই যে আমার নীতি-আদর্শ অনুসরণ করবে না, তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। (বুখারী-মুসলিম)

মূলত এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, মানব জীবনের স্বভাবসম্মত সকল চাহিদা ও দাবি পূরণে ভারসাম্য রক্ষাই হচ্ছে দীনদারের বৈশিষ্ট্য।

মধ্যমপন্থা নবুওয়তের চব্বিশ ভাগের একভাগ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজেস (রা) বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

"নেক চালচলন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং মধ্যমপন্থা নবুওয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।" (তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সর্বোত্তম মডেল : হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যেই সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন। শিশুবেলায় দুধপান, বাল্যকালে খেলার মাঠে, যুবক বয়সে হিলফুল ফুযুল গঠন করে মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে, স্বামী হিসেবে স্ত্রীদের হক পালন, পিতা হিসেবে ছেলেমেয়েদের আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধান, নানা হিসেবে নাতীদের আদর-সোহাগ, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন, ক্রেতা-বিক্রেতা, সেনাপতি, বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দীনদারির কথিত লেবাসে দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত হয়ে বৈরাগ্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে জীবন পরিচালনা করতে চান। আবার কেউ কেউ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দীনের কথা বেমালুম ভুলে থাকেন। অথচ ইবাদত-বন্দেগী সকল ক্ষেত্রেই যদি আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করা হয় তাহলে দীনমুক্ত দুনিয়া যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত হয়ে সত্যিকার অর্থে দীনের অনুশীলন সম্ভব নয়। মূলত দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে দীনের অনুসরণ করাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : হে আব্দুল্লাহ, তুমি যে দিনভর রোযা থাক ও রাতভর ইবাদতে অতিবাহিত করে দাও সে খবর আমি পাই না মনে করছ? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ হে রাসূল (স)! আপনি যা শুনেছেন তা সত্য। তখন তিনি বললেন, না, তুমি এরূপ কোর না। তুমি রোযা রাখবে, আবার মাঝে মধ্যে রাখবে না। রাত্রিকালে তুমি ইবাদত করবে কিন্তু ঘুমাবেও অবশ্যই। কেননা তোমার উপর তোমার দেহের সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে, তোমার চক্ষুর হক রয়েছে এবং তোমার জীবনসঙ্গিনীর হকও রয়েছে (আর এসব হক অবশ্যই পালনীয়)। (বুখারী)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে যেমনি আল্লাহর হক আদায় করতে হয় তেমনি আল্লাহপ্রদত্ত বিধান অনুযায়ী নিজের হক ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের হকও আদায় করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট করা নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার পরিপন্থী।

আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করার চেষ্টা করা দরকার। তিনি ফজরের নামাযশেষে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। তাদের

www.nagorikpathagar.com

রাত্রিকালীন খোঁজ-খবর নিতেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন, তালিম দিতেন এবং দায়িত্ব বণ্টন করতেন। অতঃপর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে দেখা করতেন। তারপর সর্বসাধারণের সাথে মিশতেন, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন এবং হাটবাজারে যেতেন। যোহরের নামাযের পর একটু বিশ্রাম (ক্বায়লুলা) করতেন। আসরের নামাযের পর আবার মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং সারাদিনের কাজের খোঁজ-খবর নিতেন। আসর থেকে এশা পর্যন্ত উম্মুল মুমিনীন (রা) ও হযরত ফাতেমাসহ নিকটাত্মীয়দের খোঁজ-খবর নিতেন। এশার নামাযের পর পূর্বনির্ধারিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী যেকোন একজন উম্মুল মুমিনের ঘরে ঘুমাতেন। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।

আল্লাহর রাসূলের জীবন থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, আমাদেরকে সকল কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

সকল কাজে ভারসাম্য প্রয়োজন : ভারসাম্যপূর্ণ জীবন মানে আত্মগঠন, কর্মী গঠন, সাংগঠনিক কাজ, ছাত্রত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে নিজের প্রতিভা বিকাশের নিরলস প্রচেষ্টা। মানব জীবনে যতসব প্রয়োজন রয়েছে সকল প্রয়োজন পূরণে সদা সচেষ্ট থাকা, কোনো একটির দিকে অধিক ঝুঁকে অন্যদিক ক্ষতিগ্রস্ত না করা। একটির প্রতি অধিক ঝুঁকে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত করলে শুধু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকে না– এ কারণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও ক্ষতি সাধিত হয়। তাই ব্যক্তির সকল কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য।

হযরত আবূ হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْغِنٰى - مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ - مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْعِبَادَةِ -

"সুসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম! দুঃসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম! ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম!"

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য।

www.nagorikpathagar.com

একজন মুসলিম যুবককে যেসব কাজ করতে হয়

একজন ছাত্রকে পড়াশোনার বাইরে পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। কোনো মানুষই একা দুনিয়াতে চলতে পারে না। এমনকি শুধু পরিবারের গণ্ডিতে জীবন সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। পড়াশোনা করার জন্য পাঠশালায় যেতে হয়, বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষের সুখ-দুঃখে অংশ নিতে হয়, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়, দেশের কল্যাণে ভূমিকা পালন করতে হয় এবং আল্লাহর খলিফা হিসেবে দাওয়াত ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা আবশ্যক। কোনো একদিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আরেক দিক একেবারে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কোনো একদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি মনোযোগ দিলে আরেকদিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এর ফলে ব্যক্তির জীবনে ভারসাম্য থাকে না। একজন মুসলিম তরুণকে জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। একজন মুসলিমকে মৌলিকভাবে যেসব কাজ করতে হয় তা হচ্ছে :

প্রথমত, আল্লাহর হক আদায় করার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয় : আল্লাহর হক আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব আদেশ-নিষেধ করেছেন তা মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত : ১. আল্লাহর হক, ২. মানুষের হক। উভয় ধরনের হক যথাযথভাবে পালন করা একজন মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। আল্লাহর হকের মধ্যে অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। যেমন :

ক. নামায আদায় করা। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, জুমা, দুই ঈদ ও জানাযার নামায ইত্যাদি আদায় করা। নামায আদায়ের সাথে আরও অনেক আমল জড়িত। যেমন : অযু, মেসওয়াক, জুমার নামাযের জন্য গোসল, আযান দেওয়া, আযানের দোআ পড়া, ইকামাত দেওয়া, মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়, নামাযের পর আল্লাহর কাছে মাসনূন পদ্ধতিতে দোআ করা।

খ. মুসলিম নর-নারীকে রমযানে ফরয রোযা আদায় করতে হয়। রোযার সাথে সম্পৃক্ত আরও অনেক নেক আমল করতে হয়। যেমন– ইফতারী করা, কাউকে ইফতারী করানো, সাহরী, তারাবীহ, বেশি বেশি নফল ইবাদাত ও যিকর-আযকার করা, ইতেকাফ করা, লায়লাতুল কদর, সাদকাতুল ফিতর আদায় করা।

গ. সামর্থ্যবানদের জীবনে একবার হজ্জ পালন করতে হয়। হজ্জ পালনের জন্য আরও অনেক কাজ করতে হয়। যেমন– হজ্জের টাকা জমা দেওয়া, ইহরাম ও তালবিয়া, ইহরামের আগে নামায, তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা, মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো, রামী বা পাথর নিক্ষেপ, মুযদালিফায় রাতযাপন, মাথামুণ্ডানো বা চুল ছোট করা, কুরবানী, জমজমের পানি পান করা, বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে সালাত আদায়, মসজিদে কুবায় নামায আদায় করা।

www.nagorikpathagar.com

ঘ. বিত্তবান মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ। তাই তাদেরকে উপযুক্ত খাতে যাকাত দেওয়ার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়।

উপরিউক্ত হকসমূহ আবশ্যিক। এছাড়া আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য ঐচ্ছিক কিছু ইবাদত করেন। যেমন– বারো রাকাত সুন্নাতে রাতেবাহ, আসরের আগে চার রাকাত নামায, সালাত আল আউয়াবীন, সালাত আদদোহা বা দ্বিপ্রহরের আগের নামায, সালাত আল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায, সালাত আল ইস্তেসকা, সালাত আল খসুফ ওয়াল খসুফ, সালাত আল ইস্তেখারা, সালাত আত তাওবা, সালাত আত তাসবীহ, সালাত আল হায়াত ইত্যাদি। এছাড়া সময় ও সুযোগ পেলে নফল রোযা রাখেন। নফল রোযার মধ্যে শাওয়ালের ছয় রোযা, মহরমের রোযা, আরাফার দিন রোযা, আশুরার রোযা, শা'বানের রোযা, আইয়ামে বীযের রোযা, সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সামর্থ্য থাকলে ওমরাহ ও নফল দান-সদকাত আদায় করার চেষ্টা।

আল্লাহর বান্দার আল্লাহর হক সঠিকভাবে পালন করতে হলে দীনের মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর দীনের মৌলিক ইলম অর্জন করা ফরয। আর কোনো একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরয আল কিফায়াহ। দীনের মৌলিক ইলম অর্জন করার জন্য কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকাইদ, ইসলামী সাহিত্যসহ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানার্জন করতে হয়। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য ফকীহ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈমানিক, কৃষিবিদ এই ধরনের কোনো একটি পেশায় দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, পিতা-মাতার কথা শোনা ও তাঁদের সেবাযত্ন করা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, আল্লাহর হক আদায় করার পরই মাতা-পিতার হক। তাই মাতা-পিতার খেদমতকে অন্যান্য কাজের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমাদের যাদের পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাদেরকে পিতা-মাতার সাথে বিনয়ী হতে হবে। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য মন থেকে যে দোআ করেন, আল্লাহ সে দোআ কবুল করেন। তাই পিতা-মাতার খিদমতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা দরকার। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহমিয়া থেকে বর্ণিত, একবার জাহমিয়া রাসূলে কারীম (স)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার নিয়ত করেছি। এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। একথা শোনার পর রাসূলে কারীম (স) বললেন, তোমার কি মা আছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন নবী করিম (স) বললেন, তার সেবা করা তোমার উপর কর্তব্য। কেননা জান্নাত তার পায়ের নিচে।

www.nagorikpathagar.com

অনুরূপ আরও অনেক হাদীস আছে, এসব হাদীস থেকে জানা যায়, মাতা-পিতার খেদমত করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। মাতা-পিতার খিদমত করার কেউ না থাকলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর তুলনায় মাতা-পিতার খিদমতের গুরুত্ব বেশি। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা অনেক সময় পিতা-মাতা বা শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমতের প্রয়োজন থাকলেও তা উপেক্ষা করে নানা প্রোগ্রামে সময় ব্যয় করি। বৃদ্ধ পিতা-মাতার খাবার ও চিকিৎসার খবর নেওয়ার মতোও ঘরে কেউ থাকে না। এর ফলে তাঁদের অনেক কষ্ট হয়। ফলে তারা মুখে কিছু না বললেও সন্তান-সন্ততির উপর অসন্তুষ্ট হন। হাদীস অনুযায়ী পিতা-মাতা কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন। আর পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হন।

আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আল্লাহ যে কাজের প্রতি যে ধরনের গুরুত্ব দিয়েছেন সে ধরনের গুরুত্বের সাথে উক্ত কাজ করতে হবে। সন্তানের উপর পিতা-মাতার খেদমত করা ফরয। হযরত ওয়াসে বানী (রা) এই ফরয আদায় করার জন্যই আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার পরও তাঁর সাথে দেখা করতে যেতে পারেননি। এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অসন্তুষ্ট নন; বরং সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, শরীরের হক, পরিবারের হক ও দায়িত্বের হক পালন করা : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ـ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ـ

"তোমার শরীরের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, পরিবার পরিজনের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতিও তোমার কর্তব্য রয়েছে।" (আল হাদীস)

এ হাদীস অনুসারে একজন ব্যক্তিকে অনেক কাজ করতে হয় :

ক. শরীরের হক আদায় করার জন্য পরিমিত ঘুম ও খাবার খেতে হয়। শরীরের হক ঠিকমতো আদায় না করলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনো কাজ ঠিকমতো করা সম্ভব হয় না। এই কারণে শরীর সুস্থ রাখার জন্য সচেতন থাকা জরুরি। হ্যাঁ, সচেতনতার পরও অসুস্থতা আসতে পারে।[১] কিন্তু নিজের উদাসীনতার জন্য গ্যাস্ট্রিক, আলসারসহ বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। কেউ কেউ অতি আবেগে শরীরের যত্ন নিতে ভুলে যান। খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম বাদ দিয়ে সারাক্ষণ পড়তে চান, আয় করতে চান, সংগঠনের কাজ করতে চান। ফলে কিছুদিনের ব্যবধানে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে মোটেও পড়তে পারেন না, সংগঠনের কাজ করতে পারেন না, আয়-উপার্জন করতে পারেন না।

---

১. অসুস্থতার মাধ্যমে মানুষের ঈমান পরীক্ষা হয়, গুনাহ মাফ হয়।

www.nagorikpathagar.com

কেউ কেউ আছেন শরীরের হক আদায় করার কথা বললে বিরক্ত হন। তাঁরা মনে করেন দীনের কাজ করার জন্য শরীর ফানা হলেই তো আল্লাহ খুশি হবেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কারো প্রতি যুলুম করলে আল্লাহ খুশি হন না। শরীরের হক আদায় না করা শরীরের প্রতি যুলুম বৈ কিছুই নয়। তাই এই ধরনের যুলুম থেকে বিরত থাকা উচিত।

খ. মনের হক আদায় করা। শরীর ও মনের সমন্বয়েই একজন মানুষ। শরীরের হক আদায় করার পাশাপাশি মনের হকও আদায় করতে হয়। মনের দুই ধরনের হক রয়েছে : প্রথমত, মনের শান্তির জন্য মনকে আল্লাহর যিকির-আযকারে লিপ্ত রাখতে হয়। এতে মন শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়ত, মনের কিছু চাহিদা আছে তা পূরণ করতে হয়। তবে মনের সব চাহিদা বৈধ নয়। যেমন কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় যেসব কামনা মনে জাগ্রত হয় তা পূরণ করা থেকে দূরে থাকতে হয়। কিন্তু মনের বৈধ চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই মন খুশি থাকে। মন খুশি থাকলেই সব কাজ খুশি মনে করা যায়। আর মন অখুশী থাকলে কোনো কাজই ঠিকমত করা সম্ভব হয় না।

একেকজন মানুষের মন একেক কারণে খুশি হয়। মনের খুশি ব্যক্তির মন ও মননের উপর নির্ভরশীল। সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষেরা গান, নাটক উপভোগ করতে ভালোবাসেন। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত সব ধরনের গানের বা নাটকের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বৈধ নয়। তাই কোথাও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে সুযোগ থাকলে যোগ দেওয়া ভালো। এছাড়াও নৈতিক সীমার মধ্যে থেকে আনন্দঘন অনেক অনুষ্ঠান করা যায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে মাঝে মধ্যে কৌতুক করতেন। অবশ্য কৌতুকের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান করার প্রমাণ নেই। তবে কথাবার্তার মধ্যেই কৌতুক করতেন। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস আছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমার গৃহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন। সে সময় আমার কাছে এক বৃদ্ধা বসা ছিলেন। তিনি জানতে চান, তোমার কাছে কে? আমি বললাম আমার এক খালা। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। এ কথা শোনার পর বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না, বরং যুবতী হয়ে যাবে। এ কথা শোনার পর বৃদ্ধার মুখে হাসি দেখা দিল।

আরেকবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে খেজুর খাচ্ছিলেন। খাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল (স) খেজুরের বিচিগুলো হযরত আলীর পাশে রেখে দেন। ফলে তাঁর পাশে কোনো বিচি ছিল না। খাবারশেষে তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখ দেখ আলী কি পেটুক, সে কত খেজুর খেয়েছে!

www.nagorikpathagar.com

এ কথার উত্তরে আলী (রা) বললেন, আমার শ্বশুর কি পেটুক তিনি খেজুরের বিচিসহ খেয়ে ফেলেছেন।

এ থেকে বোঝা যায়, বৈধ সীমারেখার মধ্যে মাঝে মধ্যে মনের আনন্দদায়ক কিছু করা প্রয়োজন।

অধিক পরিশ্রম করতে হলে শারীরিক শক্তির পাশাপাশি মানসিক শক্তি প্রয়োজন। আর এটা মনের আনন্দের উপর নির্ভরশীল। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনকে আনন্দিত রাখার চেষ্টা করা উচিত। তাহলেই জীবনে অনেক কিছু করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

رَوِّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً وَسَاعَةً فَإِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا وَكَلَّتْ عَمِيَتْ ـ

"কাজের ফাঁকে মনকে আনন্দ দেবে, তা না হলে মন যদি পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তবে মন অন্ধ হয়ে যাবে।"[২]

মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মাঝে মধ্যে অবকাশযাপন করা যায়। উন্নত বিশ্বের সরকারপ্রধানসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বছরে একাধিকবার অবকাশ যাপন করতে যান। এর ফলে রাষ্ট্রীয় রুটিন দায়িত্বের ঝামেলামুক্ত হয়ে নিরিবিলি চিন্তা করার সুযোগ পান। অবকাশ যাপন থেকে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি পান। আমাদের দেশে সাংগঠনিক কিংবা প্রশাসনিক ব্যক্তিরা অবকাশ যাপনের সুযোগ খুব বেশি পান না।

গ. পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা। এজন্য বৈধ পন্থায় রোজগার করতে হয়–চাকরি/উপার্জনের সন্ধান করতে হয়। আমাদের দেশে আয়-উপার্জনের জন্য কৃষিকাজ, ব্যবসা ও সরকারি-বেসরকারি চাকরি করা হয়। ব্যক্তি ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য বৈধ পন্থায় উপার্জন করাও ফরয। পরিবারের খরচের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনের দিকটাও আয়-উপার্জন ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হয়।

ঘ. ঘরের মৌলিক আসবাবপত্র ক্রয় এবং রান্না-বান্নাসহ ঘরের মৌলিক কাজে সময় দিতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রান্নার সময় মাঝে মধ্যে তাঁর স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) খলিফা হওয়ার পরও বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! কলসটি আমাকে দিন আমি ঘরে পৌঁছিয়ে দেব।" আমীরুল মুমিনীন জবাব দিলেন, "আমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় কাজ করা তোমার দায়িত্ব নয়, এটা আমার দায়িত্ব।"

---

২. সুনান আদ দাইলামী।

www.nagorikpathagar.com

হযরত ফাতেমা (রা) নিজেই আটা পিষতেন এবং রুটি তৈরি করতেন। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা থেকে এ কথারই প্রমাণ মেলে যে, পরিবারের মৌলিক কাজসমূহ পরিবারের সদস্যদেরকেই আঞ্জাম দিতে হয়। প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে চাকর রাখা বৈধ, কিন্তু পরিবারের কিছু মৌলিক কাজ আছে, যা অন্যদের দিয়ে করানো যায় না।

ঙ. স্বামী-স্ত্রীকে ইসলাম নির্ধারিত পারস্পরিক ফরয হক আদায় করতে সময় দিতে হয়। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সুন্দরভাবে সেজে থাকা, ছেলেমেয়ে ও স্বামীর পরিবার দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু কেউ কেউ সারাদিন নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, স্বামী-স্ত্রী একসাথে কিছু সময় কাটাবার সময় পান না। এর ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দেয়। আর পারিবারিক জীবনে অশান্তি বৃদ্ধি পেলে সমাজ জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের হক আদায় করাও ফরয। তাই পরস্পরের হক আদায় করার জন্য সময় দেওয়া ফরয।

চ. পিতা-মাতার উপর সন্তানকে আদর-যত্ন, নৈতিক পরিবেশে লালন-পালন, সুশিক্ষা দান এবং বিয়ের উপযুক্ত হলে সঠিক পাত্র বা পাত্রীর সাথে বিয়ে দিতে সার্বিক চেষ্টা ও সহযোগিতা করতে হয়। যেসব সন্তান পিতা-মাতার আদর-সোহাগ কম পায় তারা বড় হলে পিতা-মাতার প্রতি কম যত্নশীল থাকে। তাদের স্বভাবের মধ্যে উগ্রতা, অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ আছেন নিজের সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় না দিয়ে অন্যদেরকে আদর্শ মানুষ করার জন্য ব্যস্ত থাকেন। ফলে তাঁর ছেলেমেয়েরা এমনসব কাজে লিপ্ত হয়, যা দেখে অন্যরা আদর্শের পথে অগ্রসর হতে চায় না। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, কেউ সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও সন্তান নষ্ট হতে পারে। আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ)-এর স্ত্রী ও ছেলে তাঁর উপর ঈমান আনেনি। এর জন্য হযরত নূহ দায়ী নন। কারণ তিনি চেষ্টা করার পরও তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। কিন্তু আপন সন্তানকে আদর করা ও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠন করার জন্য সময় দেওয়া পিতা-মাতার আবশ্যিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে উদাসীন থাকলে কিয়ামতের দিন আপন ছেলেমেয়েরাই পিতা-মাতার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে নালিশ করবে। অতএব পিতা-মাতাকে সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে এদিকে সচেতন থাকতে হবে।

ছ. দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অধীনস্থদের দেখাশোনা এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হয়। সাংগঠনিক কিংবা অফিসিয়াল যেকোনো ধরনের দায়িত্ব হোক না কেন তা যথাযথভাবে পালন করাও ফরয। এমনকি অমুসলিম কোনো সংস্থা বা কোম্পানিতে চাকরি করলেও কাজে ফাঁকি দেওয়া বৈধ নয়। যথাসময়ে অফিসে যাওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছাত্রদেরকে রুটিন অনুযায়ী পড়ানো শিক্ষকের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব। তিনি যদি উক্ত দায়িত্ব পালন না করে অন্য কাজে সময় দেন তাহলে এতে ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। ফলে ছাত্রদের হক নষ্ট হয় এবং জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.nagorikpathagar.com

অনুরূপভাবে অফিসের কোনো কর্মকর্তা ঠিকমতো অফিস না করলে অনেক সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অন্ত থাকে না। কারো ব্যক্তিগত অসুস্থতা বা অনিবার্য কারণে মাঝে মধ্যে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু নানা কাজে প্রতিনিয়ত অর্পিত দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করা কিংবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থত, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া : ইসলামের দৃষ্টিতে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা আবশ্যক। ইসলাম আত্মীয়ের হক আদায়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে, বিয়ের খুতবায় যে আয়াত পাঠ করা হয় তার প্রতি একটু চিন্তা করলেই তা ফুটে ওঠে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -

"হে মানুষ, তোমরা ভয় কর আল্লাহ্ তাআলাকে, যার পবিত্র নামে তোমরা একে অপরের অধিকার দাবি করো এবং সম্মান করো তাকে, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে।"

(সূরা নিসা : ১)

এই আয়াতে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে। বিয়ের খুতবায় এই আয়াতটি তিলাওয়াত করার কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পর আমার মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষ বিয়ে করার পর নতুন পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ হয়। পারিবারিক জীবন সূচনা হওয়ার পর আস্তে আস্তে আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলে যেতে থাকে। এই কারণে নতুন সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন তোমাদের কাছের ছিল। আজ তোমরা দু'জন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাছে এসেছো। দু'জন কাছে আসার অর্থ আত্মীয়স্বজনকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়। মনে রাখবে, আত্মীয়স্বজনের হক সম্পর্কে আল্লাহর কাছে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা নিকটাত্মীয় তাদের হক বেশি। এরপর দূরবর্তীদের হক আদায় করতে হয়। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী না হলেও তার সাথে মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কিন্তু দীনের ক্ষতি হয় এমন ধরনের কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। কারণ ইসলামের অনুসারীদের কাছে দীনই বড়। যদিও সাধারণভাবে ইসলাম রক্তের সম্পর্ক রক্ষার জন্য গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দীনের সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হলে রক্তের সম্পর্ক রক্ষার চেয়ে দীনের সম্পর্ক রক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। রক্তের সম্পর্ক রক্ষার জন্য মাঝে মধ্যে তাদেরকে দেখতে যাওয়া, সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত দেওয়া, পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে সমাধান করার চেষ্টাসহ অনেক ধরনের কাজ করতে হয়।

পঞ্চমত, প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হয় : ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন ধরনের : ১. আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, ২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী। প্রতিবেশী হিসেবে সকলের হক আদায় করতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি প্রতিবেশীর সেবা-যত্ন করেছেন। প্রতিবেশীর হক

www.nagorikpathagar.com

আদায় করার ক্ষেত্রে আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশীর হক বেশি। তারপর অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশীর হক। তারপর অমুসলিম প্রতিবেশীর হক। আল্লাহর রাসূল হাদীসে বলেছেন, "সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুমিন নয়, যে পেট ভর্তি করে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।"

আল্লাহর রাসূল এখানে 'মুসলিম প্রতিবেশী' শব্দটি উল্লেখ করেননি। তাই প্রতিবেশী যে-ই হোক না কেন, তার সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে হবে। আল্লাহ্ রাসূলের জীবনে অনেক অমুসলিমের মেহমানদারী ও সেবা-যত্ন করার নজির তারই নির্দেশনা দান করে।

ষষ্ঠত, অন্যান্য মুসলমানের হক আদায় এবং ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন : ইসলাম চায় ওয়াহদানিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতির ভিত্তিতে মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হোক এবং বিশ্বজনীন ঐক্য গড়ে তুলুক। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানরা দুনিয়ার যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন তারা পরস্পর ভাই। ইসলামী ভ্রাতৃত্বে রক্ত, বর্ণ, ভাষা, গোত্র কিংবা শ্রেণীভেদাভেদ নেই। তাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবি পূরণে বিশ্বের সকল অঞ্চলের, সকল বর্ণের, সকল ভাষাভাষীদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হয়। ইসলামের মতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানরা একই দেহের অঙ্গবিশেষ। তাই কোনো মুসলমান সমস্যায় পড়লে তা সমাধানে বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সহযোগিতায় এগিয়ে আসা অপর মুসলমানের দায়িত্ব। কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে এবং তার চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকলে তাকে আর্থিক সহযোগিতা দান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সামর্থ্যবানদের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে কেউ বেদনা ভারাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ এবং সমস্যা উত্তরণে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

সপ্তমত, মানুষের হক আদায় করা : ইসলামের মানবিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা শুধু মুসলমানদের প্রতি নয়, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবতার প্রতি প্রযোজ্য। কারণ ইসলাম কোনো সাম্প্রদায়িক জীবনাদর্শ নয়। ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। ইসলাম স্বীকার করে, দুনিয়ার সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আদম সন্তান হিসেবে সমস্ত মানবতাকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ইসলাম তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'লাকাদ কাররামনা বানি আদাম' অর্থাৎ "আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)

আদম সন্তান হিসেবে ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করে। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস'–অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য।

www.nagorikpathagar.com

এখানে 'উম্মাত' বলতে মুসলিম উম্মাহকে বোঝানো হয়েছে। আর এ মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন। এ আয়াতে আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, তোমরা শুধু মুসলিম জাতিরই কল্যাণ সাধন করো। এ আয়াতে আল্লাহ 'নাস' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যা গোটা বিশ্বমানবতাকে বোঝায়। তাই মুসলমানরা অমুসলিমদের প্রতি আক্রমণাত্মক নয়। তারা সমস্ত মানবতার প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে। তবে দীনের স্বার্থে মুসলমানরা সব কিছুকেই বিবেচনা করে। মুসলমানদের মানবিক ভ্রাতৃত্ব ঈমানী চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে না। মানবিকতা ও ঈমানী চেতনা মুসলমানদের মাঝে একসাথে কাজ করে। তাই দেখা যায়, মুসলমানরা জিহাদের ময়দানে বেঈমান আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ঈমানের দাবি পূরণ করে, আবার শত্রুপক্ষের কেউ আহত হলে তাকে মানবিক সাহায্য করে; নিহত হলে শরীরের অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃত করা থেকে বিরত থাকে। নিহত শত্রুসৈন্যকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিয়ে তার লাশের হেফাজত করে।

ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি উদার ও মানবিক আচরণ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমের প্রতি খারাপ আচরণ করে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব।"

অমুসলিমদের সাথে মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ইসলাম নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

"মুমিনগণ যেন অন্য মুমিন ছেড়ে কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা কর তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ২৮)

অষ্টমত, সমাজসেবক ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন : দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশেষত স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে আল্লাহভীরু, আমানতদার, সৎ, যোগ্য, নিঃস্বার্থ, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নির্বাচিত করলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র নিরাপদ থাকবে। আমাদের সমাজে কিছু ব্যক্তির মধ্যে এমন ধারণা বিদ্যমান যে, "ভোট পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের উপহার।" তাই তারা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ফলে ইসলামবিদ্বেষী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে সমাজে মদ, জুয়া, লটারি ও পতিতাবৃত্তিসহ যাবতীয় মুনকার কাজের প্রসারে সহযোগিতা করে এবং জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে। অথচ তারা যদি সৎ, যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতেন, তাহলে দেশের সার্বিক চেহারা পাল্টে যেতো। এই কারণে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ভোট না দিয়ে বিরত থাকাকে হারাম, নাজায়েয ও পুরো জাতির উপর যুলুম করার সমতুল্য আখ্যায়িত করেছেন। সমাজসচেতন একজন

www.nagorikpathagar.com

ব্যক্তিকে সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ইস্যুতে ভূমিকা রাখতে হয়। এছাড়া রাস্তাঘাট, পুল, সেতু নির্মাণ, অসহায় গরিব ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হয়।

নবমত, দীন কায়েমের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করা : এ কথা সকলের কাছে পরিষ্কার যে, দীন কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয় থাকা ফরয। আমরা জানি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লাম শুধু নামায-রোযার তালিম দেননি। কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে, কাউকে টাকা ধার দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে, ছেলে তার মাকে কীভাবে শ্রদ্ধা করবে, এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের বিরোধ হলে কী করতে হবে, মুসলমান–কাফের বিরোধ হলে কীভাবে ফয়সালা করতে হবে। একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের হক কী, প্রাণীর সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হবে, দণ্ডবিধি কী ধরনের হবে সবই কুরআন-সুন্নাহতে আছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সামনে পূর্ণাঙ্গ দীনই উপস্থাপন করেছেন। এই পূর্ণাঙ্গ দীনের অনুসরণ করার জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।"

(সূরা বাকারা : ২০৮)

ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে দীন পালন করাই ইসলামের দাবি। তাই এই দাবি পূরণে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত, তাবলীগ, আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারসহ অনেক কাজ করতে হয়। ব্যক্তিজীবনে ইসলাম পালনের জন্য অনেক সংগ্রাম সাধনা করতে হয়। নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়, পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এভাবে ব্যক্তিজীবনে দীন পালন ও সমাজ-জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করা হয় তাই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

যে সমাজে ইসলাম বিজয়ী নেই, সেখানে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা ও যারা ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়নি তাদেরকে ইসলামের আদর্শের দিকে আহ্বান জানানো মুসলমানদের উপর সব সময়ের জন্য ফরয। যখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সে সময় রাষ্ট্রযন্ত্র ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজ করে। আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে এটা মুসলমানদের জন্য ফরযে আইন। কিন্তু জিহাদের চূড়ান্তরূপ তথা সশস্ত্র সংগ্রাম তখনই ফরয, যখন ইসলামের প্রচারের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। কোনো মুসলিম জনপদ যদি আক্রান্ত হয় সে জনপদের অধিবাসীদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। তারা যদি প্রতিরোধে অক্ষম হয় তাহলে তার পার্শ্ববর্তী যারা তাদের উপর এভাবে জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.com

ইসলাম দীন কায়েমের চেষ্টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি থেকে নাজাতের পথ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم - تؤمنون
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان
كنتم تعلمون - يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنت تجري من تحتها الانهار
ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم - واخرى تحبونها نصر من الله
وفتح قريب وبشر المؤمنين -

"হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জানো। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের এমনসব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা। আর আরেক জিনিস, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর আল্লাহ্ তা-ও তোমাদের দেবেন—আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দিন।"

(সূরা সফ : ১০-১৩)

এখানে আল্লাহ্ তাআলা আল্লাহর পথে জিহাদকে আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাতের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমরা সবাই আখিরাতে নাজাত চাই, দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাই। দোযখের আগুনের কথা শুনলেই ভয়ে আঁতকে উঠি। তাই সব সময় দোযখের আগুন থেকে পানাহ্ চেয়ে আল্লাহর কাছ দোআ করি, মোনাজাত করি। দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কী করতে হবে সে কথাই আল্লাহ্ তাআলা এখানে বলেছেন। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী আখিরাতে নাজাত পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জিহাদ করে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক উর্ধ্বে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মাসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আল্লাহ্ যালিম লোকদের হেদায়াত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।"

(সূরা তাওবা : ১৯-২০)

www.nagorikpathagar.com

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল হাজীদের পানি পান করানো অনেক সাওয়াবের কাজ হলেও তারচেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ হচ্ছে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

আল্লাহ্ আরও বলেন, "গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান, যাদের কোনো সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ মুসলমান, যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এই উভয় ধরনের লোকদের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ তাআলা গৃহে উপবিষ্টকারী লোকদের চেয়ে জান-মাল দ্বারা জিহাদকারী লোকদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ৯৫)

অন্য আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ মুজাহিদদেরকে ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আল্লাহ সেইসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মযবুত দেয়াল।"
(সূরা সফ : ৩)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, কেবল সেই ঈমানদারদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে লড়াই করে।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলে কারীম (স)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেন, 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেন, দু চোখ দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না—আল্লাহর ভয়ে যে চোখ থেকে পানি ঝরে সে চোখ, আর যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রাত কাটায়।

অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি মারা যায় অথচ জিহাদ করেনি কিংবা জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করেনি সে যেন নেফাকী মৃত্যুবরণ করলো। আর যারা জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয় কিয়ামতের দিন তারা রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবেন।

আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য যারা জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয় আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭০)

আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, "শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করে না। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব কর, কেবল ততটুকু অনুভব করে মাত্র।" (তিরমিযী)।

রাসূলে কারীম (স) আরও বলেন, "মহান আল্লাহর কাছে শহীদগণের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে : ১. রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষে দেখিয়ে দেওয়া হয়। ২. কবরের আযাব হতে নিরাপদ রাখা হয়। ৩. কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে তাকে হেফাজতে রাখা হবে। ৪. তাঁর মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে।

www.nagorikpathagar.com

তাতে খচিত একটি ইয়াকুত—দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সে সব হতে উত্তম। ৫. বড় বড় (ডাগর) চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হবে। ৬. তার নিকটতম সত্তর জন আত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।"

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আল্লাহর রাহে জান মাল দিয়ে জিহাদ করা মুসলমানদের দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন,

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইঞ্জিল, ও কুরআনে আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদাবিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশি ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা তাওবা : ১১১)

জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে লড়াইয়ের পথ থেকে মুমিনরা পিছিয়ে থাকে না। কোনো মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করে না। আল্লাহ বলেন,

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনো তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভালো করেই জানেন। এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না ও যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান।" (সূরা তাওবা : ৪৪-৪৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, দীন কায়েমের চেষ্টা করা ফরয। কিন্তু একা একা দীন কায়েম করা সম্ভব নয়। এই জন্য সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে হয়। সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অপরিহার্য দাবি পূরণে দাওয়াত সম্প্রসারণ, সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনের লক্ষ্যে কর্মী গঠন, সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হয়। এছাড়া প্রশাসন, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীসহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ, বিভিন্ন বৈঠকে যোগদান, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, ট্রেনিং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, পারস্পরিক যোগাযোগ, সাংগঠনিক রেকর্ড সংরক্ষণসহ নানা ধরনের কাজে সময় দিতে হয়।

পড়াশোনা : ছাত্র হিসেবে বইপুস্তক সংগ্রহ, পড়াশোনা, নিয়মিত ক্লাসে যোগদান, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ, লাইব্রেরিতে গমন, বন্ধুদের সাথে গ্রুপ স্টাডিসহ পড়াশোনার জন্য সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। যেমন– ড্রাইভিং শেখা, কম্পিউটার, শর্টহ্যান্ড প্রভৃতি শেখার জন্য সময় ব্যয় করতে হয়।

এভাবে একজন মুসলিম তরুণকে বিভিন্ন কাজে সময় ব্যয় করতে হয়। আর এসব কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় আর সকল কাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

সময় ব্যবস্থাপনা

সময়ের সঠিক ব্যবহারের উপরই জীবনের সফলতা নির্ভরশীল। যিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করেন, দুনিয়াতে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। আর যিনি অবহেলায় সময় নষ্ট করেন তার পক্ষে দুনিয়াতে বিশেষ কোনো অবদান রাখা সম্ভব নয়। অতীতে মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক মুসলমানই সময়সচেতন নন। ফলে তাদের পক্ষে বড় ধরনের অবদান রাখা সম্ভব হয় না। দুনিয়াতে সফল ও ব্যর্থ লোকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সফল ব্যক্তিরা জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, আর ব্যর্থ লোকদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং তারা অবহেলায়, গালগল্পে প্রচুর সময় অপচয় করে।

সময়ের বৈশিষ্ট্য : বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী[৩] সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে নিচে সময়ের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

১. সময় অস্থায়ী (Transient) : সময় হল মেঘের মতো, যা বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ায়। কখনও অল্প সময় আকাশে ভাসে, আবার কখনও বেশি সময় থাকে। কখনও মেঘ থেকে বৃষ্টিমালা হলে মানুষ খুশি হয়, আবার কখনও অতিবৃষ্টি হলে মানুষ অখুশি হয়। অনুরূপভাবে সময় কালের স্রোতধারায় প্রবহমান। সময়ের আবর্তে সুখ-দুঃখের অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। মানুষের জীবনের আনন্দ ও বেদনাও ক্ষণস্থায়ী। যেমন– কারো ছেলেসন্তান হলে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে উক্ত সন্তান বা তার মা মারা গেলে উক্ত আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে সময়ের চাকায় যা কিছু আবর্তিত হয় তার সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। মানুষসহ যতকিছু আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সবকিছুই অস্থায়ী। যদিও অনেক সময় কোনো ছেলে বা মেয়ে ১৫–২০ বছর বয়সে মারা গেলে আমরা বলে থাকি, আহা! অতি অল্প সময়েই ছেলেটি মারা গেল। আর কেউ ১০০–১৫০ বছর জীবিত থাকলে তার নাম পৃথিবীর দীর্ঘায়ুসম্পন্ন মানুষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় দুনিয়ার দীর্ঘায়ুসম্পন্ন মানুষের জীবনের কোনো তুলনা হয় কি না? হযরত নূহ (আ) পৃথিবীতে দীর্ঘদিন যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি সহস্রাধিক বছর জীবিত ছিলেন। তাঁকে তাঁর দীর্ঘায়ু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন, "আমার জীবন হচ্ছে এমন একটা ঘরের মতো, যার দুটো দরজা আছে। আমি তার একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আরেকটি দরজা দিয়ে বের হয়েছি।"[৪]

---

৩. আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী (২০০২), Time in the Life of a Muslim, London: Taha Publishers. P7-10

৪. আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী (২০০২) P7

www.nagorikpathagar.com

মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখন একজন মানুষ কত সময় জীবিত ছিল তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রত্যেককে আল্লাহ্ তাআলা যে সময় দিয়েছেন তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কি না। পার্থিব জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

"এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।" (সূরা আনকাবূত : ৬৪)

আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে আরও বলেন, "তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা। যার ফলে উৎপন্ন সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর তা খড়কুটো হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।" (সূরা হাদীদ : ২০)

দুনিয়াতে কেউ যত দীর্ঘজীবীই হোক না, তা আখিরাতের তুলনায় কোনো সময়ই নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কী সম্পর্ক। এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। যে একে ভয় করে আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।" (সূরা নাযিআত : ৩৭-৪৬)

২. সময় ফিরে আসে না : যে সময় চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। নদীর স্রোত ও বাতাস যেমন প্রবাহিত হলে আর ফিরে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে প্রবাহিত সময় ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যে সময় চলে যায় তা কালের স্রোতে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। উক্ত সময়ে ভালো কাজ করলে মানুষ পরবর্তী সময়ে ভালো প্রতিফল পায় আর খারাপ কাজ করলে খারাপ প্রতিফল পায়। যদি ভালো কিংবা খারাপ কোনো কাজ না করে ঘুমিয়ে কাটায় তাহলে তার প্রতিফলের রেকর্ড শূন্য থাকে। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই টাকা, সম্পদ, মণিমুক্তা হারালে তা ফেরত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সময় আর ফিরে পাওয়া যায় না। তাই 'সময়' সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সর্বদা চেষ্টা করা দরকার।

৩. সময় মহামূল্যবান বস্তু : মানুষের জীবনে সময় মহামূল্যবান বস্তু। যারা সময়ের মূল্য বোঝে না তারা জীবনের মূল্য বোঝে না। আর যারা সময়কে কাজে লাগায় না তাদের পক্ষে জীবনকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। কোনো একজন মানুষের জীবনে উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করতে হলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সময় অর্থের চেয়ে মহামূল্যবান।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লামা কারযাভী যথার্থই বলেছেন : Time is more expensive than money, gold, diamonds or pearls. বাস্তবেই সময়ের মূল্য অপরিসীম। সোনা-রুপার মূল্য নির্দিষ্ট। যার কাছেই সোনা-রুপা আছে সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু সময়ের মূল্য সকলের জন্য সমান নয়। যিনি এক ঘণ্টায় কয়েক লাখ টাকা আয় করেন তাঁর কাছে এক ঘণ্টার মূল্য লক্ষ টাকার চেয়ে বেশি। আর যিনি ঘণ্টায় এক হাজার টাকা আয় করেন তাঁর কাছে ঐ ঘণ্টার মূল্য এক হাজার টাকা। আর যিনি একই সময়ে ঘণ্টায় এক শত টাকা আয় করেন তার কাছে ঐ ঘণ্টার মূল্য এক শত টাকা। আর যিনি কোনো আয়ই করেন না তাঁর কাছে ঐ ঘণ্টার মূল্য শূন্য। আর যিনি ঐ ঘণ্টায় কয়েক হাজার টাকা লোকসান দেন তাঁর কাছে ঐ ঘণ্টা লোকসানের স্মারক। এ থেকে বোঝা যায় সময় মূল্যবান, তবে সকলের সময়ের মূল্য সমান নয়।

কুরআন-হাদীসে সময় সম্পর্কে বর্ণনা : কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে সময় সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। এখানে কুরআন ও হাদীস থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সময়ের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি সূরা আল-আসরে বলেছেন :

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

"সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আসর : ১-৩)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَالضُّحٰى - وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى -

"উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়।" (সূরা দোহা : ১-৩)

তিনি দিন ও রাতের শপথ করে আরো বলেন :

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى -

"রাতের কসম যখন তা ঢেকে যায়। দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়।"

(সূরা লাইল : ১-২)

কুরআনের অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে :

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا -

"সূর্যের ও তার রোদের কসম। চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়। আকাশের ও সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

(সূরা শামস : ১-৫)

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ - هَلْ فِى ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِى حِجْرٍ -

"ফজরের কসম, দশটি রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের, যখন তা বিদায় নিতে থাকে। এর মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কি কোন কসম আছে?"

(সূরা ফজর : ১-৫)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন :

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا -

"যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে।" (সূরা ফুরকান : ৬২)

হাদীসে আছে, মানুষ কিয়ামতের দিন চারটি মৌলিক বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তা হল : ১. তার জীবন কীভাবে ব্যয় করেছে। ২. যৌবন কীভাবে ব্যয় করেছে। ৩. সম্পদ কীভাবে আয় করা হয়েছে এবং কোন্ পথে ব্যয় হয়েছে। ৪. অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা হয়েছে কি না।

কুরআন-হাদীসে সময়ের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে না লাগালে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

সময়ের গুরুত্ব

১. আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে দুনিয়ায় সময় কাজে লাগাতে হবে ঃ মানুষ দুনিয়াতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসে। নির্ধারিত হায়াতশেষে প্রত্যেককে পরপারে চলে যেতে হবে। পরপারের পথে কার কখন ডাক আসবে সে কথা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তাই আল্লাহ্ যাকে যতটুকু হায়াত দান করেন তা ইবাদত-বন্দেগী ও অন্যান্য কাজে সঠিকভাবে লাগানো উচিত। দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী না করে সময় অতিবাহিত করে আখিরাতে তাকে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে, "হে আল্লাহ্! আমাকে দুনিয়াতে আবার ফেরত পাঠাও। আমি তোমার ইবাদত-বন্দেগী যথাযথভাবে করব।" কিন্তু আখিরাত থেকে দুনিয়ায় ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ হবে না। তাই দুনিয়ার প্রতিটি মুহূর্তকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলেই আখিরাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে।

২. দুনিয়াতে উন্নতি করতে হলেও সময় কাজে লাগাতে হবে : আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য সময় দান করেছেন। যে ব্যক্তি বা জাতি অলসতায় সময় অপচয় করে সে ব্যক্তি ও জাতি উন্নতি করতে পারে না। বিশ্বে উন্নতি লাভ করতে হলে সময়সচেতন হতে হবে।

৩. সময় আমানত : সময় আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে আমানত। মানুষের জীবন সীমিত। এই সীমিত সময়ে অনেক কাজ করতে হবে। তাই সময় ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি সেকেন্ড কাজে লাগাতে হবে। চিন্তা করতে হবে প্রতিদিন গড়ে ১ ঘণ্টা সময় অপচয় হলে বছরে ৩৬৫ ঘণ্টা সময় অপচয় হবে। এ সময়ে কুরআনের

www.nagorikpathagar.com

কতটুকু তেলাওয়াত বা কতটি হাদীস মুখস্থ করা অথবা কতটি নতুন শব্দ শেখা কিংবা কতটি প্রবন্ধ লেখা বা দর্শনীয় স্থানে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া বা নতুন ছাত্রের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব হয়?

৪. সময়ের সঠিক ব্যবহার যারা করে না তারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত : আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আসরে সময়ের কসম করেছেন। মাওলানা মওদূদী (র) এই আয়াতসমূহের তাফসীর করতে গিয়ে সময়ের গুরুত্ব এইভাবে তুলে ধরেছেন :

পরীক্ষার হলে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেওয়ার জন্য যে সময় দেওয়া হয়ে থাকে তার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। নিজের ঘড়িতে কিছুক্ষণের জন্য সেকেন্ডের কাঁটাটির চলার গতি লক্ষ্য করলে এই সময়ের দ্রুতগতিতে অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। অথচ একটি সেকেন্ডও সময়ের বিরাট একটি অংশ। একটি সেকেন্ডে আলো এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলেও আল্লাহর রাজ্যে এমন অনেক জিনিসও থাকতে পারে, যা তার চাইতেও দ্রুত গতিসম্পন্ন। তবু ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার চলার যে গতি আমরা দেখি সময়ের চলার গতি যদি তাই ধরে নেওয়া হয় এবং যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ আমরা করি আর যেসব কাজে আমরা ব্যস্ত থাকি সবকিছুই দুনিয়ায় আমাদের কাজ করার জন্য যে সীমিত জীবনকাল দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই দ্রুত অতিবাহিত সময় হচ্ছে আমাদের আসল মূলধন। ইমাম রাযী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সূরা আসরের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গলায় হেঁকে বলছিল দয়া করো– 'এমন এক ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি গলে যাচ্ছে।' তার কথা শুনে আমি বুঝলাম এটিই হচ্ছে আসলে সময়ের কসম। 'মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে'–বাক্যের ব্যাখ্যা। মানুষকে যে আয়ুষ্কাল দেওয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাওয়ার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি।[৫]

সময়ের সদ্ব্যবহার মুসলমানদের দায়িত্ব : মুসলিম উম্মাহ সময়ের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন থাকা উচিত। কারণ আখিরাতে সময়ের হিসাব দেওয়ার ধারণা যাদের নেই তারা শুধু দুনিয়াতে উন্নতি, বাড়ি, গাড়ি ও কাঁড়িকাঁড়ি টাকার মালিক হওয়ার জন্যই সময়ের সদ্ব্যবহার করে। আর মুসলমানরা শুধু অর্থের জন্য নয়; বরং সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আখিরাতে নাজাত পাওয়ার পথ সুগম করতে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও পূববর্তী যুগের ইসলামী চিন্তাবিদগণ তদানীন্তন সময়ের যে কারো চেয়ে সময়ের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক যত্নশীল ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদের কোনো দিনের আমল আগের দিনের চেয়ে

---

৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত, ৭ম সংস্করণ ১৯৯৬), তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী. ১৯শ খণ্ড, সূরা আল-আসরের তাফসীর।

www.nagorikpathagar.com

ভালো না হলে এত বেশি দুঃখিত হতেন যে, অন্যকোনো কারণে এত বেশি দুঃখবোধ করতেন না। আসহাবে রাসূলগণ কোনো দিন বা দিনের একটি অংশ আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদ বা ইলম হাসিল বা নেক কাজে ব্যয় করা ছাড়া অতিবাহিত করতেন না। সলফে সালেহীনগণ যেদিন নতুন কোনো জ্ঞান অর্জন, কোনো দায়িত্ব পালন, জনকল্যাণমূলক কোনো কাজের ভিত্তিস্থাপন, প্রশংসনীয় কোনো কাজের সূচনা, বা যেকোন ধরনের ভালো কাজ করা ছাড়া ব্যয় করতেন সেই দিনের সময় অপচয় হয়েছে বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা তাঁদের দীনি, ইলমী ও আমলী জিন্দেগীর উন্নয়নে প্রত্যেক দিনকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

সময়ের সঠিক ব্যবহার ও সময় ব্যবস্থাপনা

সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ নিয়ন্ত্রিত সময় ব্যয়। অন্য কথায় সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ হচ্ছে :

১. **পরিকল্পিত সময় ব্যয় :** পরিকল্পিত সময় হলে কোনো সময় অপচয় হয় না। আর যারা সময় নষ্ট করে না তারাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে।

২. **সময় ব্যয়ের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ :** পরিকল্পিত সময় ব্যয়ের অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে একেবারে স্বাধীন নন। পরিকল্পনা আপনার সময় ব্যয়ের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইচ্ছা করলে আপনি যেকোনো কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ থাকলেও 'সময় পরিকল্পনা' আপনার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে।

৩. **সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ কাজ ব্যবস্থাপনা :** সময় ব্যবস্থাপনার সাথে কাজের ব্যবস্থাপনা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। যে কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার দরকার নেই ঐ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হলে সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হয়। তাই সময় ব্যবস্থাপনার আগে কাজের ব্যবস্থাপনা জরুরি।

৪. **সময়-হত্যা ও সময় অপচয় থেকে বিরত থাকা :** আমরা সাধারণত মানুষ হত্যা, জীবজন্তু হত্যা তথা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী-হত্যার সাথে পরিচিত। কিন্তু সময়-হত্যার সাথে পরিচিত নই। অথচ প্রতিনিয়ত অন্য জীবজন্তু হত্যার চেয়ে সময়-হত্যা বেশি করে থাকি। অনুরূপভাবে 'অর্থ অপচয়' আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু অর্থ অপচয়ের চেয়ে প্রতিনিয়ত সময় অপচয় বেশি করি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না। সময়কে কোনো কাজে না লাগানোর অর্থ হচ্ছে সময় হত্যা করা। আর যে কাজে লাগানো উচিত নয় উক্ত কাজে সময় ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে সময় অপচয় করা। কোনো মুসলমান স্বেচ্ছায় সময় হত্যা কিংবা সময় অপচয় করতে পারে না। আর এজন্যই সময় ব্যবস্থাপনা দরকার।

৫. **সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা** (The right time for the right task) : ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করা। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে হয়। নির্দিষ্ট মাসে রোযা ও হজ্জ পালন করতে হয়। এ থেকে একজন মুসলিম সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ে করার শিক্ষা পায়।

৬. **সময় নিয়ন্ত্রণ :** সময় নিয়ন্ত্রণ সময় অপচয় রোধের জন্য খুবই জরুরি। যিনি সময় নিয়ন্ত্রণ করে নিজের পরিকল্পনামাফিক ব্যয় করতে পারেন তার পক্ষেই জীবনে সফলতা লাভ করা সম্ভব। আর সময়ের প্রতি উদাসীন থাকলে জীবন ভালোভাবে গড়া সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.com

সময় ব্যবস্থাপনার উপকারিতা : পরিকল্পিত সময় ব্যয় করার অনেক উপকারিতা রয়েছে :

১. অল্প সময়ে সুন্দরভাবে অধিক কাজ করা সম্ভব : যারা পরিকল্পিত সময় ব্যয় করেন তারা অল্প সময়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারেন। কোনো কাজ করার সময় আপনি কত বেশি পরিশ্রম করেছেন তা ধর্তব্য নয়, কত সুন্দরভাবে কাজটি করেছেন তাই বিবেচ্য বিষয়। সুন্দরভাবে কোনো কাজ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সময় ব্যবস্থাপনা।

২. গুরুত্বানুসারে কাজ করতে সাহায্য করে : পরিকল্পনা না থাকলে আপনি আপনার ইচ্ছামতো সবকিছু করবেন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজের তুলনায় অগুরুত্বপূর্ণ কাজ অগ্রাধিকার পেতে পারে। কিন্তু আপনার সময়ের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকলে গুরুত্বানুসারে সবকিছু করার চেষ্টা করবেন। কোনো কাজ করা বাদ দিতে হলে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাদ দেবেন।

৩. অপরিকল্পিত সময় ব্যয় থেকে বিরত রাখে : পরিকল্পিত সময় ব্যয়ের চেষ্টা অপরিকল্পিত কোনো কাজে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে অনেক ধরনের কাজ আসে। সব কাজে আত্মনিয়োগ করা সকলের জন্য উচিত নয়। আপনার সময় ব্যয়ের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে যেকোনো কাজে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করবেন না।

৪. সময়-সুযোগ কাজে লাগাতে সাহায্য করে : পরিকল্পনা অনুযায়ী সময় ব্যয়ে আপনার কাজে যে রকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তার সবটুকু কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

৫. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে : কখন কোন কাজ করা দরকার এ নিয়ে অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন। অনেক সময় দেখা যায় এখন কী করবেন এই চিন্তা করতেই সময় চলে যায়। অথচ আপনার সময় পরিকল্পনা থাকলে কখন কোন কাজ করা দরকার এই নিয়ে সার্বক্ষণিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকতে হয় না।

৬. সময় অপচয় করার অপরাধে অপরাধী মনে হয় না : সময় অপচয় করা সাধারণ অপরাধ নয়, এটা মারাত্মক অন্যায়। সময় ব্যয়ের যাদের পরিকল্পনা নেই তারা অহরহ সময় অপচয় করে। আর পরিকল্পিত সময় ব্যয় করলে সময় অপচয় কম হয়। ফলে সময় অপচয় করার অপরাধে অপরাধী মনে হয় না।

৭. পরীক্ষায় ভালো করতে সাহায্য করে : পরিকল্পিত সময় ব্যয় করলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয়। সময় ব্যবস্থাপনা পড়াশোনায় সফলতার পূর্বশর্ত।

৮. অতিরিক্ত সময় কাজে লাগানো সম্ভব হয় : পরিকল্পিত সময় ব্যয় করলে অতিরিক্ত সময়ের অপচয় হয় না।

৯. ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হয় : নিয়ন্ত্রিত সময় ব্যয় হলে একসাথে অনেক কাজ করা সম্ভব হয়। ফলে সকল কাজ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে।

১০. অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্ভব হয় : পরিকল্পিতভাবে সময় ব্যয় করলে আপনি আপনার অগ্রগতি নিজেই পর্যালোচনা করতে পারবেন। কোনো বিষয়ে পড়াশোনা কতটুকু হয়েছে এবং আরও কতটুকু করা দরকার তা চোখের সামনে স্পষ্ট থাকে।

www.nagorikpathagar.com

১১. সময় ঠিকমতো কাজে লাগালে দ্বিগুণ কাজ করা যায় : এক হাদীসে আছে, নেক আমলের মাধ্যমে হায়াত বাড়ে। এই হাদীসের একটি ব্যাখ্যা এই যে, যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে ব্যক্তি তার হায়াতে যা নেক কাজ করে অনেকের পক্ষে আরও অনেক বেশি হায়াত পেয়েও তত কাজ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ পঞ্চাশ বছরে যত কাজ করতে পারেন, অনেকে একশত বছর হায়াত পেয়েও তার অর্ধেক কাজ করতে পারেন না। এর অর্থ হচ্ছে পরিকল্পিত সময় ব্যয় করলে স্বাভাবিক সময় ব্যয়ের দ্বিগুণ কাজ করা সম্ভব হয়।

অপরিকল্পিত সময় ব্যয়ের অপকারিতা

১. সকল কাজ ঠিকমতো করা সম্ভব হয় না : আপনি যদি সময়সচেতন না হন তাহলে সবকিছু ঠিকমতো করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনার যা করা দরকার সবকিছু করতে হলে প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, সময় কখনও বসে থাকে না। সময় প্রবহমান নদীর মতো ধাবমান। আপনি আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে সময় কাজে লাগিয়েছেন তা আর পড়াশোনার জন্য কাজে লাগাতে পারবেন না। ঘুমিয়ে বা গল্পগুজব করে যে সময় কাটিয়েছেন তা আর পড়াশোনার জন্য পাবেন না। তাই প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে কাজে লাগানো উচিত।

২. প্রচুর সময় অপচয় হয় : অপরিকল্পিত সময় ব্যয় করলে প্রচুর সময় অপচয় হয়। কত সময় অপচয় হয় তার হিসাবও থাকে না। তাই অপরিকল্পিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবেন না, বিশেষত একবার পরিকল্পিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে আবার অপরিকল্পিত জীবনযাপন করবেন না। যেসব কারণে পরিকল্পিত জীবনযাপন করা সম্ভব হয় না তা দূর করার চেষ্টা করা দরকার।

পরিকল্পিত সময় ব্যয় সম্ভব হয় না কেন : অনেক কারণে পরিকল্পিত জীবনযাপন করা সম্ভব হয় না। কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য না থাকা : জীবনের সুস্পষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকলে সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। আপনি রাস্তায় পথ চলা শুরু করার পর কত সময়ের ভেতর কোথায় যেতে চান তা যদি সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালগল্প করা কিংবা এখানে-সেখানে অপরিকল্পিত ঘুরে সময় অপচয় হবেই। আর যদি সুস্পষ্ট টার্গেট থাকে তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উড়োজাহাজ, বাস, ট্রেন, প্রাইভেট কার-এর মধ্যে কোনো ধরনের পরিবহন দরকার তা আগে থেকেই চিন্তা করবেন এবং সে অনুযায়ী গন্তব্যস্থানে পৌঁছার চেষ্টা করবেন।

২. অগ্রাধিকার তালিকা না থাকা : শুধু সময় ব্যয়ের পরিকল্পনা করলেই হয় না। অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা না করলে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। অনেক কাজ বাদ থেকে যায় এবং নতুন অনেক কাজ যোগ হয়, তাই অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা দরকার।

৩. দৈনিক পরিকল্পনা না থাকা : পরিকল্পনা ছাড়া দিন শুরু হলে এমনসব কাজে জড়িয়ে যেতে পারেন, যেসব কাজে নিয়োজিত হওয়ার দরকার ছিল না।

www.nagorikpathagar.com

৪. খুঁতখুঁতে স্বভাবের মন : সকল কাজ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় একটি কাজ নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে আরও দশটি কাজ বাদ পড়ে যায়। তাই কোনো কাজ একেবারে নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে আরও দশটি কাজ বাদ পড়ে যাওয়া ঠিক নয়। কেউ কেউ আছেন কোনো কাজ যত ভালো করেই করা হোক না কেন, সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কাজের মধ্যে একটু এলোমেলো দেখলে মন খুঁতখুঁতে হয়ে যায়। এর ফলে বারবার একই কাজ করতে গিয়ে আরও অনেক কাজ বাদ পড়ে যায়।

৫. ব্যক্তিগতভাবে অগোছালো : অনেক ছাত্র-ছাত্রী ব্যক্তিগতভাবে সাজানো-গুছানো থাকে আর কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী ব্যক্তিগতভাবে খুবই অগোছালো। সাজানো-গোছানো না থাকলে ড্রয়ার থেকে জরুরি কোনো কাগজ খুঁজে বের করতে প্রচুর সময় অপচয় হয়ে যায়।

৬. হঠাৎ প্রতিবন্ধকতা আসা : কখনও কখনও দেখা যায় হঠাৎ সৃষ্ট সমস্যার কারণে সময় ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় না। যেমন হঠাৎ করে কারো ভীষণ অসুস্থতা, মৃত্যু, দুর্ঘটনার সংবাদ পেলে কাজ ছেড়ে ছুটে যেতে হয়। এভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সময় ব্যয় করা সম্ভব হয় না। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন হতে পারে। তাই অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকতার কারণে পড়াশোনার সময় যেন অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার : ক. প্রত্যেকে নিজের সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। খ. নিজের কাজসমূহ শেষ করতে কী পরিমাণ সময় দরকার তা অনুমান করতে হবে। গ. স্টাডিসহ কিছু কাজ সম্পন্ন করতে কাঙ্ক্ষিত সময়ের চেয়ে অধিক সময় লাগতে পারে এই ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখতে হবে। ঘ. অপরিকল্পিত জরুরি কাজ চলে আসতে পারে তার জন্যও কিছু সময় রাখতে হবে। ঙ. আনন্দ লাভ ও অবকাশ যাপনের জন্যও কিছু সময় রাখতে হবে। মাঝে মধ্যে রিলাক্স করা দরকার, তাহলে শরীর ও মন ভালো থাকে। শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়লে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় না। আর জোর করে মনোযোগ সৃষ্টি করা যায় না। কিছুক্ষণ পড়াশোনা বা কোনো কাজ করলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত। হযরত আলী (রা) বলতেন : এক ঘণ্টা কঠোর কাজ করলে আরেক ঘণ্টা আনন্দদায়ক কিছু করা দরকার।[৬] চ. সময়সূচি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

সময় ব্যবস্থাপনায় আপনি কি সিরিয়াস?

সময় ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের আগে আপনি আপনার নিজের বর্তমান অবস্থা যাচাই করুন।

---

৬. এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ কারণে ফজরের জামায়াত এমন সময়ে শুরু করা সুন্নাত যেন একবার ভুল হলে সূর্য ওঠার আগে দ্বিতীয়বার শুধরিয়ে নামায পড়া যায়।

www.nagorikpathagar.com

নিচের প্রশ্নসমূহের জবাবে উপযুক্ত স্থানে টিক দিন :

	হ্যাঁ	না	মাঝেমধ্যে
আপনি কি সাধারণত যথাসময়ে সকল কাজ করেন? কারো সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তা কি সব সময় রক্ষা হয়?			
যে সকল কাজ করা দরকার তা কি আপনি করতে পারেন?			
কোনো কাজ ডেডলাইনের আগ মুহূর্তে এসে শেষ করতে তৎপর হন কি না?			
আপনি কি কখনও আনন্দ লাভের জন্য অবকাশ যাপন করেন?			
কোন কাজ করতে না পারলে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন কি না?			
আপনি গালগল্প করে আড্ডা দিয়ে সময় অপচয় করেন কি না?			
কারো সাথে কথা বলার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সচরাচর ব্যয় করেন কি না?			
আপনি কি লিখিত সময়সূচি অনুসরণ করেন?			
আপনি আপনার একাডেমিক এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত কি না?			
পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা আছে কি না?			
প্রতিদিনের কাজের ডায়েরি রাখেন কি না?			
কোনো কিছু লিখতে গেলে প্রয়োজনীয় বিষয় দ্রুত লিখতে পারেন কি না?			
কোনো কিছু নির্দিষ্ট সময়ে দ্রুত পড়তে ও বুঝতে পারেন কি না?			
কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় সময়ের অপচয় রোধ করতে পারেন কি না?			
কোনো কিছু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকলে তা করতে সময় অপচয় হয় কি না?			
কোনো কাজ করার আগে কী কাজ করতে হবে তা কি ভালভাবে ভেবে কাজ শুরু করেন?			
আপনি কি প্রতিদিন সময় ব্যয়ের পরিকল্পনা করে থাকেন?			
অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী সব কাজ করেন কি না?			
সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয় কি না?			
প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করে থাকেন কি না?			
সময় অপচয় হলে বুঝতে পারেন কি না?			
পরিকল্পনানুসারে কাজ করতে বোরিং লাগে কি না?			

www.nagorikpathagar.com

সময় ব্যয় পর্যালোচনা : আপনার সময় অপচয় হয় কি না এ জন্য আপনার সময় ব্যয়ের পর্যালোচনা করা দরকার। কীভাবে পর্যালোচনা করবেন তার একটি ছক দেওয়া হলো।

বর্তমানে যেভাবে সময় ব্যয় হয়	সময়	ভবিষ্যতে যেভাবে ব্যয় করতে চান	সময়
কুরআন তিলাওয়াত, নামায ও ইসলামী জ্ঞানার্জন		কুরআন তিলাওয়াত, নামায ও ইসলামী জ্ঞানার্জন	
খাওয়া		খাওয়া	
গোসল ও টয়লেট		গোসল ও টয়লেট	
ক্লাস		ক্লাস	
চাকরি /উপার্জন		চাকরি /উপার্জন	
পড়াশোনা		পড়াশোনা	
লেখা		লেখা	
ব্যায়াম		ব্যায়াম	
বিরতি		বিরতি	
ঘুম		ঘুম	
টেলিফোন/ই-মেইল/যোগাযোগ		টেলিফোন/ই-মেইল/যোগাযোগ	
পরিবার		পরিবার	
সমাজ/সংগঠন সময় অপচয়		সমাজ/সংগঠন সময় অপচয়	

কীভাবে সময় ব্যবস্থাপনা করবেন

সকল কাজের তালিকা তৈরি করা : আমাদেরকে প্রতিদিন পড়াশোনার পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক অনেক কাজ করতে হয়। এইসব কাজ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। আপনাকে যে সকল কাজ করতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন এবং তারপর সকল কাজের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখবেন তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। কাজের তালিকা করার সময় এমন সব কাজ বাদ দেওয়া দরকার, যার সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ প্রত্যেক মানুষ দুনিয়াতে সামান্য কিছু দিনের জন্যই এসেছে। এরপর প্রত্যেককে পরপারের পথিক হতে হবে। তাই দুনিয়াতে শুধু সেই সকল কাজ করা দরকার, যা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। অনর্থক কোনো কাজে সময় দান মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

আপনার কাজের তালিকা : আপনাকে প্রতিদিন যেসব কাজ করতে হয় তার তালিকা তৈরির জন্য একটি ছক দেওয়া হলো। এ অনুযায়ী তালিকা করে সময় বরাদ্দ করুন।

www.nagorikpathagar.com

কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন		নামায	
ইসলামী জ্ঞানার্জন		খাওয়া	
ঘর-আসবাবপত্র পরিষ্কার		গোসল ও টয়লেট	
অযু ও মিসওয়াক		ক্লাস	
সমাজ/সংগঠন		চাকরি/উপার্জন	
মাতা-পিতা/পরিবারে সময়		পড়াশোনা	
ঘুমিয়ে		লেখালেখি	
গল্প-উপন্যাস পড়ে		ব্যায়াম	
বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প		বিরতি	
রেডিও/টেলিভিশন/ভিডিও/টেপ রেকর্ডিং		ঘুম	
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সময়		টেলিফোন/ই-মেইল/যোগাযোগ	

কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করুন : একজন মানুষকে যেসব কাজ করতে হয় তা তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (Most important), যে কাজসমূহ করতেই হয়, না করলে ক্ষতি আছে। গুরুত্বপূর্ণ (Important), তবে পরে করলেও চলে। কম গুরুত্বপূর্ণ (Less important), করলে ভালো না করলেও চলে। এভাবে ভাগ করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ অগ্রাধিকার দিতে হবে। মনে করুন চলতি সপ্তাহে আপনার পরীক্ষা ও আরেক বন্ধুর বিয়ের দাওয়াত আছে। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি কোনটাকে প্রাধান্য দেবেন। যদি পরীক্ষাকে প্রাধান্য দেন তাহলে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়াকেই গুরুত্ব দিতে হবে। আর যদি পরীক্ষার প্রস্তুতির চেয়ে বিয়েতে উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাহলে পরীক্ষার প্রস্তুতি গোল্লায় গেলেও বিয়েতে যেতেই হবে। আপনি যদি সকল কাজ ঠিকমতো করতে পারেন তাহলে ভালো কথা। কিন্তু তা সম্ভব না হলে অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন। এ কারণে গুরুত্বানুসারে কাজের তালিকা তৈরি করা উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করার পর সময় থাকলে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন। যেমনভাবে ফরযের সময় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নত নামায পড়া ঠিক নয়; অনুরূপভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ না করা ঠিক নয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এই কারণে ফরয নামাযের আগ মুহূর্তে জানাযা এলে ফরয নামায আদায়শেষে সুন্নাত পড়ার আগেই জানাযার নামায পড়তে হয়। কারণ সুন্নাতের চেয়ে জানাযার গুরুত্ব বেশি। ইসলামের এই শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা উচিত। তাহলে সময় অপচয় হবে না। আপনার সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

www.nagorikpathagar.com

অগ্রাধিকার তালিকা করুন : এ কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে যে, সকল কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অগ্রাধিকার তালিকা থাকা জরুরি। কারণ এমন অনেক কাজ আছে যা না করলেও চলে। কিন্তু কেউ 'কোনো ব্যক্তি না করলেও চলে' এমন কাজ আগে শুরু করেন। ফলে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে গিয়ে অনেক সময় একান্ত জরুরি কাজ করাও সম্ভব হয় না। তাই আপনি আপনার মতো করে আপনার কাজের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করুন। আপনার চিন্তার জন্য উদাহরণস্বরূপ অগ্রাধিকার তালিকার একটি ছক দেওয়া হলো।

যেসব কাজ করা দরকার	খুব গুরুত্বপূর্ণ	গুরুত্বপূর্ণ	করলে ভাল না করলে ক্ষতি নেই	করা দরকার নেই	অগ্রাধিকার অনুযায়ী নাম্বারিং
ফরয নামায ও কুরআন তিলাওয়াত	হ্যাঁ				
খাওয়া					
সমাজ/সংগঠন					
ঘুম					
আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া/নিমন্ত্রণ					
ব্যায়াম					
পরীক্ষার প্রস্তুতি/ অ্যাসাইনমেন্ট লেখা					
পত্রিকার জন্য লেখা অন্যান্য					

সময়সূচি/দৈনিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

কখন কোন বিষয় পড়বেন এবং কখন কোন কাজ করবেন তার কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন। এজন্য আপনি আপনার কাজের তালিকানুযায়ী ২৪ ঘণ্টার সময়সূচি করতে পারেন। কোনো কাজ কখন কত সময়ের মধ্যে করবেন তার পরিকল্পনার নামই টাইম টেবিল। সময় সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সময়সূচি থাকা দরকার। সময়সূচি লিখিতভাবে থাকা ভালো। তবে লিখিত সময়সূচি তৈরি না করেও পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো যায়। দিনশেষে আত্মপর্যালোচনা করা উচিত, আজকে আমি কী অর্জন করেছি এবং কী অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছি। আজকের কাজের জন্য যে সময় ছিল তা কি ঠিকমতো হয়েছে এবং কোথাও বেশি সময় নিয়ে থাকলে তা নেওয়া ঠিক হয়েছে কি না।

www.nagorikpathagar.com

২৪ ঘণ্টার সময়সূচি

সময়	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	জুমাবার
রাত ১২ – ৫							
৫–৬							
৬–৭							
৭–৮							
৮–৯							
৯–১০							
১০–১১							
১১–১২							
দুপুর ১২–১							
১–২							
২–৩							
৩–৪							
৪–৫							
৫–৬							
৬–৭							
৭–৮							
৮–৯							
৯–১০							
১০–১১							
১১–১২							

সময়সূচি করার ক্ষেত্রে পরামর্শ

১. ভারসাম্যপূর্ণ করা : একজন ছাত্রকে পড়াশোনার বাইরে আরও অনেক কাজ করতে হয়; ক. মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য খাওয়া, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি করতে হয়। খ. পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাতা-পিতার খেদমত, ছোট ভাই-বোনদের আদর-যত্ন, বড় ভাই-বোনদের আদেশ মেনে চলা, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, সমাজের পরিচিত-অপরিচিত মানুষের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হয়।

২. অনিয়ন্ত্রিত কাজের জন্য সময় : কিছু কাজ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়। এসব কাজের মধ্যে কিছু কাজ আগ থেকেই জানা থাকে, যেমন পরিবারের জন্য সময় দেওয়া, বিয়ে-শাদিসহ সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করা ইত্যাদি। আর কিছু কাজ আগে থেকে জানা থাকে না, হঠাৎ করে উক্ত কাজে সম্পৃক্ত হতে হয়। যেমন কেউ অসুস্থ হওয়া, ইন্তেকাল করা, দুর্ঘটনা ঘটা

www.nagorikpathagar.com

ইত্যাদি। যেসব কাজ আগ থেকেই নির্দিষ্ট থাকে তা পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা করা দরকার। উক্ত পরিকল্পনার সময়েই মনে রাখতে হবে, হঠাৎ করে এমন কিছু কাজ চলে আসতে পারে যাতে সম্পৃক্ত হতে হবে।

৩. পড়া ও কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা ঃ অনেক সময় একই কাজ সারাদিন করতে ভালো লাগে না। একই সাবজেক্ট সারাদিন পড়তে বোরিং লাগে। তাই পড়ার মধ্যে বৈচিত্র্য আনা দরকার, যেন পড়তে সব সময় আগ্রহ থাকে।

৪. সময়সূচির পরিবর্তন হলে : আপনার সময়সূচির কোনো একটি পরিবর্তন হলে পুরো সময়সূচি পরিবর্তন করা ঠিক নয়। এর ফলে সময়সূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। মনে করুন, যেকোনো একটা প্রোগ্রাম পরিবর্তন হয়েছে, তাহলে অন্য প্রোগ্রাম যথাসম্ভব ঠিক রেখে উক্ত প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে সময়সূচিতে অতিরিক্ত যে ফ্রি টাইম থাকে তা কাজে লাগানো যায়।

৫. রিভিউ/পর্যালোচনা : মাঝে মাঝে সময়সূচি রিভিউ করা দরকার। রিভিউ করার সময় হয়তবা দেখা যাবে, কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে তা বাস্তবায়ন করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, সময়সূচি হচ্ছে জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করার জন্য। অতএব যা গুরুত্বপূর্ণ তা-ই পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

৬. স্টাডি টাইম-টেবিল যথাযথভাবে কাজে লাগানো : স্টাডি টাইম যথাযথভাবে কাজে লাগানো দরকার। এ জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি : এক. পড়াশোনার টেবিলে বসার আগেই শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। দুই. সব ধরনের ডিস্টার্বমুক্ত থাকা জরুরি। অনেক সময় দেখা যায় স্টাডি রুমে অনবরত টেলিফোন ক্রিং ক্রিং রিং করতে থাকে। ফোন ধরতে ধরতে পড়ার সময় চলে যায়। এজন্য বন্ধু-বান্ধব একে অপরকে সিরিয়াস স্টাডি টাইম জানিয়ে দেওয়া দরকার। ফ্রি বা নরমাল স্টাডি টাইমে ফোন করা, কথা বলা কিংবা একজনের রুমে আরেকজন যাওয়া-আসা করা ভালো, সিরিয়াস স্টাডি টাইম ও রেস্ট টাইমে অন্যকে বিরক্ত করা উচিত নয়। এতে করে পড়ার মানসিকতা লোপ পায়। সিরিয়াস স্টাডি টাইমে রেডিও, টিভি বা অন্যকিছুর আওয়াজ যেন কানে আসতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য কেউ কেউ আছেন পড়ার সময় ক্যাসেট শুনলে পড়ার মনোযোগ বাড়ে। এ ধরনের ব্যতিক্রম মানুষ ছাড়া বাকিরা পড়ার সময় ঝনঝন শব্দ বা কোনো কিছুর আওয়াজ শুনলে মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন।

সময়সূচি কেন বাস্তবায়িত হয় না : বিভিন্ন কারণে সময়সূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. অবাস্তব সময়সূচি : মানুষের মৌলিক চাহিদার কথা ভুলে অবাস্তব সময়সূচি তৈরি করলে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। এ ধরনের অবাস্তব সময়সূচি না করে বাস্তবধর্মী সময়সূচি করা প্রয়োজন। কারো পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা সময়ই পড়াশোনা সম্ভব নয়। কারণ শরীরের বিশ্রাম গ্রহণের চাহিদা আছে, পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে। একজন মানুষের পক্ষে যতটুকু পড়াশোনা করা সম্ভব তারচেয়ে অতিরিক্ত পড়ার পরিকল্পনা নেওয়া ঠিক নয়।

www.nagorikpathagar.com

২. অস্পষ্ট সময়সূচি : স্টাডি পরিকল্পনা অস্পষ্ট রাখা উচিত নয়। কখন কোন্ বিষয় কত সময় ধরে পড়বেন তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রেখে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. ডেডলাইনের আগ মুহূর্তের জন্য কাজ রেখে দেওয়া : কোনো কিছুর চূড়ান্ত ডেডলাইনের আগে কোনো ধরনের সময় না রাখা। একেবারে প্রান্তিক সময়ে কোনো কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হলে পরে কোনো সমস্যা দেখা দিলে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয় না। মনে করুন ১০ জানুয়ারী সকাল ১০টায় কোনো রচনা জমাদানের শেষ সময়। আপনি যদি ৯ তারিখ রাতে ড্রাফট করার পরিকল্পনা নেন এমতাবস্থায় আপনার শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক কোনো সমস্যার কারণে ড্রাফট করতে না পারলে আপনার পক্ষে রচনাটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেওয়া সম্ভব হবে না। কখনও দেখা যায় কম্পিউটারে কোনো কিছু কম্পোজ করার পর প্রিন্ট আউট করার সময় সমস্যা দেখা দেয়। কখনও কম্পিউটার ভাইরাসের কারণে কম্পিউটার ওপেন করাই সম্ভব হয় না। আবার কখনও প্রিন্টিং শেষ হওয়ার আগেই টোনারের কালি শেষ হয়ে যায়। তাই প্রান্তিক সময়ের জন্য কোনো কাজ রেখে দেওয়া ঠিক নয়। ডেডলাইনের আগেই সব কিছু শেষ করা দরকার।

৪. প্রতিদিন কাজ না করে একসাথে করার জন্য কাজ জমিয়ে রাখা : প্রতিদিন কিছু কিছু করে কাজ করলে প্রেসার অনুভব হয় না। যদি বিরতিহীনভাবে একসাথে অনেক কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাহলে কাজের অধিক প্রেসার অনুভূত হয়। ইসলাম প্রতিদিনই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছে। এমনটি বলা হয়নি যে, বছরের ৩৬৫ দিন ৫ ওয়াক্ত করে নামায পড়ার পরিবর্তে বছরের শুরুতে বা শেষে একসাথে ১৮২৫ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে। যদি তাই করা হতো তাহলে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করার তুলনায় অধিক কষ্ট অনুভব হতো। এ থেকে শিক্ষা হচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজ একসাথে জমিয়ে না রেখে প্রতিদিন কিছু না কিছু করে ফেলা উত্তম।

সময়সূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন

১. আত্মবিশ্বাস : আপনার এই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে, স্টাডি টেবিল পালন করা আপনার পক্ষে সম্ভব। অন্যরা যখন ঘুমিয়ে কাটায় সেই সময়ও আপনি পড়তে সক্ষম।

২. অ্যাডভান্সড পরিকল্পনা করুন : আপনি যে কাজ করতে চান তা করতে আনুমানিক কত সময় লাগবে তা ঠিক করুন। এরপর সময় ভাগ করুন, আপনার হাতে কত দিন আছে। মনে করুন, কোনো কাজ করতে ২৫ ঘণ্টা সময় লাগবে। আপনার হাতে পাঁচ দিন সময় আছে। তাহলে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করে কাজ করার পরিকল্পনা নিন। এতে দেখা যাবে চার দিনেই আপনার কাজটি শেষ হয়ে যাবে। যদি কোনোদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে না পারেন তাহলে আপনার হাতে একদিন সময় থাকবে। আপনি সেদিন অবশিষ্ট কাজ সেরে নিতে পারবেন। আর যদি আপনি প্রথম তিন দিন কোনো কাজ না করে শেষ দুই দিন ১২ ঘণ্টা করে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে আপনার ওপর কাজের চাপ পড়বে। কোনো কারণে একদিন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করতে না পারলে বা নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হলে পরের দিন অধিক চাপ অনুভব করবেন। আর অধিক চাপ অনুভব করার কারণে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হতে পারে। তাই সময় বণ্টনের সময় এদিকে খেয়াল রাখা দরকার।

www.nagorikpathagar.com

৩. সময়সূচি নিজের সুবিধা অনুসারে তৈরি করা : সময়সূচি নিজের সুবিধা অনুযায়ী তৈরি করুন। কারণ আপনার সুবিধা-অসুবিধা আপনিই ভালো জানেন। কোন সময়ে বিশ্রাম নিতে হয় আর কোন সময় কোন কাজ করতে হয় তা আপনারই জানা আছে। একজনের জন্য আরেকজনে সময়সূচি তৈরি করলে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন।

৪. সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা : ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে দৈনিক পাঁচবার ফরয নামায আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্তের নামায একসাথে কিংবা প্রতি মাসের ১৫০ ওয়াক্ত নামায মাসের কোনো একদিন একসাথে আদায় করলে হবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা এই পাঁচ সময়ে পড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

"নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপ ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা নিসা : ১০৩)

এই আয়াত থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা সঠিক সময় সঠিক কাজ করে। যে কাজ যখন করা দরকার তা অন্য সময় করার জন্য ফেলে রাখে না।

৫. অন্যান্য কাজের সাথে খাপ খাইয়ে সময়সূচি করা : অনেক ছাত্রছাত্রীকে পরিবারের সাথে থাকতে হয়। তাদের পরিবারের কাজ-কর্মের সাথে খাপ খাইয়ে পড়াশোনার পরিকল্পনা করতে হবে।

৬. কাল নয় আজই শুরু করুন : অনেক ছাত্রকে দেখা যায় পড়াশোনা করার জন্য সিরিয়াস হয়ে চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করে। অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে মনে মনে ভাবে, আজ নয় কাল থেকে পড়াশোনা শুরু করবো। কাল থেকে যেহেতু সারাক্ষণ পড়াশোনা করার পরিকল্পনা, তাই আজ একটু বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করে আসি কিংবা কোথাও বেড়াতে যাই। দেখা যায় সেদিন বেড়াতে গিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে বা বন্ধু-বান্ধবের সাথে অধিক রাত পর্যন্ত গল্প করে ঘরে ফেরেন। পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায পড়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পড়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। অধিক রাত জাগার কারণে একটু বিশ্রাম নিতে হলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠতেই নাস্তার সময় হয়ে যায়। নাস্তা শেষ না হতেই খবরের কাগজ চলে আসে। খবরের কাগজে চোখ বুলাতেই ফোনে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হতে থাকে। ফোন শেষ করতে না করতেই দেখা যায় ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে উপস্থিত। চিঠি খুলে পড়তে পড়তে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নিতে হয়। বিশ্রাম নেওয়ার পর মনে করা হয় চিঠির জবাব লেখা দরকার। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যায় পারিবারিক জরুরি কাজ চলে এলো। এভাবে সেদিন পড়া আর শুরু করা সম্ভব হলো না। এ কারণে কখনও এটা ভাবা ঠিক নয়, আজ নয় কাল শুরু করবো। আপনার আজ যতটুকু সময় আছে ততটুকু সময় পড়াশোনায় ব্যয় করুন। হয়তবা কালকে আজকের মতো সময় নাও পেতে পারেন।

www.nagorikpathagar.com

৭. সহজ কাজ দিয়ে শুরু করা : কিছু কাজ সহজেই করা যায় আর কিছু কাজ করা কঠিন । কঠিন কাজ প্রথম শুরু করলে অনেক সময় সহজ কাজ করার সময় মেলে না। তাই সহজ কাজগুলো আগে স্বল্প সময়ে সেরে নিন, তারপর কঠিন কাজ শুরু করুন।

সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও কতিপয় বিষয়

১. যেকোনো কাজের মধ্যে সময় বাঁচানোর চেষ্টা : জীবনে অনেক বেশি কাজ করতে হলে কাজের মধ্যে সময় বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। মনে করুন যে কাজ করতে ৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় হওয়ার কথা তা ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে দৈনিক ৩০ মিনিট সময় বাঁচানো সম্ভব হলে বছরে পূর্ণ ২২ দিন সময় অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। এই অতিরিক্ত সময়ে অনেক কিছু করা যায় : কুরআন শরীফের অনেক আয়াত মুখস্থ করা যায়, কম্পিউটারের একটি কোর্স করা যায়, বিদেশী ভাষা শেখা যায়, ড্রাইভিং শেখা যায়, অনেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো যায়, হজ্জ বা ওমরাহ করা যায়, অনেক প্রবন্ধ/বই লেখা যায়, উপার্জনে সময় দিয়ে অতিরিক্ত প্রচুর টাকা আয় করা যায়। যারা কাজের মধ্যে সময় বাঁচাতে সক্ষম তারা নানামুখী কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন। আর যারা কোনো কাজ করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেন তাদের অনেক কাজই বাকি থেকে যায়।

২. কাজের অতিরিক্ত চাপ ও সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব গ্রহণ না করা : একজন মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজ গ্রহণ করলে শরীর ও মনের উপরও চাপ পড়ে এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজের অতিরিক্ত প্রেসারের প্রতিক্রিয়া পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক সকল কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজের চাপ গ্রহণ করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না। (সূরা বাকারা : ২৮৬)

তারপরও সাধ্যাতীত কোনো কাজ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসে তার জন্য দোআ শেখানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা এভাবে দোআ কর :

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ـ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।" (সূরা বাকারা : ২৮৬)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধ্যাতীত কোনো কাজ দেন না। মানুষের সাধ্যাতীত কোনো কাজ নিজের পক্ষ থেকে চাপিয়ে নিয়ে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত নয়। ইসলাম প্রকৃতিগতভাবে সহজ, ইসলামের বিধানাবলি পালন করা মানুষের জন্য সহজ।

৩. সময় ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা : ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি। এই পাঁচটি বুনিয়াদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হজ্জ সামর্থ্যবানদের উপর জীবনে একবার আদায় করা ফরয। আর রোযা প্রতিবছর এক মাস রাখতে হয় এবং যাকাত বছরে একবার দিতে হয়। আর ফরয নামায প্রতিদিন পাঁচবার এবং জুমা সপ্তাহে একবার আদায় করতে হয়। ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ থেকে একজন মুসলিম এই শিক্ষা নিতে পারে

www.nagorikpathagar.com

যে, মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকেরই জীবনের একটি পরিকল্পনা থাকা উচিত। আর এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বছর, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক এভাবে সুবিধা অনুসারে বিভক্ত করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা উচিত।

৪. অতিরিক্ত সময় কাজে লাগানো : অতিরিক্ত সময় বলতে কী বোঝায়? অতিরিক্ত সময় হচ্ছে কোনো কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের চেয়ে কম সময়ে উক্ত কাজ সম্পন্ন হলে কিংবা কাজের চাপমুক্ত সময়। কখনও কখনও মানুষের অনেক কাজের চাপ পড়ে। আর কখনও তেমন কাজ থাকে না। যখন তেমন কাজ থাকে না, তখন প্রচুর অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত সময় সঠিকভাবে কাজে না লাগালে খারাপ কাজে ব্যয় করার জন্য শয়তান 'ওয়াসওয়াসা' প্রদান করে। তাই অতিরিক্ত সময় পরিকল্পিতভাবে ভালো কাজে ব্যয় করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা অতিরিক্ত সময়ের ভেতরই গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলে আসতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একজন মানুষের ছুটি আছে কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা বন্ধ; অন্যকোনো ঝামেলাও বেশি নেই। এই ধরনের সময় কাটানোর মাঝেই নিকটাত্মীয় কারো দুর্ঘটনা বা বড় ধরনের অসুস্থতার কথা শুনে ছুটে যেতে হয়। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে গনীমত মনে করো। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে– যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, প্রাচুর্যতাকে দারিদ্র্য আসার আগে, হায়াতকে মওত আসার আগে।"

৫. ত্বরিত কাজে সূচনা : অতীতে সময় অপচয় করার জন্য বসে বসে অনুশোচনা, অনুতাপ, হা-হুতাশ করে আরও সময় অপচয় করার চেয়ে ত্বরিত কাজ শুরু করে দেওয়া উত্তম। কাজে আত্মনিয়োজিত না হলে সময় অপচয় হবেই। কেউ যদি বসে থাকে তাহলে অন্যরা তাকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার অনুরোধ করে। আর নিজেই কাজে লিপ্ত থাকলে অন্যরা তার কাজে সহযোগিতা করে। তাই কোনো কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়ার পর আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য।"

(সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

তাফসীরকারদের মতে, এই আয়াতে 'ক্ষমা' বলতে এমনসব কাজকে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে। (মুফতী শফী, তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ১৩৩ আয়াতের তাফসীর।)

৬. কাজ ও দায়িত্ব বণ্টন : সকল কাজ নিজে করতে গেলে প্রচুর সময় দরকার হয়। যে কাজ অন্যকে দিয়ে করানো যায় তা নিজে করার দরকার নেই। এমন অনেকেই আছেন, যারা কাউকে কাজ বণ্টন করে স্বস্তি পান না। ফলে সব কাজ নিজে করতে চান। সব কাজ নিজে করতে গিয়ে মৌলিক কাজের মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন না।

৭. ভ্রমণের সময় স্টাডি করা : আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করি। কখনও স্বল্প সময়ের জন্য আবার কখনও অধিক সময়ের জন্য। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও সাইকেল, রিকশা, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার, উড়োজাহাজসহ বিভিন্ন পরিবহনে ভ্রমণ করি। ভ্রমণের আগে যদি চিন্তা করি কত সময় ব্যয় হতে পারে? সময় হিসাব করে উক্ত সময় কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ ভ্রমণের সময় মনে

www.nagorikpathagar.com

মনে যিকির-আযকার ও কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি নতুন নতুন মাসনুন দোআ শেখা, কুরআনের নতুন আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করা, আরবী-ইংরেজি শব্দ শেখা, মুখস্থ বিষয় স্মরণ করা যায়। আপনি যদি সময় অপচয় রোধ করতে চান, তাহলে ভ্রমণের সময় পড়াশোনা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কোথাও দীর্ঘ সময়ের জন্য সফর করতে হলে উক্ত সময়ে কী পড়বেন তা আগেই ঠিক করে নিন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে পড়াশোনা করুন।

সাধারণত ট্রেন ভ্রমণে পড়াশোনা বেশি করা যায়। কোথাও যেতে হলে কীভাবে গেলে কম খরচে স্বল্পসময়ে ভ্রমণ করা যায় তা দেখা দরকার। তার পাশাপাশি কোন ধরনের বাহনে গেলে ভ্রমণের সময়টাও কাজে লাগানো যায় তার প্রতিও নজর রাখা যেতে পারে। যেমন কোথাও কোথাও বাস ভ্রমণের চেয়ে ট্রেন ভ্রমণে সময় ও খরচ কম লাগে। এমন জায়গায় ট্রেন ভ্রমণই উত্তম।

৮. একসাথে অনেক কাজ করা : একজন মানুষকে জীবনে অনেক কাজ করতে হয়। তাই সম্ভব হলে একাধিক কাজ একই সময়ে করার চেষ্টা করা দরকার। যেমন ড্রাইভিং বা পথ চলার সময় অডিও টেপ শোনা যায়। রান্নাবান্নার সময় ইংরেজি অডিও বা পড়াশোনার অডিও ক্যাসেট শোনা যায়। আপনার শপিং দরকার, চিঠি পোস্ট করতে হবে, কারো সাথে দেখা করতে যেতে হবে, ব্যাংকে বা অফিসিয়াল কোনো কাজ করতে হবে এবং কয়েকজনকে ফোন করতে হবে। এভাবে সকল কাজের তালিকা করে এবার চিন্তা করুন একসাথে কোনো কাজ করা যায় কি না? যেমন আপনার যদি মোবাইল ফোন থাকে তাহলে শপিং করতে যাওয়ার পথেই জরুরি ফোন করতে পারেন। আপনার কাছে স্ট্যাম্প থাকলে চিঠি পোস্ট করতে পারেন। অফিসিয়াল কাজ শেষ করে বন্ধুর সাথে দেখা করে ফেরার পথে শপিং করে আসতে পারেন। এবার চিন্তা করুন, আপনি যদি প্রত্যেকটা কাজ করার সময় পৃথক পৃথকভাবে ঘর থেকে বের হন তাহলে কত সময় লাগে, আর একসাথে সব কাজ করে আসতে পারলে কত সময় বাঁচে?

৯. কোনো কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় না দেওয়া : মনে করুন কোনো একটি কাজ করতে দশ মিনিট সময় প্রয়োজন। আপনি যদি বিশ মিনিট সময় ব্যয় করেন তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরও দশ মিনিট সময় ব্যয় করা হলো। যদি কোনো সভায় দশ জন সদস্য থাকেন, আর দশ মিনিট সময় অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহলে ১০০ মিনিট সময় অপচয় হলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছু করাকে আরবীতে 'ইসরাফ' বলে। ইসরাফকারীকে আল্লাহ তাআলা শয়তানের ভাই বলেছেন। তাই কোনো কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্ত সময় ব্যয় করা উচিত নয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ কারণে সমুদ্রের মাঝে অযু করার সময়ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাত-মুখ ধৌত করাকে ইসরাফ বলা হয়েছে।

১০. সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করা : ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, যেকোনো কাজ ভালোভাবে করা। এই কারণে নামাযের সকল হুকুম-আহকাম নিখুঁতভাবে আদায় করতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী কোনো প্রাণী

www.nagorikpathagar.com

জবেহ্ করার সময়ও উত্তমভাবে জবেহ্ করা দরকার। এ কারণে কোনো কিছু করার সময় চিন্তা করা দরকার সেটা ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু একটা কাজ পারফেক্ট করতে গিয়ে আরও অনেক কাজ বাদ দেওয়া ঠিক নয়। যেমন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট লেখার পর তার ডিজাইন সঠিক করতে গিয়ে আরেকটি অ্যাসাইনমেন্ট লেখার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আপনার সময় ও সুযোগ থাকলে সর্বোচ্চ সঠিক করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি সময় কম থাকে তাহলে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজই করা দরকার। একটি কাজ নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে আরেকটি কাজ বাদ যাওয়া ঠিক নয়। কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায় কোথাও বের হওয়ার সময় পোশাক নিখুঁতভাবে পরিধান করতে গিয়ে বাস, ট্রেন এমনকি ফ্লাইটও মিস করে ফেলেন। জুতা পলিশ করতে গিয়ে ট্রেনের সময় চলে যায় সে খবর থাকে না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, কোথাও যেতে সুন্দরভাবে সেজেগুজে যাওয়া সুন্নত। কিন্তু তার জন্য নিখুঁতভাবে পোশাক পরিধান করতে গিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হওয়া ঠিক নয়।

১১. ডায়েরি রাখা ও পর্যালোচনা : সাধারণত ডায়েরিতে সকল কাজের লিস্ট থাকে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে পরের দিন কী কাজ করতে হবে তার তালিকা করা ভালো। আর পরের দিন কাজ সম্পন্ন হলে টিকচিহ্ন দেওয়া যায়। আপনি আপনার স্টাডি পরিকল্পনা ডায়েরিতে রাখতে পারেন এবং প্রতিদিন তা পর্যালোচনা করতে পারেন। স্টাডি পরিকল্পনা ও পর্যালোচনার জন্য একটি ছক দেওয়া হলো :

স্টাডি পরিকল্পনা	স্টাডি পর্যালোচনা
তারিখ, পড়াশুনার স্থান, পড়া শুরুর সময় পড়ার বিষয়াবলি	পড়াশুনার সময় ও স্থান যথাযথ ছিল কিনা, এতে পরিবর্তন আনা দরকার আছে কি
সর্বমোট কয়টি সেশানে কত ঘন্টা পড়া হবে	কত ঘণ্টা পড়া হয়েছে পড়াশুনার সময় পর্যাপ্ত ছিল কি না
মোট কতবার কত সময় বিরতি দেওয়া হবে বিরতির সময়	বিরতি কখন নেওয়া হয়েছে বিরতির সময় কী বেশি হয়েছে
কী কী ধরনের সমস্যা হতে পারে	পড়াশুনায় প্রতিবন্ধকতা কমানোর উপায় আছে কিনা
স্টাডিপ্রতিবন্ধকতায় যত সময় ব্যয় হতে পারে	
লেখার ক্ষেত্রে কত সময় দেওয়া হবে	লেখার জন্য যে সময় বরাদ্দ ছিল সে অনুযায়ী লেখা সম্পন্ন হয়েছে কিনা
পড়ার ক্ষেত্রে কত সময় ব্যয় হবে	পড়ার জন্য বরাদ্দকৃত সময় যথাযথ ছিল কিনা
কত সময় খাওয়াতে ব্যয় হবে	খাওয়াতে সময় অপচয় হয়েছে কি না
কত সময় নামাযসহ অন্যান্য ইবাদতে ব্যয় হবে	নামাযসহ ইবাদতের জন্য আরও সময় দরকার ছিল কিনা
কত সময় পারিবারিক ও সামাজিক কাজে ব্যয় হবে	আপনার সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ছিল না এমন কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেছেন কি না
কত সময় ঘুমে ব্যয় হবে	ঘুমানোর জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়েছে কিনা
কখন পড়াশুনা শেষ হয়েছে এবং সর্বমোট পড়ার সময়	পড়ার সময় মনোযোগ ঠিক ছিল কি না

www.nagorikpathagar.com

সময় অপচয় রোধ করতে কতিপয় পরামর্শ

১. কঠিন কোনো কাজের পেছনে লেগে না থাকা : কোনো কাজ এই মুহূর্তে আপনার কাছে কঠিন মনে হলেও হয়তবা পরে সেই কাজটি অতি সহজ মনে হবে। তাই কোনো একটি কঠিন কাজের পেছনে লেগে থেকে আরও দশটি কাজ বাদ দেওয়া ঠিক নয়। এর অর্থ কোনো কাজ শুরু করার পর একটু কঠিন মনে হলে বাদ দিয়ে দেওয়া নয়। একবার না পারলে আরেকবার দেখতে হয়। এইভাবে একাধিকবার চেষ্টা করার পরও না হলে তা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করা উচিত। হ্যাঁ, আপনি যদি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে লক্ষ্য পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হয় এবং সব সময় লেগে থাকতে হয়। তা বর্তমান পর্যায়ে কঠিন মনে হলেও সময়ের ব্যবধানে সহজ হয়ে যাবে।

২. নিজের পক্ষ থেকে ডেডলাইন ঠিক করা : মনে করুন, আপনার কয়েকটি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে। টিউটর আপনাকে যে ডেডলাইন দেয় তার আগে নিজের পক্ষ থেকে ডেডলাইন ঠিক করে উক্ত অ্যাসাইনমেন্ট সম্পাদন করার চেষ্টা করুন। শিক্ষকের দেওয়া ডেডলাইনের আগেই অ্যাসাইন্টমেন্ট লেখা শেষ হলে মানসিক চাপ কমে যায়। ফলে অন্যসব কাজ ঠিকমতো করা যায়। কিন্তু যদি শিক্ষকের দেওয়া ডেডলাইনের আগ মুহূর্তেও কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, সেই সময় অন্যকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এলেও করা সম্ভব হয় না। কিংবা অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এর ফলে সময় ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটে।

৩. আপনার সময় ব্যবস্থাপনার কথা অন্যকে জানিয়ে দিন : আপনার সময় ব্যবস্থাপনার কথা আপনার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যসহ অন্যদেরকে জানিয়ে দেওয়া ভালো। তাহলে আপনার সময়ের আলোকেই তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। মনে করুন আপনার পরিবারের সদস্যরা যদি জানে, আপনি প্রতি সপ্তাহে জুমাবার সকালবেলা পারিবারিক কাজে সময় ব্যয় করতে চান, তাহলে সেই সময়ই পরিবারের সদস্যরা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। আর আপনি যদি প্রতি শনিবার কোনো লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে যান তাহলে সেই সময় একান্ত জরুরি না হলে কেউ আপনাকে ফোনও করবে না। ফলে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব আপনার সময় নষ্ট করতে পারবে না।

৪. সকল তথ্য পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করা : মনে করুন কোনো বিষয়ে লেখার জন্য আপনার পাঁচটি বই সংগ্রহ করা দরকার। আপনি পাঁচটি বই সংগ্রহ হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে পড়াশোনা শুরু না করে সময় কাটাতে পারেন। অথবা যে কয়টি বই সংগ্রহ হয়েছে তা পড়া শুরু করে দিতে পারেন। যদি সে সময় অন্যকোনো বিষয় পড়েন তাহলে আপনি সকল তথ্য সংগ্রহ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু যদি শুধু ঐ বিষয়ই পড়তে চান তাহলে সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করে সময় অপচয় করার চেয়ে যেসব তথ্য আপনার কাছে আছে তা পড়া শুরু করে দেওয়া উত্তম।

www.nagorikpathagar.com

৫. সবকিছুই জানার চেষ্টা না করা : কোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব নয়। জানার প্রয়োজনও নেই। তাই আপনার চিন্তা করতে হবে যে, আপনাকে কোন কোন বিষয় কতটুকু জানতে হবে। তাহলে আপনার জানার চেষ্টা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পানে পরিচালিত হবে। সব জানতে গিয়ে সময় অপচয় হবে না। বাস্তবতা হচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে এ কথা পরিষ্কার নয় যে, তাদের কি জানা উচিত এবং উক্ত বিষয়ে কতটুকু জানা আছে।

৬. অন্যদের সহযোগিতা নেওয়া : আপনি যা জানেন না এমন কোনো একাডেমিক সমস্যা একা সমাধান করতে গেলে অনেক সময় এক ঘন্টার কাজে একদিন সময় চলে যেতে পারে। তাই প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কারো সহযোগিতা নেওয়া দরকার। অন্যের সহযোগিতা নিতে লজ্জাবোধ করা ঠিক নয়। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ তাঁর কাছে যেকোন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। জানার জন্য প্রশ্ন করাতে লজ্জার কিছু নেই। আপনি জানেন না এই কথা কাউকে বললে আপনার মর্যাদাহানি হয় না; বরং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কোনো জটিল সমস্যা সমাধানে বারবার সাঁতার কাটার চেয়ে অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে ত্বরিত সমাধান করা উত্তম। এতে সময় অপচয় হয় না। কেউ সাহায্য করলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানান। তাহলে ভবিষ্যতে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পাওয়া যাবে।

৭. কাজের ফাঁকে পড়াশোনা : আমাদের দেশে ছাত্র অবস্থায় কাজ করার মানসিকতা খুব কম। অথচ উন্নত দেশগুলোতে অনেক ছাত্র টার্ম সময়ে পার্টটাইম কাজ করে। আর সামার ভেকেশনসহ বিভিন্ন ছুটিতে ফুল টাইম কাজ করে। এমনকি রাজা, রাণী, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েরাও অভিজ্ঞতার জন্য বিভিন্ন ছুটিতে কাজ করে। কাজ ও পড়াশোনা এক সাথে করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই পড়াশোনার বাইরে কম বেশি নানা ধরনের কাজ করতে হয়। এই ধরনের কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই পড়াশোনার মানসিকতা রাখা দরকার। এছাড়া কাজের মধ্যেও পড়া যায়। যেমন আপনি ঘর গুছানোর সময় মনে মনে কিছু শব্দ মুখস্থ করতে পারেন কিংবা ইতঃপূর্বে মুখস্থ করেছেন এমন কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করতে পারেন।

৮. ঘুমের সময় কমিয়ে পড়াশোনা : সাধারণত সকলে যখন ঘুমে থাকে সেই সময় চারদিকে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বজায় থাকে। আপনি ইচ্ছা করলে সকলের সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। অথবা নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে একটু সময় পড়ে ঘুমোতে পারেন। আপনি যদি প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট ঘুমের সময় কমিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে বছরে ১৮২ ঘন্টা অতিরিক্ত পড়া হবে। আর যদি প্রতিদিন ৩০ মিনিট সময় অতিরিক্ত ঘুমান তাহলে বছরে অনুরূপ সময় অতিরিক্ত ঘুমালেন। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কি অতিরিক্ত ঘুমাবেন? হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, ভালো পড়াশোনার জন্যই পরিমিত ঘুম দরকার। কিন্তু অতিরিক্ত ঘুম ব্যক্তিকে অলস করে ফেলে। তাই অতিরিক্ত ঘুমানোর অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

৯. অপেক্ষার সময় কাজে লাগানো : অনেক সময় ট্রেন বা বাস টার্মিনাল কিংবা এয়ার পোর্টে কাউকে রিসিভ করার জন্য অথবা কোথাও যাওয়ার সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এভাবে অপেক্ষার সময় গঠনমূলক কাজে লাগানো উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনাকে কাউকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। আপনার জানা আছে হাসপাতালে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। এই অপেক্ষার সময় আপনি বসে বসে কাটিয়ে দিতে পারেন কিংবা কোনো একটি বই নিয়ে গেলে তা পড়তে পারেন। অনুরূপভাবে আপনার ঘরে কাউকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু মেহমান আসতে বিলম্ব হচ্ছে, এখন আপনি কী করবেন? আপনার সামনে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিকল্প আছে, ১. নীরবে বসে থাকা, ২. মেহমানের উপর মন খারাপ করে আসতে নিষেধ করা, ৩. সারা ঘর পায়চারি করে মেহমানের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা, ৪. বিলম্বের সময়কে অন্য কাজে লাগানোর জন্য তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা নেওয়া। বুদ্ধিমান মানুষেরা বিলম্বের সময় গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, অযথা সময় নষ্ট করেন না।

১০. ছুটির দিন গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার সময় কাজে লাগানো : প্রত্যেক মানুষই কম-বেশি ছুটি উপভোগ করে, নানা ঝামেলামুক্ত হয়ে কোথাও বেড়াতে যায়। মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য মাঝে মধ্যে অবকাশে যাওয়া উত্তম। তাই উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রতিবছরই অবকাশে যান। আপনি অবকাশ যাওয়ার ইচ্ছা করলে আগেভাগেই পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আপনি ইচ্ছা করলে শুধু অবসর কাটাতে পারেন কিংবা করতে আনন্দ লাগে এমন কিছু কাজ করতে পারেন। তাহলে ঐ কাজটি পরবর্তী সময়ে করতে যে সময় ব্যয় হতো তা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারবেন। তবে অবকাশে এমন কোনো কাজ করা ঠিক নয়, যা এর আনন্দকেই বরবাদ করে দেয়, মন-মেজাজ নষ্ট করে দেয়। অবকাশের সময় নিরিবিলি বসে আপনার স্টাডি টেকনিক নিয়ে ভাবতে পারেন, আগের টার্মে পড়াশোনায় কোন ধরনের দুর্বলতা ছিল, পরবর্তী টার্মে উক্ত দুর্বলতাসমূহ কীভাবে কাটিয়ে উঠবেন এই সম্পর্কে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা নিতে পারেন।

১১. সময় খুঁজে বের করা : সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য সময় খুঁজে বেড়াতে হবে। অর্থাৎ কোনো একটি কাজ করার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে কোনো সময় পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করতে হবে। সময় পেলেই তা যথাযথ কাজে লাগাতে হবে।

১২. অপ্রয়োজনীয় সামাজিক সম্পৃক্ততা কমাতে হবে : ছাত্রদের সামাজিক কাজে এত বেশি সম্পৃক্ত হওয়া উচিত নয়, যার কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। অপ্রয়োজনীয় সামাজিক ইস্যুতে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আমরা সমাজসচেতন হবো তবে অতিরিক্ত সমাজসচেতন হয়ে ক্যারিয়ার গঠনে পিছিয়ে থাকা ঠিক নয়। তাই সময় নিয়ন্ত্রিত করতে হলে অপ্রয়োজনীয় কাজে (লারনিং টু সে নো) না বলা শিখতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

১৩. পরিকল্পিত স্টাডি করা : এক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ :

১. বাস্তবতা : বাস্তবসম্মত স্টাডি পরিকল্পনা দরকার।

২. সব সময় পড়া : সব সময় পড়াশোনা করার অভ্যাস গড়া প্রয়োজন। যদি সব সময় পড়াশোনা করা হয় তাহলে কী পড়েন তা মনে থাকে এবং যত বেশি পড়াশোনা করেন তত বেশি জ্ঞানের পরিধি বাড়ে।

৩. কোনো বই সব সময় সাথে রাখা : সব সময় কোনো বই সাথে রাখা ভালো। তাহলে সময় পেলেই পড়া যায়।

৪. অধিক মনোযোগ : পড়াশোনার প্রতি অধিক মনোযোগী থাকা দরকার। কারণ মনোযোগ না থাকলে বারবার পড়লেও তা আয়ত্ত হয় না। এতে সময়ের অপচয় হয়।

৫. পড়াশোনার পরিবেশ : ভালো পড়াশোনার জন্য নিরিবিলি পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। কারণ পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে প্রচুর সময়ের অপচয় হয়, ফলে সময়সূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৬. পড়াশোনার উপকরণ : পড়াশোনার উপকরণ ঠিকমতো না থাকলে পড়ার টেবিলে বসে উপকরণ খুঁজতে হয়। এ কারণে বিষয়ভিত্তিক ফোল্ডার, ফাইল, ডেস্ক সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা উচিত। অডিও, ভিডিও ক্যাসেট, ক্লাসনোট সঠিক স্থানে রাখা দরকার, যেন খুঁজতেই পাওয়া যায়।

৭. সব জিনিস গুছিয়ে রাখা : সকল উপকরণ গুছিয়ে রাখা দরকার। কখনও কখনও দেখা যায় কোনো একটি জিনিস খুঁজে বের করতে গিয়ে পড়াশোনার মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

৮. মুখস্থ করার চেয়ে বোঝার চেষ্টা করা : কোনো কিছু মুখস্থ করলে তা স্মরণে কম থাকে, কিন্তু তা বুঝে হৃদয়ঙ্গম করলে দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে। তাই কোনো জিনিস মুখস্থ করার চেয়ে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা দরকার।

৯. দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা : সময় যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা দরকার।

১০. দিনের শুরুতে পছন্দনীয় বিষয় পড়া : রিভিশানের জন্য প্রতিদিন সকাল বেলা এমন টপিক বেছে নেওয়া ঠিক নয়, যা আপনার অপছন্দ। কারণ অপছন্দের কোনো টপিক প্রথমেই পড়তে গিয়ে পুরো দিনটাই অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

আপনি কি সময় অপচয় রোধে সিরিয়াস?

সময় অপচয় রোধ করার জন্য সিরিয়াস হতে হবে। নিচের ছক অনুযায়ী সময় ব্যয়ের পর্যালোচনা ও সময় অপচয়রোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.com

নিজেকে প্রশ্ন করুন	বর্তমান সময় ব্যয় প্রসঙ্গে	কীভাবে আরো সুন্দরভাবে ব্যয় করা যায়
আমি কি যথাযথভাবে সময় ব্যয় করি?		
আমি কি সময় অপচয় করি?		
কী ধরনের কাজে সময় অপচয় হয়?		
সময় অপচয়ের জন্য দায়ী কে?		
আমার কি বার্ষিক/টার্ম, সাপ্তাহিক/দৈনিক পরিকল্পনা আছে?		
আমি কি কোনো কাজ শুরু করতেই সময় অপচয় করি?		
আমি কি কোনো কাজে অতিরিক্ত সময় লাগাই?		
আমার মাসিক স্টাডি ক্যালেন্ডার ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো দাগ দেওয়া আছে কি না?		
আমার সাপ্তাহিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যালেন্ডার ও স্টাডি প্ল্যান আছে কি না?		
আমার রিলাক্স ও খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে কি না? টার্গেট পূরণ হলে আমি নিজেকে নিজে পুরস্কৃত করি কি না?		

কী কারণে পড়াশোনার অপচয় হয় তা নির্ণয় করার পর সময় অপচয় রোধ করার জন্য বাস্তব পরিকল্পনা নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি টেলিফোনের কারণে সময় অপচয় হয় তাহলে আপনার সিরিয়াস স্টাডির সময় ভয়েস ম্যাসেজ অন করে টেলিফোনের টোন বন্ধ করে রাখতে হবে। পড়াশোনার সময় বন্ধু-বান্ধব এলে খুব জরুরি কোনো বিষয় না থাকলে আলাপ-আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে আপনার স্টাডির সময় জানিয়ে দিতে হবে। বন্ধুরা যদি আপনার স্টাডির সময়ে শুধু ঘোরার জন্য কোথাও যেতে পীড়াপীড়ি করে বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করবেন।

সময় বাঁচানোর আরও কয়েকটি ইঙ্গিত : হিশাম আল তালিব এ সম্পর্কে তাঁর বইতে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে : ১. প্রত্যহ সকালে লিখিতভাবে আপনার দিনের কাজগুলোর পরিকল্পনা করুন এবং হয়ে গেলে একটি একটি করে কেটে নিন। ২. টেলিফোনে না জানিয়ে কোনো বন্ধুর কাছে যাবেন না। ৩. কাগজ-কলম বা ছোট নোট সব সময় সাথে রাখবেন। অবসর সময়ে আপনার চিন্তা পরিকল্পনা লিখে নিতে পারেন। ৪. বিশ্রামের সময়কে নামাযের সময়ের সাথে মিলিয়ে পকিল্পনা করুন। ৫. লেখাপড়া করে, কোনো কিছু মুখস্থ করে বা গঠনমূলক কিছু করে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। ৬. সাক্ষাৎসূচি করার সময় উভয়েই যেন সঠিক সময় ভালোভাবে বোঝে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন ৭. দূরে যেতে হলে সম্ভাব্য সময়ের চেয়ে বেশি সময়

www.nagorikpathagar.com

হাতে রাখবেন, যাতে অভাবিত কিছু ঘটলেও সময়মতো সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। ৮. রান্না করা, প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা প্রস্তুত করা, যেকোনো কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সকল উপাদান হাতের কাছে নিয়ে নেবেন। ৯. আপনার সময়ক্ষেপণ হতে পারে এমন চিন্তাশূন্য এবং আত্মকেন্দ্রিক লোক এড়িয়ে চলবেন। ১০. চিঠি বা টেলিফোনে সেরে নেওয়া যায় এমন কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যাবেন না। ১১. পছন্দসই ফিলিং স্টেশন অতিক্রমকালে গাড়িতে তেল নিয়ে নিন। বিশেষ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন এবং কোনো অবস্থাতেই গাড়িতে তেল নেই এমন অবস্থায় পড়বেন না; তখন নিজেকে বোকা ভাববেন। ১২. টেলিফোন কল বা পার্কিং চাঁদার জন্য সব সময় খুচরা টাকা-পয়সা সাথে রাখবেন। ১৩. যদি কোনো সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা কেনাকাটা থাকে, তাহলে সবকিছু লিখে পরিকল্পনা করুন, যাতে স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ভ্রমণ দীর্ঘায়িত না করে সব কাজ করে আসতে পারেন। ১৪. কারো সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কথা বলতে যাওয়া এবং কত সময় কথা বলবেন তা জানানো। ১৫. সেলফ ম্যানেজার ঃ নিজেই নিজের ম্যানেজার-ব্যবস্থাপক হতে হবে। সাধারণত ম্যানেজাররা তাদের অধীনস্থদের কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। কোনো ব্যক্তি যদি নিজেই নিজের ম্যানেজার হতে পারে তাহলে তার পক্ষে জীবনে উন্নতি লাভ করা সম্ভব।

আমরা কীভাবে সময় অতিবাহিত করি : হিশাম আল তালিব এ বিষয়টি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, মাঝারি বয়সকালের একটি জীবনে সময় কীভাবে ব্যয় হয় তার কয়েকটি নিম্নোক্ত চার্টে দেখানো হয়েছে :

জুতার ফিতা বেঁধে	৮ দিন
ট্রাফিকলাইটের বাতির দিকে তাকিয়ে	১ মাস
নাপিতের দোকানে ব্যয়িত সময়	১ মাস
টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে	১ মাস
বড় শহরে লিফটে চড়ে	৩ মাস
নিজের দাঁত মেজে	৩ মাস
শহরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে	৫ মাস
গোসলখানায় ব্যয়িত সময়	৬ মাস
বই পড়ে	২ বছর
খাওয়া-দাওয়ার সময়	৪ বছর
জীবিকা উপার্জনে ব্যয়িত সময়	৯ বছর
টেলিভিশন দেখে	১০ বছর
ঘুমিয়ে	২০ বছর

দুনিয়াতে এমন কাজে সময় ব্যয় করা উচিত যে কাজে মরণের পরও যেন নেকী মেলে।

www.nagorikpathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষতা উন্নয়ন

স্টাডি, রিডিং, মেমোরাইজিং ও নোট টেকিং

স্কিলস বলতে কী বুঝায়

স্কিলস মানে কোনো বিষয় উত্তমভাবে করার 'দক্ষতা'। ইংরেজিতে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "The ability to do something well" কারো কোনো বিষয়ে দক্ষতা আছে বলতে বুঝায় উক্ত বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তার কাছ থেকে ঐ বিষয়ের খুঁটিনাটি জানা যায় এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিতে সক্ষম। এ কারণে কেউ ব্যবস্থাপনায় ভালো হলে বলা হয়, তিনি একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক। আর কারো যোগ্যতা থাকার পরও দক্ষতা কম থাকলে বলা হয়, তার যোগ্যতা আছে কিন্তু দক্ষতা নেই। তাই কেউ কেউ বলেন, কোনো বিষয়ে পরিপক্ব জ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানের নামই 'দক্ষতা'। দক্ষ ব্যক্তিরা Efficiency-র সাথে নিখুঁতভাবে যেকোনো কাজ করতে পারেন।

দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব

দক্ষতা ছাড়া কোনো কাজ সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয় না। তারার চারপাশে যেমনভাবে গ্রহেরা ঘুরে বেড়ায়, তেমনি দক্ষ ব্যক্তিদের চারপাশে মানুষ ঘুর ঘুর করে, বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের কাছেই ছুটে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে হলে কোনো একটা ফিল্ডে দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। দক্ষ ব্যক্তিরা অল্প সময়ে যে কাজ সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করতে পারে, অদক্ষ ব্যক্তিরা প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেও সে কাজটি করতে পারে না। তাই ব্যক্তির প্রয়োজনেই দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরি। উপরন্তু যারা একটি সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন তারা শুধু যোগ্য হলেই চলবে না, তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। একদল সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোক সমাজবিপ্লবের চেষ্টা করলে মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দেয় এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তাই কাঙ্ক্ষিত সমাজবিপ্লবের জন্য আমাদেরকে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ হতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা অর্জন করতে হবে আমরা যেন সমাজ ও উম্মাহর প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারি।

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় Skilled man power-এর গুরুত্ব : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে স্কিলড কাফেরদের সংশ্লিষ্ট স্কিল প্রশিক্ষণের

www.nagorikpathagar.com

বিনিময়ে মুক্তি দেন। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতকে সুরিয়ানি ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। এ থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। এই কারণে আল্লাহর রাসূল (স) সাহাবীদেরকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন।

কোন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন : দক্ষতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. মৌলিক দক্ষতা (Basic Skills) : একজন ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মৌলিক কাজে দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক নিত্যদিনের প্রয়োজন পূরণে যেসব কাজ করতে হয় তা করার দক্ষতা না থাকলে সকল কাজের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাই আপনার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে যেসব কাজ করতে হয় তা উত্তমভাবে করার যোগ্যতা অর্জন করা জরুরি।

২. বিশেষ দক্ষতা (Specific Skills) : একটি সমাজ পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ লোক দরকার। যেমন- কম্পিউটার, মিডিয়া, ল্যাংগুয়েজ ইত্যাদি। প্রত্যেকের আপন মেধা ও ঝোঁক প্রবণতার আলোকে যেকোনো একটি ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন।

৩. অতিরিক্ত দক্ষতা (Additional Skills) : মৌলিক প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত নয় কিন্তু সময় ও সুযোগ থাকলে যেকোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করলে সময়ের ব্যবধানে তা কাজে লাগে।

বর্তমানে আপনার কী ধরনের স্কিলস আছে এবং আরও কী ধরনের স্কিলস অর্জন করতে চান ঃ

স্কিলস, ডেভেলপমেন্ট করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আপনার বর্তমান স্কিলস কী আছে তা জানা। আপনার বর্তমান যোগ্যতা ও দক্ষতা আপনার কাছে পরিষ্কার থাকার পাশাপাশি আপনি আরও কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে চান তা সুস্পষ্ট থাকা জরুরি। তাহলে এর আলোকে আপনার স্কিলস, উন্নয়নের চেষ্টা করতে পারবেন। আপনার কাছে যদি আপনার স্কিলস উন্নয়নের লক্ষ্য পরিষ্কার না থাকে তাহলে আপনার পক্ষে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। আপনি ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন—প্রত্যেক খেলোয়াড়ের লক্ষ্য থাকে নির্দিষ্ট গোলপোস্টে বল করা। উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তারা মাঠের মধ্যখানে খেলে। অনুরূপভাবে আপনার জীবনেও অনেক কাজ করতে হয়। সকল কাজের মধ্য দিয়েই আপনাকে লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলতে হবে।

বর্তমানে আপনার কী ধরনের স্কিলস আছে তা নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। আপনি এই ধরনের একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে তাতে টিক চিহ্ন দিন।

www.nagorikpathagar.com

স্কিলস	জানা নেই	কোনো রকম জানি	ভাল জানি	জানা দরকার নেই	জানা দরকার
ভাষাগত দক্ষতা					
আরবি					
ইংরেজি					
অন্যান্য ভাষা					
কম্পিউটার					
রাইটিং স্কিলস,					
রিডিং স্কিলস,					
বায়োডাটা তৈরি					
ইন্টারভিউ					
কমিউনিকেশন					
রিসার্চ মেথড					
মিটিং ম্যানেজমেন্ট					
সময় ব্যবস্থাপনা					
ড্রাইভিং					

স্কিলস, ডেভেলপ হতে পারে : স্কিলস, এমন বিষয় যা পর্যায়ক্রমে অর্জন করা যায় এবং আরও উন্নততর হতে পারে। মনে করুন, বর্তমানে আপনি ইংরেজি লিখতে পারেন এবং পড়তে পারেন কিন্তু কথা বলতে পারেন না। আপনি চেষ্টা করলে আপনার লেখা ও পড়ার মান আরও বাড়াতে পারেন এবং অনর্গল কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রে আপনার কোনো স্কিলস, নেই, এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও আপনার স্কিলস অর্জন সম্ভব নয়। আপনি একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন একজন শিশু জন্মগ্রহণ করার পর প্রথমত মাতৃভাষার সাথে পরিচিত হয়। এরপর আস্তে আস্তে ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং ভিনদেশী অনেক ভাষার সাথেও পরিচিত হয়। একজন খেলোয়াড়, যিনি শুধু ফুটবল খেলতে পারেন তার অর্থ এটা নয় যে, তিনি চেষ্টা করলে ক্রিকেট খেলতে পারবেন না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা ব্যক্তির ঝোঁক ও ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। আপনার যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে আপনার পক্ষে কোনো ক্ষেত্রেই দক্ষতা লাভ করা সম্ভব নয়।

কোন পদ্ধতিতে দক্ষতা উন্নয়ন করবেন তার অ্যাকশান প্ল্যান

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে আপনি আপনার ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন করবেন। আপনার দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কর্মকৌশল আপনাকেই ঠিক করতে হবে। তবে এসব বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বই পড়লে কিছুটা ধারণা পাবেন, যা আপনার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে। আপনার দক্ষতা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও

www.nagorikpathagar.com

কর্মকৌশল নিয়ে আপনি নিজেই 'অ্যাকশান প্ল্যান' তৈরি করতে পারেন। এ জন্য একটি ছক দেওয়া হলো :

বিষয় : কম্পিউটার	তারিখ
বর্তমানে আপনার কী ধরনের স্কিলস আছে তার সারসংক্ষেপ	
আপনি কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে চান তার সারসংক্ষেপ	
অগ্রাধিকার তালিকার আলোকে কবে কীভাবে তা অর্জন করতে চান তার বর্ণনা	
আপনি কীভাবে তা অর্জন করতে চান তার বর্ণনা	
আপনি কীভাবে বুঝবেন যে আপনার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে মূল্যায়ন কাঠামো	

দক্ষতা উন্নয়নে কতিপয় পরামর্শ

১. পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না। আপনি কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে চান তার পরিকল্পনা নিতে হবে।

২. আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে, আপনার পক্ষে সম্ভব– আপনি যে ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে চান তা আপনি অর্জন করতে পারবেন এই ধরনের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। মনে করুন, আপনি কম্পিউটার, ড্রাইভিং এবং ল্যাংগুয়েজ বিষয়ে স্কিলস অর্জন করতে চান। আপনার মনে যদি দুর্বলতা থাকে যে, আপনার পক্ষে ড্রাইভিং পাস করা কঠিন তাহলে সত্যিই আপনার পক্ষে ড্রাইভিং শেখা কঠিন হবে। কারণ কোনো সহজ বিষয়ও মানসিকভাবে কঠিন মনে করলে 'কঠিন' বলে অনুভূত হয়। আর কঠিন বিষয়ও সহজ মনে করলে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের কারণে তা সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হয়। কারো যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তার পক্ষে বড় কোনো অবদান রাখা কঠিন।

৩. প্র্যাক্টিস ও অভ্যাস, আপনি যে ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে চান তা অর্জন করার জন্য প্র্যাক্টিস করতে হবে এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

৪. দক্ষ ব্যক্তিদের সাথে মেশা, আপনি কোনো একটি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে ঐ ক্ষেত্রে দক্ষ কারো কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে, শুধু তত্ত্বকথা পড়েই দক্ষতা অর্জন করা যায় না।

www.nagorikpathagar.com

৫. আত্মপর্যালোচনা, আপনি কতটুকু দক্ষতা উন্নয়ন করলেন—মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করা উচিত। আপনি নিজেও পরীক্ষা করতে পারেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতাও নিতে পারেন। মনে করুন, আপনি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান, মাঝে মধ্যে ইংরেজিতে নিজের কোনো বক্তব্য রেকর্ডিং করে পরে তা শুনতে পারেন এবং গ্রামার দেখে কী কী ভুল করেছেন তা চিহ্নিত করতে পারেন।

দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগও প্রয়োজন : দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শুধু ইচ্ছা থাকলেই সব করা যায় না, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকাও প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোতে নাগরিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। কেউ বৃদ্ধ বয়সেও ইচ্ছা করলে কম্পিউটার শিখতে পারে, ভাষার উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা এখনও নেই। কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য নাগরিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তাই তৃতীয় বিশ্বের সরকারসমূহের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বেরও দায়িত্ব রয়েছে। উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনসম্পদকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করতে পারে।

দক্ষতা অর্জনে পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক প্রভাব : দক্ষতা উন্নয়নে পরিবেশের বিরাট প্রভাব রয়েছে। যে শিশুটি তার বাবা-মাকে প্রতিদিন কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেখে সে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিয়ে বড় হয়। কম্পিউটার কীভাবে 'অন' বা 'অফ' করতে হয়, মাউস ও কী-বোর্ড কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, এভাবে কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান অন্যদের কম্পিউটার ব্যবহার দেখেই শিখে ফেলে। সে ছোটবেলা থেকেই কম্পিউটার গেম খেলতে শুরু করে। গ্রামের যে শিশুটি কাদামাটিতে খেলতে খেলতে বড় হয়, সেই শিশুটি যদি শহরের ঐ পরিবারে জন্ম নিতো যেখানে তার বড় ভাই-বোনদেরকে কম্পিউটার গেম খেলতে দেখতো তাহলে সেই শিশুটিও কম্পিউটার গেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বড় হতো। আর শহরের যে শিশুটি কম্পিউটার গেমের প্রতি আকৃষ্ট সে যদি গ্রামের এমন কোনো পরিবেশে জন্ম নিতো যেখানের লোকজন কম্পিউটার কী জিনিস তা জানে না, তাহলে সে কম্পিউটার গেমের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হতো না। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিপার্শ্বিকতার বিরাট প্রভাব থাকে।

বাধ্য হয়েই দক্ষতা উন্নয়ন : কোন কোন সময় ব্যক্তির ইচ্ছা খুব বেশি না থাকলেও বাধ্য হয়েই কোনো ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। যেমন বলা যায়, কারো যদি এমন অফিসে চাকরি হয় যেখানে প্রতিনিয়তই আন্তর্জাতিক যোগাযোগ করতে হয়, চিঠিপত্র লিখতে হয়, তাহলে তাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্তে আনতেই হবে। এজন্য ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতি তাকে বিশেষ নজর দিতে হয়। এভাবে কেউ কেউ বাধ্য হয়েই কম্পিউটার শেখা শুরু করে। কিন্তু ব্যক্তির মনের আকর্ষণ না থাকলে বাধ্য হয়ে কোনো কিছু শেখা শুরু করলেও খুব বেশি দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এ জন্য আপনার ঝোঁকের সাথে সঙ্গতি রেখেই আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

দক্ষতা পরিমাপযোগ্য : আপনি নিজেকে যতটুকু দক্ষ মনে করেন তা বাস্তবে কতটুকু সত্য তা অনায়াসেই অপরের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আপনি কোথাও চাকরির জন্য বায়োডাটাতে নিজেকে আরবি/ইংরেজি ভাষায় দক্ষ বলে উল্লেখ করলেন। আপনার ইন্টারভিউতে দুই-এক মিনিট কথা বলার পর সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আপনি বাস্তবেই কতটুকু দক্ষ। আপনি যদি ড্রাইভিং জানেন বলে উল্লেখ করেন, কোনো একটি গাড়ি চালাতে দিলেই বোঝা যাবে আসলেই আপনি গাড়ি চালাতে পারেন কিনা। আপনি যদি মনে করেন কম্পিউটারে আপনার পর্যাপ্ত দক্ষতা রয়েছে, কোনো ডাটা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে বললেই বোঝা যাবে আপনার দক্ষতা কতটুকু। এই আলোচনা থেকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, দক্ষতা দাবি করার বিষয় নয়, এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রমাণের বিষয়।

সমালোচনা নয়, দক্ষতা বৃদ্ধি করুন ও অবদান রাখুন ঃ মুসলমানদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ আছে। একধরনের লোক আছে যারা শুধু সমালোচনা করেন। তাদের সমালোচনার ভাষা এই ধরনের, মুসলিম দেশগুলো কী করছে? ইসলামী সংগঠনগুলো কিছুই করতে পারছে না, সাধারণ সাহিত্যের তুলনায় ইসলামী সাহিত্যের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে, যারা ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন সেসব কোনো সাহিত্যই নয়, প্রশাসনে লোক নেই, মিডিয়াতে লোক নেই, মাঠে-ময়দানে যোগ্য নেতা নেই- এই ধরনের অনেক অভিযোগ পেশ করেন। আমি তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলতে চাই না। মুসলিম উম্মাহর জন্য তাদের দরদ আছে নিঃসন্দেহে। তাদের অভিযোগের বাস্তবতাও থাকতে পারে। কিন্তু শুধু অভিযোগ করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

স্টাডি স্কিলস

স্টাডি স্কিলস তত্ত্বগত বিষয় নয় : স্টাডি স্কিলস বলতে বোঝায় স্টাডি করার বিভিন্ন কৌশল। এটা শুধু তত্ত্বগত বিষয় নয়, বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণয়ন করতে হয়। প্রত্যেক মানুষের বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতা এক ধরনের নয়। তাই সকলের স্টাডি টেকনিকও এক ধরনের হয় না। ছাত্রছাত্রীর বয়স, ক্লাস, পড়াশোনার বিষয় ও পড়াশোনার পরিবেশের পার্থক্যের কারণে স্টাডি টেকনিকেও পার্থক্য হয়। তবে কিছু কমন বিষয় আছে যা সকলের জন্য প্রযোজ্য। নিচে এ সম্পর্কে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। আপনি আপনার বাস্তব অবস্থার আলোকে স্টাডি প্ল্যান ও স্টাডি টেকনিক প্রণয়ন করুন। আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখানে আলোচিত বিষয়ের বিপরীত টেকনিকও অনুসরণ করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে কিছু টেকনিক অনুসরণ করার পর যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে আপনার ব্যক্তিগত পড়াশোনা বেশি হয়, সেই কৌশলই স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা দরকার এবং তা-ই আপনার জন্য উত্তম কৌশল।

স্টাডি টেকনিক বাস্তব অবস্থার আলোকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয় : সব সময় একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাই আপনার স্টাডি কৌশল আপনাকেই বাস্তব

www.nagorikpathagar.com

অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্য কারো পরামর্শ সহযোগী ভূমিকা পালন করে। মূল ভূমিকা ব্যক্তিকেই পালন করতে হয়।

ভালো পড়াশোনার পূর্বশর্ত পড়াশোনার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব : পড়াশোনার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব না থাকলে ভালো পড়াশোনা করা যায় না। পড়াশোনার প্রতি আপনার মনোভাব কতটুকু তা বুঝতে হলে নিজকে নিজে জিজ্ঞাসা করুন :

পড়াশোনা করতে আপনার কেমন লাগে?
পরীক্ষার ফলাফল পেলে আপনার ভাল লাগে কিনা?
পড়াশোনার প্রতি আপনার মনোযোগ কতটুকু?
কঠিন টেক্সট বুক পড়তে গিয়ে পড়া ছেড়ে দেন, না বোঝার চেষ্টা করেন?
বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে পড়াশোনা করাকে অগ্রাধিকার দেন কিনা?
নিয়মিত ক্লাসে যোগদান করেন কিনা?
ক্যারিয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আছে কিনা?
শ্রেণীশিক্ষক ভালভাবে বোঝাতে না পারলে নিজে অধিক পরিশ্রম করে বোঝার চেষ্টা করেন কিনা?
কঠিন কাজ করার পর নিজেকে নিজে পুরস্কৃত করেন কিনা?
ক্লাস নোট যত্নসহকারে করেন কিনা এবং তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিভাইজ করেন কিনা?

ভালো স্টাডি করার জন্য কতিপয় পরামর্শ

১. বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন : সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়া ভালো পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। জীবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্টাডির জন্য বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণ করা দরকার। ঘুম, খাওয়া, প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় বণ্টন না করে সারাক্ষণ পড়াশোনার কৌশল গ্রহণ বাস্তবসম্মত নয়।

২. মানসিক প্রস্তুতি : স্টাডির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে বিরামহীন চেষ্টা করতে হয়। এ জন্য সর্বপ্রথম মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। মন ভালো রাখার জন্য কিছুক্ষণ শ্বাস নিন, তারপর নিজে নিজে একটি মিষ্টি হাসি দিন। তারপর হাত-পা নাড়াচাড়া করে একটু রিলাক্স হোন। এরপর আপনার চিন্তারাজ্যের বিভিন্ন স্বপ্ন, নানা ধরনের কথা যা বারবার উঁকি মারে তা দূরে সরিয়ে রাখুন এবং একাগ্রচিত্তে পড়তে বসুন।

৩. আগ্রহ : স্টাডির প্রতি আপনার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকতে হবে। অভিভাবকদের চাপে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বড় কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। জীবনে বড় ধরনের কোনো অবদান রাখতে হলে শেখার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা জরুরি।

www.nagorikpathagar.com

৪. অভ্যাসে পরিণত করা : পড়াশোনা আপনার অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। প্রতিদিন কিছু সময় পড়াশোনা করতে হবে। মাঝে মধ্যে পড়াশোনা করে বেশি কিছু অর্জন করা যায় না। ভালো কিছু অর্জন করতে হলে পড়াশোনাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

৫. মডেল অনুসরণ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী যারা আছেন তাদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে অনুসরণ করতে পারেন। মনে করুন আপনি ইসলামের উপর গবেষণা করতে চান। তাহলে অতীতে এই বিষয়ে গবেষণা করে যারা যশস্বী হয়েছেন তাদের কয়েকজনের জীবনী পড়ে দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। বর্তমানে জীবিত আছেন এমন কারো সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও তার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন।

৬. স্টাডির বিষয়াবলির তালিকা তৈরি করা : একজন ছাত্রছাত্রীকে অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়। শিক্ষাবছরের শুরুতে সিলেবাস দেখে স্টাডির বিষয়াবলির একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। উক্ত তালিকা অনুসারে পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে।

৭. স্টাডির অগ্রাধিকার তালিকা করা : একজন ছাত্রছাত্রীকে অনেক বিষয় পড়তে হয়। তবে সকল কিছু পড়ার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। স্টাডির বিষয়াবলিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ এইভাবে ভাগ করে পড়াশোনা করা ভালো।

৮. সময়সূচি তৈরি করা : আপনি কখন কোন বিষয় পড়বেন তার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। অপরিকল্পিত পড়াশোনার চেয়ে পরিকল্পিত অধ্যয়নে অনেক বেশি শেখা যায়। কখন কী পড়বেন ও কখন কী করবেন এজন্য একটা স্টাডি প্ল্যান তৈরি করতে পারেন। এ বিষয়ে 'সময় ব্যবস্থাপনা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্টাডি কৌশল

ক. ব্যক্তিগতভাবে স্টাডি করা ঃ এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ঃ ১. কখন পড়াশোনা করবেন। ২. কোথায় কোন পরিবেশে পড়াশোনা করবেন। ৩. কিভাবে পড়াশোনা করবেন। ৪. কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন।

খ. উত্তমভাবে পড়ার জন্য উত্তম পরিবেশ দরকার : পড়াশোনার জন্য উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। জনৈক বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদকে তাঁর পড়ার কক্ষ সুন্দরভাবে সাজাতে দেখে আরেকজন প্রশ্ন করলেন, "আপনি এত সুন্দর করে রুম সাজাচ্ছেন কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "পড়াশোনার জন্য।" এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "পড়ার জন্য কি এত চমৎকারভাবে রুম সাজাতে হয়?" তখন তিনি জবাব দিলেন, "পড়ার পরিবেশ যত উন্নত হয় আমার লেখাও তত ভালো হয়।"

www.nagorikpathagar.com

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পড়ার উত্তম পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? যিনি যে পরিবেশে উত্তমভাবে পড়তে পারেন তার জন্য তাই উত্তম পরিবেশ। কারণ অনেকে কোলাহলের ভেতরই পড়তে পারেন। পড়ার রুম ও টেবিল ছাড়া রাস্তার আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করেও অনেকে যশস্বী হয়েছে। আবার কেউ গাছের পাতা নড়লেও পড়তে পারেন না। তাই পড়ার উত্তম পরিবেশ ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। কারো জন্য লাইব্রেরি হচ্ছে পড়ার উত্তম স্থান। যারা লাইব্রেরি ছাড়া অন্য কোথাও পড়তে অভ্যস্ত নন, তাদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় পড়াশোনা শেষ করার চেষ্টা করা উচিত। তাহলে বাড়িতে এসে রিলাক্স করা সম্ভব হয়। তার বিপরীতে কেউ নিজের বেডরুমেই পড়তে ভালোবাসেন। অন্য কোথাও পড়তে তাদের মন বসে না। তাই প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্টাডি স্টাইল অনুযায়ী স্টাডি স্থান ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হয়।

উত্তম পরিবেশ বজায় রাখতে কতিপয় পরামর্শ : আপনার সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী পড়াশোনার উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ :

১. পড়াশোনার কিছু নিয়মনীতি করা : আপনি যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকেন তাহলে আপনার পড়াশোনার জন্য নিয়মনীতি পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে জানিয়ে দিন। তাহলে তারা আপনার পড়াশোনার বিষয়ে সচেতন থাকবেন

২. আলো ও তাপ ঠিকমতো রাখা : যে রুমে আপনি পড়াশোনা করবেন সেই রুমের আলো ও তাপমাত্রা ঠিকমতো থাকা দরকার। কারণ অধিক আলো আর কম আলোতে পড়তে অসুবিধা হয়, এটি চোখের জন্য ক্ষতিকর। আর অধিক তাপ কিংবা কম তাপ শরীরের জন্য অস্বস্তিকর।

৩. পানীয় সাথে রাখা : মাঝে মধ্যে পানি পান করা দরকার। পানি পান করলে অনেক সময় ক্লান্তি দূর হয় এবং কাজ করার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪. চলাফেরা করা : দীর্ঘ সময় একাধারে বসে থাকা ঠিক নয়। তাই অধিক সময় বসে বসে পড়াশোনা করার পর মাঝে মধ্যে চলাফেরা করা উত্তম।

আপনার উপযুক্ত পরিবেশ আপনিই সৃষ্টি করুন : আপনার স্টাডির জন্য আপনাকেই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোন ধরনের পরিবেশে আপনি পড়াশোনার প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারেন তা আপনিই সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন। আপনার বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনা করে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা আপনার দায়িত্ব। অন্য কেউ আপনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবে এই আশায় বসে থাকার সুযোগ নেই। যে সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে তার পড়াশোনার লক্ষ্য পরিষ্কার থাকে তারা যেকোনো মূল্যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

আপনার পড়াশোনার অভ্যাস পর্যালোচনা করুন : উত্তম স্টাডি ও উত্তম পরিবেশের সাথে পড়াশোনার ব্যক্তিগত অভ্যাস সম্পৃক্ত। সকল ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার অভ্যাস এক ধরনের নয়। তাই সকলের স্টাডি পরিবেশও এক রকম হয় না। আবার স্টাডি

www.nagorikpathagar.com

পরিবেশের সাথে সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি সম্পৃক্ত। তাই আপনার সুযোগ-সুবিধার আলোকে নিজের পড়াশোনার উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আপনার অভ্যাসকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এখন আপনার পড়াশোনার অভ্যাস সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন।

	হ্যাঁ	না
আপনি কি কোনো কিছু দেখে দেখে পড়তে ভালবাসেন?		
অডিও, ভিডিও দেখে কোনো কিছু জানতে বেশি পছন্দ করেন?		
ক্লাসে লেকচার শুনতে ভালবাসেন?		
ক্লাসে লেকচার নোট করতে ভালবাসেন?		
ক্লাসে লেকচার রেকর্ড করতে ভালবাসেন?		
বাড়িতে/নিজ রুমে পড়তে ভাল লাগে?		
লাইব্রেরিতে পড়তে ভাল লাগে?		
অন্য কারো সাথে পড়তে ভাল লাগে?		
সন্ধ্যায় পড়তে ভাল লাগে?		
গভীর রাতে জেগে পড়তে পছন্দ করেন?		
সকালবেলা পড়তে পছন্দ করেন?		
ছুটির দিনসমূহে পড়তে পছন্দ করেন?		
সব সময় পড়তে পছন্দ করেন?		
বিকালবেলা পড়তে পছন্দ করেন?		
একা পড়তে ভালবাসেন?		
বন্ধু-গ্রুপ স্টাডি করতে পছন্দ করেন?		
নিরিবিলি রুমে পড়তে চান?		
গান/টিভিসহ পড়তে চান?		
আপনার প্রত্যেক ৩০ মিনিট পর বিরতি নেওয়া দরকার হয়?		
প্রত্যেক ঘণ্টায় বিরতি নিতে হয়?		
দুই ঘণ্টা পরপর বিরতি নিতে হয়?		
এক ঘণ্টা পর বিরতি নিতে হয়?		

আপনার পড়াশোনার উত্তম স্থান বেছে নিন : সাধারণত নিজ বাসা, লাইব্রেরি, মেস, ছাত্রাবাস কিংবা লজিংয়ে থেকে ছাত্ররা পড়াশোনা করে। বড় বড় লাইব্রেরিতে সাধারণত নিরিবিলি স্টাডি করার জায়গা থাকে। কিন্তু সকল স্থানে বড় লাইব্রেরি নেই। তাই বাসা বা নিজ রুমেই অনেক ছাত্রছাত্রীকে পড়তে হয়। নিজ বাসায় পড়াশোনা করার সময় অনেক কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। এইসব বাস্তবতাকে সামনে রেখেই পড়ার উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

লাইব্রেরিতে পড়াশোনা : যে সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে লাইব্রেরি হচ্ছে পড়াশোনার সবচেয়ে উত্তম স্থান, তারা নিজেদের রুমে পড়াশোনা করতে পছন্দ করে না। অপরদিকে যাদের কাছে লাইব্রেরি হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর সমাগমস্থল, প্রচুর ছাত্রছাত্রীর মাঝে বসে পড়তে তাদের কাছে অস্বস্তি লাগে। উন্নত বিশ্বে প্রায় প্রত্যেক কলেজেই প্রচুর বইসমৃদ্ধ লাইব্রেরি আছে। উন্নত বিশ্বের অনেক লাইব্রেরিতে কমন স্টাডি, ব্যক্তিগত স্টাডি ও গ্রুপ স্টাডির জন্য পৃথক পৃথক স্থান আছে। লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত কম্পিউটার থাকে এবং ব্যক্তিগত ল্যাপটপ ব্যবহারেরও সুযোগ থাকে। আমাদের দেশে সব প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে প্রচুর বই না থাকলেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি খুবই সমৃদ্ধ। এছাড়া কিছু পাবলিক লাইব্রেরি আছে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচুর বই-পুস্তক আছে। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিগুলো খুবই সমৃদ্ধ।

একই রুমে অন্যের সাথে পড়াশোনা করা : খুব কম ছাত্রই একা এক রুমে পড়ার সুযোগ পায়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে নিজ ঘরের পড়ার রুমে একাধিক ভাই-বোনের সঙ্গে পড়াশোনা করতে হয়। মেস, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসেও একাধিক ছাত্রকে একই রুমে পড়তে হয়। একাধিক ছাত্র একই রুমে থাকলে তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে ঃ ১. প্রত্যেকের স্টাডি প্ল্যান ও সময়সূচি একে অপরের জানা দরকার। কোনো ছাত্র রাতে বেশি জাগ্রত না থেকে ভোরবেলায় পড়তে অভ্যস্ত, আর কেউ গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে সকালে ঘুমাতে অভ্যস্ত। পড়াশোনার দুই ধরনের অভ্যাস থাকার কারণে পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া একই রুমে উভয়ের উত্তমভাবে পড়াশোনা করা কঠিন। তাই উভয়ের স্টাডি টাইম একে অপরের জানা থাকা এবং পরস্পরের পড়াশোনায় যেন সমস্যা না হয় তার প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

২. রুমমেটের স্টাডি টাইমে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসে গল্পের আসর জমানো ঠিক নয়। সে সময় কারো বিনোদনের প্রয়োজন হলে অন্যস্থানে গিয়ে গল্প বা বিনোদন করা ভালো।

যেসব ছাত্র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়াস পড়ুয়া। আবার কেউ কম পড়েও ভালো রেজাল্ট করে। আবার কারো ধারণা থাকে, "আমি পড়লেও সেকেন্ড ক্লাস আর না পড়লেও সেকেন্ড ক্লাস পাব। তাই অত পড়ে লাভ কি?" খুব ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছা না থাকায় তাদের গল্পগুজবের সময় বেশি থাকে। আর যাদের ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছা আছে কিংবা গল্পগুজবের পরিবর্তে পড়তে বেশি পছন্দ করে তারা নিরিবিলি পড়তে চায়। তাদের পড়াশোনায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এজন্য অন্যদেরকেও সচেতন থাকা আবশ্যক। কিন্তু কারো মধ্যে এই ধরনের মানসিকতা দেখা যায়, আমিও পড়ব না আর কাউকেও পড়তে দেব না। এই ধরনের মানসিকতা পোষণ করা ঠিক নয়। বিশেষত স্টাডি টাইমে একান্ত জরুরি না হলে কারো রুমে নক করা বা কারো কাছে যাওয়া কিংবা কাউকে ফোন করা উচিত নয়।

আপনার স্টাডি পরিবেশ কেমন : আপনার স্টাডি পরিবেশ কেমন তা নিচের প্রশ্নমালায় টিক চিহ্ন দিয়ে যাচাই করুন :

www.nagorikpathagar.com

	হ্যাঁ	না
নিরিবিলি স্টাডি করার জন্য আপনার কোনো রুম আছে?		
আপনি কি যেকোনো পরিবেশে, যখন ইচ্ছা পড়তে পারেন?		
আপনার পড়াশোনার স্থান কি আনন্দদায়ক?		
আপনার পড়াশোনার জায়গায় আপনার বন্ধু-বান্ধব আনতে পছন্দ করেন?		
আপনার পড়াশোনার স্থানের আলোর ব্যবস্থা কি উপযোগী (খুব বেশি আলো নয় বা একেবারে কম নয়)?		
পড়াশোনার সকল উপকরণ কি পড়াশোনার স্থানে থাকে?		
পড়াশোনার রুমেই কি খাওয়া-দাওয়া করেন?		
পড়াশোনার রুমেই কি ঘুমান?		
আপনার পড়াশোনার স্থানে কি বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ হয় যা আপনার পড়ার ক্ষেত্রে মনোযোগ নষ্ট করে?		
রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আপনি কি পড়তে পারেন?		
আপনার পড়াশোনার রুম কি অন্য কেউ এলোমেলো করে?		

যেকোনো পরিবেশে পড়ার অভ্যাস করুন : সময় যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে যেকোনো পরিবেশে পড়ার মানসিকতা রাখতে হবে। আপনি যদি শুধু একা একা পড়তে অভ্যস্ত হন সেক্ষেত্রে কারো সাথে শেয়ার করে থাকতে হলে আপনার সময় অপচয় হবে। পড়ার পরিবেশ একেবারে নিরিবিলি না হলে এবং সুন্দর স্টাডি টেবিল ও রুম না থাকলে আদৌ পড়া সম্ভব হবে না। আপনাকে যেকোনো পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে পড়ার মানসিকতা রাখতে হবে। কারণ পড়ার জন্য সব সময় উত্তম পরিবেশ ও উত্তম স্থান পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। যদি মানসিকতা এমন হয় যে, উত্তম পরিবেশ না পেলে পড়াই সম্ভব নয়, তাহলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সকল মানুষের পক্ষে সব সময় পড়াশোনার উত্তম পরিবেশ, উত্তম স্থান নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তাই যেখানে সেখানে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বাসে, ট্রেনে ভ্রমণের সময় পড়ুন। নিরিবিলি বা একাধিক জন একই রুমে ঝামেলাপূর্ণ পরিবেশে পড়ার চেষ্টা করুন এবং প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশের সাথে মানিয়ে পড়াশোনা করুন।

গ. কিভাবে স্টাডি করবেন

১. সকল কাজের তালিকা তৈরি করুন : যে সকল কাজ করতে হয় তার তালিকা তৈরি করুন :

	কাজের তালিকা	আনুমানিক সময়
পারিবারিক কাজ		
একাডেমিক কাজ		
সামাজিক কাজ		
সাংগঠনিক কাজ		
ব্যক্তিগত কাজ		

www.nagorikpathagar.com

২. বার্ষিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক ক্যালেন্ডার করুন : বার্ষিক ক্যালেন্ডার দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিকল্পনা করতে সহায়ক। আর মাসিক ক্যালেন্ডার দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনাকে ভাগ করতে সাহায্য করে। সাপ্তাহিক ও দৈনিক ক্যালেন্ডার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক।

৩. স্টাডি সেশন : আপনার ব্যক্তিগত স্টাডির সময়কে কয়েকটি সেশনে ভাগ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ আপনি মর্নিং সেশন, ডে সেশন, ইভনিং সেশন ও নাইট সেশন এই চারভাগে ভাগ করতে পারেন। এবার প্রত্যেক সেশনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন তার আলোকে বিষয় ঠিক করুন এবং সে অনুযায়ী পড়াশোনা করুন।

৪. মনোযোগ সহকারে পড়ুন : মনোযোগ সহকারে না পড়লে পড়ায় বরকত হয় না। তাই প্রথমেই মনোযোগ নষ্টের কারণসমূহের তালিকা করুন। আপনি যখন পড়তে বসেন কী কারণে আপনার মনোযোগ নষ্ট হয় তা আপনি সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন। মনোযোগ নষ্টের কিছু সাধারণ কারণ থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনোযোগ বিনষ্টের কিছু কারণ থাকে। সেইসব কারণ ব্যক্তিগতভাবে দূর করার চেষ্টা চালাতে হবে। তারপর মনোযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে হবে।

পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়

১. নিজেকে পুরস্কার দিন : আপনি দীর্ঘ সময় বিরতিহীন পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনায় অনেক বরকত হয়েছে। তাই নিজকে নিজে পুরস্কৃত করুন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে নিজেকে নিজে পুরস্কৃত করবেন? আপনি যা করলে আপনার মন খুশি হয় কিছু সময় তা করুন। যদি দু-তিন মাস একাধারে পড়াশোনা করেন, তাহলে দু-এক দিনের জন্য কোথাও বেড়াতে যান।

২. প্রথম অতি অল্প সময় মনোযোগসহ পড়া ঃ পড়াশোনার প্রতি আপনার মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। এখন কী করবেন? আপনি যদি এক-দু-তিন ঘণ্টা মনোযোগসহ পড়তে চান তাহলে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হবে। তাই প্রথমত শুধুমাত্র দশ মিনিট একাগ্রচিত্তে কোনো কিছু পড়ার চেষ্টা করুন। তারপর একটু বিরতি দিয়ে আনন্দদায়ক কোনো কিছু করুন। এরপর বিশ মিনিট একাগ্রচিত্তে কোনো কিছু পড়ার চেষ্টা করুন। এইভাবে আস্তে আস্তে মনোযোগসহ পড়ার সময় বৃদ্ধি করে পড়ার চেষ্টা করুন।

৩. জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা : কোনো কিছু জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে সেই বিষয় জানার জন্য মন উদগ্রীব থাকে। জানার কৌতূহলই বিষয়টির উপর পড়াশোনার সময় ব্যক্তিকে মনোযোগী করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারো যদি পেটে তীব্র ক্ষুধা থাকে তাহলে যা খায় তাই ভালো লাগে এবং খাবারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকে। আর পেটে ক্ষুধা না থাকলে সুস্বাদু খাবারও খেতে মন চায় না।

www.nagorikpathagar.com

নিম্নলিখিত কারণে পড়ার সময় মনোযোগ নষ্ট হয়

১. বিরতিহীন দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করলে : বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ সময় পড়লে পড়াশোনার মনোযোগ নষ্ট হয়। এই কারণে মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে মনকে রিচার্জ করা দরকার। যেন পড়াশোনা করতে ভালো লাগে।

২. শারীরিক অসুস্থতা : কখনও কখনও শারীরিক অসুস্থতার কারণে পড়াশোনার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না

৩. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা : ব্যক্তিগত, শারীরিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার কারণে অনেকের পক্ষে পড়াশোনার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

পড়াশোনার ফাঁকে বিরতি দিন, বিরতিহীন পড়াশোনা ভালো নয় ঃ

কারো কারো মানসিকতা এমন থাকে যে, কঠোর পরিশ্রম করব, বইয়ের সবকিছুই পড়ব। কাজ শেষ করার আগে পড়ার টেবিল থেকে উঠব না। কাজ শেষ হওয়ার আগে আমার কোনো ফ্রি সময় নেই। এই ধরনের মানসিকতা পোষণকারীদের পড়াশোনার প্রতি অধিক আগ্রহের কারণে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করলেই ভালো পড়াশোনা হয় না। ভালো পড়াশোনার জন্য ফ্রি সময় ও পড়ার সময়সূচির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। কোনো বইয়ের সবকিছু পড়া প্রয়োজন না-ও হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় অংশই পড়া দরকার। কোনো কাজ করতে গিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন। এ কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে বিলম্ব হতে পারে। তাই মাঝখানে কিছুটা বিরতি দিন। বিরতি দিয়ে মন প্রফুল্ল করে আবার কাজটি করার চেষ্টা করুন। দেখবেন অল্প সময়েই কাজটি হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিচ্ছি, আপনি কম্পিউটারে কাজ করার সময় হঠাৎ কম্পিউটার 'হ্যাং' হয়ে গেলে কম্পিউটার অফ করে পুনরায় চালু করলে দেখা যাবে ঠিকমতোই চলে। অনুরূপভাবে আপনার ব্রেইনও কম্পিউটারের মতো। অনেকক্ষণ ধরে কোনো সূত্র বা কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করার কারণে ক্লান্ত হয়ে যাবার কারণে হয়তো মাথা আর কাজ করছে না। এমতাবস্থায় আপনি যদি মনে করেন, "বিষয়টি সমাধান করার আগে টেবিল থেকে উঠব না"- তাহলে রাত কেটে যাবে, সমাধান হবে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি বিরতি নিন, কোনো কিছু খান, প্রিয় কোনো কাজ করুন বা একটু ঘুমিয়ে নিন। তাহলে পরবর্তী সময়ে টেবিলে বসার পর দেখবেন সহজেই সমাধান বেরিয়ে আসছে।

বাস্তব উদাহরণ : একবার কয়েকজন ছাত্র একটি অংকের হিসাব মেলানোর জন্য রাতভর চেষ্টা করে হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আবার চেষ্টা করার সাথে সাথেই হিসাব মিলে যায়। রাতে সকলেই ঘুমের ঘোরে থাকার কারণে হিসাবে গরমিল ছিল।

www.nagorikpathagar.com

স্টাডি করার সময় বিরতি কেন প্রয়োজন : কারো কারো মতে বিরতি না দিয়ে একসাথে পড়াই ভালো। তাদের যুক্তি হচ্ছে, একবার বিরতি দিয়ে আবার পড়াশোনাতে মনোযোগ দেওয়া কঠিন। তবু এ কথা অধিক যুক্তিসঙ্গত যে, প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই বিরতি দেওয়া ভালো। আল্লাহ বিরতিহীন কিছুই করতে বলেননি। এমনকি ইফতারী ও সেহরী না খেয়ে বিরতিহীন রোযা রাখা ইসলামে নিষেধ। দুই দিনের রোযার মাঝখানে ইফতারী ও সেহরী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন। অনুরূপভাবে একাধারে স্টাডি করাও ভালো নয়। স্টাডির ফাঁকে সংক্ষিপ্ত চা বিরতি বা দীর্ঘ বিরতি দিতে হয়। কোনো ড্রাইভারকেও বিরতিহীনভাবে বেশি ড্রাইভিং করতে দেওয়া হয় না। এটা আইনত নিষেধ। কারণ এতে দুর্ঘটনার আশংকা বাড়ে।

পড়াশোনার ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে বিরতি দরকার। কেন বিরতি প্রয়োজন এ সম্পর্কে অনেক কারণই উল্লেখ করা যায়। যেমন– ১. পড়াশোনা আনন্দঘন রাখে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিরতি দিয়ে পড়লে তুলনামূলকভাবে অধিক সময় পড়া যায়। ২. আপনি যদি ক্লান্ত না হন তারপরও পড়াশোনার মাঝে বিরতি দেওয়া ভালো। এতেকরে মনোযোগ বেশি থাকে। ৩. বিরতি দিলে আপনার মন প্রফুল্ল থাকে। ৪. বিরতি দিলে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত করা সহজ হয়। ৫. পরিকল্পিতভাবে বিরতি দেওয়া দরকার। মনে করুন একটি বইয়ের কোনো অধ্যায় পড়ছেন, আপনার পরিকল্পনা হলো একবার পড়ে বিরতি দিয়ে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় নোট করবেন। এরপরে বিরতি দিয়ে শুরু করার পর নোট সামনে রেখে কোনো বিষয়ে আপনার ড্রাফট তৈরি করবেন। ৬. বিরতি দিলে কীভাবে সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা শেখা যায়। কারণ অধ্যয়নের মাঝখানে একবার বিরতি দিয়ে আবার পড়াশোনা করতে হয়। এর ফলে আপনার পক্ষে সময় নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। ৭. সারাক্ষণ কোনো বই বা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিরতি দিলে আপনার দৃষ্টি অন্যদিকে দিতে পারেন, যা শরীরের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন।

তবে কতক্ষণ বা কত সময়ের জন্য বিরতি দেওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা কঠিন। কারণ একেক জন ছাত্রের একেক ধরনের পাঠাভ্যাস। তাই প্রত্যেকের নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও ইচ্ছার আলোকে বিরতি দেওয়া দরকার। তবে অনেক বইতে আছে, প্রতি বিশ মিনিট পর অন্তত ৫ মিনিট বিরতি দেওয়া ভালো। কেউ কেউ মনে করেন অন্তত প্রতি ৪৫ মিনিট পর ১০ মিনিট বিরতি দেওয়া দরকার। আর কেউ মনে করেন একাধারে সর্বোচ্চ ১.৩০ মিনিট পড়া যায়, এর চেয়ে বেশি নয়।

২. গ্রুপভিত্তিক স্টাডি ঃ অনেক ছাত্র আছে, যারা একা একা পড়তে ভালোবাসে। আবার কিছু ছাত্র কয়েকজন মিলে পড়তে পছন্দ করে। যারা কয়েকজন মিলে পড়তে মজা পায় এই ধরনের একই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তিন-পাঁচজন মিলে এক একটি 'স্টাডি গ্রুপ' করা যায়। স্টাডি গ্রুপ খুব বড় হওয়া ঠিক নয়। খুব বড় হলে বিভিন্ন জনের প্রশ্নের সমাধান খুঁজতেই সকলের সময় চলে যাবে। পড়াশোনার প্রতি সিরিয়াস এমন ছাত্রছাত্রী মিলেই স্টাডি গ্রুপ করা দরকার। প্রত্যেক স্টাডি গ্রুপে কিছু ভালো ছাত্রছাত্রী থাকা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.com

গ্রুপভিত্তিক পড়াশোনার উপকারিতা : একা একা পড়ার চেয়ে কয়েকজন মিলে স্টাডি গ্রুপ করে পড়লে কিছু উপকার আছে। প্রথমত, সকল ছাত্রের ধারণক্ষমতা সমান নয়। তাই শিক্ষকের লেকচার কেউ সহজেই বুঝতে পারে আবার কেউ সহজে বুঝতে পারে না। কয়েকজন মিলে একসাথে বসলে শিক্ষক কী পড়িয়েছেন বা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন তা বুঝা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তাআলা একেকজনকে একেক ধরনের ধীশক্তি দান করেছেন। কোনো জটিল বিষয় হয়তবা একজনের বুঝে আসছে না; কিন্তু তা গ্রুপের আরেক জন সহজেই বুঝতে পারে। এভাবে জটিল বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তৃতীয়ত গ্রুপভিত্তিক পড়াশোনার মাধ্যমে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। চতুর্থত, কেউ কোনো দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও অন্যের সহযোগিতায় পাঠ বোঝা যায় এবং একে অপরের ক্লাস নোট দেখে নিজের নোট সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের সুযোগ পায়। পঞ্চমত, একজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল রেফারেন্স বই কেনা বা সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু স্টাডি গ্রুপ হলে গ্রুপের একেকজন একেকটি বই কিনতে বা সংগ্রহ করতে পারে এবং পরস্পর বই বিনিময়ের মধ্যে বই পড়াতে ও শেয়ার করতে পারে। ষষ্ঠত, কর্মজীবনে অনেকের সাথেই কাজ করতে হয়। ছাত্রজীবনে গ্রুপ স্টাডির অভ্যাস গড়ে উঠলে কর্মজীবনে অনেকের সাথে মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। সপ্তমত, গ্রুপ স্টাডি করলে যেকোনো আইডিয়া অধিক পরিপক্ব হয়। কারণ এতে সকলের মতামত যোগ হয় এবং ভাবের আদান-প্রদান হয়।

গ্রুপ স্টাডির নেতিবাচক দিকসমূহ : ১. গ্রুপের সকলেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী না হলে উপস্থিতি কম হয়। এতেকরে আগ্রহে ভাটা পড়ে। ২. অনেকেই একসাথে কথা বলার কারণে সময় বেশি লাগে। ৩. একাধিক লোক একসাথে থাকার কারণে গল্প বেশি হয়। ৩. ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা সামাধানের আগ্রহ কমে যায়। ৪. গ্রুপের অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। ৫. বড় গ্রুপে সময় অপচয় হয়। আড্ডায় নিয়মিত হতে পারে।

গ্রুপ স্টাডির জন্য কতিপয় পরামর্শ : ১. নিয়ম-নীতি প্রয়োজন ঃ স্টাডি গ্রুপের সদস্যদেরকে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে কিছু নিয়ম-নীতি ঠিক করতে হবে। নিয়ম-নীতি থাকলে গ্রুপ স্টাডির সদস্যদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় না। নিয়ম অনুসরণ করে গ্রুপের সদস্যরা একে অপরকে সহযোগিতা করলে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

২. স্টাডি গ্রুপ পরিচালক : গ্রুপের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিমাসের জন্য এক একজন পরিচালক হতে পারে। নামের বা জন্মতারিখের ক্রমধারা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পরিচালক করা যেতে পারে।

৩. গ্রুপ মিটিং : প্রতি মাস/সপ্তাহে কয়বার গ্রুপ স্টাডি করা হবে তা ঠিক করা দরকার এবং প্রত্যেককে স্বউদ্যোগে গ্রুপ স্টাডির জন্য যাওয়া উচিত।

স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের প্রতি পরামর্শ : স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :

www.nagorikpathagar.com

১. বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা : স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হতে হবে। তাহলেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একে অপরের সহযোগিতায় পড়াশোনা করা সম্ভব। স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের পরস্পরের মনোমালিন্য পুরো গ্রুপের স্টাডির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২. গোপনীয়তা : স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের একে অপরের দুর্বলতা বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়।

৩. পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন না করা : একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেউ সাধারণ কোনো বিষয় না পারলেও এই কথা বলা উচিত নয় যে, 'একেবারে সাধারণ বিষয় পার না, কঠিন বিষয় কীভাবে বুঝবে?

৪. পরস্পরকে প্রতিযোগী নয়, সহযোগী ভাবা : গ্রুপ স্টাডির সদস্যরা পরস্পরকে প্রতিযোগী না ভেবে সহযোগী ভাবা প্রয়োজন। কারণ যদি একে অপরকে ফলাফলের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন তাহলে পরস্পরের মধুর সম্পর্ক দীর্ঘদিন বজায় থাকে না। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, গ্রুপের সদস্যরা কোনো বিষয়কে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন এই ধরনের প্রতিযোগিতা ভালো। ইসলামে প্রতিযোগিতা বৈধ, কিন্তু হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বৈধ নয়। সহপাঠীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সম্পর্ক বজায় রেখেই তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া যায়। প্রতিযোগিতা যেন প্রতিহিংসায় পরিণত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কখনও কখনও প্রতিযোগী একজন ছাত্র আরেকজন ছাত্রের পড়াশোনার উপকরণ নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। লাইব্রেরিতে কোনো ভালো বই পেলে তা গোপন করে রাখে কিংবা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলে, যেন তার প্রতিযোগী ছাত্র তা না পায়।

৫. পরস্পরকে পরামর্শ প্রদান ঃ গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে পড়তে হবে, কোন বই পড়া ভালো, কোথায় বইটি পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরকে পরামর্শ দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, অপরকে পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজে তা অনুসরণ করা কঠিন। তাই অপরের পড়াশোনার উন্নতির জন্য পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি নিজের পড়াশোনার উন্নতির জন্যও নিজেকে নিজে পরামর্শ দেওয়া দরকার।

৬. গঠনমূলক সমালোচনা ঃ স্টাডি গ্রুপের সদস্যরা পরস্পরের স্টাডি টেকনিক সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারো পড়ার টেকনিক বা লেখার টেকনিক আরও উন্নত করা সম্পর্কে কারো যদি গঠনমূলক কথা থাকে তা নির্দ্বিধায় বলা দরকার। একে অপরের পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা শোনা এবং তার আলোকে স্টাডি টেকনিক উন্নত করার ব্যাপারে আন্তরিক থাকা উচিত।

৭. অপরের কথা শোনা : গ্রুপভিত্তিক পড়াশোনার সময় শুধু নিজের কথা অপরকে শোনানোর চেষ্টা করা ঠিক নয়। আপনি আপনার কথা সংক্ষেপে বলুন এবং অপরের কথা বেশি শোনার চেষ্টা করুন। কেউ যদি সারাক্ষণ কথা বলতে চায় তাহলে গ্রুপের অপর সদস্যদের মনে তার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.com

৮. বোঝার জন্য প্রশ্ন করা : গ্রুপের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনার সময় যে সকল প্রশ্ন সৃষ্টি হয় তা লিপিবদ্ধ রাখতে পারেন। যখন গ্রুপ স্টাডিতে বসা হয় তখন প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করা যায়। গ্রুপের যারই সন্তোষজনক জবাব জানা থাকে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেবেন। কারো যদি জানা না থাকে তা পরে বই স্টাডি করে কিংবা অন্য কারো সহযোগিতায় জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

৯. ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, একাডেমিক সমস্যা আলোচনা : গ্রুপের সদস্যদের কমবেশি ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্যা একান্ত জরুরি না হলে গ্রুপ স্টাডির সময় উপস্থাপন না করাই ভালো। গ্রুপ সদস্যদেরকে শুধু একাডেমিক সমস্যার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কিন্তু কখনও দেখা যায়, একসাথে কয়েকজন বসলে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে করতে স্টাডির সময় শেষ হয়ে যায়।

১০. হুবহু কারো কপি না করা : স্টাডি গ্রুপের সদস্যরা একে অপরকে সহযোগিতা করবে, কিন্তু কারো কিছু হুবহু কপি করবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলে একজন লিখলে বাকিরা তা হুবহু কপি করে জমা দেওয়া উচিত নয়। অ্যাসাইনমেন্ট কীভাবে লিখতে হবে, অ্যাসাইনমেন্টের মৌলিক পয়েন্ট, এই সম্পর্কিত তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করা ভালো। কিন্তু কারো ড্রাফট হুবহু কপি করা ঠিক নয়। এতে প্রত্যেকের সৃজনশীলতা নষ্ট হয় এবং কয়েকজনের লেখা হুবহু এক হলে শিক্ষক নম্বর বেশি প্রদান করেন না।

১১. উদ্দীপনা দেওয়া : গ্রুপ সদস্যদের পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার পাশাপাশি একে অপরকে পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়া প্রয়োজন। কখনও কখনও দেখা যায়, উদ্দীপনামূলক একটি বাক্য অনেকের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে জাদুকরী প্রভাব ফেলে। গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে যারা পড়াশোনায় ভালো তাদের উচিত অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের সব সময় উৎসাহ দেওয়া।

১২. ইনসাফ বজায় রাখা : গ্রুপের সদস্যদের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একে অপর থেকে বই ধার নেওয়া, কাউকে কোনো তথ্য প্রদান করা, কারো মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে তা দূর করাসহ সকল ক্ষেত্রেই ইনসাফ বজায় রাখা একান্ত জরুরি। ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সকল কিছু বিচার করা না হলে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্টাডি গ্রুপের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।

১৩. প্রতারণামুক্ত থাকা : গ্রুপ স্টাডির সদস্যরা একে অপরকে প্রতারণা করা মারাত্মক অন্যায়। সকলে একে অপরকে সরল মনে সহযোগিতা করা উচিত। আপনার কাছে কোনো তথ্য থাকলে তা আরেকজনকে দেওয়া এবং তার কাছে কোনো তথ্য থাকলে তা নেওয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকেরই পড়াশোনায় উন্নতি হয়। কেউ যদি শুধু পেতে চায় কিন্তু দিতে না চায় তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.com

ঘ. **শিক্ষা-উপকরণ ঃ** শিক্ষা-উপকরণের সাথে কয়েকটি বিষয় সম্পৃক্ত :

১. **একাডেমিক উপকরণ সংগ্রহ :** এজন্য শিক্ষাবছরের শুরুতেই টেক্সট বই ও রেফারেন্স বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী তা সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. **শিক্ষার আনুষঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ :** পড়াশোনার স্থান অনুযায়ী আনুষঙ্গিক উপকরণাদি রাখা দরকার। সাধারণত ভালো করে পড়াশোনার জন্য নিজস্ব স্টাডি টেবিল, আরামদায়ক চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিধান, টেক্সট ও রেফারেন্স বই থাকা দরকার। অনেক ছাত্রছাত্রী বর্তমানে হাতে লেখে না, কম্পিউটারে কম্পোজ করে। এমনকি টাইপ রাইটিং-এর প্রচলনও খুব একটা নেই। তাই রেকর্ডিং, কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ আধুনিক উপায় উপকরণও পড়াশোনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

৩. **শিক্ষা-উপকরণ ঠিকমতো রাখা :** প্রথমত, ঠিক করা দরকার পড়াশোনার জন্য আপনার কী কী জিনিস জরুরি (Indenitifying the learning needs)— সেই সকল জিনিস গুছিয়ে রাখা দরকার। কারো পড়ার টেবিলে বসার পর পড়াশোনার উপকরণ খুঁজতে খুঁজতে পড়ার সময় চলে যায়। কোনো ছাত্র বই বা শিক্ষা-উপকরণ ঠিকমত না পেলে মন খারাপ হয়, এমনকি পড়ার মানসিকতাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতিদিনের পড়া শেষে পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা উত্তম। কারো কারো পড়ার টেবিলে বসার পর কাগজ খুঁজতে একবার, কলম খুঁজতে আরেকবার, পানির গ্লাস আনতে তৃতীয়বার আর পানি পান করে বাথরুমে যেতে চতুর্থবার উঠতে হয়। এতে পড়ার সময় চলে যায়। এ জন্য পড়ার টেবিলে বসার আগেই পড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে রাখা দরকার।

৪. **পড়ার টেবিল এলোমেলো দেখলে ক্ষেপে না যাওয়া :** কখনও দেখা যায় ছোট ভাই-বোন বা অন্য কেউ পড়ার টেবিল এলোমেলো করে ফেলে। এতে ক্ষেপে যাবেন না। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মাথা গরম করলে কি পড়ার টেবিল ঠিক হয়ে যাবে? যদি রেগে গেলে পড়ার টেবিল ঠিক হয়ে যেতো তাহলে আপনার ইচ্ছামতো সর্বোচ্চ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা ঠিকই হতো। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একাধিক মানুষ কোনো ঘরে থাকলে বিশেষত ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে পড়ার টেবিল এলোমেলো হওয়াটা স্বাভাবিক। এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে দ্রুত পড়ার টেবিল গুছিয়ে পড়তে বসা দরকার। তাহলে আপনার সময় অপচয় কম হবে। তবে আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যেন আপনার পড়ার টেবিল অন্য কেউ এলোমেলো করতে না পারে। এজন্য পরিবারের অন্য সদস্যদেরও সচেতন থাকা উচিত।

স্টাডির ক্ষেত্রে আরও কতিপয় পরামর্শ

১. **পর্যালোচনা ও পুরস্কার :** পড়াশোনায় ভালো করলে বা পরিকল্পনা অনুযায়ী পড়াশোনা হলে নিজেকে নিজে পুরস্কৃত করা দরকার। একজন ছাত্রের পড়াশোনার অগ্রগতি হচ্ছে কিনা তা সহজেই অনুমান করা যায়। পড়াশোনায় অগ্রগতি হলে কিংবা কখনও পড়াশোনা না হলে আত্মপর্যালোচনায় ধরা পড়ে। তাই মাঝে মধ্যে

www.nagorikpathagar.com

আত্মপর্যালোচনা বা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা উচিত। আপনি পড়ার যে টার্গেট নির্ধারণ করেছেন সে টার্গেট অনুযায়ী আপনার পড়া হচ্ছে কিনা, লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পড়ার বর্তমান টেকনিক ও গতি যথেষ্ট কিনা, যা পড়েছেন তা কতটুকু আয়ত্তে এনেছেন এসব বিষয়ে নিজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিজেকে নিজেই মূল্যায়ন করা দরকার। কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, আমি তো কিছু জানি না, কিছুই করি না, কি-ইবা পর্যালোচনা করবো? এই ধরনের মানসিকতা পোষণ করা ঠিক নয়। কারণ আপনি যা জানেন না তা জানার জন্যই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট দরকার। পরীক্ষক আপনার পরীক্ষা নেওয়ার আগে নিজেই নিজের পরীক্ষা নিলে পরীক্ষায় ভালো করা যায়। এই কারণে হযরত ওমর (রা) প্রায়ই বলতেন, "তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হওয়ার আগে দুনিয়াতে নিজেই নিজের হিসাব নাও।"

আত্মপর্যালোচনার জন্য পরামর্শ

১. পর্যালোচনার সময় আপনার সাথে অন্য যারা পড়াশোনা করছে তাদের তুলনা করুন। এক্ষেত্রে আরেকটি হাদীসের প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেক কাজের ক্ষেত্রে আপনার চেয়ে যারা বেশি নেক আমল করে তাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবা দরকার, আমার আরও বেশি নেক আমল করা দরকার। আর কোনো সমস্যায় পড়লে আপনার চেয়ে অধিক সমস্যাগ্রস্তদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবা দরকার যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে অনেক ভালো রেখেছেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ভালো ছাত্রছাত্রীদের কথা বেশি স্মরণ করা দরকার। তারা কীভাবে পড়াশোনা করছে। আপনার চেয়ে কম পড়াশোনা যারা করে তাদের কথা মনে করে এই ধরনের পুলক অনুভব করা ঠিক নয় যে, আমি তা অনেকের চেয়ে ভালো।

২. পর্যালোচনার সময় পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক সময় পড়ার পরিকল্পনা ও লক্ষ্য পরিবর্তন করতে হয়। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্টাডি পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে রাখা উত্তম পড়াশোনার জন্য জরুরি। বিষয়টি এমন নয় যে, একবার পরিকল্পনা করার পর তা আর পরিবর্তন করা যাবে না।

২. সব সময় পড়া যায় এমন কিছু সাথে রাখা : আপনার সাথে সব সময় কোনো নোট বই বা সহজেই বহন করা যায় পড়াশোনার এমন কোনো উপাদান রাখা দরকার। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একটি কাজের জন্য যে সময় রাখা হয়, তার আগেই কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়। অথবা কোনো কাজে বের হওয়ার পর পথে কোনো কারণে আটকা পড়তে হয় এই সময় কি করবেন? আপনার সাথে পড়ার মতো কিছু থাকলে পড়তে পারেন আর পড়ার মতো কিছু না থাকলে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বা বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.com

ধরনের চিন্তা করে সময় কাটাতে হয়। সময় যেন অপচয় না হয় এ কারণে সব সময় শিক্ষা-উপকরণ সাথে রাখা দরকার।

৩. ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্পর্ক বজায় রাখা : পড়াশোনার সাথে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হলে পড়াশোনায় বরকত হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের মধ্যকার সম্পর্কও হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের জন্য 'উসওয়া' বা আদর্শ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে কৌতুক করেছেন, একসাথে খেয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন। একজন শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক শুধু ক্লাসের লেকচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার :

১. আপনি কার কাছে কতটুকু পড়েছেন তা দেখার বিষয় নয়। কারো কাছে একটি অক্ষর শিখলেও তিনি আজীবনের জন্য আপনার শিক্ষক। তাই তাকে আমরণ শ্রদ্ধা করা উচিত।

২. শিক্ষকের প্রতি কী ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা সাহাবা, তাবেয়ীন ও যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষীর জীবন-ইতিহাস থেকে জানা যায়।

৩. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার সম্পর্ক। এই কারণে কোনো আরবী কবি বলেছিলেন, "আমার পিতা-মাতার তুলনায় আমি আমার ওস্তাদকে অগ্রাধিকার প্রদান করি। কারণ আমার পিতা-মাতা আমার দেহ লালন করেছেন, আর শিক্ষক আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন।

৪. শিক্ষক সম্পর্কে সব সময় ভালো ধারণা পোষণ করা উচিত। তার পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, তারাও মানুষ। সকল বিষয় তার জানা থাকবে এমন ভাবা ঠিক নয়। শিক্ষককে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করলে বলতে না পারলে ঐ শিক্ষক সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা বা খারাপ মন্তব্য করা উচিত নয়।

৫. শিক্ষকের লেকচার আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত বই পড়ে যা বোঝা যায় না তা কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের এক লেকচার থেকেই বোঝা যায়। এ কারণে ক্লাস লেকচার মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত।

৬. শিক্ষকের সামনে আপনার আগ্রহ ও উদ্দীপনা তুলে ধরা উচিত। অর্থাৎ আপনি ঐ বিষয়ে জানতে খুব আগ্রহী এমন ভাব দেখালে তিনি ক্লাস লেকচারের বাইরেও আপনাকে ডেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, যা আপনার পড়াশোনার জন্য খুবই উপকারী।

৭. শিক্ষকের সামনে এমন কোনো কথা বলা উচিত নয় যা থেকে এ কথা প্রকাশ পায় যে, আপনি তাঁকে পছন্দ করেন না। কোনো শিক্ষকের আচরণ আপনার ভালো না লাগলেও তা নিজের মধ্যে রাখবেন। এমনকি আপনার নিকটস্থ কোনো

www.nagorikpathagar.com

বন্ধু-বান্ধবের কাছেও বলবেন না। কারো কাছে মনের কথা বললে তা আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারে। এমনকি শিক্ষকের কানেও এটি চলে যেতে পারে।

৮. ক্লাসে মনোযোগী ও নিয়মিত উপস্থিত থাকার সাথে সাথে শিক্ষক যেসব কাজ দেন তা যথাযথভাবে করার চেষ্টা করা দরকার। কোনো শিক্ষক যে ধরনের আচরণ পছন্দ করেন তা যদি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তা করাতেও কোনো আপত্তি নেই।

৪. ক্লাস লেকচার ভালোভাবে শোনা ও তা শুনতে যাওয়ার আগে করণীয়

১. শিক্ষক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা : ক্লাস শিক্ষকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কোন শিক্ষক কোন ধরনের, কার মেজাজ কেমন, কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদের সাথে কৌতুক করেন আবার কোন শিক্ষক ছাত্রদের সথে মেশেন না। যিনি কৌতুক পছন্দ করেন না তার সাথে কৌতুক করলে তিনি রেগে যেতে পারেন। তাই শিক্ষকের মন-মেজাজ অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

২. লেকচার শোনার মানসিক প্রস্তুতি : ক্লাস লেকচার শোনার জন্য পূর্ব থেকে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। সাধারণত আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তী ক্লাসে কোন বিষয়ে আলোচনা হবে। তাই উক্ত বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে স্টাডি করে ক্লাসে গেলে শিক্ষকের লেকচার বুঝতে সহজ হয়।

৩. কী জানতে চান প্রশ্ন ঠিক করে যাওয়া : আপনি ক্লাস লেকচারে কী জানতে চান তা নোট করে নিয়ে যাওয়া উত্তম। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকের লেকচার শোনার পর আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি লেকচারে সকল প্রশ্নের উত্তর জানা না যায় তাহলে আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

৪. নিজের মতামত : কোনো বিষয় পড়াশোনা করার পর নিজস্ব ধারণা বা অভিমত লিপিবদ্ধ/স্থির করা ভালো। ক্লাসে শিক্ষকের বক্তব্য শোনার পর আপনার মতামত পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

৫. পূর্বের লেকচারের সাথে যোগসূত্র : অনেক সময় পূর্বের লেকচারের সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই ক্লাসে লেকচার দেওয়া হয়। তাই ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে আগের ক্লাস নোট এক নজর দেখা এবং উভয় লেকচারের মাঝে যোগসূত্র খুঁজে বের করা উত্তম।

লেকচারের সময় করণীয়

১. ক্লাস লেকচার ভালোভাবে শোনা ও নোট করা : ক্লাসে শিক্ষকগণ খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। শিক্ষকগণ প্রচুর অধ্যয়ন করে ক্লাস লেকচার প্রস্তুত করেন। ছাত্র বই পড়ে যা বুঝতে কষ্ট হয় শিক্ষক অতি সহজে তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন এবং দুর্লভ অনেক বই থেকে তথ্য প্রদান

www.nagorikpathagar.com

করেন। ক্লাস লেকচারে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মন্তব্য পর্যালোচনা শোনা যায়। তাই ক্লাস লেকচার থেকে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। ক্লাস লেকচারে উপস্থিত থাকলে বিষয়টির উপর আলোচনার সময় অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর মতামতও জানা যায়। এতেকরে গভীর পড়াশোনার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

২. রেকর্ডিং করা : এতে ক্লাস লেকচার ভালোভাবে শোনা যায় এবং ক্লাসে যেসব শব্দ বুঝতে কষ্ট হয়েছে তা বোঝা সম্ভব হয়।

৩. ক্লাসে সক্রিয় থাকা-প্রশ্ন করা : শিক্ষক ক্লাসে পাঠদানের সময় ছাত্রছাত্রী সক্রিয় থাকলে এবং জানার জন্য প্রশ্ন করলে পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে বুঝা যায়। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করার অর্থ হচ্ছে হয়তো সবকিছুই জানা আছে কিংবা কী জানতে হবে, তা-ও জানে না। ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণত ক্লাসে পাঠ শুরু করার আগে শিক্ষক ছাত্রদের মাঝে বিষয়টি প্রশ্নাকারে উপস্থাপন করেন। ছাত্রছাত্রীদের উত্তরের সূত্র ধরেই শিক্ষক ক্লাসে পাঠদান করেন। পাঠদানশেষে কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা জানতে চান।

উল্লেখ্য, পাশ্চাত্যে সাধারণত শিক্ষকের ডাকনাম ধরেই প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটা মারাত্মক বেয়াদবি। তাই শ্রদ্ধার সাথেই শিক্ষককে প্রশ্ন করা উচিত। ক্লাসে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা ভালো। তবে অতিরিক্ত প্রশ্ন কিংবা প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন বা প্রশ্নোত্তরকে বিতর্কে পরিণত করা ঠিক নয়।

লেকচারশেষে করণীয়

১. অপর ছাত্রছাত্রীর সাথে আলোচনা : শিক্ষকের ক্লাস লেকচার শেষ হলে অপর ছাত্রছাত্রীর সাথে ক্লাস লেকচার নিয়ে আলোচনা করা ভালো। এভাবে লেকচার পুনঃ আলোচনা করলে বিষয়টি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

২. হোমওয়ার্ক ঠিকমতো করা : শিক্ষকগণ অনেক সময় বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বাড়ির কাজ করতে চান না। ফলে তারা শিক্ষকের বিরাগভাজন হন। বাড়ির কাজ যথাসম্ভব উত্তমভাবে করা দরকার। এতে সহজেই ক্লাসের পড়া বোঝা যায়। হোমওয়ার্ক ঠিকমতো করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষক কী করতে বলেছেন তা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। হোমওয়ার্ক করার সময় কারো লেখা বা বই হুবহু কপি করা ঠিক নয়। তথ্যসূত্র উল্লেখ না করে কোনো বই থেকে কপি করার নাম PLAGIARISM.[১] বিভিন্ন বই পড়ে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

লেকচার রেকর্ড : ক্লাস লেকচার নোট করার পর তা সুন্দর করে লেকচার রেকর্ড ফাইলে সংরক্ষণ করে রাখা দরকার। লেকচার রেকর্ড ফাইল করার জন্য একটি ছক দেওয়া হল :

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

www.nagorikpathagar.com

বিষয়/কোর্স : লেকচারের বিষয়বস্তু :	লেকচারারের নাম : তারিখ : স্থান :
লেকচার শোনার পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার সময় যেসব প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে	
লেকচারার কর্তৃক উপস্থাপিত ভূমিকা	
লেকচারের মূল পয়েন্টসমূহ	
মূল পয়েন্টের সমর্থনে উদাহরণ প্রমাণ	
লেকচারার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নাবলি	
রেফারেন্স বইয়ের তালিকা	

৫. স্টাডি ও বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক : আপনার পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সহযোগিতা করতে পারে। তাদের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পেতে পারেন তা চিন্তা করুন। যেমন আপনি একজন রিসার্চ স্টুডেন্ট, বিদেশ থেকে আপনার কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, এক্ষেত্রে সে দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা নিতে পারেন। এভাবে কার কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পেতে পারেন তার তালিকা তৈরি করে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আপনার তালিকা অনুযায়ী ৬০% আশা পূরণ না-ও হতে পারে। কারণ যারা বিদেশে থাকে, প্রত্যেকেই নানা কাজে ব্যস্ত। কারো কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখার পর তার জবাব না পেলে হতাশ হবেন না এবং তার সাথে সম্পর্ক খারাপ করবেন না। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কাউকে কাউকে দেখা যায় পড়াশোনার চাপে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারো সাথে ন্যূনতম যোগাযোগও রক্ষা করেন না। এতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টির অবকাশ থাকে। তাই আপনার পড়াশোনার ব্যস্ততার বিষয় আপনার নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে পরিষ্কার রাখা ভালো।

৬. ছোট ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে পড়াশোনা : অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে পড়তে হয়। বিশেষত বিবাহিত ছাত্রছাত্রীর সন্তান থাকলে আর তাদের দেখাশোনা করার জন্য অন্য কেউ না থাকলে নিজের ছেলে-মেয়েদের সাথে নিয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ :

ক. শিশুকে ব্যস্ত রাখার পরিকল্পনা : শিশু নিরিবিলি থাকতে পারে না। সে সঙ্গ চায়, খেলাধুলা করতে চায়। তাই শিশুকে ব্যস্ত রাখার জন্য পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকতে হবে। আপনি যদি শিশুকে ব্যস্ত রাখার পরিকল্পনা করতে না পারেন তাহলে শিশুই আপনাকে ব্যস্ত রাখবে।

খ. শিশুকে আপনার পড়াশোনার অংশ বানানো : শিশুর তত্ত্বাবধান আপনার পড়াশোনার অংশ বানিয়ে ফেলা উচিত। কারণ শিশুর প্রতি বিরাগভাজন হলে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। শিশুর উপর রাগ করলে সে উল্টো আপনার উপর রাগ করবে কিংবা কান্না করবে। এতে পড়াশোনার সময় অপচয় হয়।

www.nagorikpathagar.com

গ. পর্যাপ্ত খেলনা রাখা : শিশুর খেলার জন্য পর্যাপ্ত খেলনা রাখা জরুরি। খেলনার বাইরে আপনার ঘরে ভিডিও প্লেয়ার থাকলে ইসলামী ভালো কোনো ভিডিও দিতে পারেন। বিশেষত কার্টুন ছবি শিশুরা পছন্দ করে।

ঘ. ঘুমের সময় পড়া : শিশু যখন ঘুমায় সেই সময় পড়তে পারেন। এই জন্য শিশুর ঘুমের টাইমটেবিল করা দরকার। তাকে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো, খাওয়া, গোসল ও খেলাধুলার প্রতি অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

ঙ. শিশুর সাথে খেলা ও পড়া : শিশুর সাথে খেলা ও পড়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। শিশুর সাথে খেলার সময় কী পড়া যায় তা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক শব্দ খেলার মাঝে শেখা যায়।

চ. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহযোগিতা : স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে কিছু সময় বাইরে কোথাও নিরিবিলি পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সাপ্তাহিক পরিকল্পনার সময় বাবা-মা কখন পড়বেন এবং কখন শিশুর সাথে সময় দেবেন তা নির্দিষ্ট করা ভালো।

রিডিং স্কিলস

আমরা কেন পড়ি এবং কী ধরনের বই পড়ি (Reasons for reading & types of Books) : আমরা যা জানি না তা জানার জন্য পড়ি। কিন্তু কোনো বই পড়ার আগে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন কেন পড়বেন? বইটি পড়ে কী জানতে চান? কোনো বই বা প্রবন্ধ পড়ার উদ্দেশ্য নিজের কাছে পরিষ্কার থাকলে পড়ার আগ্রহ থাকে, মনোযোগ বাড়ে। সাধারণত কয়েকটি কারণে আমরা কোনো কিছু পড়ি :

১. দীন জানা ও বোঝার জন্য, এজন্য আমরা কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, আকাইদসহ বিভিন্ন ধরনের ইসলামী সাহিত্য পাঠ করি।
২. ক্লাসের লেকচার বোঝার জন্য টেক্সট বই তথা সিলেবাসের বই ও রেফারেন্স বই পড়া হয়।
৩. কোনো বিষয়ে রিসার্চ করার জন্য গবেষণাধর্মী বই, প্রবন্ধ ও রিসার্চ রিপোর্ট পড়া হয়।
৪. কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করার জন্য বা কারো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বই খুঁজতে হয় এবং পড়তে হয়।
৫. কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য, যেমন শরীআহ্, ফিকহ্, মেডিক্যাল সায়েন্স, আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশুনা করতে হয়।
৬. ভাষার উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাকরণ, অভিধান পড়া হয়।
৭. আনন্দ উপভোগ করার জন্য যেমন– নাটক, উপন্যাস।
৮. দেশ-বিদেশের খবরাখবর জানার জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়া হয়।

জনৈক লেখক বলেন, পড়ার সাথে ছয়টি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। আর তা হচ্ছে : What, Why, Who, Where, When, How?

www.nagorikpathagar.com

অর্থাৎ আপনি কী শিখতে চান, কেন শিখতে চান, কার কাছে শিখতে চান, কোথায় শিখতে চান, কখন শিখতে চান এবং কীভাবে শিখতে চান? তাই কোনো বই পড়ার আগে ভালো বই কি না চিন্তা করুন। কেননা আমরা কী ধরনের বই পড়ি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা জন্মে। এই কারণে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন,

"Tell me what you read and I shall tell you who you are."[২]

পাঠকের সংজ্ঞা : জানার জন্য যারা কোনো কিছু পড়েন তারাই পাঠক। সাধারণত মানুষ জানার জন্য অনেক কিছু পড়ে। যেমন, কুরআন হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। পাঠককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ জেনারেল রিডার (সাধারণ পাঠক) ও স্টুডেন্ট রিডার। 'সাধারণ পাঠক' বলতে এমন সকল মানুষকে বোঝানো হয় যারা বই পড়েন। আর 'স্টুডেন্ট পাঠক' বলতে সেই সকল ছাত্রছাত্রীকে বোঝানো হয় যারা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হিসেবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বই পড়েন।

ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা : ছাত্র হিসেবে অনেক ধরনের বই পড়তে হয় :

ক. টেক্সট বই, খ. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের অনেক রেফারেন্স বইও পড়তে হয়। সাধারণত শিক্ষকের দেওয়া রেফারেন্স তালিকা থেকে বই নির্বাচন করা হয়।

বই পড়ার উদ্দেশ্য : অনেক উদ্দেশ্যে বই পড়া হয় :

১. রচনা বা অ্যাসাইনমেন্ট লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।
২. কোনো বিষয়ে জানার পরিধি বিস্তৃত করার জন্য।
৩. কোনো বিষয়ে লেখার সময় অন্যরা কী লিখেছে তা জানার জন্য।
৪. শিক্ষক উক্ত বই পড়তে বলেছেন।
৫. বই থেকে কোনো উদ্ধৃতি প্রদান করার জন্য।
৬. রাইটিং স্কিলস উন্নত করার জন্য।
৭. অন্য তথ্যসূত্র থেকে রেফারেন্স দেওয়ার জন্য।
৮. কোনো রচনা লেখার ক্ষেত্রে উক্ত বই থেকে ধারণা পাওয়ার জন্য।
৯. কোনো বিষয়ে ব্যক্ত মতামতের পক্ষে অন্যদের মতামত তুলে ধরে বক্তব্য শক্তিশালী করার জন্য।
১০. কোনো বিষয়ে অধিক জানার জন্য।
১১. পরীক্ষায় পাস করার জন্য।
১২. কোনো বিষয়ে ব্যক্ত মতামত পরিবর্তন করার জন্য।
১৩. কোনো লেখককে ভালো জানার কারণে তার বই পড়া হয়।
১৪. কেউ বই উপহার দেওয়ায় বইটি পড়া হয়।
১৫. শিক্ষক বইটি লেখায় শিক্ষকের লেকচার বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে মনে করে সেই পড়া হয়।

---

২. আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী (২০০২) , Time in the Life of a Muslim London Taha Publishers. P.48

www.nagorikpathagar.com

১৬. লাইব্রেরি থেকে ধার নেওয়ার জন্য এসে যে বইটি ধার নেওয়ার সুযোগ হয় তাই পড়া হয় ইত্যাদি।

বই পড়ার উপরিউক্ত কারণসমূহের মধ্যে সকল কারণ যৌক্তিক নয়। যেমন- কোনো লেখককে ভালো জানার কারণে তার সকল বই আপনাকে পড়তে হবে তা নয়। অনুরূপভাবে কোনো একটি বই ভুলক্রমে কেনার কারণে তা পড়তেই হবে এমন কথা নেই। কোনো বই পড়ার আগে যৌক্তিক কারণ খুঁজে বের করতে হবে যে, কেন বইটি পড়া দরকার।

পড়ার টেকনিক : এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কারণে এবং নানান উদ্দেশ্যে আমাদেরকে অনেক কিছু পড়তে হয়। যেমন- টেক্সট বই, রেফারেন্স বই জার্নাল, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা, অফিসিয়াল রিপোর্ট, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি। কিন্তু সকল পাঠকই সমান মনোযোগী পাঠক নন। কিছু ছাত্রছাত্রী পাঠ্যবই পড়তে মজা পায়। আর কিছু ছাত্রছাত্রীর কাছে পাঠ্যবই পড়তে তেমন মজা লাগে না। এর পরিবর্তে গল্প বা উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে। অপরদিকে যতজনই বই পড়েন সকলের রিডিং স্কিলস সমান না থাকায় বই পড়ে প্রত্যেকে সমান উপকৃত হয় না। তাই রিডিং স্কিলস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

আপনি কোন ধরনের পাঠক : আপনি কোন ধরনের পাঠক তা আগে পর্যালোচনা করুন। এজন্য নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন :

	হ্যাঁ	না
যেকোনো বই পড়তে আপনি ভালোবাসেন? যদি উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে কেন ভালো লাগে তা লিখুন।		
বই পড়তে কষ্ট লাগে? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তাহলে কেন?		
কখনও বই পড়তে ভালো লাগে আর কখনও বোরিং লাগে? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তাহলে কারণ লিখুন।		
আপনি কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন?		
কোনো কারণে উপরিউক্ত ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন?		
আপনি কি মনে করেন আপনি একজন ভালো পাঠক? যদি তাই হয় তাহলে কেন নিজেকে 'ভালো পাঠক' মনে করেন? কারণগুলো লিখুন।		
আপনি কি বাধ্য হয়েই পড়েন, না পড়তে মজা লাগে তাই পড়েন?		
আপনি কি একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানা ধরনের বই পড়তে মজা পান, না একই বিষয়ের একাধিক বই বা একটি বই শেষ করে আরেকটি বই পড়তে মজা পান?		
কোনো বই পড়া শুরু করার পর শেষ করতে না পারলে আপনার কি খারাপ লাগে?		
কোনো বই পড়া শেষ হলে বই সম্পর্কে অন্য কারো সাথে কথা বলতে কি আপনার আনন্দ লাগে?		
বই পড়ার সময় আপনি কি নোট করেন?		

www.nagorikpathagar.com

বই পড়ার ক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ

১. জানা-অজানা বিষয়ের তালিকা করা : কোনো বিষয় পড়ার জন্য ঠিক করার পর উক্ত বিষয়ে পড়াশোনা শুরুর আগে সেই বিষয়ে আপনি কী জানেন তার তালিকা তৈরি করুন। যে বিষয়ে পড়তে মনস্থ করেছেন উক্ত বিষয়ে আপনি কী জানেন আর কী জানেন না এবং কি জানতে চান তার তালিকা তৈরি করে পড়াশোনা করলে বিষয় সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়।

২ শিক্ষা বছরের শুরুতেই বই পড়ার সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করতে হবে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে কয়টি বই পড়া দরকার তার তালিকা তৈরি করুন।

৩. অগ্রাধিকার তালিকানুযায়ী বই নির্বাচন করুন : বই পড়ার তালিকা থেকে অগ্রাধিকার তালিকানুসারে বই নির্বাচন করে পড়ুন।

৪. একাডেমিক উদ্দেশ্যে কোনো বই বা প্রবন্ধ পাঠ শুরু করার পর যদি মনে করেন এই বই বা প্রবন্ধ আপনার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে না, তাহলে উক্ত বই বা প্রবন্ধ পড়ে সময় ব্যয় করার পরিবর্তে আপনার একাডেমিক তথ্যের জন্য সহায়ক এমন বই পাঠ করা উচিত।

৫. বই পড়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক অভ্যাস থাকলে তা দূর করা : বই পড়ার ক্ষেত্রে একেক জনের একেক ধরনের অভ্যাস আছে। যেমন– কেউ জোরে জোরে বই পড়তে অভ্যস্ত। আবার কেউ শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে বই পড়তে চায়। এইভাবে নানাজনের নানা ধরনের বই পড়ার অভ্যাস। শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পড়তে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। আর জোরে জোরে কোনো কিছু পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তার পাশে অন্য কেউ পড়তে পারে না। তাই এই ধরনের অভ্যাস ত্যাগ করাটাই ভালো।

৬. কোনো রেফারেন্স বই পড়ার সময় কাঙ্ক্ষিত সকল তথ্য না পেলে হতাশ হবেন না। আরেকটি রেফারেন্স বই পড়ার চেষ্টা করুন। হয়তবা পরবর্তী বইতে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাবেন।

৭. সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বাধ্য হয়ে কোনো বই পড়বেন না, আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পড়বেন।

বই পড়ার ক্ষেত্রে আপনার অভ্যাস ও স্কিলস পর্যালোচনা

বই পড়ার ক্ষেত্রে আপনার অভ্যাস ও স্কিলস আপনি নিজেই পর্যালোচনা করতে পারেন (নিচের প্রশ্নাবলি সম্পর্কে ভাবুন)।

www.nagorikpathagar.com

আপনি কি আপনার পড়াশোনার অভ্যাস নিয়ে সন্তুষ্ট? পড়াশোনার সময় আপনার কোনো লক্ষ্য থাকে কি না এবং বই পড়ে আনন্দ পান কি না?
দিনের কোন সময়ে পড়তে বেশি ভালো লাগে?
প্রতি সপ্তাহে দৈনিক পড়ার সময়সূচি আছে কি না?
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রথম করেন কি না?
পরিকল্পিত বিরতি নেন কি না?
বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সময় যথাযথভাবে ভাগ করেন কি না?
কোনো কাজ সফলতার সাথে করার পর নিজেকে নিজে পুরস্কৃত করেন কি না?
আপনার স্মরণশক্তি কী ধরনের কাজ করে?
লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা আছে কি না?
কোনো লাইব্রেরিতে কী ধরনের বই আছে সেই সম্পর্কে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন কি না?
প্রতিটি বই সমান পদ্ধতিতে পড়েন কি না?
অভিধান কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানা আছে কি না?
আপনার নোট সহজেই বোঝা যায় কি না? সহজেই রিভাইজ দেওয়া যায় কি না?
আপনার অ্যাসাইনমেন্ট সুপরিকল্পিত কি না?
সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন কি না?
সঠিক ডায়াগ্রাম এবং টেবিল করতে পারেন কি না?
কম্পিউটারের মৌলিক জ্ঞান আছে কি না?
শেষ সময় পর্যন্ত রিভাইজ করেন কি না?
পরীক্ষাভীতি কাজ করে কি না?
আপনি কি জোরে পড়তে পছন্দ করেন?
আপনি কি নিরিবিলি একা একা পড়তে পছন্দ করেন?

বই পড়ার বিশেষ টেকনিক (SQ3R)

১. সার্ভে (Survey) : কোনো বই পড়ার আগে জেনারেল সার্ভে করা দরকার যে, বইটি কী সম্পর্কে? বইতে আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য কতটুকু আছে? বইটি পড়া আপনার জন্য কতটুকু জরুরি? আপনার প্রয়োজন কতটুকু পূরণ হবে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনো একটি বই হাতে নেওয়ার পর তা আপনার পড়ার প্রয়োজন আছে কি না কীভাবে বুঝবেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। আর তা হচ্ছে বইটির শিরোনাম, সূচিপত্র ও প্রকাশকের কথা পড়লেই বইটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয় যে, কোন বিষয় সম্পর্কে বইটি লিখিত এবং কোন অধ্যায়ে কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের ভূমিকা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, মুখবন্ধ পড়েও বই সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জিত হয়।

২. আপনি বইটি পড়ে কী জানতে চান (Question) : বইটি পড়ে আপনি কী জানতে চান এই সম্পর্কে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করুন।

www.nagorikpathagar.com

৩. পড়া (Read) : বইটি পড়ে কী জানতে চান তা আপনার কাছে পরিষ্কার হওয়ার পর বইটি পড়া শুরু করুন। পড়ার ক্ষেত্রে স্কিমিং বা স্কিনিং কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

৪. স্মরণ করার চেষ্টা (Recall/Recite) : বইটি পড়া শেষ হওয়ার পর এবার কী পড়লেন এবং কতটুকু বুঝলেন তা স্মরণ করার চেষ্টা করুন।

৫. পুনরায় পড়া (Review) : বইটি পড়া শেষে কী পড়লেন তা স্মরণ করার চেষ্টা করার সময় দেখবেন কিছু পয়েন্ট ভালোভাবে মনে আছে আর কিছু পয়েন্ট কিছুটা মনে আছে; কিন্তু পুরোপুরি মনে করতে পারছেন না। আবার কিছু পয়েন্ট একদম মনে আসছে না। তাই বইটি আবার পড়ুন। দেখবেন এবার যেসব পয়েন্ট মনে আসছিল না তা ভালোভাবে মনে আসবে।

বই পড়ার আগে কতিপয় বিষয় লক্ষ্য করুন : কোনো বই পড়ার আগে কয়েকটি বিষয় দেখতে হয় :

ক. লেখকের নাম : ভবিষ্যতে উক্ত বই খুঁজে পাওয়া এবং বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য এটা জরুরি।

খ. শিরোনাম-সাবটাইটেল : শিরোনাম সাধারণত বইয়ের আলোচ্য সূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

গ. প্রকাশের তারিখ : বইটি প্রথম কখন প্রকাশিত হয় এবং এই বইটি কততম সংস্করণ তা জানতে সাহায্য করে। বইটি কতবার প্রকাশিত হয়েছে তা জানলে বইটি পাঠকদের মাঝে কেমন সমাদৃত হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়।

ঘ. ব্লার্ব : প্রকাশক কর্তৃক বই ও লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়াকেই ব্লার্ব বলা হয়। এটা সাধারণত বইয়ের কভারের শেষ পৃষ্ঠায় থাকে।

ঙ. সূচিপত্র : সূচিপত্র পড়লে বইতে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জিত হয়।

চ. তথ্যপঞ্জি : লেখক যে সকল বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং আরো যে সকল বইতে এই ধরনের তথ্য আছে তার তালিকাকেই তথ্যপঞ্জি বলে।

ছ. ইনডেক্স : যেকোনো একাডেমিক বইতে সাধারণত ইনডেক্স থাকে। এর মাধ্যমে বইয়ের বিভিন্ন বিষয় দ্রুত অনুসন্ধান করা যায়।

কিভাবে বই পড়বেন : বই পড়ার কয়েকটি ধরন আছে :

১. সিলেক্টিভ রিডিং : পুরো বই কাছে থাকলেও শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অধ্যায়/অংশ পাঠ করা; প্রয়োজন অনুযায়ী পড়া।

২. স্কিম রিডিং ঃ একাডেমিক কোনো তথ্য সংগ্রহ করার সময় রেফারেন্স বই সাধারণত দুইভাবে পড়তে হয়, Skimming and scanning Reading. আপনি যে বইটি পড়ার জন্য নিয়েছেন তা আপনার পড়ার প্রয়োজন আছে কি না কিংবা আপনি যে বিষয়ে কোনো রচনা/প্রবন্ধ লিখতে চান সেই বিষয় উক্ত বইতে আছে কি না এজন্য

www.nagorikpathagar.com

প্রথমে Skimming করতে হয়। Skimming হচ্ছে : A way of reading for the general or main idea of a text.[৩] কোনো বই হাতে নেওয়ার পর এক নজরে মূল পয়েন্টসমূহ পড়া। বইয়ের টাইটেল, সাব টাইটেল (যদি থাকে), লেখকগণের নাম, প্রকাশক, ভূমিকা, উপসংহার পড়ার পর বইতে কাঙ্ক্ষিত তথ্য আছে কি না তা পরিষ্কার হয়ে যায়। পুরো বইটি পড়া দরকার—না নির্দিষ্ট কিছু অধ্যায় বা কোনো একটি অধ্যায়ের অংশবিশেষ আপনার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তা বইটির সূচিপত্র ও বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রথম প্যারাগ্রাফের কিছু অংশ পড়লেই বোঝা যায়।

৩. **স্কিনিং রিডিং ঃ** কোনো নির্দিষ্ট তথ্য/পরিসংখ্যান পাওয়ার জন্য কোনো বই পড়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো টেলিফোন হ্যান্ডবুকে যদি ৫০০ ফোন নম্বর থাকে সেখান থেকে একটি নম্বর খুঁজে বের করা। এজন্য ব্যক্তির ডাক নাম অনুযায়ী অনুসন্ধান করতে হবে।

৪. **বিস্তারিত পড়া** (Detalied Reading) : এটি হচ্ছে পুরো বইটি/অধ্যায়/প্রবন্ধ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া। সাধারণত কোনো বিশেষ অর্থ বা প্রশ্নোত্তর খুঁজে বের করার জন্য পুরো বই পুঙ্খানুপঙ্খভাবে পড়তে হয় এবং বুঝতে হয়।

৫. **বিশ্লেষণধর্মী পড়া** (Close Reading) : অর্থাৎ কোনো বই পড়ার সময় প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণ করে পড়া।

বই পড়ে বুঝতে হলে : সাধারণত কোনো বইয়ের টেক্সট পড়ে অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অর্থ প্রক্রিয়া আছে। আর তা হচ্ছে :

1. Conceptual meaning : the meaning a word can have of its own.
2. Prepositional meaning : the meaning a sentence can have of its own.
3. Contextual meaning : the meaning a sentence can have only when in context.
4. Pragmatic meaning : the meaning a sentence has only as part of the interaction between writer and reader.

কোনো একটি বই পড়ে বুঝতে হলে বিশেষ শব্দগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে। প্রত্যেক বই বা প্রবন্ধে কিছু বিশেষ শব্দ থাকে, যা উক্ত বই বা প্রবন্ধ বুঝতে সাহায্য করে। অন্য কথায় বলা যায়, উক্ত শব্দসমূহ জানা না থাকলে বই পড়ে বোঝা যায় না। তবে প্রথমবার বুঝে আসুক বা না আসুক পুরো প্রবন্ধ পড়া উত্তম। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় অপরিচিত শব্দসমূহের অর্থ জানার চেষ্টা করতে হবে।

---

৩. Ramanoff, Majorie Reinwald, P.74

www.nagorikpathagar.com

আপনি বই পড়ে কেমন বোঝেন পর্যালোচনা করুন : আপনি কোনো বই পড়ে কেমন বোঝেন তা নিজেই পর্যালোচনা করতে পারেন। এই বিষয়ে নিম্নে কতিপয় প্রশ্ন করা হলো ঃ

প্রশ্নাবলি	হ্যাঁ %	না %	মাঝে মধ্যে
আপনি কোনো কিছু পাঠ করার পর বুঝতে পারেন কি না?			
কোন কিছু পাঠ করলে সাধারণত কত ভাগ বুঝতে পারেন?			
পড়তে আনন্দ না লাগলে তা পড়তে মন চায় কি না?			
পড়ার সময় হাইলাইটার ব্যবহার করেন কি না?			
পড়ার সময় নোট করার অভ্যাস আছে কি না?			
বই পড়ে লেখক মৌলিক কী কথা বলতে চেয়েছেন তা অনুধাবন করতে পারেন কি না?			
আপনি বিশেষ কোনো তথ্য জানার জন্য কোনো বই পড়লে সংশ্লিষ্ট তথ্য সহজেই বের করতে পারেন কি না?			
পড়ার পর সারাংশ অনুধাবন করতে পারেন কি না?			

বই পাঠ পর্যালোচনা : আপনি কোনো একটি বই/প্রবন্ধ পাঠশেষে নিজেকে প্রশ্ন করুন :

প্রশ্নাবলি	হ্যাঁ	না
আপনি উক্ত বই/প্রবন্ধ পড়তে কি আনন্দ পেয়েছেন?		
পড়ার সময় কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি না?		
পড়তে কত সময় লেগেছে? তা কি আপনার পরিকল্পনারও বেশি ছিল?		
লেখাটি কী সম্পর্কে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন?		
লেখকের কোন পয়েন্টগুলো আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে?		
প্রবন্ধের মূল কথাগুলো কয়েক সপ্তাহ পরেও মনে থাকবে কি না?		
পড়ার সময় মার্কার বা পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছেন কি না?		
কতটি অপরিচিত শব্দ পেয়েছেন? অভিধান দেখে অর্থ জানার চেষ্টা করেছেন কি না?		
কঠিন প্যারা/শব্দগুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন কি না?		

বই পড়ে বোঝার জন্য কয়েকটি পরামর্শ

১. পড়ার আগ্রহ : পড়ার আগ্রহ না থাকলে কোনো কিছু পড়ে লাভ নেই। কোনো ছাত্র-ছাত্রী যদি কোনো বিষয় জানতে আগ্রহী হয় তাহলে তা পড়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। এর ফলে সহজেই পড়া আয়ত্ত করা সম্ভব হয়।

২. পড়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ : মনে রাখতে হবে, কেউ কাউকে পড়িয়ে দিতে পারে না। নিজের খাওয়া নিজেকে খেতে হয়, নিজের ঘুম নিজেকে ঘুমাতে হয়। অনুরূপভাবে কেউ কারো পড়া পড়িয়ে দিতে পারে না। নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে নিজেকেই সিরিয়াস থাকতে হবে। তাহলেই কোনো বই/প্রবন্ধ পড়লে সহজেই বোঝা যাবে।

www.nagorikpathagar.com

৩. টেক্সট বই সম্পর্কে সহপাঠীর সাথে আলোচনা : কোনো বই কতটুকু বুঝেছেন তা ক্লাসে বা কোনো সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।

৪. ভুল থেকেই শিখতে হবে : A mistake is an opportunity to learn.

৫. আমি জানি না এ কথা অকপটে স্বীকার করতে হবে : ছোটবেলায় সব জান্তা শমসেরের গল্প পড়েছিলাম। সে কিছুই জানতো না, কিন্তু নিজেকে নিজে মনে করতো সব কিছুই জানে। এটা ঠিক নয়। আপনি কোনো বই পড়ে কোনো শব্দের অর্থ না বুঝলে তা অকপটে স্বীকার করুন এবং কারো কাছ থেকে জানার চেষ্টা করুন।

৬. বারবার বুঝার চেষ্টা করা ঃ প্রথমবার পাঠ করার পর কতটুকু বুঝতে পারলেন তা মূল্যায়ন করে দ্বিতীয়বার পাঠ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়বার পাঠ করার সময় আগেরবার যা বোঝা যায়নি তার অনেকটা বোঝা যাবে। এরপরও বুঝতে না পারলে আবার পাঠ করুন।

৭. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশেষভাবে পড়া : আপনি কোনো বই বুঝতে হলে বিশেষ তথ্য যে পৃষ্ঠাগুলোতে পাবেন তা বিশেভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন।

৮. যে শব্দ বোঝেন না তাতে দাগ দিন : যে বইটি পড়ছেন তা যদি আপনার মালিকানাধীন হয় তাহলে বই পড়ার সময় বইয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশে হাইলাইটার বা পেন্সিল দিয়ে নোট করতে পারেন।

৯. প্রশ্ন নোট করা : বই পড়ার সময় যেসব প্রশ্ন আপনার মনে জাগ্রত হয় তা নোট করুন এবং উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

১০. সারাংশ বের করা : সমস্ত বই পড়াশেষে উক্ত বইয়ের সারকথা বা নির্যাস বের করার চেষ্টা করুন। বইটি পড়ে কী বুঝলেন তা নোট করে রাখুন।

১১. বই পড়াশেষে মূল্যায়ন : কোনো বই পড়া শেষ হলে মূল্যায়ন করা দরকার, লেখক যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন সেক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছেন এবং কোন বিষয় ঘাটতি আছে।

১২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো পড়া : আপনি কোনো একটি বই পড়া শেষ করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আরো বই পড়তে পারেন। কোনো একটি বিষয় পড়াশোনার সময় উক্ত বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থকারের বই পড়লে বিষয় সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়।

১৩. অভিধান সাথে রাখা : কঠিন শব্দাবলির অর্থ জানার জন্য অভিধান সাথে রাখা ভালো। তাহলে কোনো কঠিন শব্দ পেলেই তার অর্থ তালাশ করা যায়। এতে টেক্সট বুঝতে সহজ হয় এবং পড়ার প্রতি পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১৪. পড়াশেষে মনে করা : কোনো বই/প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে পুরো বই/প্রবন্ধ পড়ে কী বুঝেছেন তা স্মরণ করার চেষ্টা করা দরকার। এভাবে পড়ার পর বোঝার চেষ্টা করলে আরো পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পড়াশেষে সকল শব্দ হুবহু মনে রাখার চেষ্টা করা দরকার নেই। শুধু মৌলিক পয়েন্টগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

১৫. শিক্ষক/অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিকনির্দেশনাকে গুরুত্ব দেওয়া : শিক্ষকরা অনেক বেশি অভিজ্ঞ। একটি কথা প্রচলিত আছে যে, অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। আপনি এক সপ্তাহে যা পড়বেন অনেক সময় একজন ভালো শিক্ষকের এক ঘণ্টার দিকনির্দেশনা তারচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। তাই পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দিকনির্দেশনাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মানুষ কোনো বই পড়তে নিরুৎসাহিত হয় কেন

১. টেক্সট না বুঝলে : অনেক সময় দেখা যায়, কোনো বই পড়া শুরু করার পর শেষ করার আগে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এমনকি খাওয়া, ঘুম পর্যন্ত ভালো লাগে না। আবার তার বিপরীতে কোনো বই হাতে নেওয়ার পর দু'চার পৃষ্ঠা পড়ার পর বই আর পড়তে ইচ্ছে করে না। এর কারণ হচ্ছে টেক্সট না বোঝা।

২. কাঙ্ক্ষিত তথ্য না পেলে : অনেক সময় দেখা যায় একটি বই নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য পড়া শুরু করা হয়। কিন্তু কিছু পাঠ করার পর যদি মনে হয় যে, কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যাবে না তখন বইটি পড়ার আগ্রহ হারিয়ে যায়।

৩. পড়ার ক্ষেত্রে ভুল টেকনিক : প্রত্যেক শব্দ বোঝার চেষ্টা করা কিংবা খুব দ্রুত কোনো বই শেষ করার ইচ্ছা করলে কোনো বই পড়ে মজা পাওয়া যায় না। এই কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদকে তারতিলের সাথে অর্থাৎ থেমে থেমে উত্তমভাবে পড়ার জন্য বলেছেন। তাড়াহুড়া করে পাখির বুলির মতো কোনো কিছু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই বইটি বোঝা যায় না। আর কোনো বই পড়ার সময় বুঝে না এলে তা পড়তে ইচ্ছা করে না। তাই দ্রুত কোনো বই শেষ করার চেয়ে বইটি বুঝে আস্তে আস্তে পড়ার চেষ্টা করাই উত্তম। তবে কেউ বুঝে পড়ার পরও যদি দ্রুত কোনো বই শেষ করতে পারেন তাতে ক্ষতি নেই। যত বেশি বই পাঠ করবেন তত বেশি জ্ঞান লাভ হবে। এই কারণে শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন, বই পড়ার উদ্দেশ্য সাধিত হলে দ্রুত পড়া যেতে পারে।

৪. পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থতা : বইটি কী উদ্দেশ্যে পড়তে চান তা জানা না থাকলে পড়ার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

৫. পড়তে/উচ্চারণে সমস্যা : অনেক সময় কোনো বই হাতে নেওয়ার পর তাতে লিখিত শব্দাবলি উচ্চারণ করা কষ্টকর হয়। তাই বইটি পড়ার আগ্রহ হারিয়ে যায়।

বই পড়ার আগ্রহ কখন থাকে

১. বইটি পড়ে কী জানতে চান তা পরিষ্কার থাকলে : যদি কোনো পাঠকের সামনে বইটি পাঠ করে কী জানতে চান তা পরিষ্কার থাকে তাহলে আগ্রহের সাথে তা পড়া হয়।

২. যথাযথ বই নির্বাচন করা : কোনো বিষয়ে তথ্য জানার জন্য আপনি যদি যথাযথ বই নির্বাচন করেন তাহলে আপনার পড়তে ভালো লাগবে। এ কারণে কোনো বই পড়া শুরুর আগে হেডিং, সাব হেডিং, বিষয়সূচি পড়ার সাথে সাথে বইটির মধ্যে কী আছে তা ব্লার্ব থেকে জানার চেষ্টা করা দরকার।

www.nagorikpathagar.com

৩. পূর্ণভাবে বুঝে এলে : কোনো বই পড়ার সময় বুঝে এলে তা পড়তে ইচ্ছে করে।

৪. একই বিষয়ের আরও রেফারেন্স বই পড়া : একটি বই বোঝার জন্য একই বিষয়ে লেখা অন্য লেখকের রেফারেন্স বই পড়াও গুরুত্বপূর্ণ।

৫. লেখকের লেখার টার্গেট ও পাঠকের পড়ার উদ্দেশ্য এক হওয়া : যদি লেখকের লেখার টার্গেটের সাথে পাঠকের পড়ার উদ্দেশ্যের মিল হয় তাহলে সহজেই বইটি পড়ে অনুধাবন করা যায়। কখনও কখনও দেখা যায়, একই টেক্সট বিভিন্ন পাঠক বিভিন্নভাবে বোঝেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে টেক্সটে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নিরূপণে পার্থক্য। কোনো বই পাঠ করার সময় লেখক যে সত্য তুলে ধরতে চান তা বোঝার চেষ্টা করা দরকার। লেখক যে আবেগ দিয়ে বইটি লিখেছেন একই ধরনের আবেগ দিয়ে বইটি পড়লে মজা পাওয়া যায়।

৬. বইতে ব্যবহৃত বিশেষ পরিভাষা জানা থাকলে : প্রত্যেক বইতে কিছু বিশেষ শব্দ/পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এইসব শব্দের অর্থ জানা থাকলে বইটি বুঝতে সহজ হয়। তাই প্রত্যেক বইয়ের একাডেমিক পরিভাষাগুলো জানার চেষ্টা করা দরকার।

বই পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা : পড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রের ভূমিকাই মুখ্য। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ। কারণ ছাত্রকে পড়তে হয়, কেউ পড়িয়ে দিতে পারেন না। তারপরও শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের ভূমিকা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

১. ছাত্রের জন্য উপযোগী টেক্সট বই নির্বাচন করা, ২. পড়ার প্রতি উৎসাহ যোগানো, ৩. ছাত্রের সামনে এ কথা পরিষ্কার করতে হবে যে, আমরাও পড়ে শিখেছি, ৪. কোনো বই বুঝার ক্ষেত্রে শিক্ষক সহযোগিতা করতে পারেন, ৫. বইয়ের উপর কার্যকর কিছু কার্যক্রম ঠিক করা এবং তা করা ও বোঝার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে সহযোগিতা করা, ৬. ক্লাসের সকল ছাত্রের পড়া মনিটর করা এবং প্রত্যেকের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা, ৭. টেস্টিং বেটার দেন টিচিং—অর্থাৎ যে বিষয় পড়ানো হবে তা ছাত্রকে আগে প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে উত্তর জানতে চাওয়া। এতে ছাত্ররা সঠিক বা ভুল যা-ই করুক না কেন তারপর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া ভালো।

পত্র-পত্রিকা পাঠ : দুনিয়ার সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ জানতে হলে পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে হয়। পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে সংক্ষিপ্তাকারে চলমান ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ থাকে এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ থাকে। একজন ছাত্রকে সচেতন হতে হলে পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে হবে। পত্রিকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে হলে প্রচুর সময় দরকার। আপনাকে চিন্তা করতে হবে পত্রিকা পাঠের জন্য আপনার কতটুকু সময় বরাদ্দ? উক্ত সময়ের মধ্যে পত্রিকা পাঠ শেষ করতে হলে হেডিং, সাবহেডিং এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার। তারপর আপনি যেসব ফিচার বা সংবাদ বিস্তারিত পড়তে চান তা পড়তে পারেন। পত্রিকা পাঠকের মধ্যে কেউ খেলার সংবাদ বেশি পছন্দ করেন, আর কেউ আন্তর্জাতিক সংবাদ পড়তে বেশি আগ্রহী হন। কেউ সাহিত্য পাতা পড়তে চান, আবার কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্য জানতে পত্রিকা কেনেন। অনেকেই শুধু চাকরির বিজ্ঞাপন দেখার জন্য পত্রিকা পড়েন।

www.nagorikpathagar.com

আপনার পত্রিকা পাঠের টার্গেট কী? আপনি কি দেশ-বিদেশের সংবাদ জানতে পত্রিকা পড়তে চান, না কোনো বিশেষ ফিচারের প্রতি আকৃষ্ট? বিশেষ কোনো ফিচার বা তথ্য জানার আগ্রহের সাথে সঙ্গতি রেখে পত্রিকা পাঠ করেন? পত্রিকা পাঠের সময় একটি নোটখাতা রাখতে পারেন এবং বিশেষ বিশেষ তথ্য পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। যাঁরা লেখালেখি করেন তাদের জন্য পত্রিকার তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। একারণে পত্রিকা পাঠের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করা ভালো।

মুখস্থকরণ বা Memorising

স্মৃতিশক্তি কী ঃ স্মৃতিশক্তি হচ্ছে কোনো কিছু মনে রাখার যোগ্যতা। কেউ কেউ একে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : 'Memory is the ability to remember what you know.[৪] সাধারণত মুখস্থ করে (Rote Learning) কিংবা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে (Learning by understanding) হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে কোনো কিছু স্মরণ রাখার চেষ্টা করা হয়। মুখস্থ করে কিংবা বুঝে কোনো কিছু হৃদয়ঙ্গম করার পর তা কখনও দীর্ঘদিন মনে থাকে, আবার কখনও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। এ কারণে স্মৃতিশক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

স্বল্পমেয়াদি স্মৃতিশক্তি (Short-term memory) আর দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি শক্তি (Long-term memory)। কোনো তথ্য জানার পর মেমোরি তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। প্রথম পর্যায়ে Short-Term memory-তে ধারণ করে। তারপর উক্ত তথ্য কোনো কাজে লাগানোর পর তা Long-Term memory-তে চলে যায়। Long-Term memory-তে আসার পর মাঝে মধ্যে ইচ্ছাকৃত, ভুলক্রমে বা স্বপ্নে স্মরণ করা হলে স্মৃতিতে হুবহু বহাল থাকে। আর মাঝে মধ্যে স্মরণ করা না হলে আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়।

আজ থেকে হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক বড় বড় প্রবন্ধ মুখস্থ করতে হতো। তবে বর্তমানে মুখস্থ করার চেয়ে বুঝে হৃদয়ঙ্গম করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫] সময়ের ব্যবধানে মুখস্থ করার পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণের পদ্ধতিও অনেক উন্নত হয়েছে। অডিও, ভিডিও রেকর্ডিং ও কম্পিউটারে অনেক তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। ফলে মুখস্থ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। তারপরও অনেক তথ্য আমাদের মুখস্থ রাখতে হয়।

সকল মানুষের স্মৃতিশক্তি সমান নয় : কেউ কেউ আছেন দুই-একবার শুনলেই কোনো কিছু মনে রাখতে পারেন। আবার কেউ আছেন অনেকবার শুনলেও মনে রাখতে পারেন

৪. Palmer, Richerd. (2nd edition 1996). Brain Train Studying for success. London-New York. E&FN SPON, An Imprint of Chapman & Hall. P.40

৫. Turner. J. 2002. How to Study. London : SAGE Publication LTD. P-18-19

www.nagorikpathagar.com

না। ছোটবেলায় জনৈক বড় আলেমের কথা শুনেছিলাম। তিনি খুবই গরিব ছিলেন। বই কিনতে পারতেন না। একবার তার উস্তাদ একটি বই কেনার জন্য বলেন। অন্য ছাত্ররা বইটি কিনে আনেন। কিন্তু তিনি বই কিনতে পারেননি তাই লাইব্রেরিতে গিয়ে বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। একবার দেখার পরই বইটি মুখস্থ হয়ে যায়। বাড়িতে এসে হুবহু বইটি লিখে ফেলেন। পরে মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখা গেল তার লেখা ও বইয়ের মধ্যে একটি অক্ষর পর্যন্ত পার্থক্য হয়নি।

আরেকজন বড় আলেমের কথা। তিনি অন্ধ হওয়ার আগে হাদীস সংগ্রহের জন্য পথ অতিক্রম করার সময় একটি গাছ রাস্তায় বাঁকা হয়ে পড়তে দেখেন। তাই মাথা একটু নিচু করে উক্ত পথ অতিক্রম করেন। কিছুদিন পর গাছটি কেটে ফেলা হয়। দীর্ঘদিন পর তিনি ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের স্থান অতিক্রম করাকালে মাথা নিচু করেন। সঙ্গীরা মাথা নিচু করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে একটি গাছ বাঁকা হয়ে আছে, তাই না? সঙ্গীরা জবাব দিলেন এখানে কোনো গাছ নেই। তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এই এলাকার প্রবীণ কোনো মানুষ খুঁজে বের কর এবং আমার কাছে নিয়ে এসো। গ্রামের প্রবীণ কিছু মানুষ আসার পর হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্থানে বাঁকা কোনো গাছ ছিল কি না? তারা বললেন, অনেক আগে এখানে গাছ ছিল। বহু আগেই তা কেটে ফেলা হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, এখানে গাছ ছিল না এই কথা আজ যদি প্রমাণিত হতো তাহলে আমি আজ থেকে হাদীস চর্চা বন্ধ করে দিতাম। কারণ দুর্বল স্মৃতিশক্তি নিয়ে আল্লাহর রাসূলের হাদীসচর্চা করা ঠিক নয়।

এই ঘটনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, সকলের স্মৃতিশক্তি এক ধরনের হয় না। আর স্মৃতিশক্তি সব সময় এক ধরনের থাকে না। কখনও দেখা যায় কোনো কথা শোনার পরপরই জিজ্ঞাসা করলে মনে আসে না। কিন্তু অনেক দিন পর হঠাৎ সেই কথাটি মনে পড়ে। আবার কখনও কখনও দেখা যায় অতি পরিচিত সাধারণ একটি কথা স্মৃতিতে আসছে না। কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম কথাও জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে বলা যায়।

স্মরণ রাখা কেন জরুরি : মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিদিনই তার স্মৃতিভাণ্ডারে কিছু না কিছু যোগ হয়। একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার কাছে দুনিয়ার সবই নতুন ও অপরিচিত মনে হয়। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে অনেক কিছুই দেখে, অনেক কিছুই শেখে এবং মনে রাখে। কোনো ব্যক্তি যা পড়েন বা শোনেন তা যদি স্মরণ রাখতে পারেন তাহলে বারবার তা পড়া বা শোনার দরকার হয় না। তাই কোনো কিছু মনে রাখা খুবই জরুরি।

সব স্মরণ রাখা দরকার নেই : আমরা যা পড়ি বা শুনি তার সবটুকুই স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। তাই কোন জিনিস স্মরণ রাখা দরকার তার একটি তালিকা তৈরি করুন এবং কার্ডে বা নোটবইতে লিখে রাখুন। তারপর অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী মনে রাখার চেষ্টা করুন। কোনো ছাত্রের পক্ষেই যা পড়ে বা শোনে সব কিছু হুবহু মনে রাখা কঠিন। তাই এ কথা বলা ঠিক নয় যে, ভালো ছাত্র তারাই হতে পারে, যারা যা পড়ে বা শোনে সবকিছু মনে থাকে।

www.nagorikpathagar.com

কিছু ভোলা দরকার : আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় দেখবেন কম্পিউটার মেমোরি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে অপ্রয়োজনীয় কিছু ফাইল মুছে ফেলে মেমোরি খালি করতে হয়। অনুরূপভাবে আপনার ব্রেইনেও অনেক কিছু সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা আপনার মনে রাখার দরকার নেই। যেসব জিনিস মনে রাখার দরকার নেই তা ভুলে যাওয়া দরকার। তবে কোনো কথা মনে রাখার তুলনায় ভোলা অনেক কঠিন। কোনো কিছু ভোলার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ঐ জিনিস স্মরণ না করা। আপনি কোনো কিছু যত বেশি স্মরণ করবেন তত বেশি দিন স্মৃতিতে আটকা থাকবে।

আপনি কী জানেন ও কী জানা দরকার : কোনো একটি বিষয়ে আপনি কী জানেন এবং আর কী জানা দরকার তা প্রথম নির্ণয় করা ভালো। তারপর যা জানেন না তা জানার চেষ্টা করুন। এইভাবে পড়লে অল্প সময়ে অনেক বেশি বিষয় জানতে পারবেন। অনেক সময় আমরা জানার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া পড়ি। এই ধরনের পড়া মনে থাকে কম। আপনি কোনো কিছু জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পড়লে ঐ বিষয়টি পড়ার সাথে সাথে মনে থাকে।

ভুলে যান এমন জিনিসের তালিকা তৈরি : আপনি সাধারণত ভুলে যান এমন কতিপয় জিনিসের তালিকা তৈরি করুন। আপনি যা ভোলেন তা যদি জানেন তাহলে দ্বিতীয়বার ঐ জিনিস আর ভুলবেন না। এই ধরনের জিনিস মনে রাখার জন্য প্রথম কয়েকদিন প্রতিদিনই কিছু সময় চর্চা করা দরকার।

আমরা ভুলি কেন ঃ ক. ব্রেইনের ধারণক্ষমতার বেশি পড়া : প্রত্যেকের ব্রেইনের নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা আছে। একসাথে অধিক পড়লে সব বিষয়ে মনে রাখা কঠিন। এই কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সংক্ষিপ্ত খোতবা দিতেন। এ কারণে তিনি যা বলতেন সাহাবীদের মনে তা বদ্ধমূল থাকতো।

খ. রিভিউ না করা : পড়ার সময় নতুন ধারণা আসে তা বর্তমান ধারণার জায়গা দখল করে। সেটা রিভিউ না করলে আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। তবে যা একবার পড়া হয় তা ব্রেইনে থাকে। নোট দেখলে বা কেউ একটু বললে সাথে সাথে স্মরণে আসে।

উদাহরণ ঃ কোনো একটি গ্লাস পানি ভর্তি হওয়ার পর আরও পানি ঢাললে উপচে পড়ে। কম্পিউটার বা টেলিফোন মেমোরি পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কম্পিউটার বা টেলিফোন মেমোরিতে কোনো কিছু সেইভ করা সম্ভব হয় না।

অনুরূপভাবে মানুষের ব্রেইনে স্মৃতি ধারণকারী কোষগুলি ভর্তি হয়ে গেলে কিংবা ক্লান্ত হয়ে পড়লে নতুন কোনো তথ্য পড়লেও মনে থাকে না।

কেন স্মরণ থাকে : ক. আপনার স্মৃতিশক্তি ভালো এই আত্মবিশ্বাস থাকা : আপনার স্মৃতিশক্তি ভালো এই কথা বিশ্বাস করা দরকার। কেউ যদি মনে করেন তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল তাহলে তিনি জটিল কোনো বিষয় মনে রাখার সাহসই করবেন না। আর মনে রাখার চেষ্টা করার ফলেই এমন অনেক কিছু স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে, যা মনে রাখা সম্ভব ছিল।

www.nagorikpathagar.com

খ. পড়তে আনন্দ পাওয়া : যা পড়তে বা শুনতে বেশি আনন্দ লাগে তা বেশি দিন মনে থাকে। কারণ আনন্দদায়ক জিনিস পড়ার সময় মনে জানার খুব বেশি কৌতূহল থাকে। ফলে এই সময় যা পড়া হয় তা দীর্ঘদিন মনে থাকে।

গ. স্মরণ রাখতে বাধ্য হলে : অনেক সময় স্মরণ রাখার বাধ্যবাধকতার কারণে মনে থাকে। যেমন কারো যদি পরীক্ষা থাকে, তার পরীক্ষায় পাসের জন্য যদি কিছু পড়া হয় তা সাধারণ পড়ার চেয়ে বেশিক্ষণ মনে থাকে। কারণ এই সময় পঠিত বিষয় মনে রাখার আগ্রহ নিয়েই পড়া হয়।

ঘ. মনোযোগ সহকারে শোনা : কোনো কিছু মনে রাখতে হলে মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে বা পড়তে হবে। পড়া বা শোনার সময় মনোযোগ না থাকলে অনেক জরুরি কথাও স্মৃতিতে আটকা থাকে না। অমনোযোগী কাউকে রাস্তায় পথ চলার সময় সালাম দিলেও তিনি বলতে পারেন না যে, কেউ তাকে সালাম দিয়েছে। অমনোযোগী কারো সামনে কেউ কোনো কথা বললেও তিনি বলতে পারেন না যে, কী বলা হয়েছে। তাই কোনো কিছু শোনার সময় মনোযোগসহ শোনা উচিত।

ঙ. রিভাইজ ও বারবার স্মরণ করা : একজন মানুষের ব্রেইন ১২০০-১৪০০ গ্রাম মাত্র। অথচ এই ব্রেইন ১০ লক্ষ কম্পিউটারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমাদের ব্রেইন প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার নতুন তথ্য ধারণ করতে সক্ষম। কিন্তু সুষ্ঠু চর্চার অভাবে ব্রেইনে ধারণকৃত সবকিছু সব সময় স্মরণে আসে না। যে কথা বারবার স্মরণ করা হয় তা মনে থাকে বেশি। যেমন সূরা ফাতিহা প্রতিদিন নামাযে বারবার তিলাওয়াত করা হয় বলেই প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই সুরা ফাতিহা বলতে পারেন। কিন্তু এমন আরও অনেক সূরা/আয়াত আছে, যা মুখস্থ করার পর তিলাওয়াত না করার কারণে স্মৃতির পাতা থেকে হারিয়ে গেছে।

এ কারণে কোনো কোনো গবেষকের মতে, কোনো কিছু মুখস্থ করার পরের দিন রিভাইজ করা দরকার। তারপর এক সপ্তাহ পরে, এরপর এক মাস পরে, তারপর কিছুদিন পর পর রিভাইজ করলে বিষয়টি দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে।

স্মরণ রাখার কৌশল : মানুষে প্রতিদিন যত কথা শোনে, যা কিছু দেখে বা পড়ে তার একটি অংশ আদৌ স্মরণে থাকে না। আর কিছু কথা একবার শোনার পর জীবনে আর ভোলে না। আবার কিছু কথা আছে শোনার পর কয়েক দিন মনে থাকে। এরপর ভুলে যায়। মনে করুন আপনি গতকাল কি দিয়ে ভাত খেয়েছেন তা আজ বলতে পারবেন, হয়তবা আরো দুই-এক সপ্তাহ স্মরণে থাকবে; কিন্তু তারপরে ভুলে যাবেন। কিন্তু আপনার কোনো বন্ধুর বিয়েতে কী খেয়েছেন তা কয়েক বছর পরও মনে থাকে। অনুরূপভাবে প্রতিদিনই আমরা কত মানুষের সাথে কথা বলি। সকল কথা কয়েক দিন পর ভুলে যাই। কিন্তু বিশেষ কিছু উক্তি সব সময় স্মরণ থাকে। কেউ সহজেই স্মরণ রাখতে পারেন আবার কারো স্মরণ রাখতে কষ্ট হয়। যারা সহজেই স্মরণ রাখতে পারেন তারা স্মরণ রাখার জন্য বিশেষ কিছু কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন :

১. পরিকল্পনা : কোনো কিছু পড়ার সময়/শোনার সময়ই তা স্মরণ রাখার পরিকল্পনা করতে হবে। এজন্য শোনার পর দুই-তিনবার মনে মনে রোমন্থন করতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

২. জানা কোনো তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন : যেকোনো নতুন তথ্য জানার পর ইতঃপূর্বে জানা কোনো তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করে মুখস্থ করার চেষ্টা করলে সহজেই মনে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৫২ সালের কোনো তথ্য মনে রাখতে হলে ভাষা আন্দোলনের সনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তথ্যটি মনে রাখার চেষ্টা করুন। দেখবেন অল্প সময়েই তথ্যটি মনের ভিতর গেঁথে যাবে।

৩. মুখস্থ করার টেকনিক অনুসরণ : মুখস্থ করার টেকনিককে ইংরেজিতে Memonics বা Memori trick তথা মুখস্থ করার কৌশল বলা হয়। প্রত্যেকের কৌশল এক রকম হতে হবে বিষয়টি এমনটি নয়। একেকজন মানুষ মুখস্থ করার জন্য একেক ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন কেউ কোনো নাম মুখস্থ করার সময় পরিচিত কোনো নামের সাথে মিলিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করেন।[৬]

৪. পয়েন্ট আকারে বিভক্ত করা : দীর্ঘ কোনো ড্রাফট মুখস্থ করতে প্রচুর সময়ের দরকার। তাই লম্বা টেক্সট পড়ার পর মূল পয়েন্ট চিহ্নিত করে মুখস্থ করার চেষ্টা করলে অল্প সময়েই মুখস্থ হয়ে যায়।

৫. গল্পের মতো করে পড়া : সাধারণত তত্ত্বকথার চেয়ে গল্প বেশি মনে থাকে। তাই গল্পের মতো করে মুখস্থ করার চেষ্টা করা ভালো। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। আপনারা কয়েকজন বন্ধু একসাথে মিলিত হয়ে সকলের নাম, পিতার নাম, টেলিফোন নম্বর, ভাই-বোনদের নাম, জীবনে কী হতে চান, জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত ও বেদনাবিধুর কোনো ঘটনা বলুন। এবার একে অপরকে জিজ্ঞাসা করুন। এতে দেখবেন টেলিফোন নম্বর অনেকেই মনে রাখতে পারেননি, কিন্তু স্মরণীয় ঘটনা প্রায় সকলেরই মনে আছে। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্বকথা স্মরণ রাখা কঠিন, কিন্তু গল্প মনে রাখা সহজ।

মুখস্থ রাখার আরও কতিপয় পরামর্শ

১. ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা : দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো কিছু পড়লে বা শোনলে তা মনে রাখা কঠিন। অতএব ক্লান্ত কিংবা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ার চেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে কিংবা চিন্তামুক্ত হওয়ার পর পড়াশোনা করা ভালো।

২. ঘুমানোর সময় স্মরণ করা : সারাদিন যাকিছু পড়া হয় তার মৌলিক পয়েন্টগুলো ঘুমানোর আগ মুহূর্তে একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন। সাধারণত ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে উঠে কোনো কিছু স্মরণ চেষ্টা করলে তা স্মৃতির পাতায় ভালোভাবে আটকে থাকে।

---

৬. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার সাথে নতুন কারো সাথে দেখা হলো। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নাম কি?. তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, তার নাম জিয়াউর রহমান বা মুজিবুর রহমান কিংবা গোলাম আযম। আপনি নতুন পরিচিত উক্ত ব্যক্তির নামের সাথে আপনার অতি পরিচিত নামের সংযোগ স্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করুন। এতে দেখবেন অল্প সময়েই কারো নাম মনে রাখা যায়।

www.nagorikpathagar.com

৩. ঘুমের ভিতর পড়া : ঘুমের ভিতর মানুষ স্বপ্ন দেখে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঘুমের ভিতরেও ব্রেইন কাজ করে। তাই এমনভাবে পড়াশোনা করার দরকার যেন ঘুমের ভিতরও পড়াশোনা স্বপ্ন দেখা হয়।

৪. পরিবেশ/রুম পরিবর্তন : কোনো স্থানে দীর্ঘক্ষণ বসে পড়তে পড়তে অনেক সময় একঘেঁয়েমি চলে আসে। এর ফলে চেষ্টা করলেও মুখস্থ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় নতুন কোনো পরিবেশ বা অন্যকোনো রুমে গিয়ে ব্রেইন ফ্রেশ করে নেওয়া ভালো। নতুন পরিবেশে পড়লে বা একটু ঘুরে এসে আবার পড়তে বসলে সহজেই মুখস্থ হয়।

৫. ঘরে বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে রাখা : মুখস্থ করা দরকার এমন পয়েন্টগুলো শোবার স্থান, খাবার স্থান ও চলাফেরার স্থানে কোনো কাগজে লিখে দেওয়ালে আটকে রাখা হলে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করার সময় বারবার নজরে পড়বে। এর ফলে অল্প সময়েই মুখস্থ হয়ে যাবে।

৬. অডিও ক্যাসেট : কোনো কিছু স্মৃতিতে ভালোভাবে রাখতে হলে তা অডিও রেকর্ড করা দরকার এবং চলাফেরার সময় বারবার শোনা দরকার। এইভাবে পথ চলার সময় অডিও ক্যাসেট শুনলে সময় অপচয় রোধ হয়। আবার প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় মুখস্থ করাও সহজ হয়।

৭. কাল্পনিক বন্ধুকে শোনানো : মুখস্থ করার পর শোনাবার মতো কেউ থাকলে তাকে শোনান। কিন্তু কেউ সাথে না থাকলে কল্পনার জগতে একজন বন্ধু বানিয়ে তাকে শোনানো দরকার। কল্পনার জগতের বন্ধু ভুলত্রুটি সংশোধন করতে না পারলেও তাকে শোনালে মুখস্থ বলার চর্চা হবে।

৮. পড়ার সময় পয়েন্ট নোট করা : পড়ার সময় পয়েন্ট নোট করলে পরে পয়েন্ট দেখলেই বিষয়টি স্মরণে আসে। তাই কোনো বই পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নোট করুন এবং মাঝে মধ্যে উক্ত পয়েন্টগুলো দেখে বিষয়টি স্মরণে রাখার চেষ্টা করুন।

৯. মুখস্থ করার পর লেখুন : কোনো কিছু মুখস্থ করার পর না দেখে লেখার চেষ্টা করলে স্মৃতিপটে গেঁথে যায় এবং দীর্ঘদিন মনে থাকে। লিখলে ভুলভ্রান্তি যাচাই করা যায় এবং শুদ্ধ করে আবার শেখা যায়।

মেমোরি টেস্ট : আপনার স্মৃতিশক্তি কেমন? আপনি কি কোনো কথা শুনলে দীর্ঘদিন স্মরণ রাখতে পারেন? কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে সহজেই কি বলে দিতে পারেন? আপনারা কয়েকজন মিলে নিজেরাই নিজেদের মেমোরি টেস্ট করতে পারেন। কোনো বইয়ের নির্দিষ্ট কিছু লাইন বা প্যারাগ্রাফ বাছাই করে সকলে একবার করে প্যারাগ্রাফটি পড়ুন। এবার কে কী বুঝলেন তা লিখুন। দেখবেন সকলের লেখা এক ধরনের হয়নি। কেউ সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে পেরেছেন আর কেউ আংশিক মনে রাখতে পেরেছেন। এবার কোনো একটি কবিতার বইয়ে কয়েকটি চয়ন সিলেক্ট করুন। সকলে একসাথে মুখস্থ করা শুরু করুন। দেখা যাবে কেউ আগে মুখস্থ করে ফেলেছেন, আর কেউ এখনও মুখস্থ করতে পারেননি। অতীতে পড়েছেন এমন বিষয়ের উপর সাধারণ জ্ঞানের কিছু প্রশ্ন সেট করুন। তারপর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করুন। দেখা যাবে, কেউ অনেক আগে পড়লেও ঠিকমতো মনে রাখতে পেরেছেন আর কেউ সাম্প্রতিক পড়া বিষয়ও ভুলে গেছেন।

www.nagorikpathagar.com

নোট করার টেকনিক ঃ কোনো কিছু একবার শোনলে বা একবার পড়লে হুবহু মনে রাখতে পারেন এমন ছাত্রের সংখ্যা বেশি নয়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই যা শোনে বা হৃদয়ঙ্গম করে তার বিরাট অংশ পরবর্তীতে ভুলে যায়। কোনো ছাত্রছাত্রীই যা শোনে তার শতভাগ বুঝতে ও স্মরণ রাখতে পারে না। তাই কারো লেকচার শোনা অথবা কোনো বই পড়ার সময় নোট করার প্রয়োজন হয়। এ কারণে অনেকেই নোটকে most important resources বলে উল্লেখ করেছন।

নোট করার উপকারিতা : নোট করার অনেক উপকারিতা আছে। যেমন–

১. নোট হচ্ছে বক্তা বা লেখকের মূল কথাগুলোর কার্যকর রেকর্ড। পরবর্তীতে তা ব্যবহার করা যায় এবং তথ্যসূত্র সহজেই জানা যায়।

২. নোট করলে টেক্সটে এর মূল পয়েন্টগুলো পরবর্তীতে স্মরণ করতে সুবিধা হয়।

৩. কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কাছে কতটুকু তথ্য আছে তা ত্বরিত জানা যায় এবং উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নতুন তথ্য যোগ করতে সুবিধা হয়।

৪. পরবর্তীতে লেখার ক্ষেত্রে কাজে আসে। কারণ নোট দেখলেই বিষয় সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার আলোকে লেখার পরিকল্পনা করা যায়।

৫. কোনো কিছু পড়ার সময় অধিক মনোযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ নোট করার জন্য যখন পড়া হয় তখন অন্তত পয়েন্টগুলো বুঝার চেষ্টা গভীরভাবে করা হয়।

৬. নোট করলে বিষয়টি বুঝতে সহায়ক হয় এবং পরবর্তীতে নোট দেখতে উদ্বুদ্ধ করে।

৭. পরীক্ষার আগে রিভাইজ করতে সুবিধা হয়। কারণ তথ্যগুলো সাজানো-গুছানো থাকে।

৮. নোট করলে মুখস্থ করতে সহজ হয়। কারণ নোটে সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ সব পয়েন্ট লেখা থাকে।

৯. নোট করার সময় শরীর ও মন ব্যস্ত থাকে। তাই বিষয়টি সহজেই মুখস্থ হয়ে যায়।

১০. নোট অগ্রগতির সাক্ষ্যবহন করে।

১১. কোনো বই পড়ে প্রয়োজনীয় নোট রাখলে অনেক সময় অপচয় রোধ হয়।

নোট করার নেতিবাচক দিকসমূহ : কোনো কোনো ছাত্র নোট করা পছন্দ করে না। তাদের যুক্তি হচ্ছে :

১. নোট করতে গেলে ভালোভাবে শোনা সম্ভব হয় না এবং বোঝার চেষ্টা কম করা হয়। কারণ তখন এই ধারণা থাকে যে, নোট থেকে পরবর্তীতে শিখবো।

২. দ্রুত লেখার কারণে নিজের লেখাই পরবর্তীতে পড়া কষ্টকর হয়, তাই নোট করে লাভ নেই।

৩. ক্লাসে লেকচারের সময় নোট করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। সব কিছু লেখা যায় না।

৪. নোট করার পর তা পরীক্ষার আগে দেখার সুযোগ হয় না। তাই তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নোট করতে গিয়ে ভালোভাবে শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকা ঠিক নয়।

www.nagorikpathagar.com

নোট করা প্রয়োজন : এ কথা ঠিক যে, কোনো কিছু লিখতে গেলে ভালোভাবে শোনা সম্ভব হয় না এবং শোনার সময় অধিক মনোযোগ দেওয়া যায় না। তবে এ কথাও ঠিক যে, শোনা বা পড়ার সময় সকল কিছু ভালোভাবে মুখস্থ করা সম্ভব হয় না। আর যতটুকু মুখস্থ হয় তা-ও দীর্ঘদিন মনে থাকে না। ফলে পরবর্তীতে অনুমাননির্ভর তথ্য প্রদান করতে হয়। তাই ক্লাস লেকচার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, রেডিও-টিভি প্রোগ্রাম, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নোট করে রাখা ভালো। তাই শোনা বা পড়ার সময় নোট করার প্রয়োজন। কোনো কিছু শোনা/পড়ার সময় নোট করতে ব্যর্থ হলে স্মৃতি থেকেও নোট করে রাখা যায়। নোট করার পাশাপাশি সম্ভব হলে অডিও-ভিডিও রেকর্ড করে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফটোকপি করে রাখা যায়।

সবকিছু নোট করার প্রয়োজন নেই : সব তথ্য নোট করার প্রয়োজন নেই। তাই কোনো কিছু নোট করার আগে ভাবুন :

	হ্যাঁ	না
এই তথ্য নোট করা আসলেই প্রয়োজন আছে কি না?		
আপনি কি সত্যিই পরবর্তীতে এই নোট ব্যবহার করবেন? (পরবর্তীতে ব্যবহারের প্রয়োজন হলে কখন কী উদ্দেশ্যে?)		
এ ধরনের তথ্য ইতোমধ্যে নোট করেছেন কি না?		
এই তথ্য দ্বারা কী ধরনের প্রশ্নোত্তর করতে চান?		

ভালো নোট করার কৌশল

১. বিস্তারিত লেখার চেয়ে পয়েন্ট লেখা : কোনো কিছু শোনার সময় বা পড়ার সময় প্রত্যেক লাইন লেখার নাম 'নোট' নয়। সাধারণত বোঝার জন্য বা পরবর্তীতে লেখার সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য নোট করা যায়। তাই আপনি নোট করার সময় বিস্তারিত লেখার চেয়ে শুধু পয়েন্ট লিখতে পারেন।[৭] কেউ যদি প্রত্যেক লাইন লিখতে যান তাহলে বক্তার পরবর্তী বক্তব্য ভালোভাবে শোনা সম্ভব হয় না। এর ফলে এক লাইন লিখতে গিয়ে আরও ২-৩ লাইন শোনা বাদ পড়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ছাত্র হুবহু লেকচার বা বই নোট করার চেষ্টা করে। ফলে নোটের কলেবর বড় হয়। কিন্তু বিষয় সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার হয় না। আলোচক কোন বিষয়ে আলোচনা করছেন বা লেখক কোন বিষয় তার বই বা প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তা না বুঝে দীর্ঘ নোট করার মধ্যে খুব একটা লাভ নেই। এজন্য আলোচকের আলোচনা শুনে বা লেখকের বই পড়ে বক্তব্যের সারকথাই নোট করা দরকার। সংক্ষেপে নোট করার ক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ :

ক. বিশেষণসমূহ না লেখে শুধু মূল বক্তব্য লেখা।
খ. কোনো পয়েন্ট একবার লেখার পর দ্বিতীয়বার আর না লেখা।
গ. মূল পয়েন্ট বোঝার পরই সারকথা লেখা।
ঘ. অপ্রয়োজনীয় কথা লেখা থেকে বিরত থাকা।
ঙ. লেখক মৌলিকভাবে কোন বিষয় তুলে ধরছেন তা নোট করা।

---

৭. কারণ সবকিছু লিখতে গেলে প্রচুর সময়ের দরকার হয়। ক্লাসে নোট করার সময় বেশি থাকে না।

www.nagorikpathagar.com

২. **ভালোভাবে শোনা :** নোট করতে হলে লেকচার ভালোভাবে শুনতে হয়। লেকচার চলাকালে পরস্পর কথা বললে লেকচার শোনা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অজানা থেকে যায়। এজন্য নোট করার সময় বক্তার মূল বক্তব্যের প্রতি খেয়াল করা এবং বক্তব্য ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করা দরকার। তাই লেকচার শোনা ও নোট করার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা জরুরি।

৩. ক্লাসে লেকচার শোনার জন্য যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পড়া।

৪. আলোচিত বিষয়ে আপনি কী জানেন এবং কী জানেন না তা উপলব্ধি করা।

৫. সহপাঠীর কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া। কোনো পয়েন্ট বাদ গেলে ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ না করা। (বিরতির সময়ে একে অপরের নোট দেখে সংশোধন ও সংযোজন করা)

৬. এক লাইন লেখার পর আরেক লাইনের মধ্যে জায়গা রাখা যেন পরবর্তীতে নতুন তথ্য যোগ করা যায়।

৭. শিক্ষক কী বলছেন তা বুঝে নিজের ভাষায় সহজভাবে লেখা। এক্ষেত্রে কঠিন শব্দ পরিহার করা উচিত।

৮. নোট করার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাইলাইটার দিয়ে মার্ক করা।

৯. নোট করার নিজস্ব কৌশল ডেভেলপ করা। তাহলে পরবর্তীতে নোট বুঝতে সহজ হয়।

১০. কোনো কিছু বুঝে না আসলে লেকচারশেষে শিক্ষককে প্রশ্ন করা (প্রশ্ন প্রদত্ত লেকচারের সাথে সম্পৃক্ত, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া দরকার)।

১১. নোট সাজানো-গুছানো রাখা।

১২. শব্দ সংকেত ব্যবহার করা : নোট করার সময় মনে রাখতে হবে যে, আপনি আপনার জন্যই নোট লিখছেন, অন্য কারো জন্য নয়। তাই যেভাবে লিখলে পরবর্তী সময়ে আপনি বুঝতে পারবেন সেভাবেই নোট করা দরকার। নোট করার সময় শব্দসংক্ষেপ (Abbreviation) ব্যবহার করা ভালো।[৮] কিছু কমন Abbreviation আছে, এছাড়া প্রত্যেকে নিজস্ব Abbreviation স্টাইল গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে নোট করতে ও পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন : 'Economics' সংক্ষেপ করে 'Econ' লেখা হয়।

নোট করার আরও কতিপয় পরামর্শ

১. নোট করার প্রস্তুতিসহ ক্লাসে উপস্থিতি : ক্লাস লেকচার বা কোনো বই পড়ার সময় নোট করতে হলে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। সে জন্য একটি নোট বই ও কলম থাকা আবশ্যক। কলমের সাথে বিভিন্ন রংয়ের হাইলাইটার থাকা ভালো। তাহলে পয়েন্ট-উপপয়েন্টের নিচে দাগ দেওয়া সম্ভব হয়।

২. অডিও-ভিডিও রেকর্ড : ক্লাস লেকচার নোট করার সময় মনোযোগ যেন নষ্ট না হয় এবং লেকচার হুবহু সংরক্ষণ করার সুবিধার্থে কেউ কেউ ক্লাস লেকচার নোট করার পরিবর্তে অডিও-ভিডিও রেকর্ড করেন। এর কিছু সুবিধা আছে। যেমন– পথ চলার

---

৮. কিছু Common Symbol S useful common abbreviation পরিশিষ্টে দেওয়া হলো w/o-without.

www.nagorikpathagar.com

সময় টেপ রেকর্ডিং শোনা যায় এবং বাসায় ভিডিও দেখে ক্লাস লেকচার ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তবে অডিও-ভিডিও করা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তা সম্ভব নয়।

৩. হুবহু কপি না করে নিজের ভাষায় লেখা : শিক্ষকের লেকচার বা বই নোট করার সময় হুবহু কপি করার চেয়ে নিজের ভাষায় নোট করা ভালো। তাহলে দেখা যাবে নোট করার সময়ই বিষয়টি বুঝে ফেলা সম্ভব। তবে কোনো শব্দ বুঝে না এলে তা হুবহু কপি করাই ভালো। কারণ এক্ষেত্রে নিজের ভাষায় লিখতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. বৈচিত্র্যময় লেআউট : পুরো নোট এক ধরনের হওয়া ঠিক নয়। নোট করার সময় হেডিং, সাবহেডিং, পয়েন্ট, সাবপয়েন্টসহ বিভিন্ন বিষয় বিভিন্নভাবে লেখা উচিত। যেমন- হেডিং একটু বড় হওয়া ভালো। পয়েন্টের নিচে দাগ দেওয়া যেতে পারে। সাবপয়েন্ট কোনো কিছু দিয়ে হাইলাইট করা যেতে পারে। তাহলে পরবর্তী সময় নোট পড়তে বসলে পয়েন্ট ও সাবপয়েন্ট নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে হবে না।

৫. হাইলাইট ও আন্ডারলাইন দেওয়া : আপনি নোট করার সময় হাইলাইটার ব্যবহার করতে পারেন। মূলপয়েন্ট, উপপয়েন্ট এমনভাবে লেখা দরকার যেন পরবর্তীতে বুঝতে কষ্ট না হয়। কোনো বই পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা শব্দসমূহ হাইলাইটার দিয়ে দাগানো উচিত। এর ফলে পরবর্তীতে পড়ার সময় মৌলিক কথাগুলো সহজেই চোখের সামনে ভাসে।

৬. স্বল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা : নোট দেখে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিস্তারিত লেখে ফেলা দরকার। কারণ অনেক সময় দেখা যায় ক্লাসে সংক্ষেপে যা লেখা হয় দীর্ঘ সময় হয়ে গেলে তা আর মনে থাকে না।

৭. শিক্ষকের কাছে বসা : ক্লাসে এমন জায়গায় বসার চেষ্টা করা দরকার যেখান থেকে শিক্ষকের লেকচার যথাযথভাবে শোনা যায় এবং তিনি বোর্ডে যা লেখেন তা ভালোভাবে দেখা যায়। কেননা কখনো কখনো যথাযথভাবে লেকচার না শোনার কারণে সবকিছু ঠিকমতো লেখা যায় না।

নোট করার ক্ষেত্রে সমস্যা

১. সবকিছু লিখতে চেষ্টা করা , এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ পড়ে যায়।
২. অস্পষ্ট লেখা : অনেকে নোট করার পর নিজের লেখা নিজে পড়তে পারে না। ফলে পরবর্তীতে নোট বুঝতে সমস্যা হয়।
৩. নোট করার পর দীর্ঘদিন না পড়া। এর ফলে কী নোট করা হয়েছে তা পরবর্তীতে আর মনে থাকে না।
৪. নোট করার কাগজ সঠিক সাইজের না হলে সংরক্ষণ করতে সমস্যা হয়।
৫. নোট করার জন্য সুনির্দিষ্ট নোটখাতার পরিবর্তে একেক সময় একেক স্থানে নোট করলে তা সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে যায়।
৬. অনেক বেশি নোট করার পরও যদি মূল পয়েন্ট বাদ থাকে তাহলে নোট করার সার্থকতা নেই।

আপনার নোট করার টেকনিক কী ঃ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই কম-বেশি নোট করে এবং সকলেরই নোট করার নিজস্ব স্টাইল আছে।

www.nagorikpathagar.com

আপনি আপনার নোট করার স্টাইল সম্পর্কে ভাবুন
আপনি কি সাধারণত নোট করেন?
আপনার নোট করার টেকনিক কী? আপনি কি প্রথমবার কোনো বই পড়ার সময় নোট করেন, না একবার পড়ে বই সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় নোট করেন?
আপনি খুব বিস্তারিত নোট করেন, নাকি সংক্ষেপে নোট করেন?
যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নোট পড়ে ভালভাবে লিখে ফেলেন?
কোনো বই বা প্রবন্ধ নোট করার পর আপনি কি আবার যাচাই করেন যে, সঠিকভাবে সবকিছু লিখেছেন, না কোনো তথ্য বা পয়েন্ট লেখার সময় ভুল হয়েছে?
নোট করার সময় আপনি কি তথ্যসূত্র যথাযথভাবে লিখে রাখেন?
কোন পদ্ধতিতে আপনি নোট করেন (পয়েন্টাকারে/ডায়াগ্রামাকারে)?
আপনি নোট কীভাবে সংরক্ষণ করেন (ফাইলে রাখেনর/কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ রাখেন)?

আপনার নোট কি উত্তম

নোট করাশেষে নোটের প্রতি তাকান এবং ভাবুন আপনি কি উত্তমভাবে নোট করেছেন?

নোট	উত্তম নোট
পড়তে কষ্ট হয়	সহজেই পড়া যায়
খুবই বিস্তারিত	সংক্ষিপ্ত, পয়েন্টভিত্তিক
বুঝতে কষ্টকর	বুঝতে সহজ
গোছানো নয়	সাজানো-গুছানো
পৃষ্ঠা নম্বর নেই	পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আছে
পরবর্তীতে নোট দেখে শেখা যায় না	নোট দেখে শেখা যায়
শব্দসংকেত নেই	শব্দসংকেত ব্যবহার করা হয়েছে
অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ, মূল পয়েন্ট, সাবপয়েন্ট কিছুই বোঝা সম্ভব নয়	গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেখলেই বোঝা যায়

নোট করার বিশেষ নির্দেশিকা

১. **তথ্যসূত্র :** নোট বই/প্রবন্ধ নোট করার সময় তথ্যসূত্র যথাযথ উল্লেখ করতে হবে।

২. **রেফারেন্স :** শুধু তথ্যসূত্র উল্লেখ করলেই চলবে না, বিস্তারিত রেফারেন্সও লিখতে হবে।

৩. ক্লাস লেকচার নোট করার সময় লেকচারের নাম, লেকচারের সময়, স্থান, তারিখ ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখে রাখা প্রয়োজন।

৪. ক্লাসের ভালো ছাত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫. নোটকে অর্গানাইজড রাখা। এর জন্য স্প্রাইরাল বা হোল নোট বুক ব্যবহার করা যায়। লুজ ফোল্ডার ব্যবহার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা দরকার। কারণ এতে এলোমেলো হয়ে যায় এবং হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.nagorikpathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

রাইটিং অ্যান্ড রিসার্চ স্কিলস বা লেখা ও গবেষণার দক্ষতা অর্জন

লেখার গুরুত্ব : বক্তব্য ও লেখা দীন প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। বক্তব্য উপস্থিত লোকেরা শুনতে পায়। কিন্তু লেখা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মননেও রেখাপাত করে। এই কারণে লেখার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। তাই যাদের যোগ্যতা আছে লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের পয়গাম মানুষের কাছে তুলে ধরা আবশ্যক। হিশাম আল তালিব লেখার উদ্দেশ্য এভাবে তুলে ধরেছেন :

"লেখা হচ্ছে একটি বহুমুখী হাতিয়ার। অন্যকে জানানোর জন্য, বোঝানো বা উপদেশের মাধ্যমে নিজের মতে আনার জন্য, উৎসাহিত করার জন্য, এমনকি ভীতি প্রদর্শনের জন্য আমরা লিখে থাকি। ভালো লিখতে পারা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লেখা :

১. বিভিন্ন ধারণা এবং তথ্যকে এমন স্থায়ী রূপ দেয়, যা সহজে রেফারেন্স এবং উদ্ধৃতির জন্য পাওয়া যায়।
২. লেখায় ব্যক্ত মত বা বাণী অনুযায়ী অন্যকে কাজে উৎসাহিত করে।
৩. বৃহত্তর পরিসরে শ্রোতাদের জন্য লেখকের ধারণাসমূহকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে লেখকের সময় বাঁচায়।
৪. সংক্ষিপ্ত এবং যৌক্তিক আকারে নতুন বা বিভিন্ন প্রকারের ধারণা পেশ করে পাঠকদের গাইড বা পথপ্রদর্শন করে।
৫. লেখককে পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়ে লেখকের কর্তৃত্ব এবং আস্থাশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে।
৬. সংক্ষেপে নির্ভুলভাবে, স্থায়ীভাবে কাজের বিভিন্ন গতিধারা উল্লেখ করে সফলতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
৭. দাওয়াতি কাজের একটি কার্যকর মাধ্যম বা উছিলা।"

কেন লিখবেন : একজন লেখক কেন লেখেন এ প্রসঙ্গে ইবনে হাযম বলেন, "সাত কারণে কেউ কোনো বই বা কোনো কিছু রচনা করে থাকেন। সেই কারণগুলো হচ্ছে :

১. কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা– সমাজ ও যুগের চাহিদা পূরণে যা লেখা হয়।
২. ইতঃপূর্বে লিখিত অপূর্ণাঙ্গ কোনো লেখাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের জন্য। যেমন– তাফসীর জালালাইন দুইজনে লিখেছেন– তাঁদের নাম হচ্ছে জালালুদ্দীন আল–সয়ুতি ও জালাল উদ্দিন আল মহল্লা। একজনের মৃত্যুর পর অপূর্ণাঙ্গ তাফসীর শেষ করার জন্য আরেকজন লিখেছেন।

www.nagorikpathagar.com

৩. ইতঃপূর্বে লিখিত কোনো বই বা প্রবন্ধের সমালোচনা করার জন্য।
৪. ইতঃপূর্বে সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত কোনো বই বা প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে লেখা।
৫. বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একসাথে কোনো বিষয় লেখা।
৬. ইতিপূর্বে লিখিত দীর্ঘ কোনো বইকে মৌলিকত্ব পরিবর্তন করা ছাড়া সংক্ষেপিত করা। যেমন– তাফসীরে ইবনে কাসীরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।
৭. বিভিন্ন গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা তথ্যাদি একসাথে সংকলন করা।

আল্লাহ্ সকলকে লেখার যোগ্যতা দান করেননি : এমন অনেক শিক্ষাবিদ আছেন, যাঁদের লেখা বই পড়ে অন্যরা ভালো বক্তব্য দিতে পারেন। কিন্তু তিনি কারো সামনে দুই-এক মিনিট কথা বলতে পারেন না। কারো সামনে বক্তব্য দিতে দাঁড়ালে বলার মতো শব্দ খুঁজে পান না। তার বিপরীত এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা চমৎকার বক্তব্য দিতে পারেন, কিন্তু দুই-এক কলম লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবে আল্লাহ তাআলা একেকজনকে একেক ধরনের প্রতিভা দান করেছেন। কেউ ইচ্ছা করলেই লিখতে পারেন না। যদি ইচ্ছা করলেই লেখা সম্ভব হতো তাহলে পৃথিবীতে আরও প্রচুর লেখক হতেন।

আল্লাহ্ সকলকে সব বিষয়ে লেখার যোগ্যতা দান করেননি : লেখা আল্লাহর দান। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে সব বিষয়ে লেখার যোগ্যতা দান করেননি। এই কারণে সবাই সব বিষয়ে লিখতে পারেন না। আল্লাহ্ তাআলা কাউকে কাব্যপ্রতিভা দিয়েছেন আর কাউকে সাহিত্যপ্রতিভা দিয়েছেন। কেউ গল্প লিখতে পারেন, আর কেউ উপন্যাস লিখতে পারেন। কেউ গবেষণাধর্মী লেখা লেখেন আর কেউ বর্ণনাধর্মী লেখা লিখতে পারদর্শী। আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মওদূদী, শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, কবি হালি, মাওলানা রুমী, কবি নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ফররুখ আহমদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, কবি আল মাহমুদ, কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখের লেখনীর ধরন ও প্রতিভা এক নয়। আল্লাহ যাঁকে যে ধরনের লেখার প্রতিভা দান করেছেন তিনি ঐ ধরনের লেখা লিখতে পারেন। যদি ইচ্ছা করলেই সব বিষয়ে লেখা সম্ভব হতো তাহলে সবাই কাব্য, উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা সব ধরনের লেখাই লিখতেন। সাধারণত একেকজন একেক ক্ষেত্রে লেখালেখি করেন। কারণ অন্য ক্ষেত্রে লেখার প্রতিভা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেননি।

সকলের লেখা সমানভাবে পাঠকসমাদৃত হয় না : সকল লেখকের লেখা সমানভাবে পাঠকসমাদৃত হয় না। কোনো লেখকের লেখা প্রকাশের আগেই পাঠক পড়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। আর কোনো লেখকের বই পড়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েও পাঠক খুঁজে পাওয়া যায় না। কারো লেখা প্রকাশের জন্য প্রকাশক লেখকের পেছনে ঘোরেন আর কারো লেখা প্রকাশের জন্য লেখককে প্রকাশকের পেছনে ঘুরতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

আপনার লেখার যোগ্যতা : সকলের লেখার দক্ষতা ও উপস্থাপনা-কৌশল সমান নয়। লেখার ক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা কতটুকু বা আপনি কোন ক্ষেত্রে লিখতে অভ্যস্ত তা আপনিই ভালো জানেন। নিচের চার্ট অনুযায়ী আপনার লেখার যোগ্যতা কী ধরনের তা যাচাই করুন।

আপনি কী জানেন?	হ্যাঁ	না	লেখার মান ১, ২, ৩, ৪	লেখার মান আরও ভাল করতে হলে কী করা দরকার
আপনি কি স্বভাবগতভাবে সব সময় লেখালেখি করেন?				
একাডেমিক লেখা কীভাবে লিখতে হয় তা কি জানেন?				
সাধারণ লেখা ও একাডেমিক লেখার পার্থক্য কি জানেন?				
প্রবন্ধ কীভাবে লেখা হয়?				
কাব্যচর্চা কীভাবে করতে হয়?				
পত্রিকার রিপোর্ট কীভাবে লিখতে হয়?				
প্রবন্ধের ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে কি আপনি পারদর্শী?				
বর্ণনামূলক লেখার ক্ষেত্রে আপনি কি দক্ষ?				
পর্যালোচনামূলক লেখা লিখতে কি আপনি পারদর্শী?				
প্রবন্ধের মূল পয়েন্টসমূহ আপনি কি চমৎকারভাবে লিখতে পারেন?				
সুন্দরভাবে প্যারাগ্রাফ করার ক্ষেত্রে আপনি কি পারদর্শী?				
লেখায় তথ্য উপস্থাপন করতে আপনি কি দক্ষ?				
উপসংহার লেখার ক্ষেত্রে পারদর্শী কিনা?				
প্রুফ রিডিং করার দক্ষতা আছে কিনা?				
লেখার তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আপনি কি দক্ষ?				
পাঠকের মতামত বা সমালোচনা গ্রহণ করেন কিনা?				

১. ভালো নয়। ২. কোনো রকম। ৩. ভালো। ৪. খুব ভালো।

www.nagorikpathagar.com

লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা : দুনিয়াতে বড় লেখক হয়ে কেউ জন্ম নেয় না। আবার কেউ ইচ্ছা করলেই বড় লেখক হয়ে যেতে পারে না। কেউ ভালো বক্তা কিন্তু ভালো লেখক নন। আবার কেউ ভালো লেখক কিন্তু ভালো বক্তা নন। লেখার কিছুটা যোগ্যতা যাদের আছে তাদের লেখাকে অভ্যাসে পরিণত করা দরকার। তাহলে সময়ের ব্যবধানে বড় একজন লেখক হওয়া সম্ভব। যারা কখনও লেখালেখি করেনি, কিন্তু লিখতে আগ্রহী তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে : প্রথমত, আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন বা বেদনাদায়ক কোনো ঘটনা কিংবা বাল্যজীবনের কোনো স্মৃতি লিখে আপনার পরিচিত কাউকে শোনান। দ্বিতীয়ত, কিছু শব্দ শিখুন এবং ঐ শব্দসমূহ ব্যবহার করে কোনো ঘটনা লেখার চেষ্টা করুন। এভাবে পর্যায়ক্রমে লিখতে থাকুন। তৃতীয়ত, কোনো বিষয় নিয়ে ৫ মিনিট নিরিবিলি ভাবুন তারপর মনের অভিব্যক্তি কালির আঁচড়ে প্রকাশ করুন। এরপর আরও বেশি সময় ব্যয় করে লেখার চেষ্টা করুন। চতুর্থত, প্রথম পর্যায়ে প্রবন্ধ লেখার পরিবর্তে চিঠিপত্র কলামে লেখার চেষ্টা করুন। তারপর প্রবন্ধ লেখা শুরু করতে পারেন। পঞ্চমত, প্রবন্ধ লেখা শুরু করার পর প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠান। তারপর আস্তে আস্তে প্রধান প্রধান পত্রিকাসমূহে লিখতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকায় ছাপা হওয়ার আনন্দ পাওয়া দরকার। প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় লেখা পাঠানোর পর ছাপা না হলে মনে হতাশা আসতে পারে।

মনে যা আসে লিখে ফেলুন : মনের রাজ্যে অনেক সময় নানা ধরনের চিন্তা উঁকি মারে। আল্লাহ তাআলা সকলের মনে এই ধরনের চিন্তা দান করেন না। তাই আপনার মনে কোনো ধরনের ভাবের উদয় হলে তা লিখে ফেলুন। আপনার ভাব সুন্দর ভাষার অভাবে লেখার কাঙ্ক্ষিত মান না পেলেও হতাশ হবেন না। এভাবে ভাব লিখতে থাকুন এবং যতক্ষণ ভাব থাকে ততক্ষণ লেখার চেষ্টা করুন। একটি কথা মনে রাখা দরকার, ইচ্ছা করলে খাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা করলে লেখা যায় না। আর কোনো কিছু লিখার প্রথমেই মনে ভাবের উদ্রেক হয়। ভাব ছাড়া লেখা আসে না; আর মনের ভাব সব সময় দেখা যায় না. কিছুক্ষণ পরে মনের ভাব চলে যায়। ফলে জন্মের আগেই একটি লেখার অপমৃত্যু ঘটে। আর ভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেখা অব্যাহত না রাখলে দেখা যায় লেখার প্রথমাংশের ভাবের সাথে দ্বিতীয়াংশের ভাবের মিল থাকে না।

ভালো লিখতে হলে লেখার টেকনিক জানতে হয় : লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেখার মাধ্যমে মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ পায়। তাই চিন্তা-ভাবনা করেই লেখা উচিত। অন্যদের কাছে ব্যক্তিত্ব হালকা হয় এমন কিছু লেখা উচিত নয়। অপরদিকে লেখার সময় নিজের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের চেয়ে পাঠকের রুচি ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। যারা পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখেন তারা জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হন। জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হতে হলে সাধারণ ভুলত্রুটিমুক্ত হয়ে লিখতে হবে। যেসব লেখা নানা ধরনের ভুলত্রুটিতে ভরপুর, সে ধরনের লেখা পাঠকসমাদৃত হয় না।

www.nagorikpathagar.com

এ সম্পর্কে হিশাম আল তালিব চমৎকার আলোচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ হলো : লেখায় খুব অল্প বা বেশি তথ্য দেওয়া, বিষয়বস্তু দুর্বলভাবে সাজানো, প্রথম খসড়া সংশোধন করতে ব্যর্থ হওয়া, খুব দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার, প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোচনা, কাঠামোগত ক্রুটি, অপ্রচলিত শব্দ এবং ভাষার ব্যবহার, অপ্রতুল ভূমিকা এবং উপসংহার, দুর্বলভাবে এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্ট পরিবর্তন ইত্যাদি।

লেখা শুরুর আগে কয়েকটি কাজ : লেখা শুরুর আগে আপনাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে :

১. পরিকল্পনা : পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কিছু লেখা হয় না। প্রত্যেক মানুষের কল্পনাজগতে অনেক কিছু উঁকি দেয়। সব বিষয়ে লেখা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। মাথায় যেসব চিন্তা উঁকি দেয় তা থেকে বাছাই করে লেখার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হয়। এরপর উক্ত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা করলেই ইট, রড, সিমেন্টসহ প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। তারপর পরিকল্পনা অনুসারে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করতে হয়। লেখালেখিও অনুরূপ। লেখার চিন্তাকে বাস্তবরূপ দান করতে হলে তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়। তারপর লেখার আউটলাইন অনুসারে লেখার কাজ শুরু করতে হয়। বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর রঙ-তুলি দিয়ে ভালোভাবে বার্নিস করে। অনুরূপভাবে কোনো প্রবন্ধ লেখার কাজ শেষ হওয়ার পর তা সম্পাদনার মাধ্যমে ভুলক্রটি দূর করতে হয়।

২. কেন লেখা লিখছেন : যেকোনো লেখার সাথে কয়েকটি প্রশ্ন জড়িত, কেন লেখাটি লিখছেন (why), কাদের উদ্দেশ্যে লিখছেন (for whom), লেখার বিষয়বস্তু কী (what) এবং কোথায় লেখাটি প্রকাশিত হবে (where)। উপরিউক্ত মৌলিক প্রশ্নাবলির জবাবের সাথে লেখার স্টাইলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই লেখা শুরুর আগে আপনি কেন লিখছেন তা ঠিক করুন।

৩. কোন ধরনের লেখা লিখবেন : আমরা অনেক ধরনের লেখার সাথে পরিচিত। যেমন– প্রবন্ধ, টিউটরিয়াল, চিঠিপত্র, চাকরির আবেদনপত্র, লেকচার নোট, কার্যবিবরণী, বই বা প্রবন্ধ পর্যালোচনা, পত্রিকার সংবাদ, রিপোর্ট, স্মারকলিপি ইত্যাদি। সব ধরনের লেখার আলাদা স্টাইল আছে। যেমন পত্রিকার প্রবন্ধ আর পরীক্ষার হলের প্রশ্নোত্তর এক ধরনের হয় না। সাধারণ লেখা (গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ) ও একাডেমিক লেখার (যথাঃ Academic essay, Thesis, dissertation, Case Study) ধরন, কলেবর ও উপস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। একাডেমিক ও সাধারণ লেখাকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়– বর্ণনামূলক লেখা (Descriptive writing) ও

www.nagorikpathagar.com

পর্যালোচনামূলক লেখা (Analytic writing). বিবরণমূলক লেখায় কোনো জিনিস যেভাবে দেখা সেভাবেই লেখা হয়। যেমন একটি গাছ দেখতে কেমন? তাতে সবুজ পাতা আছে, শাখা-প্রশাখা আছে, শিকড় গভীরে। এই ধরনের লেখায় লেখকের বা অন্য কারো মূল্যায়ন, পর্যালোচনা থাকে না। এই কারণে এ ধরনের লেখাকে বলা হয় বিবরণমূলক লেখা। কিন্তু কোনো বর্ণনা যদি বিস্তারিতভাবে লেখা হয় আর তাতে লেখকের বা অন্য কারো পর্যালোচনা থাকে, বস্তুর দোষগুণ সম্পর্কে আলোচনা -পর্যালোচনা স্থান পায় তাহলে এ ধরনের লেখাকে বলা হয় পর্যালোচনামূলক লেখা। উভয় ধরনের লেখার স্টাইলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তাই লেখা শুরুর আগে আপনি কোন ধরনের লেখা লিখবেন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।

ভালো লেখার জন্য কতিপয় পরামর্শ

১. প্রবন্ধ লেখার জন্য পড়া : আমরা জানি কোনো কিছু লিখতে হলে পড়তে হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে, পড়ার জন্য প্রস্তুতকৃত সকল রেফারেন্স বই অনেক সময় পড়ার প্রয়োজন হয় না। আর কখনও তালিকার বাইরেও বই পড়তে হয়। তাই প্রবন্ধের শিরোনাম ভালোভাবে দেখে প্রবন্ধের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা পড়তে হবে। সকল তথ্য পড়ার সময় হয় না। তাই এক নজরে পড়ার টেকনিক অনুসরণ করতে হয়।

২. নোট করা : তথ্য সংগ্রহ ও পড়াশোনার সময় প্রয়োজনীয় নোট করা দরকার, তাহলে লিখতে সুবিধা হয় এবং সকল মৌলিক পয়েন্ট সুন্দরভাবে সাজানো সম্ভব হয়।

৩. সংগৃহীত তথ্য সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা : সংগৃহীত তথ্য সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা দরকার।

৪. প্রবন্ধ পরিকল্পনা : কোনো প্রবন্ধ লেখা শুরু করার আগে প্রবন্ধ পরিকল্পনা করা দরকার। এটা খুবই জরুরি। প্রবন্ধ পরিকল্পনা করলে সকল পয়েন্ট যথাযথভাবে উল্লেখ করা এবং তুরিত প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হয়। পরিকল্পিতভাবে কোনো প্রবন্ধ লিখলে তাতে পুনরাবৃত্তি কম হয় এবং মূল পয়েন্টগুলো সঠিকভাবে লেখা সম্ভব হয়। প্রবন্ধ লেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ হয়।

৫. ওয়ার্ড লিমিট (শব্দসংখ্যা) : কোনো কোনো রচনায় শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। শব্দসংখ্যার প্রতি খেয়াল রেখে কোনো লেখা দরকার।

৬. অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকা : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের টিউটরিয়াল কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা জানা এবং সে অনুযায়ী লেখা দরকার।

৭. শুরুতেই কাউকে আক্রমণ করে কিছু লেখা ঠিক নয় : কারো সমালোচনা বা যুক্তির সমালোচনা করার আগে নিজের যুক্তির পক্ষে শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থাপন করা দরকার। নিজের বক্তব্য সতর্কভাবে উপস্থাপন করা এবং বক্তব্যের পক্ষে তথ্যপ্রমাণ দেওয়া দরকার।

www.nagorikpathagar.com

৮. বিশেষ বিশেষ শব্দের সংজ্ঞা : প্রত্যেক লেখকই অনেক নতুন শব্দ, পরিভাষা ব্যবহার করেন। পাঠক এসব পরিভাষা সম্পর্কে পরিচিত না থাকলে তার পক্ষে লেখাটি বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে লেখার সাথে বিশেষ বিশেষ শব্দ বা পরিভাষার ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া ভালো।

৯. ডায়াগ্রাম ব্যবহার : যেখানে প্রয়োজন ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যে টার্গেটকে সামনে রেখে লেখা হচ্ছে তা ফোকাস করা দরকার।

১০. সমস্যা আলোচনা : কোনো সমস্যা আলোচনার সময় সমস্যাকে ভালোভাবে ফোকাস করার সাথে সাথে পর্যালোচনাসহ সমাধান উল্লেখ করা দরকার।

১১. ভালো লেখক ও লেখা থেকে সহযোগিতা নেওয়া : অনেকেই আছেন ভালো ছাত্র কিন্তু ভালো লেখক নন। কোনো কিছু সুন্দরভাবে ড্রাফট করতে পারেন না। আবার কারো ড্রাফট খুবই চমৎকার হয়। ম্যাগাজিন বিশেষত একাডেমিক জার্নালে বিভিন্ন বিষয়ে একাডেমিক রচনা লেখার আগে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করলে নতুন ধারণা পাওয়া যায়। তাই লেখার স্টাইল সুন্দর করতে বিভিন্ন রচনা/ প্রবন্ধ বেশি বেশি পড়া দরকার।

১২. নিজের লেখা নিজে বারবার পড়ুন এবং সমালোচনা করুন : আপনি কোনো বিষয়ে কিছু লিখলে পরবর্তী সময়ে বারবার তা পাঠ করুন এবং অন্যের লেখা পড়ে যেভাবে পর্যালোচনা করেন, সেভাবে নিজের লেখার নেতিবাচক দিকগুলোর তালিকা তৈরি করুন এবং পরবর্তী লেখাতে তা দূর করার চেষ্টা করুন।

একাডেমিক রাইটিং

একাডেমিক প্রবন্ধ কী (Essay) : Essay হচ্ছে কোনো বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত লেখা—যার শুরু, মধ্য ও শেষ আছে। কেউ কেউ এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : An essay is a form of expository writing consisting of more than one paragraph. Like a paragraph, an essay has a beginning, middle, and an end.

Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে– Essay is a piece of writing, usually short, on any one subject.

Stella Cottrel এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "An Essay is a piece of writing with a particular structure and layout."

একাডেমিক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য (Academic Assignment/Essay/ Tutorial) : অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে কোর্সওয়ার্কের অংশ হিসেবে অনেক টিউটরিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট

www.nagorikpathagar.com

লিখতে হয়। কখনও কখনও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আলাদা আলাদা টপিকের উপর লিখতে হয়। আর কখনও গ্রুপ টিউটরিয়ালের নম্বর কোর্সের নম্বরের সাথে যোগ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউটরিয়াল হিসেবে প্রদত্ত একাডেমিক লেখায়-

১. বর্ণনা ও পর্যালোচনার সমন্বয় সাধন করতে হয়। মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত একাডেমিক প্রবন্ধে কোনো একটি বিষয় বর্ণনা করতে হয় এবং পর্যালোচনা করতে হয়।

২. সুনির্দিষ্ট কনসেপ্টের সাথে তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ সাধন করতে হয় এবং ব্যাখ্যা করতে হয়।

৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেয়ে পূর্ব প্রকাশিত তথ্য অধ্যয়ন করেই প্রবন্ধ লিখতে হয়।

৪. পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিসহ লেখা লিখতে হয়।

৫. সংক্ষিপ্তাকারে মৌলিক কথা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে হয়। এতে একাডেমিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

৬. ব্যক্তিগত পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবন্ধের মূল বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়।

একাডেমিক প্রবন্ধসহ লেখার ক্ষেত্রে পরামর্শ : যে সকল ছাত্রছাত্রীকে গবেষণাধর্মী অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হয় তাদেরকে গবেষণার শিরোনাম এবং গবেষণা নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়তে হবে এবং নিচের কতিপয় বিষয়ের প্রতি ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে :

১. শিরোনাম ঠিক করা ও ভালোভাবে বোঝা : যেকোনো প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে চমৎকার শিরোনাম ঠিক করতে হয়। পাঠক সাধারণত শিরোনাম পড়েই লেখাটা পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই কারণে কিছু লিখতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিরোনাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। একাডেমিক কোনো বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দেওয়া হলে উক্ত বিষয় ভালোভাবে বোঝা দরকার। তাই অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার পর কয়েকবার নিজে নিজে শিরোনাম পড়ুন এবং মূল কথার নিচে দাগ দিন। তারপর অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে দুই লাইনে সারকথা লিখুন। শিরোনাম বুঝতে না পারলে সহপাঠী অন্য কারো সাথে কথা বলার চেষ্টা করুন। তারপরও বুঝতে কষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে কথা বলতে পারেন। শিরোনাম বোঝার ক্ষেত্রে ক্লাস নোট সহায়ক হতে পারে। শিরোনাম পড়ার সময় যে সকল পয়েন্ট মনে আসে তা নোটখাতায় লিখে রাখুন।

২. ব্রেইন স্টর্ম : অ্যাসাইনমেন্ট লেখার জন্য কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং উক্ত অ্যাসাইনমেন্ট এ মৌলিকভাবে কোন কোন বিষয় আলোচনা করতে হবে এ সম্পর্কে ব্রেইন স্টর্ম করা দরকার। লেখা হচ্ছে একটি সুরম্য প্রাসাদের মতো।

www.nagorikpathagar.com

অনেকগুলো ইট একসাথে ফেলে রাখলেই প্রাসাদ হয় না। অনুরূপভাবে অনেক তথ্য একসাথে লিখে রাখলেই লেখা হয় না। বিল্ডিং-এর রড, ইট, সিমেন্ট ও বালির মতো সুন্দরভাবে তথ্যাদি সাজানোর মধ্যেই লেখার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আর এই জন্য ব্রেইন স্টর্ম করার বিকল্প নেই। ব্রেইন স্টর্মের সময় লেখার পরিকল্পনা করতে হয়, যুক্তি সাজাতে হয়, উপস্থাপনা- কৌশল, প্যারাগ্রাফ ও শব্দবিন্যাস নিয়ে ভাবতে হয়। অতএব আপনি যেই বিষয়ে লিখতে চান ঐ বিষয়ে আপনার ধারণা কতটুকু আছে তা ব্রেইন স্টর্মের মাধ্যমে যাচাই করুন। এখন চিন্তা করুন আপনার অ্যাসাইনমেন্ট/প্রবন্ধ/রচনাটি লেখার জন্য আর কী কী জানা দরকার।

৩. তথ্য সংগ্রহ : একাডেমিক যেকোনো ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হলে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অ্যাসাইনমেন্ট লেখার জন্য কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন তা চিন্তা করতে হবে। সাধারণত বই, প্রবন্ধ, অফিসিয়াল রিপোর্ট, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, রেডিও ও টেলিভিশন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কত দিনের মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে এই আলোকে তথ্য সংগ্রহ ও লেখা শুরু করতে হবে।

লেখার কৌশল

১. সঠিক স্টাইল ডেভেলপ করা : একাডেমিক টিউটোরিয়াল বা যেকোনো লেখার জন্য সঠিক স্টাইল অনুসরণ করতে হয়। যেমন- আকর্ষণীয় ভূমিকা লেখা। ভূমিকা খুব ভালোভাবে লেখা দরকার। কারণ অনেকে ভূমিকা পড়েই লেখাটি পড়তে আগ্রহী হন কিংবা পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ভূমিকার প্রথম বাক্য পড়েই পাঠক যেন বুঝতে পারেন এটা একটা মৌলিক কাজ। পুরো রচনা লেখার পর এমনকি উপসংহার লেখার পরই ভূমিকা লেখা ভালো। ভূমিকায় নিজস্ব কোনো মন্তব্য বা পর্যালোচনা করা ঠিক নয়। লেখায় কোনো কোনো বিষয় উপস্থাপন করতে চান শুধু তাই ভূমিকাতে তুলে ধরা প্রয়োজন।

ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ

ক. ভূমিকা

১. খুব দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। অনেক শিক্ষাবিদের মতে, ভূমিকা মূল প্রবন্ধের পাঁচ-দশ ভাগ হওয়াই ভালো। কীভাবে প্রবন্ধ লেখা হবে এবং কোন কোন বিষয় মৌলিকভাবে আলোচনা করা হবে তাই ভূমিকাতে উল্লেখ করা দরকার।

২. ভূমিকায় শিরোনাম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আলোচনা আসা জরুরি। অস্পষ্ট কোনো বক্তব্য ভূমিকাতে উল্লেখ না করাই ভালো।

৩. প্রবন্ধ লেখা শেষ না করলে ভূমিকা লেখা কঠিন। কারণ কোন কোন বিষয় কীভাবে আলোচনা করা হয়েছে তা প্রবন্ধ শেষ না হলে জানা যায় না। তাই প্রবন্ধ শেষ করেই ভূমিকা লেখা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

৪. যেকোনো প্রবন্ধের ভূমিকা লেখার সময় পাঠকের কথা ভাবা উচিত। প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কিছু কথা লিখতে হয়। পাঠক ভূমিকা দেখেই যেন বুঝতে পারেন প্রবন্ধটি ইন্টারেস্টিং, এটি পড়া উচিত। পাঠক পরবর্তীতে উক্ত প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অন্যখানে ব্যবহার করতে পারবেন ভূমিকাতে এমন ধারণা দেওয়া উচিত।

A good introductory paragraph or section will serve as a focus and stimulus to your readers, encouraging them to continue reading.

খ. মূল বক্তব্য : ভূমিকার সূত্র ধরে তথ্য ও প্রমাণসহ মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়। মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট, সুচিন্তিত ও সুপঠিত হওয়া দরকার এবং পৃথক পৃথক প্যারাগ্রাফে পৃথক পৃথক যুক্তিসমূহ উল্লেখ করা উচিত। বিভিন্ন পয়েন্ট উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন এবং যে সময়ে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সে সময়ের কোনো ঘটনার প্রতিচ্ছবিসহ সর্বশেষ তথ্য সংযোগ করা ভালো। একাডেমিক লেখায় মূল বক্তব্যে আবেগের স্থান গৌণ, এতে তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা থাকতে হয় এবং কোন যুক্তির ভিত্তিতে কোন প্রশ্নের নির্দিষ্ট সমাধান গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখ করতে হয়। প্রবন্ধ বা টিউটরিয়ালে যে ধরনের প্রশ্ন থাকে তার সরাসরি জবাব থাকা প্রয়োজন। কারণ ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করলে পরীক্ষক/পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয়।

গ. উপসংহার ভালোভাবে লেখা : একাডেমিক যেকোনো লেখার ক্ষেত্রে ভূমিকা ও উপসংহার জরুরি। ভূমিকা ও উপসংহার নাম দিয়েই তা লিখতে হবে বিষয়টি এমন নয়। ভূমিকা ও উপসংহারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার। কোনো কোনো শিক্ষাবিদের মতে, শিরোনামের আলোকে মূল কথাটিই সর্বশেষ লাইনে চমৎকারভাবে তুলে ধরা আবশ্যক।

২. বাক্যবিন্যাস (Sentencing) **ঠিকমতো হওয়া :** বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার :

ক. প্রথম বাক্য সংক্ষিপ্ত হওয়া ভালো। কখনও কখনও Long Compound Sentence ব্যবহারের ফলে ভাবোদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রথম বাক্যের পর সিম্পল সেন্টেসের পরিবর্তে এক বাক্যে একাধিক ক্লজ বা আইডিয়া থাকা ভালো।

খ. কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে তা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই (Never begin a sentence until you are sure of what you want to say in it and of how it will end)

www.nagorikpathagar.com

গ. পাঠকের প্রতি খেয়াল রেখেই লেখা লিখতে হবে (All good writing has a proper sense of its audience)

ঘ. বানান শুদ্ধ হওয়া দরকার। কারণ অনেক সময় বানান ভুলের কারণে অনেক ভালো লেখাও পাঠককে বিরক্ত করে ।

ঙ. Punctuation যথাযথ হওয়া, বিশেষত কমা ও ফুলস্টপ যথাস্থানে প্রয়োগ করা দরকার। কমা বা ফুলস্টপ যথাস্থানে প্রয়োগ না করলে অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন নিচের লাইন দু'টি :

১. এখানে দাঁড়াবেন, না দাঁড়ালে জরিমানা দিতে হবে,

২. এখানে দাঁড়াবেন না, দাঁড়ালে জরিমানা দিতে হবে। এইবার একটু লক্ষ্য করুন উপরিউক্ত উদাহরণে একটি 'কমার' কারণে অর্থের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? তাই ইংরেজিতে বলা হয় : Inadequate punctuation can rapidly causes disaster—অতএব কমা, ড্যাশ, কোলন, সেমিকোলন, হাইফেন, ফুলস্টপ ব্যবহারের নিয়ম জানতে হবে।

চ. এমন শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে, যার অর্থ বোঝা কঠিন কিংবা অস্পষ্টতার কারণে পাঠক সঠিক অর্থের পরিবর্তে ভুল অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

ছ. পুনরাবৃত্তি না হওয়া, লেখার ক্ষেত্রে কোনো শব্দে বেশি পুনরাবৃত্তি হওয়া ঠিক নয়, তাহলে পাঠকের কাছে বোরিং লাগে। কোনো বিষয় পুনরাবৃত্তি না করে নতুন কিছু উপস্থাপন করলে পাঠক পড়তে অধিক আগ্রহী হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'খায়রুল কালামে মা ক্বালা ওয়া মাদালা' অর্থাৎ সর্বোত্তম শব্দ সেগুলো যেগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সুব্যক্ত। তাই সহজ, সরল, তথ্যভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত লেখাই উত্তম। লেখার সময় কর্তৃবাচক শব্দ পরিহার করে চলা উচিত। একই শব্দ বারবার ব্যবহার না করে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা উত্তম।

৩. সুন্দরভাবে প্যারাগ্রাফ লেখা : লেখার ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা অর্থ বুঝতে সাহায্যে করে এবং এর ফলে লেখা দেখতে সুন্দর লাগে। সাধারণত এক একটি প্যারাগ্রাফে এক একটি বিষয়, যুক্তি, অভিমত, পয়েন্ট তুলে ধরা হয়−A paragraph should usually deal with one main topic -তথ্য ও লেখার ধরন অনুসারে প্যারাগ্রাফ ছোট বা বড় হতে পারে। তাই কোনো প্যারাগ্রাফ ৮-১০ বাক্যের আবার কোনো প্যারাগ্রাফ ২-১ বাক্যের মধ্যেও সীমাবদ্ধ দেখা যায়। নতুন তথ্য/যুক্তি নতুন

www.nagorikpathagar.com

প্যারাগ্রাফে থাকা উচিত। প্যারাগ্রাফ লেখার সময় 'টপিক সেন্টেন্স' ও 'সাপোর্টিং সেন্টেন্স' চমৎকারভাবে লিখতে হয়। বিষয় উপস্থাপনার সময় ভাষার মধ্যে সাবলীলতা থাকা জরুরি। একটি বাক্যের সাথে আরেকটি বাক্য, একটি প্যারাগ্রাফের সাথে আরেকটি প্যারাগ্রাফের সুসমন্বয় ও সংযোগ থাকা দরকার। এজন্য লেখার সময় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

৪. পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে লেখা শুরু করা : কেউ কেউ কোনো রচনা লেখার চাপ সহ্য করতে পারেন না। খুব বেশি অস্থির হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আছেন ডেডলাইনের আগ মুহূর্তে কোনো লেখা শুরু করেন। ফলে তার অস্থিরতা বেড়ে যায়। এই কারণে হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে লেখা শুরু করা দরকার। কারণ ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে কোনো কাজ করা। যেমন ফজর নামায এমন সময় পড়া উত্তম, যেন একবার ভুল হলে দ্বিতীয়বার পড়া যায়। এ থেকে মানব জীবনের সামাজিক শিক্ষা হলো এই যে, কোনো কাজ করার সময় নির্ভুল করার চেষ্টা করা দরকার। তারপরও মানুষ হিসেবে ভুলক্রটি রয়ে যেতে পারে। তাই ভুল সংশোধনের অবকাশ রাখা ভালো। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো টিউটোরিয়াল জমা দেওয়ার পর শিক্ষক দ্বিতীয়বার সংশোধনের সুযোগ দেন যা ভালো নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। কিন্তু ডেডলাইনের পূর্ব-মুহূর্তে কিংবা জমা দেয়ার নির্দিষ্ট সময় বৃদ্ধি করে জমা দিলে শিক্ষক সে সুযোগ প্রদান করেন না।

৫. প্রথম ড্রাফট করা : পরিকল্পনা অনুসারে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করার পর উক্ত বিষয়ে লেখার কাজে হাত দিতে হয়। এজন্য প্রথমেই খসড়া ড্রাফট করতে হয় এবং উক্ত ড্রাফট নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে কথা বলা ভালো। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে কথা বলে তাঁর দিকনির্দেশনা অনুসারে সংশোধন ও বিয়োজন করার পর ফাইনাল ড্রাফট করা দরকার। তাহলে অ্যাসাইনমেন্টের মান ভালো হয় এবং বেশি নম্বর পাওয়া যায়।

৬. শিক্ষকের মন্তব্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা : টিউটোরিয়াল বা যে কোনো ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার পর শিক্ষক প্রত্যেকটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে মন্তব্যসহ ফেরত দেন। পরবর্তী রচনা ভালো করে লেখার জন্য আগের লেখা সম্পর্কে শিক্ষকের মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের মন্তব্য ভালোভাবে অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের মান ভালো করা দরকার। কোনো লেখা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করলে মন খারাপ করবেন না। নেতিবাচক গঠনমূলক সমালোচনা পরবর্তী সময়ে লেখার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক। যে সকল ছাত্রছাত্রীর অ্যাসাইনমেন্ট ভালো হয়েছে এবং যাদের অ্যাসাইনমেন্টের এর জন্য শিক্ষক ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাদের প্রবন্ধ দেখা ও পড়ার চেষ্টা করা দরকার।

www.nagorikpathagar.com

৭. টেক্সট বুক, ক্লাস নোট ও রেফারেন্স বই থেকে বেশি সহযোগিতা নেওয়া : কোনো একাডেমিক রচনা বা অ্যাসাইনমেন্ট লেখার সময় টেক্সট বুক ও রেফারেন্স বইতে যেসব পয়েন্ট আলোচিত হয়েছে তার উল্লেখ থাকা জরুরি। টেক্সট ও রেফারেন্স বই থেকে সহযোগিতা নেওয়ার পর অন্যান্য বই থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। রেফারেন্স বইয়ের জরুরি পয়েন্ট আলোচনা না করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে চমৎকারভাবে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট লেখার পরও নম্বর কম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তখন পরীক্ষকের ধারণা হয় যে, ছাত্রটি তার টেক্সট বই পড়াশোনা করেনি।

৮. তথ্যসূত্র ও প্রমাণ উপস্থাপন : একাডেমিক লেখাতে যুক্তির অনুকূলে তথ্য উপস্থাপন করা খুব জরুরি। কারণ একাডেমিক লেখা আবেগ বা বর্ণনানির্ভরের পরিবর্তে যুক্তি ও তথ্যনির্ভর হতে হয় এবং প্রাসঙ্গিকতা থাকা জরুরি। এছাড়া একাডেমিক লেখায় রেফারেন্স ও তথ্যপঞ্জি দিতে হয়। বিশেষত লেখাতে যখন কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া হয় তখন লেখার সাথে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ এই একই তথ্য আরেকখানে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা দরকার।

৯. রেফারেন্স ভালোভাবে দেখা : যেসব গ্রন্থ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে লেখা জমা দেওয়ার আগে সম্ভব হলে তা আবার দেখা ভালো। এতে কিছু তথ্য সংশোধন বা সংযোজন করার সুযোগ হয়। কখনও কখনও লেখার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুল হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার রেফারেন্স দেখলে এই ধরনের ভুল সংশোধন করা সম্ভব হয়।

১০. লেখা সম্পাদনা করা/সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন : কোনো কিছু প্রথম লেখার সময় মনে যা আসে তাই লিখে ফেলবেন। লেখার পর এবার সংশোধন করতে বসুন। আপনি যে বিষয়ে লিখতে বসেছেন আপনার লেখায় উক্ত বিষয়ের সাথে মিল নেই এমন কোনো কিছু লিখেছেন কিনা? যদি লিখে থাকেন তাহলে তা কেটে ফেলুন। এবার আরও ভালো করে চিন্তা করুন, যে বিষয়ে লিখেছেন সে বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য নতুন কোনো তথ্য বা আরও কোনো পয়েন্ট লেখা দরকার আছে কিনা? যদি মনে করেন আরও কিছু কথা যোগ না করলে বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছে না তাহলে আরও কিছু কথা যোগ করে ভালো করে আবার পড়ুন এবং নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে কিনা তা দেখুন। যদি নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে ড্রাফট পড়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো বাদ দিন কিংবা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দপ্রয়োগ করে শব্দসংখ্যা কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন। এভাবে লেখা সম্পাদনা করেই সম্পাদক বা শিক্ষকের কাছে জমা দেওয়া দরকার। লেখা সম্পাদনার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয় :

www.nagorikpathagar.com

	হ্যাঁ	না
লেখা অর্থবহ হয়েছে কিনা?		
মূল বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা?		
বক্তব্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে কিনা?		
প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা?		
যুক্তির অনুকূলে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?		
যথাযথভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা?		
বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধ হয়েছে কিনা?		
রেফারেন্স তালিকা সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা?		
পাঠক বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে এমন কোনো কথা বলা হয়েছে কিনা?		
ভূমিকা ও উপসংহার যথাযথ হয়েছে কিনা?		
কোনো শব্দ/তথ্য পুনরাবৃত্তি হয়েছে কিনা?		
বাক্য বেশি দীর্ঘ হয়েছে কিনা?		

লেখা সম্পাদনা করার পর পুনরায় ড্রাফট করা ভালো। পুনরায় ড্রাফট করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ড্রাফট খুব বেশি সংক্ষিপ্ত কিংবা খুব দীর্ঘ এবং ভূমিকা ও উপসংহার যথাযথ হয়েছে কিনা, যুক্তি উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতা এবং বর্ণনার মধ্যে যোগসূত্র ঠিক আছে কিনা।

১২. প্রুফ রিডিং : প্রুফ না দেখে কোনো লেখা জমা দেওয়া উচিত নয়। লেখার ত্রুটিবিচ্যুতি ধরার জন্যই প্রুফ দেখা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের কিছু কমন ভুল থাকে। এই ধরনের ভুলের তালিকা তৈরি করে রাখা দরকার এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রুফ দেখলে সংশোধন করতে সুবিধা হয়। প্রফেশনাল প্রুফরিডারদের কাছ থেকে এই সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিজের প্রুফ দেখার পর সম্ভব হলে প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে প্রুফ দেখানো উত্তম। কারণ নিজের লেখা নিজে দেখার সময় অনেক ভুল শব্দ শুদ্ধ মনে হয়।

লেখালেখির ক্ষেত্রে আরও কিছু কথা

ম্যাগাজিন/পত্রিকার প্রবন্ধ : আপনি যদি কোনো পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের জন্য প্রবন্ধ লিখতে চান তাহলে আগেই পত্রিকার মান সম্পর্কে ধারণা নিন। পত্রিকার সম্পাদকের সাথে কথা বলে শব্দসীমা জেনে নিন, তারপর লেখা শুরু করুন। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, একটি ছোট ম্যাগাজিনের মধ্যে বিশাল প্রবন্ধ ছাপানো সম্ভব হয় না। যার কারণে লেখককে দ্বিতীয়বার সংক্ষিপ্ত করার জন্য দেওয়া হয় বা সম্পাদক নিজেই সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেন।

www.nagorikpathagar.com

পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা : যে পত্রিকার জন্য লেখা হয় উক্ত পত্রিকার পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। সব ফলই সুমিষ্ট কিন্তু সবাই সব ফল সমানভাবে পছন্দ করেন না। অনুরূপভাবে সব ফুলই সুন্দর। সব ফুলেরই অনুরাগী আছে, তবে একেক ফুল একেক জনের কাছে অধিক প্রিয়। অনুরূপভাবে সব লেখাতেই জানার অনেক কিছু থাকে, কিন্তু সকল ধরনের লেখার আলাদা পাঠক আছে। তাই পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পত্রিকার লেখা লিখতে হয়।

কম্পিউটার টাইপিং ও লে-আউট : বর্তমান যুগকে কম্পিউটার ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। বর্তমানে প্রায় সবকিছু কম্পিউটারেই ড্রাফট করা হয়। আপনার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রবন্ধ কম্পিউটার কম্পোজ করলে যত সুন্দর লাগে তা হাতে লিখলে ঐ ধরনের সুন্দর লাগে না। কম্পিউটারে ইচ্ছামতো ডিজাইন করে জমা দিন। বাংলাতে একটি কথা আছে, "আগে দর্শনধারী তারপর গুণবিচারী"। অর্থাৎ কারো লেখাতে প্রচুর উপাদান থাকলেও দেখতে ভালো না হলে শিক্ষকের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে নম্বর কম পাওয়া যায়। তবে এর অর্থ এ নয় যে, লেখার মান ভালো না হয়ে শুধু ডিজাইন সুন্দর হলেও বেশি নম্বর পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আরেকটি প্রবাদ মনে রাখা দরকার, "চক চক করলেই সোনা হয় না।" এর অর্থ হচ্ছে দেখতে সুন্দর হলেও তত্ত্ব ও তথ্য ভুল হলে নম্বর পাওয়া যায় না।

লেখার ডিজাইন সুন্দর হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার : ১. টাইপ ডিজাইন ও ফন্ট ব্যবহার, ২. প্রয়োজনে স্ট্যান্ডার্ড, ইটালিক বা বোল্ড করা, ৩. টাইপ সাইজ, ৪. প্রয়োজন অনুসারে আপার বা লোয়ার কেস ব্যবহার করা।

রাইটার্স ফোরাম বা রাইটার্স গ্রুপ : প্রবন্ধ নিয়ে ছাত্রছাত্রী বা অভিজ্ঞ কারো সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় প্রবন্ধের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা উচিত। তাই যাদের লেখার অভ্যাস আছে এ ধরনের কয়েকজন মিলে একটি রাইটার্স ফোরাম করা যেতে পারে। এই ফোরামের সদস্যরা মাসে এক বা একাধিকবার বৈঠকে মিলিত হবে এবং প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয়ের উপর লেখা উপস্থাপন করবে। প্রত্যেকটি লেখার উপর ফোরামের সদস্যরা বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করবে। মাঝে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লেখক, কবি–সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ জানানো যায়। এইভাবে নবীন লেখকরা প্রবীণ লেখকদের কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করে লেখার মান বৃদ্ধি করতে পারবেন।

জয়েন্ট রিসার্চ/যৌথ প্রবন্ধ লেখা : যেমনিভাবে কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেওয়া যায় অনুরূপভাবে একাধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে রিসার্চ করতে পারেন কিংবা যৌথ কোনো প্রবন্ধ লেখা যায়।

লেখার সময় আটকে যাওয়া (Writer's block)

লেখার মন-মানসিকতা সব সময় এক ধরনের থাকে না, ফলে লেখা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না। কয়েকভাবে লেখা বন্ধ হতে পারে :

১. কোনো বিষয়ে লেখা শুরু করার পর হঠাৎ লেখার ভাব না আসা।

www.nagorikpathagar.com

২. আবার কখনও দেখা যায়, ড্রাফট করার সময় সঠিক শব্দ মনে আসে না।

৩. লেখা শুরু করার পর দেখা গেল সংগৃহীত তথ্য অপর্যাপ্ত।

৪. উপস্থাপিত যুক্তি প্রবন্ধের শিরোনামের আলোকে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না, কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি খুঁজে মনে আসে না। এমতাবস্থায় কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নতুন ভাব আসার পর বা পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর আবার লেখা শুরু করা দরকার এবং লেখালেখি করেন এমন কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন। কারো সাথে আলোচনা করলে লেখায় নতুন ভাবের সঞ্চার হতে পারে।

একাডেমিক রিপোর্ট

রিপোর্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু অবগত করা। "A report is the formal writing up of a piece of research or project work." রিপোর্টে সাধারণত খুব সংক্ষেপে সাদামাটা ভাষায় তথ্য উল্লেখ করতে হয়। এতে হেডিং ও সাবহেডিং থাকে। প্রবন্ধ ও রিপোর্টের মধ্যে মৌলিক অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

প্রবন্ধ	রিপোর্ট
প্রবন্ধে সকল বক্তব্য পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়	রিপোর্টে সাধারণত হেডিং, সাব-হেডিং ও নাম্বারিং থাকে
প্রবন্ধ লেখার মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে	রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকে না। প্রত্যেক পয়েন্ট আলাদা আলাদা লেখা হয়।
প্রবন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিমত/বিষয়-কেন্দ্রিক যুক্তি-তর্ক থাকে	রিপোর্টে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান, সার্ভে বা কেস স্টাডি থাকে
প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা থাকে	রিপোর্টে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ থাকে
প্রবন্ধে একই ধরনের স্টাইল অনুসরণ করা হয়	রিপোর্টে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল থাকে

রিপোর্টের লেখা কীভাবে শুরু করবেন : কী জন্য এবং কাদের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট লিখছেন তা আগে ঠিক করা দরকার। নতুন কোনো তথ্য দিয়ে রিপোর্ট শুরু করা ভালো। রিপোর্টের সার্বিক পরিকল্পনা থাকা দরকার। রিপোর্টে সততা ও স্বচ্ছতা থাকা দরকার। টেক্সট ড্রাফট করুন। দেখতে চমৎকার হওয়া দরকার। এক পাতায় সংক্ষেপে সারাংশ তুলে ধরা, পর্যালোচনা ও মন্তব্য দেওয়া।

রিপোর্ট লেখার স্ট্রাকচার (Structuring reports)

১. শিরোনাম (Title) **:** রিপোর্টের প্রথমেই শিরোনাম থাকতে হয়। শিরোনামের নিচে যে শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে তাঁর নাম লিখতে হয়, তারপর ছাত্র/ছাত্রীর নাম, কোর্সের নাম ও তারিখ লিখতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

২. **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** (Acknowledgements) : রিপোর্টের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নাম লিখতে হয়।

৩. **এক নজরে রিপোর্ট** (Abstract/Overview) : মূল রিপোর্ট লেখার আগে এক নজরে রিপোর্টের মৌলিক কথাগুলো লিখতে হবে :

আলোচ্যসূচি (List of Contents) : এতে রিপোর্টে উল্লিখিত সকল বিষয়/অধ্যায়ের উল্লেখ থাকতে হয়।

ভূমিকা (Introduction) : এতে গবেষণার বিষয়বস্তু এবং কেন এই বিষয়ে গবেষণা করা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়।

অনুরূপ গবেষণা হলে আলোচনা (Review of the literature) : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতঃপূর্বে কোনো গবেষণা হলে উক্ত গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি (Method) : কোন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

তথ্য পর্যালোচনা পদ্ধতি (Measurment criteria) : সংগৃহীত তথ্য কোন নিয়ম অনুসারে পর্যালোচনা করা হবে– সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে।

ফলাফল (Findings) : গবেষণা করতে গিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে ফলাফল তুলে ধরা।

ফলাফল আলোচনা (Discuss the results) : গবেষণার ফলাফল আলোচনা/পর্যালোচনা করতে হয়।

উপসংহার (Conclusions) : কোনো কোনো রিপোর্টে উপসংহার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। তবে সাধারণত উপসংহারে গবেষণার মূল কথা উল্লেখ করতে হয়।

সুপারিশ (Suggestions) : রিপোর্টের শেষে সুপারিশ থাকতে হয়।

রেফারেন্স ঃ যে সব তথ্য প্রদান করা হয় তার সকল তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হয়।

তথ্যপঞ্জি (Bibliography) : রিপোর্ট/গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার জন্য যে সকল বই/তথ্য পড়া হয়েছে সকল কিছুর তালিকা তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখ করতে হয়।

অতিরিক্ত তথ্য (Appendices) : মূল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি অথচ উল্লেখ করা জরুরি এমনসব তথ্য অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

বই পর্যালোচনা

বই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় : কারো বই পর্যালোচনা করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয় ঃ

১. বইটি গুরুত্বপূর্ণ কিনা। গুরুত্বপূর্ণ হলে কেন, না হলে কেন নয়?

২. কোন কোন বিষয় বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. লেখকের আলোচনার মধ্যে কোন ধরনের সফলতা-দুর্বলতা রয়েছে।

৪. বই সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনা কী এবং কারণ কী?

www.nagorikpathagar.com

বই পর্যালোচনা কীভাবে লিখতে হয় : প্রথম পর্যায়ে বইটি এক নজরে পড়তে হয়। এই সময় বইয়ের শিরোনাম, আলোচ্যসূচি, মুখবন্ধ, ভূমিকা, উপসংহার পড়তে হয়। তারপর বইয়ের অধ্যায়ের প্রতি চোখ বুলাতে হয়– এই সময় মূল পয়েন্ট ও সাবপয়েন্ট, বইয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির প্রতি খেয়াল করতে হয়। তারপর প্রথম অধ্যায় ভালোভাবে পড়তে হয়। অতঃপর সর্বশেষ অধ্যায় ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরো বই পড়তে হয়। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় বইয়ের কোন দিকটি পর্যালোচনায় তুলে ধরা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং পড়ার সময় প্রয়োজনীয় নোট করতে হয়। এক্ষেত্রে লেখক যে পয়েন্টগুলোতে গুরুত্ব দিয়েছেন তা বিশেষভাবে তুলে ধরতে হয় এবং রিভিউকারীর নিজস্ব মতামত চিন্তা করতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ে আবার বইটি দেখতে হয় এবং অন্যান্য অধ্যায়ের প্রতি খেয়াল করতে হয়। এইবার পড়ার সময় রিভিউকারীর পর্যালোচনা সঠিক হয়েছে কি না তার প্রতি খেয়াল করতে হয়। চতুর্থ পর্যায়ে পর্যালোচনা লেখা শুরু করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমত বইয়ের প্রাথমিক পরিচয় (লেখক, প্রকাশের সন, বইয়ের শিরোনাম ও প্রকাশক) তুলে ধরতে হয়। দ্বিতীয়ত, বইয়ের আলোচ্যসূচির সারাংশ তুলে ধরতে হয়। তৃতীয়ত, বই সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। এই আলোচনায় লেখকের নিজস্ব যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হয় এবং পর্যালোচনাকারীর ইতিবাচক-নেতিবাচক পর্যালোচনার সপক্ষে লেখকের বই থেকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। সর্বশেষ, বইটি সম্পর্কে পর্যালোচক/ সমালোচকের ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরতে হবে।

সামারাইজিং–সারসংক্ষেপ করা

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কিছু পড়ার পর তার সারাংশ বের করা দরকার। কোনো কিছুর সার নির্যাস বের করা সহজ কাজ নয়। কারণ সারনির্যাস বের করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ ও অগুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে।

সারাংশের প্রকারভেদ : সারাংশ কয়েক ধরনের হতে পারে : সিলেক্টিভ সামারি (Selective summary) : কোনো বই বা প্রবন্ধের নির্দিষ্ট কিছু অংশের সারাংশ করা। দ্বিতীয়ত, নোটের মতো সারাংশ করা : কোনো প্যারা বা অধ্যায় পড়ে মৌলিক পয়েন্ট নোট করার মাধ্যমেই সারনির্যাস তুলে ধরা। তৃতীয়ত, সংক্ষিপ্ত সারাংশ : কোনো একটি প্রবন্ধ পড়ে দুই-এক লাইনে সারনির্যাস বের করার নামই হচ্ছে Short summary. গ্লোবাল সামারি হচ্ছে কোনো বই বা প্রবন্ধের বিস্তারিত সারমর্ম বের করা।

মূলনীতি : কোনো লেখা, প্রবন্ধ বা বইয়ের সারসংক্ষেপ বের করার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে :

১. লেখকের লেখা অনেক ছোট করতে হবে, সে জন্য লেখকের অনেক কথা বাদ দিতে হবে।

২. গুরুত্বপূর্ণ সকল মৌলিক পয়েন্ট আসতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

৩. কোনো পয়েন্ট বা শব্দ বারবার উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. সারাংশ নিজের ভাষায় লিখতে হবে।

৫. সারাংশ লেখার পর অন্য কাউকে দেখাতে হবে।

পদ্ধতি : এর জন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন : প্রথমবার স্বাভাবিকভাবে পড়তে হবে। এই সময় নোট করার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়বার মনোযোগ সহকারে আবার পড়তে হবে এবং প্রয়োজনীয় নোট করতে হবে। তারপর দেখতে হবে, টেক্সট কবে লেখা হয়েছে এবং লেখার উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য কী? এরপর নোট দেখে পঠিত অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে। তারপর মূল টেক্সট না দেখে নিজের ভাষায় সারাংশের প্রথম ড্রাফট করতে হবে। প্রথম ড্রাফট করার পর দ্বিতীয়বার ভালোভাবে দেখতে হবে এবং আরও সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর ফাইনাল ড্রাফট করতে হবে এবং সকল পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করে– এমন শিরোনাম দিতে হবে। সর্বশেষ শব্দসংখ্যা গণনা করে দেখতে হবে সারাংশ খুব বিস্তারিত হয়েছে কিনা।

সারাংশ করার পাঁচ মূলনীতি : ১. অপ্রয়োজনীয় সবকিছু বাদ দেওয়া, ২. বিস্তারিত উদাহরণ না দেয়া, ৩. লিস্ট বা আইটেমকে সমন্বয় সাধন করা॥শুধু এক ধরনের তালিকা না দেয়া, ৪. টপিক সেন্টেস ব্যবহার করা ও ৫. প্যারাগ্রাফ ভালো করে দেখা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কী : এই প্রশ্নের উত্তরে Howkes বলেন, "a systematic investigation towards increasing the sum of knowledge. গবেষণা হচ্ছে কোনো বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার নাম।

গবেষণাকর্ম দুই ধরনের : গবেষণাকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ গবেষণা ও দীন সম্পর্কিত গবেষণা। উভয় ধরনের গবেষণার কিছু সাধারণ নীতিমালা রয়েছে, যা অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন– ফুটনোট ব্যবহার, রেফারেন্স, কোটেশান বা উদ্ধৃতি, তথ্যপঞ্জি ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। দীনের গবেষণার জন্য গবেষককে উপরিউক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা থাকার পাশাপাশি দীনের গবেষণা করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়।

দীনের গবেষণা বা ইজতিহাদ

ইজতিহাদ কী : দীনের গবেষণাকে ইসলামের পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলা হয়। ইজতিহাদ শব্দটি 'জাহদুন' শব্দ থেকে এসেছে। আরবীতে 'জাহদুন' অর্থ চেষ্টা, শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগ ইত্যাদি। আল্লামা বায়যাভী (র) ইজতিহাদের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন : اَلِاجْتِهَادُ اِسْتِفْرَاغُ الْجُهْدِ فِى دَرْكِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

শরীআতের আহকাম অনুসন্ধান করার চেষ্টাকেই ইজতিহাদ বলা হয়।

www.nagorikpathagar.com

দীনের উপর গবেষণার গুরুত্ব : আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন মানবজাতির হেদায়েতের উৎস হিসেবে। কুরআনে মানবসমাজের সকল সমস্যা সমাধানের মৌলিক দিকনির্দেশনা রয়েছে।[১] যদি ইজতিহাদের সুযোগ না থাকে তাহলে যুগচাহিদা পূরণে কুরআনের ব্যাখ্যা কীভাবে পেশ করা হবে? কুরআনের আলোকে যুগসমস্যার সমাধান বের করতে হলে কুরআন নিয়ে 'তাদাব্বুর' ও 'তাফাক্কুর' করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর করার কথা কুরআনের অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

ইসলামে ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের সময় ইজতিহাদের প্রয়োজন বেশি ছিল না। আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি অনুভূত হয়। সাহাবীদের যুগে ইজতিহাদ করতে হতো না। তাই সে সময় ইজতিহাদনির্ভর কুরআনের তাফসীরের চেয়ে হাদীসনির্ভর কুরআনের তাফসীর বেশি দেখা যায়; কিন্তু পরবর্তী সময়ে কুরআনে কারীমের ইজতিহাদনির্ভর অনেক তাফসীর লেখা হয়।

ইজতিহাদনির্ভর তাফসীরকে 'তাফসীর বিল মা'কুল' বা 'তাফসীর বিদ দেরায়াত' বলা হয়।[২] তাবেয়ীনদের পরবর্তী যুগ থেকে এই ধরনের তাফসীর চর্চা শুরু হয়। আলেমদের কেউ কেউ মনে করেন, এই ধরনের তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মানুষ নিজস্ব চিন্তায় যা বলে তা নিছক ধারণা মাত্র; এর মাধ্যমে ইয়াকীন তথা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার কথা বলেছেন।[৩] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন হযরত মুয়ায বিন জাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা করার সময় প্রশ্ন করলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি কুরআনে তার ফায়সালা না পাও? তখন তিনি জবাব দিলেন, তাহলে সুন্নাতে রাসূলের ভিত্তিতে ফায়সালা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি এখানেও না পাও? তখন মুয়ায জবাব দিলেন,

---

১. সূরা আন আমের ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি কুরআনে কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অর্থাৎ কুরআনে সব কিছুর মৌলিক দিননির্দেশনা আছে।

২. আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫।

৩. সূরা মুহাম্মদের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।' এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য। সূরা ছোয়াদের ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।' এই আয়াতে অনুধাবনের কথা বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

তাহলে ইজতিহাদ করে ফয়সালা করবো।[৪] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জবাবে সন্তুষ্ট হলেন। এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, যে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ করা বৈধ।

ইজতিহাদকে প্রবহমান নদীর সাথে তুলনা করা যায়। যে নদীতে পানিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তা বন্ধ্যা নদী, তেমনি ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হলে ইসলামের গতিশীলতায় বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হবে। তাই ইজতিহাদের পথ বর্তমানেও খোলা আছে। তবে সব ধরনের ইজতিহাদ বৈধ নয় এবং যে কেউ ইচ্ছা করলেই ইজতিহাদ করে শরীআতের মৌলিক ব্যাপারে অভিমত দিতে পারবেন না। তবে ইসলামী শরীআতের মৌলিক নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমন বিষয়ে যে কেউ গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী শরীআতের মৌলিক ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে হলে তাকে প্রয়োজনীয় ইলমী যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

ইজতিহাদের শরয়ী বিধান : ড. হাসান আহমদ ইজতিহাদকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ[৫]

১. ওয়াজিব আল আইন (ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক) : যদি ইসলামী শরীআত সম্পর্কে এমন কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না এবং উক্ত প্রশ্নের জবাবদান সময়ের অনিবার্য দাবি। এমতাবস্থায় ঐ ধরনের প্রশ্নের জবাবদানের যোগ্যতাসম্পন্ন শুধু একজন ব্যক্তি থাকলে উক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া ব্যক্তিগতভাবে তার উপর বাধ্যতামূলক। এই ধরনের বিষয়ে ইজতিহাদ করার জন্য সময়ক্ষেপণ করার সুযোগ নেই। সময়ের চাহিদানুযায়ী ইজতিহাদ করা ওয়াজিব আল আইন।

২. ওয়াজিব আল কিফায়াহ : যদি যুগের চাহিদার আলোকে শরীআতের কোনো বিষয়ে জবাব দেওয়ার মতো একাধিক ব্যক্তি থাকে এবং তারা যদি জবাব না দেয় তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

৩. মুস্তাহাব ইজতিহাদ : ভবিষ্যতে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে শরীআতের এমন প্রশ্নের সমাধানের জন্য ইজতিহাদ করা মুস্তাহাব।

৪. হারাম ইজতিহাদ : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো বিধান কিংবা সকল যুগের উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন এমন কোনো বিষয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইজতিহাদ করা হারাম।

---

৪. আল্লাহ তাআলা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, যে বিষয়ে তোমার সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলো না। কুরআন তথা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে ধারণাপ্রসূত কিছু বলা মানেই আল্লাহর কালাম সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া কথা বলার সামিল। তাই ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাফসীর করা বৈধ নয়।

৫. হাসান আহমদ, ১৯৮৪, আল-ইজতিহাদ ফী আল শরীআাত আল ইসলামিয়্যাহ. রিয়াদ, ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ, পৃ-১৯।

www.nagorikpathagar.com

৫. মাকরূহ ইজতিহাদ : অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করা মাকরূহ।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়া ইজতিহাদ করা যায় না : কুরআন ও হাদীসের অনেক বিধান মুহকাম তথা সুস্পষ্ট, তা সময় ও যুগের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয় না। যেমন মদ হারাম হওয়ার বিষয়। আবার কিছু বিষয় আছে তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের সাথে নির্ভরশীল। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, আজকের যুগে বন্দীদের সাথে হুবহু কি সেই আচরণ করতে হবে, না সময় ও স্থানের আলোকে ইসলামী নেতৃত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন? এটা ঠিক যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী নেতৃত্বকে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনি কুরআন ও হাদীসের টেক্সটের পাশাপাশি কনটেক্সট যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরআনী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ কী তা ভালোভাবে বুঝতে হলেও কুরআন হাদীসের এই সংক্রান্ত টেক্সট ও কনটেক্সট যথাযথভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কুরআন ও হাদীসের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদ 'আযীমত' ও 'রুখসত' অর্থাৎ কঠিন ও সহজ পন্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন। তবে সহজ এমন কোনো পন্থা আবিষ্কার করা যাবে না, যা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।

তাই ইচ্ছা করলেই যে কেউ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা কিংবা শরীআতের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করতে পারবেন না।

'মাবাহেস ফী উলূম আল-কুরআন' গ্রন্থে মুফাসসিরের শর্তাবলি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :[৬]

ইসলামের সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের অনুসারী হতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে, কুরআনের তাফসীর প্রথমে কুরআন মাজীদের মাধ্যমেই করা প্রয়োজন। কারণ কুরআনের এক জায়গার ব্যাখ্যা অন্য জায়গায় বিদ্যমান। কুরআনের ব্যাখ্যা সুন্নাতে রাসূল থেকে গ্রহণ করতে হবে। কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা রাসূলের সুন্নায় পাওয়া না গেলে সাহাবীদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

শরীআতের ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে হলে কতিপয় জরুরি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। 'ইতকান' গ্রন্থে নিম্নোক্ত ১৫টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ফিকহ, তাফসীর ও উসূলে তাফসীর, আকাইদ, শানে নুযূল, নাসেখ ও মানসূখ আয়াত, উসূলে ফিকহ, উসূল আল-দীন, ইলমে কিরাআত, ইলমে ছরফ, কুরআনের বাচনভঙ্গি ও পরিভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান, আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ইলম।

---

৬. মাবাহেস ফী উলূমিল কুরআন. পৃ-২৪০-২৪১, আল-কুরআন আত-তাফসীর আল-মুফাসসির, পৃ-৬২।

www.nagorikpathagar.com

উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার পর সহীহ্ নিয়তে ইজতিহাদ করলেই তা গ্রহণযোগ্য। ডা. হাসান আহমদের মতে, শরীআতের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করতে হলে মুজতাহিদের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পাওয়া যেতে হবে :

১. মুজতাহিদকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

২. আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

৩. কুরআনের বিধিবিধান ভালোভাবে জানতে হবে। কারণ কুরআনই হচ্ছে ইসলামী শরীআতের প্রধানতম উৎস।

৪. সুন্নাহর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। সহীহ্, যয়ীফ, মাওযূ হাদীস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

৫. আরবী ভাষা ও আরবী বাকরীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে–

৬. উসূলে ফিকহ্ -এর জ্ঞান থাকতে হবে। আম, খাস, নাসেখ, মানসুখ, মুতলাক, মুক্বাইয়াদ, ইসতিহসন প্রভৃতি বিষয় জানা থাকতে হবে।

৭. যেসব বিষয়ে উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যেসব বিষয়ে ইখতিলাফ আছে এ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এ সম্পর্কে শরীআতের সকল বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলেও যে বিষয়ে ইজতিহাদ করছেন ঐ বিষয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতামত জানতে হবে।

৮. উলামায়ে কেরাম শরীআতের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে কী মূলনীতি গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

৯. শরীআতের উদ্দেশ্য জানা থাকতে হবে।

১০. তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

১১. বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

শরীআতের নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়ে ইজতিহাদ করার যাদের যোগ্যতা নেই, তাদের কুরআনের তাফসীর কিংবা শরীআতের ব্যাপারে মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এ ধরনের ইজতিহাদ করার সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই ধরনের ব্যক্তিদের নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ কিংবা ফিক্‌হের কিতাব থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা উচিত। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, যাদের যোগ্যতা আছে তারা সহীহ্ নিয়তে ইজতিহাদ করার সময় ভুল হলেও সওয়াব পাবেন। আর সহীহ্ হলে দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। আর যাদের যোগ্যতা নেই তারা ইজতিহাদ করাটাই অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ডাক্তার রোগীর অপারেশন করার সময় ভুল হলেও এটা অপরাধ নয়। কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্স না পড়ে রোগীর প্রেসক্রিপশান দেওয়া কিংবা অপারেশন করাটাই দণ্ডনীয় অপরাধ।

www.nagorikpathagar.com

সাধারণ গবেষণা

ইসলামের বিভিন্ন দিক কিংবা একাডেমিক কোনো বিষয়ের উপর গবেষণায় আগ্রহী যে কেউ গবেষণা করতে পারেন। শরীআতের কোনো বিধানের সাথে সম্পর্কিত নয় ইসলামের এমন কোনো দিক কিংবা সাধারণ কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণের প্রয়োজন নেই। সাধারণ গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করাই যথেষ্ট। গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ না করে কোনো কিছু লিখলে তা একাডেমিক লেখা হয় না, এটাকে সাধারণ লেখা বলা হয়।

গবেষণাধর্মী/একাডেমিক লেখা ও সাধারণ লেখার পার্থক্য : একাডেমিক লেখা ও সাধারণ লেখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে :

একাডেমিক লেখা	**সাধারণ লেখা**
যুক্তিনির্ভর	আবেগনির্ভর
ফুটনোট ও তথ্যসূত্র থাকতে হয়	রেফারেন্স উল্লেখ না করলেও চলে
প্রমাণ উল্লেখ করতে হয়	প্রমাণ ছাড়াও কোনো বিষয় উপস্থাপন করা যায়
বক্তব্য প্যাসিভ ভয়েস হিসেবে উল্লেখ করা হয়	বক্তব্য অ্যাক্টিভ ভয়েস হয়
বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়	বেশি তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না
অন্য গবেষকরা রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন	একাডেমিক রেফারেন্সের মর্যাদা পায় না
অবজেক্টিভ	সাবজেক্টিভ

গবেষক ও রিসার্চ স্টুডেন্ট : গবেষণার যোগ্যতা এবং আগ্রহ আছে এমন যে কেউ যেকোনো বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কোর্সওয়ার্কের অংশ হিসেবে কিছু গবেষণা করতে হয়, শিক্ষকদের দেওয়া নির্দেশিকা অনুসারে তাদের গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হয়। আর এমফিল ও পিএইচডির ছাত্রছাত্রীদেরকে থিসিস লিখতে হয়। এছাড়া সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কিছু সংস্থা আছে, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করাই তাদের কাজ।

গবেষণা করার কমন যোগ্যতা ঃ ১. আগ্রহ (Curiosity) : শুধু ভালো ছাত্র হলেই ভালো গবেষক হওয়া যায় না। ভালো গবেষক হতে হলে গবেষণা করার আগ্রহ থাকতে হবে। কোনো বিষয়ের উপর গবেষণা করতে হলে উক্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি বিষয় জানতে আগ্রহ থাকতে হবে। কোনো চাষীর চাষ করার আগ্রহ না থাকলে জমিতে ভালো চাষ করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে কোনো গবেষক আগ্রহী না হলে ভালো গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে পারে না।

২. সুস্পষ্ট চিন্তা (Clear, Logical Thought) : গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়। তাই কোনো বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ থাকাটাই যথেষ্ট নয়, উক্ত বিষয়ের উপর গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

৩. অধ্যবসায় (Tenacity) : কোনো বিষয়ের উপর গবেষণা করতে গেলে বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহ ও তা পড়ে আয়ত্ত করাকে রুটিন কাজে পরিণত করতে হয়। এমনকি মাঝে মধ্যে একঘেয়ে অনুভূত হলেও তথ্য সংগ্রহ ও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার পর তত্ত্বাবধায়ক একাধিকবার সংশোধন ও সংযোজন করার জন্য ফেরত দিতে পারে। সর্বাবস্থায় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়ার মতো মন-মানসিকতা রাখতে হবে।

৪. একাডেমিক যোগ্যতা : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমফিল বা পিএইচডি করার জন্য গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি থাকতে হয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল বা পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টে আপার সেকেন্ড ক্লাস চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাড়া সাধারণত এমফিল করেই পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হতে হয় কিংবা এমফিলে নির্দিষ্ট কোর্সওয়ার্ক করার পর এবং গবেষকের অগ্রগতি সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সন্তুষ্ট হলে তার সুপারিশক্রমে পিএইচডিতে স্থানান্তর হওয়া যায়।

এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা : মাস্টার্স/এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণার ধরন প্রায় কাছাকাছি হলেও উভয় ধরনের গবেষণার পদ্ধতি ও কলেবর হুবহু এক নয়। এমফিল হচ্ছে কোনো বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত তথ্যাবলির সারনির্যাস গবেষণার পদ্ধতি অনুসারে লেখা। এতে গবেষকের ব্যক্তিগত অভিমত তেমন থাকে না। কিন্তু পিএইচডি গবেষণায় গবেষকের মতামত বিশেষভাবে উক্ত বিষয়ে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক নিয়ম হচ্ছে :

Evaluated an approved topic and demonstratred an understanding of research methods appropriate to the chosen field, has presented and defended a thesis, by oral investigated and evaluated an approved topic resulting in an independent and original contribution to knowledge and demonstrated an understanding of research methods appropriate to the chosen field, has presented and defended a thesis, by oral examination, to the statisfaction of the examiners.[৭]

উপরোল্লিখিত উভয় স্টেটমেন্ট থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাস্টার্স/এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, এম ফিল/মাস্টার্স মৌলিক গবেষণা নয়, এতে লেখকের নতুন অবদান রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পিএইচডি হচ্ছে মৌলিক গবেষণা। এতে জ্ঞানের জগতে নতুন অবদান রাখতে হয়। এছাড়া গবেষণার সময় ও থিসিসের আকৃতির ক্ষেত্রেও কিছুটা পার্থক্য আছে। মাস্টার্স/এমফিল গবেষণার জন্য যে সময় থাকে পিএইচডি করার জন্য তার দ্বিগুণ সময় দেওয়া হয় এবং থিসিসের কলেবরও অনেক বড় হতে হয়। বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে এমফিল ২০০০০ শব্দ এবং পিএইচডি ৪০০০০ শব্দ আর সমাজবিজ্ঞান অনুষদে এ বিষয়ে এমফিল/ মাস্টার্স ৪০০০০ শব্দ আর পিএইচডি ৭০০০০০ শব্দ হচ্ছে মান বা স্ট্যান্ডার্ড।

---

৭. Stelle Cottrel, 1999, The Study Skills Handbook. P-148.

www.nagorikpathagar.com

পিএইচডি কয়েক ধরনের হতে পারে : PhD : Doctor of Philosophy, EdD : Doctor of Education, MD : Doctor of Medicine, DocFA : Doctor of Fine Arts.

এমফিল ও পিএইচডি করার জন্য প্রস্তুতিমূলক পরামর্শ

টপিক নির্ধারণ করা : গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা সহজ কাজ নয়। গবেষণার বিষয় নির্বাচনে ভুল হলে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য গবেষণার বিষয় চূড়ান্ত করার আগে উক্ত বিষয়ের উপর লাইব্রেরী ওয়ার্ক করে দেখা দরকার যে এরজন্য পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা।

গবেষণার টপিকের উপর প্রাথমিক পড়াশোনার পর টপিক নির্ধারণ করতে হয়। টপিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ : প্রথমত, গবেষকের আগ্রহ আছে কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের আগ্রহ নেই- এমন টপিক নির্ধারণ করা ঠিক নয়। এই ধরনের টপিকে গবেষণা সম্পাদন করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, ইসলাম, দেশ ও মানবতার জন্য কোন বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন তা বিবেচনায় আনা উচিত। তৃতীয়ত, টপিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে রেফারেন্স বই পাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এমন টপিক নির্ধারণ করা ঠিক নয়, যে বিষয়ে গবেষণা করার মতো রেফারেন্স বই পাওয়া দুষ্কর। চতুর্থত, তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ গবেষণার টপিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কের আগ্রহের মিল না হলে গবেষণা সম্পন্ন করা কঠিন। পঞ্চমত, সালাতুল ইস্তেখারা আদায় করে টপিক চূড়ান্ত করা। কারণ আল্লাহর সাহায্য না হলে শুধু মনের ঝোঁক থাকলেই গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

গবেষকের ইচ্ছা ও তত্ত্বাবধায়কের অনুমোদনক্রমে গবেষণার বিষয় প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারণ করার পর তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হয়। বিভাগ ও ফ্যাকাল্টির একাডেমিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন লাভ করার পরই গবেষণার বিষয় চূড়ান্ত হয়।

সিনোপসিস তৈরি করা : গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান উক্ত বিষয়ে একটি সিনোপসিস তৈরি করতে হয়। সিনোপসিস তৈরি করার সময় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগের বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সিনোপসিসে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে হয়। যেমন- ১. এই বিষয়ে কেন গবেষণা করতে আগ্রহী ২. ইতিপূর্বে এই বিষয়ে কী ধরনের গবেষণা হয়েছে। ৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী। ৪. গবেষণার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ৫. গবেষণার পদ্ধতি কী হবে এবং কেন উক্ত পদ্ধতিতে গবেষণা করতে চান। ৬. গবেষণা সমাপ্ত করার সময়সীমা। ৭. গবেষণাকর্ম কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত থাকবে। ৮. এমন টপিক নির্ধারণ করা উচিত নয়, যে বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য রেফারেন্স

www.nagorikpathagar.com

পাওয়া কঠিন। ৯. ফুটনোট দেওয়া। গবেষণাকর্মে রেফারেন্স ও ফুটনোট ব্যবহার করতে হয়। তাই সিনোপসিস তৈরির সময় রেফারেন্স ও ফুটনোট যথাযথভাবে প্রদান করা উত্তম।[৮]

সম্ভাব্য তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ : ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করতে তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল বা পিএইচডিতে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদনপত্রে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশ লাগে। কিন্তু ইংল্যান্ডের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনোপসিসসহ আবেদনপত্র পাঠানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ এমন একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। সাধারণত গবেষককেই তত্ত্বাবধায়কের সন্ধান করতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও তত্ত্বাবধায়ক নিজেই গবেষণা করার জন্য ছাত্রছাত্রী খোঁজেন।[৯] উল্লেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষকের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা জরুরি। উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকলে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা কঠিন। এ কারণে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বন্ধুত্বপূর্ণ এমন কাউকে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করা ভালো।

ফুল টাইম-পার্ট টাইম : এমফিল ও পিএইচডি ফুল টাইম কিংবা পার্ট টাইম স্টুডেন্টদের সার্বক্ষণিক গবেষণায় ব্যস্ত থাকতে হয়। এই সময়ে চাকরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর পার্ট টাইম স্টুডেন্টরা চাকরি করেও রিসার্চ করতে পারেন।

কো-সুপাইভাইজার : আপনি যদি ইচ্ছা করেন একসাথে একাধিক তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণা করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে মূল তত্ত্বাবধায়কের সাথে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক নিতে পারেন। মূল তত্ত্বাবধায়ক ব্যস্ততার কারণে প্রয়োজনীয় সময় দিতে না পারলে অথবা গবেষণার টপিক সম্পর্কে মূল তত্ত্বাবধায়ককে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে কো-সুপাইভাইজার নেওয়া যায়। কোনো কোনো ছাত্র মূল তত্ত্বাবধায়কের চেয়ে সেকেন্ড সুপাইভাইজারের কাছ থেকে অনেক বেশি সহযোগিতা পান।

টপিক পরিবর্তন : নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয়ে এমফিল বা পিএইচডিতে রেজিস্ট্রেশন করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া না গেলে[১০] অথবা তারচেয়ে চমৎকার কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে মনস্থ করলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে টপিক পরিবর্তন করা যায়।

---

৮. সিনোপসিস তৈরি করার সময় আগে যারা গবেষণা করেছেন বা বর্তমানে গবেষণা করছেন, এমন ছাত্রদের কাছ থেকে আপনি সহযোগিতা নিতে পারেন।

৯. সাধারণত কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য তত্ত্বাবধায়ক আগ্রহী হলে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সন্ধান করেন।

১০. কোনো একটি বিষয়ের উপর প্রথম দিক মনে হয় প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু কিছু দিন কাজ করলে দেখা যায় তথ্য পাওয়া কঠিন।

www.nagorikpathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন : গবেষক যদি মনে করেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সম্যক ধারণা রাখেন না কিংবা তাঁর অধীনে গবেষণা করা কঠিন, তাহলে গবেষণাকর্ম শুরু করার পর ইচ্ছা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করতে পারেন।

এমফিল থেকে পিএইচডিতে স্থানান্তর : সাধারণত এমফিলে প্রথম ভর্তি হতে হয়।[১১] এমফিল স্টুডেন্ট হিসেবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে পরীক্ষা দিতে হয়। উক্ত পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে এমফিল থেকে পিএইচডিতে স্থানান্তর করা হয়। আর কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিলে পরীক্ষা দেওয়া লাগে না। গবেষক কয়েক অধ্যায় লিখে তত্ত্বাবধায়ককে দেখানোর পর তত্ত্বাবধায়ক যদি মনে করেন তাকে এমফিল থেকে পিএইচডিতে স্থানান্তর করা যায়, তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত ছাত্রছাত্রীর এমফিল থেকে পিএইচডিতে স্থানান্তরের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। গবেষককে এমফিল থেকে পিএইচডিতে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

স্টাফদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা : স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত দুই ধরনের স্টাফ থাকে। একাডেমিক ও নন-একাডেমিক স্টাফ। প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, লেকচারার, টিউটর, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রমুখ হচ্ছেন একাডেমিক স্টাফ। ভিসি, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার, ক্লার্ক প্রমুখ হচ্ছেন নন-একাডেমিক স্টাফ। একাডেমিক জীবনে ভালো করতে হলে সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে সুসম্পর্ক থাকা বেশি প্রয়োজন। কারণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে কোর্স মেটারিয়াল সহজেই পাওয়া যায়। কোনো বিশেষ কারণে টিউটোরিয়াল জমাদানের সময়সীমা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে বৃদ্ধি করতে সমস্যা থাকে না। কোর্স সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করে সহজেই যেকোনো সমস্যার সমাধান করা যায়।

গবেষণা স্কলারশিপ : দেশ-বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা গবেষণা করার জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে। গবেষককে বিভিন্ন সংস্থার তথ্য সংগ্রহ করে বৃত্তি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়।

গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে হলে মৌলিকভাবে যা প্রয়োজন

১. গবেষণার উপযোগী পরিবেশ : যেখানে গবেষণা করতে চান সেই স্থানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে হবে এবং গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও নিরিবিলি পড়াশোনা করার মতো লাইব্রেরি থাকতে হবে।

২. প্রাথমিক পড়াশোনা : গবেষককে তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু করে দিতে হয়। এই পর্যায়ে এ ধরনের গবেষণা অতীতে আর কারা করেছে তাদের গবেষণাকর্ম এবং রেফারেন্স বই সংগ্রহ করতে হয়।

---

১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরাসরি পিএইচডি করার সুযোগ পান।

www.nagorikpathagar.com

৩. লাইব্রেরিতে তথ্য সন্ধান : প্রাথমিক স্টাডির পর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছুটতে হয় এবং তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এযাবৎ যত গবেষণা হয়েছে তার তালিকা তৈরি করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বে অনুরূপ বিষয়ে গবেষণা করেছেন এমন ব্যক্তিদের সাথে সম্ভব হলে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে মত বিনিময় করলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ফাইল/ফোল্ডার তৈরি করা দরকার। উক্ত ফোল্ডারে সকল ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। প্রথম পর্যায়ে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের তথ্য জোগাড় করা উচিত। সংগৃহীত তথ্য এক নজর পড়ার পর অনুধাবন করা সম্ভব হয় যে, কোন তথ্য গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত আর কোন তথ্য অপ্রয়োজনীয়। এই পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য পৃথক করে ফেলা দরকার। তারপর প্রয়োজনীয় তথ্য ভালোভাবে অধ্যয়ন করা ও গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত তথ্য নোট করতে হয়।

৪. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া : ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা ই-মেইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে হয়।

৫. বিদেশে পড়াশোনা : গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কখনও কখনও বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয় এবং বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরীসমূহে তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়।

৬. সংগৃহীত তথ্য গভীর পড়াশোনা করে গবেষণার বিষয় কয়েক অধ্যায়ে বিভক্ত করা : অতঃপর থিসিস লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম ড্রাফট ছয় সপ্তাহে সম্পন্ন করবেন। এরপর তিন সপ্তাহে সম্পাদনা করবেন। তারপর ফাইনাল কপি করবেন। এরপর তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দেবেন।

৭. কম্পিউটার কম্পোজ : সংগৃহীত তথ্য পড়াশোনা করে প্রথম ড্রাফট শুরু করতে হয়। কম্পিউটার কম্পোজ করা ভালো। তাহলে সহজেই সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যায়।

৮. প্রথম ড্রাফট : পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যাদি ভালোভাবে পড়ার পর থিসিসের প্রথম ড্রাফট করা শুরু করা যায়। প্রথম ড্রাফট করার সময় কাগজ পর্যাপ্ত জায়গা রাখা দরকার যেন তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করতে পারেন। প্রথম ড্রাফট কম্পিউটার কম্পোজ করা ভালো। তত্ত্বাবধায়ককে দেখানোর পর তার নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বিয়োজন করতে হবে। প্রথম ড্রাফট তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও অভিজ্ঞ কাউকে দেখানো উত্তম। অন্যদের পরামর্শও ফাইনাল ড্রাফট করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

৯. রিভাইজিং : প্রথম ড্রাফট করার পর পুনরায় পড়া ও গভীরভাবে চিন্তা করার সময় রাখা উচিত। যদি সম্ভব হয় প্রথম ড্রাফট করার পর মাঝখানে একটু সময় বিরতি দিয়ে রিভাইজ করা ভালো।

www.nagorikpathagar.com

রিভাইজ করার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় :

	হ্যাঁ	না
গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে কি না?		
গবেষণার শিরোনামের আলোকে আলোচ্যসূচি যথাযথ হয়েছে কি না?		
উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতা আছে কি না?		
সকল তথ্য গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কি না?		
যে সকল পয়েন্ট আলোচনা করা হয়েছে তার স্বপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?		
অতিরিক্ত তথ্য বেশি এসেছে কি না		
পাঠক মৌলিক যুক্তিগুলো বুঝতে সক্ষম হবে কি না		
বাক্য ও প্যারাগ্রাফের মধ্যে সংযোগ আছে কি না		
সমগ্র গবেষণাকর্মে একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কি না?		
ভাষা খুবই জটিল বা একেবারে সহজ হয়েছে কি না?		
ভূমিকা ও উপসংহার ঠিকমতো লেখা হয়েছে কি না?		
প্রয়োজনীয় সকল রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে কি না?		
গবেষণাকর্মে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক কি না?		

১০. ফাইনাল ড্রাফট : রিভাইজড ড্রাফট বারবার পড়া দরকার। রিভাইজড ড্রাফট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করার পর ভূমিকা ও উপসংহার ভালোভাবে লেখা হয়েছে কি না তা আবার যাচাই করা। ফাইনাল সংশোধিত কপি আবার দেখা দরকার। কারণ অনেক সময় রিভাইজ ড্রাফট অনুসারে সকল অধ্যায় সংশোধন করা হয় না। কিংবা সংশোধন করলেও কম্পিউটারে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় আগের ড্রাফটই থেকে যায়। রেফারেন্স ও তথ্যপঞ্জি ভালোভাবে দেখে ফাইনাল কপি প্রিন্ট করতে হয়।

১১. থিসিস ফাইনাল লে আউট : থিসিসের ফাইনাল ড্রাফট করার সময় ফরমেট, ফন্ট সাইজ, পৃষ্ঠা নম্বর, ফুটনোট, রেফারেন্স, তথ্যপঞ্জি সবকিছু ঠিকমতো আছে কি না তা যাচাই করা দরকার। সাধারণত থিসিসের ফাইনাল লে-আউট নিম্নরূপ হয়ে থাকে : ভূমিকা, সূচিপত্র, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, মূল থিসিস বিভিন্ন অধ্যায়, ফুটনোট, এন্ডনোট, রেফারেন্স, তথ্যপঞ্জি ইনডেক্স।

১২. প্রুফরিডিং : প্রুফরিডিং হচ্ছে লেখার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার নাম। সাধারণত লেখার সময় বানান, স্টাইল, ব্যাকরণ, সংযোগ অব্যয় ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। প্রুফরিডিংয়ের মাধ্যমে এই ধরনের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে হয়। থিসিস লেখা সম্পন্ন করার পর জমা দেওয়ার আগে প্রুফরিডিং করা দরকার। প্রুফরিডিংয়ের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.com

অনেক ভুলত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করা যায়। নিজে একবার প্রুফরিডিং করার পর অন্য কারো মাধ্যমে, বিশেষত পেশাদার কারো মাধ্যমে প্রুফরিডিং করা ভালো। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কাউকে প্রুফরিডিং করার জন্য পাওয়া গেল ভালো, কিন্তু এ ধরনের কাউকে না পেলে দক্ষ কারো মাধ্যমে প্রুফরিডিং করানো প্রয়োজন। এ ধরনের কাউকে পাওয়া না গেলে একই ধরনের বিষয়ে গবেষণারত জুনিয়র কোনো ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমেও প্রুফরিডিং করানো যায়। এতে তারাও উপকৃত হবে। প্রুফরিডিং করার সময় গ্রামার, বানান, প্যারাগ্রাফ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কি না দেখা দরকার। একই শব্দ বারবার ব্যবহার হলে তা সংশোধন করে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা উত্তম।

১৩. থিসিস জমা দেওয়া ও পরীক্ষা : থিসিস ফাইনাল করার আগে তত্ত্বাবধায়কের চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হয়। এরপর ফাইনাল কপি প্রিন্ট করে তত্ত্বাবধায়কের সুপরিশসহ নির্দিষ্টসংখ্যক কপি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার বরাবরেও প্রেরণ করতে হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কমিটি সদস্যদের কাছে থিসিসের কপি পাঠাবেন। তারা থিসিস দেখে প্রাথমিক পর্যায়ে সন্তুষ্ট হলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল কয়েক ধরনের হতে পারে : ১. ডিগ্রি প্রদান করতে পারে। ২. কিছু ক্ষুদ্র ত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষে ডিগ্রি প্রদান করতে পারে। ৩. থিসিস আবার লিখে জমা দিতে বলা হতে পারে। এই পর্যায়ে থিসিস দেখে সন্তুষ্ট হলে মৌখিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ৪. থিসিস পুনরায় জমাদানের জন্য বলা হতে পারে এবং আবারও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। ৫. পুনরায় শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। ৬. ডিগ্রি প্রদান এবং পুনরায় থিসিস জমাদানের সুযোগ দেওয়া না-ও হতে পারে। ৭. পিএইচডি থিসিস জমাদানের পর মাস্টার্স/এমফিল ডিগ্রি দেওয়া হতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহ ছাড়া গবেষণা করা যায় না : তথ্য সংগ্রহ ছাড়া গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সাধারণত লাইব্রেরি, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার তথ্য দুই ধরনের : ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশান ও সেকেন্ড ইনফরমেশান। এটা প্রাইমারি সোর্স ও সেকেন্ডারি সোর্স হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

প্রাইমারি সোর্স : প্রাইমারি উৎস হচ্ছে কোনো লেখকের নিজস্ব বই/প্রবন্ধ, গবেষকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, অফিসিয়াল ডকুমেন্ট ইত্যাদি। কোনো কোনো লেখক প্রাইমারি সোর্সকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন :

The primary source is first- hand accounts not based on other written works, nor reinterpreted by other researchers. In documentary

www.nagorikpathagar.com

research, primary sources are original documents such as diaries, company reports, official documents, a company's equal opportunity policy statement, or a record of transactions completed. In scientific research, a primary source is usually something within an experiment such as change in the behavior of a cell culture. In social research, primary sources can be people who are directly observed, or the answers they give to questions.

সেকেন্ডারি সোর্স : সেকেন্ডারি সোর্স হচ্ছে প্রাইমারি সোর্সের উপর অন্যদের আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি।[১২]
কেউ কেউ সেকেন্ডারি সোর্সকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন,

"Secondary sources draw upon and discuss primary sources and therefore come into being later than the primary source. Secondary source are generally in the form of commentaries reviews, opinions, critiques, interpretations and other researcher's findings.[১৩]

গবেষণার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় ধরনের তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা বলা ঠিক নয় যে, প্রাইমারি সোর্স সেকেন্ডারি সোর্স থেকে উত্তম।

কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন : গবেষণার বিষয়বস্তুর আলোকে তথ্য সন্ধান করতে হয়। গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান করার শুরুতেই তত্ত্বাবধায়ক অথবা ইতিপূর্বে ঐ ধরনের বিষয়ে গবেষণা করেছেন এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা দরকার। তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরির ক্যাটালগ দেখতে হয়। ক্যাটালগ দেখে রেফারেন্স তালিকা তৈরি করা ভালো। এর আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। নিচে লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. লাইব্রেরিতে তথ্যসন্ধান : কোনো গবেষকের কাছেই সকল তথ্য থাকে না, গবেষককে নানা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে লাইব্রেরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গবেষক নয়, যেকোনো ছাত্রছাত্রীকে কোনো বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে সেই বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন বই পড়া দরকার। শুধু পাঠ্যবই নির্ভরশীল হয়ে থাকা ঠিক নয়। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও আরও অনেক রেফারেন্স বইয়ের উপর পড়তে হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরিতে যাওয়া দরকার। নিজের প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই না থাকলে যেখানে উক্ত বিষয়ের উপর বই পাওয়া

---

১২. সাইয়েদ কুতুবের রাজনৈতিক দর্শন : একটি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করতে হলে সাইয়েদ কুতুব লিখিত বইসমূহ হবে প্রাইমারি সোর্স। আর তার বই/দর্শনের আলোচনা, সমালোচনা করে লিখিত বইসমূহ হবে সেকেন্ডারি সোর্স।

১৩. Martin Campton, Academic skills, class notes 2002-2003, London, Tower Hamlets College.

www.nagorikpathagar.com

যায় সেই লাইব্রেরিতে যেতে হয়। এজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচিত কোনো ছাত্রের সাথে বন্ধুত্বকে কাজে লাগিয়ে তার মাধ্যমে বইপুস্তক নিয়ে নোট বা প্রয়োজনীয় অংশ ফটোকপি করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।[১৪] এর জন্য লাইব্রেরির তালিকা ও ঠিকানা সংগ্রহ করুন : যেসব লাইব্রেরিতে আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য আছে দেশ-বিদেশের সেই সকল লাইব্রেরির নাম ও ঠিকানা আপনার সংগ্রহে থাকা দরকার। তারপর কোন লাইব্রেরিতে কোন ধরনের বই বেশি আছে, লাইব্রেরির সময়সূচি বহিরাগত ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি দেখিয়ে লাইব্রেরিতে পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরি কার্ড করতে পারে। অবশ্য বহিরাগত ছাত্রছাত্রীরা বই ধার নেওয়ার সুযোগ পায় না। তবে তারা ফটোকপি কার্ড ক্রয় করে লাইব্রেরিতে ফটোকপি করতে পারে।

লাইব্রেরিতে কীভাবে বই সন্ধান করবেন

১. লাইব্রেরি ক্যাটালগ : সাধারণত লাইব্রেরিগুলোর ক্যাটালগ থাকে। আপনি ক্যাটালগ দেখে আপনার কোন ধরনের বই বা তথ্য দরকার তা নির্বাচন করতে পারেন। ব্রিটিশ লাইব্রেরির মতো কোনো কোনো বড় লাইব্রেরিতে আগে থেকেই বইয়ের অর্ডার দিতে হয়। তারপর নির্দিষ্ট দিন বাসময়ে গিয়ে বই সংগ্রহ করে রিডিং রুমে পড়তে হয়। ছোট লাইব্রেরিগুলোতে আগে থেকে অর্ডার দেওয়া লাগে না। লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্যাটালগ দেখে বই নির্বাচন করে নিজেই বুকশেলফ থেকে বই নিয়ে পড়তে হয়।

২. কম্পিউটার : কম্পিউটার আবিষ্কারের আগে সাধারণত কার্ড ক্যাটালগে বইয়ের নাম লেখা থাকত। বর্ণের ক্রমধারা অনুসারে লেখক, বইয়ের শিরোনাম এবং বিষয়বস্তুর আলোকে একেক কার্ডে একেক বইয়ের নাম লেখা থাকতো। কম্পিউটার আবিষ্কারের পর কার্ড ক্যাটালগের পরিবর্তে কম্পিউটারের মাধ্যমেই লাইব্রেরিগুলোতে বই অনুসন্ধান করা হয়। সাধারণত লেখক, বইয়ের নাম কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অনুসন্ধান করে বই খুঁজে বের করা হয়। আমাদের দেশে কম্পিউটারের মাধ্যমে বই অনুসন্ধানের সুযোগ এখনও সীমিত। ক্যাটালগ দেখেই অধিকাংশ লাইব্রেরিতে বই সন্ধান করতে হয়।

৩. প্রথম দিন এক নজর বুকশেলফসমূহ দেখা : একেবারে ছোট লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ বা কম্পিউটার থাকে না। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন শেলফে বই সাজানো থাকে। শেলফ ঘুরে ঘুরে দেখে বই সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য এই ধরনের লাইব্রেরিতে গেলে প্রথমেই বুকসেলফসমূহ এক নজর দেখে নেওয়া ভালো।

৪. লাইব্রেরি স্টাফদের সহযোগিতা : লাইব্রেরিতে যারা কাজ করেন অনেকেই দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে খুব অভিজ্ঞ হয়ে পড়েন। আপনি কোনো তথ্য খুঁজে পেতে সমস্যা হলে তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন। এজন্য যেসব লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে যাবেন সেইসব লাইব্রেরি বই ফেরত দান কিংবা রিনিউ করার বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হবে।

---

১৪. যদি লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক ফটোকপি করার অনুমোদন থাকে।

www.nagorikpathagar.com

২. ইলেক্ট্রনিক ইনফরমেশন : বর্তমানে অনেক তথ্য প্রতিনিয়ত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে চলে আসে। এই ধরনের তথ্য পেতে হলে ইন্টারনেটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে যেতে হবে। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেটে যেসব তথ্য আসে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কিছু কথা আছে। কারণ যে কেউ যেকোনো বিষয়ের উপর ওয়েবসাইটে তথ্য রাখতে পারেন। তাই ওয়েবসাইটে তথ্য সংগ্রহ করার সময় তথ্যসূত্র এবং কখন উক্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভালোভাবে দেখতে হবে। ইন্টারনেটে যেসব তথ্য থাকে সব আপনার রিসার্চের জন্য উপযোগী না-ও হতে পারে। তাই তথ্য প্রিন্ট করার আগে এক নজর দেখে নেবেন যে, আপনার গবেষণার বিষয়ের সাথে প্রাপ্ত তথ্য কতটুকু সম্পৃক্ত?

যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করুন : এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, সব ধরনের তথ্য আপনার গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সময় ব্যয় করার চেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা দরকার। তথ্য সংগ্রহ ও তা কাজে লাগানোর ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। তথ্য সংগ্রহের আগে নিজেকে নিজে এই প্রশ্নগুলো করা দরকার :

গবেষণার টপিক ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন কি না?	হ্যাঁ	না	জানি না
কী ধরনের তথ্য প্রয়োজন তা কি আপনার কাছে পরিষ্কার?			
আপনি কি রেফারেন্স তালিকা অনুযায়ী বই বা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন?			
প্রাপ্ত তথ্য কি আপনার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত?			
প্রাপ্ত পুরো বই বা সকল তথ্য না অংশবিশেষ আপনার গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত?			
আপনি কি সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন?			
কোনো তথ্য পাওয়ার পর আপনি হেডিং, সাবহেডিং ও কিছু প্যারাগ্রাফ পড়েই কি উপলব্ধি করতে পারেন তথ্যটি আপনার প্রয়োজন কি না?			
কোনো তথ্য পেলেই ফটোকপি করে ফেলেন, না দেখেশুনে ফটোকপি করেন?			
কোনো তথ্য পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় অংশে কোনো কিছু দিয়ে দাগ দেন কি না?			
প্রাপ্ত তথ্য আপনি নোট করেন কি না?			
প্রাপ্ত তথ্য এক নজর পড়ে মূল পয়েন্ট সহজেই বের করতে পারেন কি না?			

www.nagorikpathagar.com

চৌর্যাপরাধ (Plagiarism)

'প্লেইজিঅ্যারি' হচ্ছে অপরের ভাব বা রচনা চুরি করে নিজের বলে চালানো। Stella Cottrell এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : "Plagiarism is using the work of others without acknowledging your source of information or inspiration."[১৫] অর্থাৎ তথ্যসূত্র উল্লেখ না করে বা অন্যের কথা সংশ্লিষ্ট লেখককে উদ্ধৃতি না দিয়ে নিজের নামে লেখাই প্লেইজিঅ্যারিজম। Gibaldi-এর মতে, 'প্লেজিঅ্যারিজম' শব্দটি ল্যাটিন Plagiarius (kidnapper) শব্দ থেকে উৎসারিত। প্লেজিঅ্যারিজমকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, "The false assumption of authorship : the wrongful act of taking the product of another."[১৬]

প্লেইজিঅ্যারিজম হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক চুরি। এটা মারাত্মক অপরাধ। অনেকের লেখা প্রকাশের পর এমনকি কারো কারো পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর এটা ধরা পড়ে। ফলে তার ডিগ্রিও বাতিল হয়ে যায়। প্রাইমারি ও হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা না জানার কারণে কোনো বই থেকে হুবহু কপি করতে পারে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থীদের বেলায় এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অন্য কারো মতামত উল্লেখ করা অপরাধ নয়। অপরাধ হচ্ছে কারো প্রবন্ধ, লেকচার, রেডিও-টেলিভিশন প্রোগ্রাম, বই অথবা অন্য কোথাও ব্যক্ত করা উক্তি হুবহু বা অনুরূপ শব্দে তথ্যসূত্র উল্লেখ না করে বর্ণনা করা। কিংবা কারো কোনো অভিমত বা চিন্তাধারা তার নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করা। আল্লামা কারযাভীর মতে এইভাবে উল্লেখ করা অপরাধ নয়।

প্লেজিঅ্যারিজম থেকে মুক্ত থাকতে হলে : কোনো লেখা চুরি করার অভিযোগ থেকে বাঁচতে হলে সবকিছু নিজের ভাষায় লিখতে হবে। আর কারো কথা বা বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ধৃত করলে তথ্যসূত্র ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে এবং লেখার শেষে বিস্তারিত তথ্যপঞ্জি দিতে হবে।

শব্দান্তরমূলক বর্ণনা (Paraphrase)

প্যারাফ্রেইজ (paraphrase) হচ্ছে শব্দান্তরে প্রকাশ করা (Expression of the same thing in other words)। সংশ্লিষ্ট লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে কারো লেখা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু কারো মতামত হুবহু বা শব্দান্তর করে প্রকাশ করা উচিত নয়। সাহিত্য ও গবেষণাকর্মে প্লেইজিঅ্যারি ও প্যারাফ্রেইজ বড় ধরনের অপরাধ।

---

১৫. Stella Cottrell, 1999 The Study Skills Handbook, Plgrave. p. 122

১৬. Alexander Lindey, Plagiarism and Originality New York : Happer, 1952.P.2

www.nagorikpathagar.com

কোটেশন বা উদ্ধৃতি (Quotation)

কারো অভিমত উল্লেখ করলেই উদ্ধৃতি দিতে হয়– এই ধরনের ধারণা ঠিক নয়। লেখকের অভিমত হুবহু উদ্ধৃত করার চেয়ে তাঁর বক্তব্য ভালোভাবে বুঝে সারকথা নিজের ভাষায় লেখা উত্তম। লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত না করে বিষয়টি লেখক যেভাবে বুঝিয়েছেন সেভাবে বোঝানো কঠিন হলে উদ্ধৃতি দিতে হয়। তবে খুব বেশি উদ্ধৃতি দেওয়া ঠিক নয়। উদ্ধৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ও পরোক্ষ উদ্ধৃতি। সাধারণত সরাসরি তখনই উদ্ধৃতি দিতে হয়–

১. যখন দেখা যায় লেখকের উক্তি এত বেশি শক্তিশালী এবং সুস্পষ্ট যে, তা অন্য কারো ভাষায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

২. কারো উক্তির সমালোচনা করার সময় তার বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা। ৩. বক্তব্য শক্তিশালী করা এবং অস্পষ্টতা দূর করার জন্য প্রত্যক্ষ উদ্ধৃত করা উত্তম।

কেন উদ্ধৃতি দেওয়া হয় : কয়েক কারণে উদ্ধৃতি দিতে হয় :

১. উপস্থাপিত বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে।

২. এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে উপস্থাপিত/বর্ণিত মতামত লেখকের নয় অন্য কারো, লেখক তা তুলে ধরছেন মাত্র।

৩. লেখকের বক্তব্যের অনুরূপ অভিমত আরও অনেকের কাছ থেকে প্রমাণ করার জন্য।

৪. কোনো বিষয় খোলাসা করার জন্যও কোটেশন দেওয়া যায়।

কোটেশন দেওয়ার পদ্ধতি

১. সংক্ষিপ্ত কোটেশন তথা দুই-তিন লাইন টেক্সটের দুই পাশে সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক দ্বারা উদ্ধৃতি দিতে হয়। যদি তিন লাইনের বেশি উদ্ধৃত করা হয় তাহলে কোটেশন মার্ক দেওয়ার পরিবর্তে পৃথক প্যারাগ্রাফে উল্লেখ করতে হয়।

২. কোটেশনের ভেতর কোটেশন দিতে হলে প্রথমবার সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক ব্যবহার করতে হবে তারপর ডাবল কোটেশন মার্ক (“ ”) দিতে হবে।

৩. কোটেশন থেকে কোনো শব্দ বাদ দেওয়া হলে পরবর্তী শব্দের আগে তিনটি ডট বসাতে হয়। যেমন– তিনি বলেছেন ... আমাদেরকে এই সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে। কিন্তু যদি এক বা একাধিক লাইন বাদ দেওয়া হয় তাহলে এক লাইনের অনুরূপ জায়গা বাদ রাখতে হবে।

৪. উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় প্রথম অক্ষর বড় অক্ষরের হতে হবে যদিও মূল টেক্সটে তা ছোট বর্ণের থাকে।

৫. কোটেশন সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, খুব দীর্ঘ হওয়া ভালো নয়।

৬. সরাসরি কোটেশন দেওয়ার সময় লেখকের শব্দ ও যতিচিহ্ন হুবহু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.com

৭. কোটেশন কোথা থেকে দেওয়া হয়েছে তা উদ্ধৃতির শুরুতে কিংবা শেষে বা ফুটনোটস হিসেবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন– মওদূদী : ১৯৮৯. পৃ-৩৮,

৮. কোটেশন বিশুদ্ধ হতে হবে। যদি সঠিকভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করা না হয় তাহলে লেখার মান কমে যায়। কখনও পাঠক কোটেশন যাচাই করতে পারে।

ব্লক কোটেশন, ডাবল কোটেশন মার্ক ও সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক : ডাবল কোটেশন মার্ক কয়েক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় :

১. কোনো টাইটেল উল্লেখ করার সময় ডাবল কোটেশন মার্ক উল্লেখ করতে হয়।

২. হেডিং- সাবহেডিং ব্লক কোটেশন হিসেবে উল্লেখ করতে হয়।

৩. কোটেশনের ভেতর কোটেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক ব্যবহৃত হয়। একই কোটেশনে আরেকটি কোটেশন দেওয়ার সময় ডাবল কোটেশন মার্ক দিতে হয়।

কোটেশন প্রদানে অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে : কপিরাইট অ্যাক্ট অনুসারে কোনো কিছু উদ্ধৃত করা দরকার। অনেক বইয়ে লেখা থাকে এই বইয়ের কোনো অংশের হুবহু উদ্ধৃতি বা ফটোকপি করা যাবে না। তাহলে এই ধরনের বই থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত নয়। সাধারণত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির জন্য লেখক/প্রকাশকের অনুমতি প্রয়োজন হয় না, রেফারেন্স উল্লেখ করলেই চলে। তবে কোনো বইয়ের অধ্যায় বা একটি কবিতা পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃত করতে হলে অবশ্যই অনুমতির প্রয়োজন আছে।

রেফারেন্স

রেফারেন্স কী : রেফারেন্স হচ্ছে গবেষণাকর্মে উল্লিখিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করার নাম। একাডেমিক যেকোনো লেখায় তথ্যসূত্র উল্লেখ করা অপরিহার্য। তবে অপ্রয়োজনীয় রেফারেন্স দেওয়া উচিত নয়। আপনি কত বই পড়েছেন শুধু তা প্রমাণ করার জন্য রেফারেন্স দেওয়ার দরকার নেই। অতিরিক্ত রেফারেন্স পাঠকের কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। সাধারণত নিচের কারণসমূহের জন্য রেফারেন্স দিতে হয় :

১. রেফারেন্স দিলে পাঠক প্রয়োজনে মূল তথ্যসূত্র সহজেই দেখতে পারেন।

২. রেফারেন্স দিয়ে যার মতামত উল্লেখ করা হয় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

৩. রেফারেন্সের মাধ্যমে পাঠকের কাছে এই কথা পরিষ্কার করা হয় যে, এটা অন্য কারো বক্তব্য।

৪. কোনো তথ্য পুনরায় যাচাই করার প্রয়োজন হলে রেফারেন্স অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

৫. রেফারেন্স থাকলে উক্ত বই থেকে কোথাও উদ্ধৃতি দিতে পাঠক বেশি আস্থাশীল হন।

কখন রেফারেন্স দেওয়া প্রয়োজন : প্রত্যেক কথা বা বক্তব্যের রেফারেন্স দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কয়েক ক্ষেত্রে রেফারেন্স দিতে হয় : যদি কারো বিশেষ মতামত/থিওরি বর্ণনা করা হয়, কোনো বিশেষ তথ্য বা পরিসংখ্যান প্রদান করা হলে, কারো কথা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করলে, কারো বক্তব্য ভাষান্তর করলে।

www.nagorikpathagar.com

রেফারেন্সে কী কী থাকতে হয় : রেফারেন্সে এমনসব প্রয়োজনীয় তথ্য থাকা উচিত, যা দেখে যে কেউ লাইব্রেরি বা অন্য কোনো স্থান থেকে সংশ্লিষ্ট বই/তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলি থাকা জরুরি :

ক. বইয়ের রেফারেন্স

১. লেখকগণের নাম/সম্পাদকের নাম, যে সংস্থা বইটি প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছে তার নাম, প্রকাশের সন ব্রাকেটে লিখতে হয়। ২. বই/প্রবন্ধের শিরোনাম আন্ডারলাইন করতে হয় কিংবা ইটালিক অথবা বোল্ড করে লিখতে হয়। ৩. সংস্করণ– যদি একাধিক সংস্করণ হয়ে থাকে। ৪. প্রকাশের স্থান যদি জানা থাকে। ৫. প্রকাশকের নাম এবং ৬. পৃষ্ঠা নম্বর।

খ. জার্নাল হলে ঃ ১. লেখকগণের ডাকনাম ও ইনিশিয়ালস। ২. প্রকাশের সাল ব্রাকেটে। ৩. প্রবন্ধের শিরোনাম জার্নালের নাম আন্ডার লাইনকেও। ৪. ভলিউম সংখ্যা। ৫. ইস্যু ব্রাকেটে এবং ৬. সাপ্তাহিক পত্রিকা হলে প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা নম্বর।

রেফারেন্স কোথায়, কীভাবে লিখতে হয় : Harvard referencing guide অনুসারে সাধারণত দুইভাবে রেফারেন্স দেওয়া হয় :

১. মূল টেক্সটের ভিতর : কারো বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল টেক্সটের ভেতর উল্লেখ করার সময় মূল টেক্সটের ভিতরই রেফারেন্স উল্লেখ করা যেতে পারে। তারপর বই/প্রবন্ধের শেষে রেফারেন্স তালিকায় বিস্তারিত তথ্য বিবরণী লিখতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন, হার্ভার্ড রেফারেন্সিং সিস্টেমে মূল টেক্সটের সাথে রেফারেন্স দেওয়ার কারণে পড়ার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন এর ফলে টেক্ট পড়ার সময়ই তথ্যসূত্র সম্পর্কে মৌলিক ধারণা পাওয়া যায়। মূল টেক্সটের ভিতর কয়েকভাবে রেফারেন্স দেওয়া যায় :

ক. কোনো একজন লেখকের পরোক্ষ মতামত মূল টেক্সটের ভিতর লেখকের নামের সর্বশেষ অংশ ও বই বা প্রবন্ধ প্রকাশের তারিখ ব্রাকেটে উল্লেখ করে লেখা যায়।

   উদাহরণ ১ : কারযাভী (২০০৩)-এর মতে হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

   উদাহরণ ২ : গবেষণায় (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৩) দেখা গেছে, বাংলাদেশের ৩৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে হাইস্কুলে যাওয়ার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।

খ. একই লেখকের একই সনে প্রকাশিত একাধিক বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া হলে বইয়ের সনের সাথে ছোট অক্ষরে ক, খ লিখে বইয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। যদি কোনো প্রবন্ধে একই লেখকের একই সনে প্রকাশিত একটি বই থেকে শুধু রেফারেন্স দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সন লেখার পর ক, খ লেখার প্রয়োজন নেই।

www.nagorikpathagar.com

উদাহরণ : কারযাভী (২০০৩ ক)-এর মতে হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারযাভী (২০০৩ খ)-এর দৃষ্টিতে হালাল-হারামের ব্যাপারটি ইসলামী শরীআতের বিধানের আকাশে সদা আবর্তনশীল।

গ. দুইজন ব্যক্তি কোনো একটি বই লিখলে উভয়ের নামের সর্বশেষ অংশ ও বই প্রকাশের সন উল্লেখ করে মূল টেক্সটের ভিতর রেফারেন্স দেওয়া যায়।

উদাহরণ : কায়যাভী ও নদভী (২০০৩) -এর মতে, হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

ঘ. দুইয়ের অধিক ব্যক্তি কোনো বই লিখলে শুধু প্রথমজনের নামের শেষ অংশ উল্লেখ করতে হয়। রেফারেন্স তালিকা বা তথ্যপঞ্জিতে সকলের নাম লেখতে হয়।

উদাহরণ : কারযাভী ও অন্যান্যদের (২০০৩) মতে, হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

ঙ. একই ধরনের কথা বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন বই/প্রবন্ধে উল্লেখ করলে নিচের উদাহরণ অনুযায়ী মূল টেক্সটের ভিতর রেফারেন্স দেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে যে বইটি আগে লেখা হয়েছে উক্ত বইয়ের গ্রন্থাকারের নাম প্রথম লিখতে হবে। আর একই সনে একাধিক গ্রন্থ লেখা হলে লেখকের নামের বর্ণক্রম অনুযায়ী রেফারেন্স লিখতে হবে।

উদাহরণ : হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। (কারযাভী ১৯৮০, আদেল ২০০২, বাকের ২০০২)

চ. ইলেক্ট্রনিক তথ্য মূল টেক্সটের ভিতর উল্লেখ করার সময় লেখকের নাম, তারপর সন, এরপর ইন্টারনেট/সিডির নাম উল্লেখ করে মতামত লিখতে হয়। তাহলে বোঝা যাবে, এটি ইন্টারনেট বা সিডি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

উদাহরণ : কারযাভী (২০০৩, ইন্টারনেট) মতে, হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

ছ. মূল টেক্সটের ভিতর প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি দিতে হলে উদ্ধৃতির দুই পাশে কোটেশন মার্ক দিতে হবে এবং লেখকের নাম, প্রবন্ধ, বই প্রকাশের সন ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সংক্ষিপ্ত কোটেশন আলাদা প্যারাগ্রাফে লেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দীর্ঘ কোটেশন পৃথক প্যারাগ্রাফে লিখতে হয়।

উদাহরণ ১ : কারযাভী (২০০৩, পৃ-৬) বলেন, 'হালাল-হারাম বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।'

উদাহরণ ২ : হজ্জের তাৎপর্য সম্পর্কে মওদূদী (১৯৭৮ পৃ-৫৬) বলেন :

হজ্জের নিয়ত এবং এজন্য প্রস্তুতি হইতে শুরু করিয়া নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত হাজীর মন-মগজে গভীর খোদায়ী ভাবধারা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। এই কাজে শুরু হইতে সময়ের কুরবানী, অর্থের কুরবানী করতে হয়, সুখ-শান্তি ত্যাগ করিতে হয়। এই

www.nagorikpathagar.com

সব কিছুই তাহাকে করিতে হয় কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নিজস্ব কোনো স্বার্থ তাহাতে স্থান পাইতে পারে না। তারপর এই সফরে তাকওয়া পরহেজগারীর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর দিকে মনের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় তাহাও মানুষের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বহু দিন পর্যন্ত সেই প্রভাব স্থায়ী হইয়া থাকে। হেরেম শরীফে কদম রাখিয়া হাজী প্রত্যেক পদে পদে সেইসব মহামানবদের অতীত কর্মধারার স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পায় যাঁরা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য করিয়া এবং আল্লাহর দীন ইসলামকে কায়েম করিতে গিয়া নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করিয়াছেন। যাঁহারা সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। নানা প্রকার দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। নির্বাসনদণ্ড অকাতরে ভোগ করিয়াছেন। অসংখ্য যুলম বরদাশত করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম না করা পর্যন্ত তাঁহারা এতটুকু ক্লান্তি বোধ করেন নাই। যেসব বাতিল শক্তি মানুষকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো দাসত্ব করিতে বাধ্য করিতেছিল, তাঁহারা তাহাদের সকলই মস্ক চূর্ণ করিয়া দ্বীন-ইসলামের পাতাকা উন্নত করিয়া ধরিয়াছেন।

২. টেক্সটের ভিতর রেফারেন্স উল্লেখ না করে প্রবন্ধ বা বইয়ের শেষে রেফারেন্স উল্লেখ করা। টেক্সটের শেষে রেফারেন্স দেওয়ার নিয়ম তথ্যপঞ্জি-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রেফারেন্সের আরও কতিপয় নিয়ম

নিয়ম-১ : একই তথ্যসূত্র পরপর উল্লেখ করার সময় বারবার তথ্যসূত্রের নাম লেখার দরকার নেই। বাংলায় 'প্রাগুক্ত' আর ইংরেজিতে 'অঠধঢ' লিখলেই চলে। যদি একই পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী সময়ে রেফারেন্স দেওয়া হয় তাহলে শুধু প্রাগুক্ত লিখতে হয়। আর যদি একই বইয়ের পৃথক পৃষ্ঠা থেকে রেফারেন্স দেওয়া হয় তাহলে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হয়।

উদাহরণ : ১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ-১৫০

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত পৃ-২৩৭

নিয়ম-২ : একবার বিস্তারিত লেখার পর পরবর্তী সময়ে লেখক ও গ্রন্থের নাম সংক্ষেপে লেখা যায়।

উদাহরণ : ১. মওদূদী, আবুল আলা, সাইয়েদ ১৯৯৬, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী;

২. মওদূদী, ২০০০, হজ্জের হাকীকত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী।

নিয়ম-৩ : রেফারেন্স বইয়ের নাম ইটালিক বা আন্ডারলাইন কিংবা বোল্ড করে দিতে হয়।

উদাহরণ : ১. মওদূদী, আবুল আলা, সাইয়েদ, ১৯৯৬, *তাফহীমুল কুরআন*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী।

২. মওদূদী, ২০০০ হজ্জের হাককীত. ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী।

www.nagorikpathagar.com

উল্লিখিত প্রথম উদাহরণে বইয়ের নাম ইটালিক আর দ্বিতীয় উদাহরণে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম-৪ : যদি পরপর একই বই থেকে রেফারেন্স দেওয়া হয়, তাহলে প্রাগুক্ত লিখে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া যথেষ্ট। কিন্তু একই লেখকের দুইটি বই থেকে পরপর রেফারেন্স দিলে প্রাগুক্ত উল্লেখ করা যাবে না। একই লেখকের অন্য বই থেকে পরপর উদ্ধৃতি দেওয়া হলে পূর্ণ রেফারেন্স লিখতে হবে। প্রাগুক্ত শুধু বইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, লেখকের ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত লেখা যায় না।

উদাহরণ : ১. মওদূদী, আবুল আলা, সাইয়েদ ১৯৯৬, তাফহীমুল কুরআন ১ম খণ্ড ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৩

নিয়ম-৫ : সঠিক তথ্যসূত্র উল্লেখ করা দরকার। অনুমাননির্ভর কোনো সূত্র উল্লেখ করা উচিত নয়।

নিয়ম-৬ : সকল রেফারেন্স একই পদ্ধতিতে লেখা।

নিয়ম-৭ : রেফারেন্স লেখার সময় লেখকের নামের সর্বশেষ অংশ লিখতে হয় এবং বর্ণমালার ক্রমানুসারে লেখকদের নাম সাজাতে হয়। একই লেখকের একাধিক বইয়ের নাম তথ্যপঞ্জি/রেফারেন্স তালিকায় থাকলে যে বইটি আগে প্রকাশিত হয়েছে তার নাম প্রথম লিখতে হয়। আর একই বছর একই লেখকের একাধিক বই প্রকাশিত হলে সন লেখার পর ক, খ এভাবে বইয়ের তালিকা দিতে হয়।

নিয়ম-৮ : কোনো বই/ প্রবন্ধ প্রকাশের সন প্রদান করা না হলে তারিখ দেওয়া নেই কথাটি লেখা দরকার।

নিয়ম-৯ : কোনো বই একই ফ্যামিলির দুইজনে লিখলে তাহলে প্রথম রেফারেন্স লেখার সময় উভয়ের পূর্ণ নাম লিখতে হবে। উদাহরণ : শাকিল রব এবং জাহান রব এভাবে লিখতে হবে। শাকিল এবং জাহান রব লেখা যথেষ্ট হবে না।

নিয়ম-১০ : কোনো লেখকের নামের সাথে ডা. প্রফেসর, প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি পদবি লেখা থাকলেও তা রেফারেন্স লেখার সময় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে প্রবন্ধের বিষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলে সে সময় উল্লেখ করা যায়।

নিয়ম-১১ : কোনো বইয়ের লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক সবই থাকতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে লেখকের নাম প্রথম, তারপর বইয়ের নাম, অতঃপর সম্পাদক, তারপর অনুবাদকের নাম লিখতে হয়।

উদাহরণ : মুসলমানদের যা জানা উচিত, সম্পাদনা কামাল উদ্দিন জাফরী. অনুবাদ : নরসিংদী : জামেয়া কাসেমী প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.com

নিয়ম-১২ : কোনো লেখকের একাধিক সাহিত্যকর্ম কেউ সম্পাদনা করে প্রকাশ করলে লেখকের নাম বইয়ের শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করতে হয়।

উদাহরণ : মওদূদী রচনাবলী ও নজরুল রচনাবলী ইত্যাদি।

নিয়ম-১৩ : উদ্ধৃত বইয়ের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হলে সংস্করণের সন উল্লেখ করতে হয়।

নিয়ম-১৪ : বইয়ের টাইটেল উল্লেখ করার পর প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হয়। তবে কোনো অপরিচিত শহর থেকে কোনো বই প্রকাশিত হলে দেশের নাম উল্লেখ করতে হয়।

নিয়ম-১৫ : প্রকাশকের নাম পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করতে হয়। এক্ষেত্রে শব্দসংক্ষেপ ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেমন– লিমিটেডের পরিবর্তে লিঃ।

তথ্যপঞ্জি (Bibliography)

Bibliography **কী :** রেফারেন্স হচ্ছে বই। প্রবন্ধে উদ্ধৃত বই বা তথ্যসূত্রের তালিকা। আর তথ্যপঞ্জি হচ্ছে প্রবন্ধ বা বইতে উদ্ধৃত ও উদ্ধৃত হয়নি কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এমনসব তথ্যসূত্রের নাম। কিন্তু কেউ কেউ রেফারেন্স ও তথ্যপঞ্জির মধ্যে পার্থক্য করেন না। তাঁদের মতে বই বা প্রবন্ধে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি এমন বইয়ের তালিকা তথ্যপঞ্জিতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাঁদের মতে রেফারেন্স তালিকা দেওয়ার পর পৃথকভাবে তথ্যপঞ্জি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণত ছোট প্রবন্ধে শুধু রেফারেন্স থাকে। কিন্তু বড় বইতে রেফারেন্স ও বিবলিওগ্রাফি উভয়টি থাকে।

রেফারেন্স দেওয়া জরুরি। কিন্তু রেফারেন্স দেওয়ার পর তথ্যপঞ্জি পৃথকভাবে দেওয়া হবে কি না তা সংশ্লিষ্ট গবেষকের ইচ্ছা ও তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা অনুসারেই ঠিক করা ভালো।

তথ্যপঞ্জি লেখার পদ্ধতি

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ১ : লেখকের নাম, প্রকাশের সন, বইয়ের শিরোনাম (আন্ডারলাইন বা ইটালিক), প্রকাশের স্থান ও প্রকাশক।

উদাহরণ : Alen, J.R. 1985, Principle of physical Sedimentology, London : Allen & Unwin খান, আ. আ. ১৯৯৭. মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন, ঢাকা : কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ.

ইউনুছ, আ. দ. ম. ২০০২. মানুষের শেষ ঠিকানা, ঢাকা, কামিয়াব প্রকাশন।

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ২ : লেখকের নাম, বইয়ের শিরোনাম (আন্ডারলাইন বা ইটালিক), প্রকাশক, প্রকাশের স্থান ও প্রকাশের সন।

উদাহরণ : ড মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৮

www.nagorikpathagar.com

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ৩ : লেখকের নাম, (প্রকাশের সন), বইয়ের শিরোনাম (আন্ডারলাইন বা ইটালিক), প্রকাশের স্থান ও প্রকাশক।

উদাহরণ : আজমী, নূর মোহাম্মদ, মাওলানা, (২০০১) মেশকাত শরীফ (৫ম খণ্ড) ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার।

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ৪ : একই লেখকের একাধিক বইয়ের নাম তথ্যপঞ্জি/ রেফারেন্স তালিকায় থাকলে যে বইটি আগে প্রকাশিত হয়েছে তার নাম প্রথম লিখতে হয়।

উদাহরণ : মওদূদী, আবুল আ'লা, সাইয়েদ, ১৯৯৩ হজ্জের হাকীকত, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী।

মওদুদী, আবুল আলা, সাইয়েদ ১৯৯৬, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী।

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ৫ : একই বছর একই লেখকের একাধিক বই প্রকাশিত হলে মাস ও সন উল্লেখ করতে হয় এবং যেটি আগে প্রকাশিত হয়েছে তার নাম আগে লিখতে হবে। আর যদি একই মাসে প্রকাশিত হয় তাহলে সন লেখার পর ব্র্যাকেটে ক,. খ এভাবে বইয়ের তালিকা দিতে হয়।

উদাহরণ : Grindy, A.P. 1975 (a) Mathematical Statistics. Oxford : OUP

------------------ 1975 (b) Medical Statistics. Oxford : OUP

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ৬ : অনেকগুলো প্রবন্ধের সংকলন যদি কেউ সম্পাদনা করেন, উক্ত প্রবন্ধ সংকলনের কোনো একটি প্রবন্ধ থেকে তথ্য নেওয়া হলে প্রথমে লেখকের নাম, (সন ব্র্যাকেটে), প্রবন্ধের শিরোনাম, সম্পাদকদের নাম, বইয়ের নাম. প্রকাশের স্থান ও প্রকাশকের নাম লিখতে হয়। এই ক্ষেত্রে প্রবন্ধের পরিবর্তে বইয়ের নাম ইটালিক বা আন্ডারলাইন করতে হবে।

উদাহরণ : Grice, H.P. (1975), Logic and conversation in Cole, P. & Morgan, J. (eds) Syntax and Semantics 3 : Speech Acts, New York : Academic Press .

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি ৭ : কোনো লেখকের বই অন্য কেউ সম্পাদনা বা অনুবাদ করলে নিচের পদ্ধতিতে তথ্যপঞ্জি লিখতে হয়। লেখকের পূর্ণ নাম (নামের সর্বশেষ অংশ প্রথম লিখতে হয়), বইয়ের নাম ও উপনাম (যদি থাকে), সম্পাদক/অনুবাদক যদি থাকে, সংস্করণ, ভলিউম সংখ্যা– যদি বইটির একাধিক খণ্ড থাকে, বইটি কোনো সিরিজের অংশ হলে সিরিজের নাম– যেমন সাইমুম সিরিজ, প্রকাশের স্থান– যদি একাধিক স্থান থেকে প্রকাশিত হয় তাহলে সকল শহরের নাম প্রকাশকের নাম প্রকাশের সন।

উদাহরণ : আল তালিব, হিশাম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রশিক্ষণ গাইড, ড. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অনূদিত, বাংলা প্রথম সংস্করণ, মানব উন্নয়ন সিরিজ নং ১,

www.nagorikpathagar.com

ঢাকা : দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ১৯৯৭।

কোনো বইয়ের অংশবিশেষ থেকে তথ্য নেওয়া হলে এভাবে রেফারেন্স দিতে হয় ঃ

FATCHETTA A (1994) Politics, Policy and Nursing, Chapter 4. London, Bailliere Tindall .

একজন লেখকের বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি :

CHANDLER T (1992) Support worker Training. London : Baillier Tindall.

দু'জন লেখকের বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি :

IRONBAR No and HOOPER A (1989) Self-Instruction in Mental Health Nursing. London, Bailliere Tindall.

তিনজন লেখকের বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি :

KELNR C, HARVEY D and SIMPSON C (1995) The Sick Newborn Baby. London, Bailliere Tindall —

অনেক বেশি লেখকের বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি :

Parker, Geoffery, and others, The Thirty Years war. London, 1984

কোনো লেখকের বইয়ের সংগ্রহ বা সংস্করণ রেফারেন্স দিতে হলে ঃ

Marvell, Andrew. The Poem and Letters of Andrew Marvell, ed. H.M Margoliouth, 2 vols, 2nd ed.Oxford, 1952

Keating, Peter ed. The Victorian Prophets : A Reader from Carlyle to Wells. Glasgow, 1981

অনূদিত গ্রন্থের রেফারেন্স ঃ

Virgil. The Aenied, Trans. W.F.jackon Knight. Harmondssworth, 1956

বুখারী, ই.হ. সহীহ আল বুখারী. বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা. মুহাম্মদ মুসা ও অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত. ২য় খণ্ড, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী. ২০০১।

সম্পাদিত বইয়ের বিবরণী : লেখকের মতো সম্পাদকের নাম প্রথম হবে। অবশিষ্ট পদ্ধতি একই ধরনের হয়।

ed. Cowan, J.M. 1976. The Hans Wehr Dictionary of Modern written Arabic, 3rd edition. London : Spoken Language Service

ব্যক্তির মতো কোনো সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হলে উক্ত সংস্থার নাম প্রথম হবে।

www.nagorikpathagar.com

একাডেমিক প্রবন্ধ তথ্যপঞ্জিতে লেখার নিয়ম : লেখকের নাম, প্রকাশের সন, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক/আন্ডারলাইন হবে), ভলিউম ও ইস্যু নাম্বার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পৃষ্ঠা নম্বর।

উদাহরণ : পাটওয়ারী, আ.ক.ম ১৯৯৬. ইহুদী ও বিশ্বব্যাপী তার তৎপরতা. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ-১৩-২৯।

পত্রিকা/ম্যাগাজিন প্রবন্ধ : লেখকের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, Title of the Periodical, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা নম্বর।

পত্রিকার প্রবন্ধ

জার্নালের রেফারেন্স

Encounter, vol.54, No. 1 (January 1980) pp-31-55

সম্পাদিত কোনো ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ

Cohen, London, 1264

বিশ্বকোষ থেকে রেফারেন্স

– 634.1964

গাইড বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা

Guide to the British Musum, London, 1965

অপ্রকাশিত গবেষণাকর্মের রেফারেন্স দেওয়ার সময় বিস্তারিত লিখতে হয়

STEPHENSONP (1995) Nursing and Race relations, Unpublised BA (Hons) Thesis, London, University of London

অন্য টেক্সট থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলে : সরাসরি রেফারেন্স বই থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে অন্য টেক্সট বই থেকে উদ্ধৃতি দিলে এভাবে লিখতে হয় :

O' Conor, J. and McDermott, i. (1996). Principles of NLP. London : Thorsons. Cited in Conttrell, S.M (1999). The Study Skills Handbook. Basingstoke: Macmillan

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া : এভাবে তথ্যপঞ্জি লিখতে হয় ঃ

Tower Hamlets College Access Department (1999) The Student Handbook (online).

London, Tower hamlets College. Avaible from

http:/www.hasa.org.uk/handbook.html (Accessed 25th December 2003)

বইয়ের বিবরণী লেখার পদ্ধতি : বিষয়ভিত্তিক তথ্যপঞ্জি সাজানো উত্তম।

<u>কুরআন :</u> কুরআনুল কারীম

<u>তাফসীর</u> : মওর্দদী, আবুল আ'লা, সাইয়েদ. ১৯৯৬, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী।

www.nagorikpathagar.com

হাদীস ও হাদীসের শরাহ্ : বুখারী, ই.হ. সহীহ্ আল বুখারী, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা, মুহাম্মদ মূসা ও অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১।

অন্যান্য গ্রন্থ : আল মোবারকপুরী, সফিউর রহমান, ১৯৯২, আর রাহীক আল মাখতুম, ৮ম সংস্করণ. রিয়াদ : দার আর সালাম.

অভিধান : ed. Cown, J.M. 1976. The Hans Where Dictionary of Modern written Arabic, 3rd edition.

London: Spoken Language Service

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া : www.islamonline.net.com/Hajj consell 23/5/2003

বই বিবরণী বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিখতে হয় :

1. Bailey, P. (1978), Leisure and Class in Victorian England. London : Methuen
2. David, B. Pirie, 1985, *How to write critica; essays*—A guide for students of literature, Methuen & Co. Ltd.
3. Leader, W.G. 1990, *How to pass Exams,* England Stanley Thorns Publishers Ltd
4. Tracy, Eillen, 2002, *The Studen'ts guide to Exam Success.* Buckingham, Open University Press

নোট, ফুটনোটস ও এন্ডনোটস Footnotes & Endnotes

নোটস কেন ব্যবহার করতে হয় : সাধারণত গবেষণার মূল টেক্সটে উল্লিখিত কোনো বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট করার জন্য ফুটনোট বা ইন্ডনোট দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন,

"Footnotes are used to provide additional explanations or details of work by other writers referred to in the main text".[১৭]

Turabian -এর মতে, চার কারণে নোট ব্যবহার করা হয় : ১. টেক্সটে উল্লিখিত কারো অভিমত হুবহু উদ্ধৃত করার জন্য। ২. ক্রস রেফারেন্স অর্থাৎ একই প্রবন্ধ বা বইয়ের অন্য স্থানে আলোচিত কোনো বিষয়ের রেফারেন্স দেওয়া প্রয়োজন হলে। ৩. কোনো বিষয় মূল টেক্সটে সংক্ষেপে বলা হয়েছে কিন্তু আরো খোলামেলা আলোচনার জন্য। ৪. তথ্যসূত্র কিংবা মূল টেক্সটে উল্লিখিত কোনো বক্তব্যের প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য। ৫. মূল টেক্সটে উল্লেখ করার দরকার নেই এমন অতিরিক্ত যেকোনো তথ্য উপস্থাপন করার জন্য।

---

১৭. Study Skills for Academic writing. p-60.

www.nagorikpathagar.com

নোট ব্যবহারের পদ্ধতি : নোট ব্যবহারের সর্বজনগ্রহণযোগ্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে :
ফুটনোট : প্রতি পৃষ্ঠার নিচে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার টেক্সটের ফুটনোট দেওয়া–

They may appear at the bottom of the page to which they refer, in which case they are usually sperated from the main text by a ruled line.

২. **এন্ডনোট :** প্রবন্ধের শেষ বা কোনো বইয়ের প্রতি অধ্যায়ের শেষে কিংবা বইয়ের শেষে দেওয়া– They may be found at the end of a piece of work। এমফিল/পিএইচডি গবেষকদেরকে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনাক্রমে নোট ব্যবহার করতে হবে। আর সাধারণ গবেষকদের নিজের/প্রকাশকের পছন্দানুসারে নোট ব্যবহার করতে হয়।

নোট ব্যবহারে বিশেষ নির্দেশিকা

১. নোট ব্যবহারের সময় নম্বর দেওয়া উচিত।

২. ফুটনোট বা ইন্ডনোটে শব্দ সংক্ষেপে লেখা যায়।

গবেষণাকর্ম সম্পাদনে নৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(Ethical consideration)

কোনো কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া, প্রশ্নমালা পূরণ করা কিংবা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হয়। যেমন কেউ যদি 'বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেট ২০০৩, জনপ্রত্যাশা ঃ একটি পর্যালোচনা' এই ধরনের কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে চান তাকে অনেক মানুষের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালা তৈরি করে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে মানুষের অভিমত জানা যায়। যদিও প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে অনেকেই মনের কথা খুলে বলতে চান না কিংবা ইন্টারভিউ গ্রহণকারীর মতামতের প্রতি বায়াস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তারপরও সাক্ষাৎকার কোনো কোনো গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ। এ ধরনের গবেষণার জন্য গবেষক আগেই প্রশ্নাবলি তৈরি করে রাখেন। ব্যক্তির সাথে সময় নিয়ে ইন্টারভিউ করতে যান। ইন্টারভিউর সময় নোট করেন বা অডিও রেকর্ডিং করেন। কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে তা পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করেন এবং ইন্টারভিউর পরে তা লিখে ফেলেন।

কোনো কোনো গবেষণার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করে বিতরণ করতে হয়। প্রশ্নমালা বিতরণ করা সহজ কিন্তু সকলের পক্ষ থেকে উত্তর আসে না। প্রশ্নমালায় অনেক উত্তর অস্পষ্ট থাকে, উত্তরদাতা সঠিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন কি না তার নিশ্চয়তা থাকে না। তারপরও প্রশ্নমালার মাধ্যমে গবেষণার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাই অনেক গবেষণাকর্মের জন্য 'প্রশ্নমালা' বিতরণ করতে দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.com

কোনো কোনো গবেষণার জন্য বাস্তব ময়দানে পর্যবেক্ষণ করতে হয় (A practical method to prove your theory.)। যেমন 'বাংলাদেশের ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য উপযোগী কি না' এ ধরনের বিষয়ে গবেষণা করতে হলে গবেষককে সরাসরি ক্রিকেট স্টেডিয়াম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আবার কোনো গবেষণার জন্য মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যেমন 'ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণ : কারণ ও প্রতিকার' বিষয়ে গবেষণা করতে হলে মহানগরীতে অবস্থান করেন/চলাচল করেন এমন মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এভাবে গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্যে কারো সাক্ষাৎকার নেওয়া বা প্রশ্নমালা বিতরণ কিংবা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে কতিপয় নৈতিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. **অনুমতি** (Consent) : কারো সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউ নেওয়া কিংবা কারো আচার-আচরণ গবেষণার উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে (The investigator should inform all participants of the objectives of the investigation and should inform all aspects of research or intervention that might reasonably be expected to influence their willingness to participate)।

অনুমতি ছাড়া কারো কাউকে গবেষণায় অংশ গ্রহণ করানো কিংবা কারো আচরণ পর্যবেক্ষণ করা নৈতিকতা পরিপন্থী[১৮] (No one should be made to participate in a research study against their will)। কারো কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার আগে গবেষণা শুরু করা উচিত নয় (Research involving a subject should not commence until subject has given informed consent.)।

গবেষণার উদ্দেশ্যে কোনো মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হলে তাকে জানাতে হবে যে, তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে (Where the subject of research are people, then they have a right to be told that they are being observed)।

সুস্পষ্ট কোনো ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্য না হয়ে সামষ্টিক আচরণ পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্য হলে সর্বসাধারণের মধ্যে এ কথা প্রচারিত হওয়াই যথেষ্ট যে, অমুক স্থানে চলাচলকারীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ হতে পারে।[১৯]

---

১৮. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের উপর গবেষণাকর্মের জন্য মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে স্থানে অবস্থান করা হবে উক্ত স্থানে লিখে দিতে হবে, এই স্থান দিয়ে চলাচলকারীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হবে।

১৯. যেমন ঢাকা শহরে রাস্তায় কফ, থুথু, ময়লা ফেলার ক্ষেত্রে অধিবাসীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

www.nagorikpathagar.com

২. **গোপনীয়তা** (Confidentiality) : গবেষণাকর্মে অংশগ্রহণকারীদে প্রদত্ত তথ্য ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে (Participants in psychological research have a right to expect that information they provide will be treated confidentially)।

এ কারণে প্রশ্নমালায় অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখা কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত গোপন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। কারো প্রদত্ত তথ্য প্রকাশ করতে হলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে (If the investigator wants to disclosed, he must get consent in advance)।

৩. **প্রভাবমুক্ত** : অংশগ্রহণকারীরা গবেষক বা অন্য কারো প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে যেন মতামত ব্যক্ত করতে পারেন সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে (Intentional deception of the participants over the purpose should be avoided)।

৪. **ক্ষতির সম্ভাবনাহীন** : গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক ক্ষতি হতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকলে তাদের গবেষণায় অংশগ্রহণ করানো উচিত নয় (Participants must be protected from stress by all appropriate measures)।

৫. **প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ** : গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা গবেষণাকর্ম সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জানতে চাইলে গবেষককে তাদের তথ্য প্রদান করতে হবে (Investigator should provide necessary information when the data have been collected)।

৬. **গবেষণায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকার অধিকার** (Withdrawal from the investigation) : কেউ গবেষণায় অংশ নিতে না চাইলে তাকে গবেষণায় অংশ নিতে বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ গবেষণায় অংশ নিয়ে গবেষণাকর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দিতে গবেষক বাধ্য (The investigator should clear to participants that they have right to withdraw from the research at any time without being required to give reasons for leaving the study)।

গবেষক ছাত্রদের সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা

কতিপয় পরামর্শ : পিএইচডি স্টুডেন্টদের গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন দিকের উপর কয়েকটি সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করতে হয়। সেমিনারে উপস্থাপনার জন্য আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ দেওয়া হলো :

১. **প্রবন্ধ প্রস্তুতি** : একাডেমিক অন্যান্য প্রবন্ধের মতো সেমিনারের প্রবন্ধে ভূমিকা, মূল বক্তব্য ও উপসংহার থাকতে হয় এবং রেফারেন্স তালিকা সঠিকভাবে দিতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

২. উপকরণ : সেমিনারের জন্য কী কী উপকরণ প্রয়োজন তা আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে হয়। যেমন অভারহেড প্রজেক্টর, স্লাইড প্রজেক্টরস, টেলিভিশন ও ভিডিও রেকর্ডার, টেপ রেকর্ডার, সাদা বোর্ড, বোর্ড মার্কার, কম্পিউটার ইত্যাদি। এই সকল উপকরণ কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আগে থেকেই জেনে রাখা প্রয়োজন।

৩. প্রশ্নোত্তর সময় : সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনের শুরুতেই শ্রোতাদের প্রশ্ন করার সুযোগ কখন দেওয়া হবে তা জানিয়ে দিতে হয়।

সেমিনারের পূর্বপ্রস্তুতির জন্য কতিপয় পরামর্শ

১. সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন কীভাবে করবেন এই নিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। সেমিনারের তারিখ ঠিক হওয়ার পর থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিন।

২. আপনার বিষয়বস্তুর মৌলিক তথ্যসূত্র সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন।

৩. ভিজুয়্যাল সাপোর্ট যেমন অভারহেড প্রজেক্টরের জন্য ট্রান্সপারেন্সিস সংগ্রহ করেছেন কি না? পাওয়ার পয়েন্ট বা অন্যকোনো ধরনের উপাদান আপনার উপস্থাপনায় ব্যবহার করার পরিকল্পনা থাকলে তা আগে থেকেই কাছে রাখুন।

৪. আপনার নির্ধারিত সময় হিসাব করে নিজে নিজেই বক্তব্য প্র্যাকটিস করুন।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন বিষয়ে কতিপয় পরামর্শ

১. সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনের শুরুতে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিন এবং কোন বিষয়ে বলতে চান তা তুলে ধরুন।

২. শ্রোতাদের সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে লিখিত প্রবন্ধ শুধু পড়ে শোনাবেন না। মাঝে মধ্যে শ্রোতাদের দিকে তাকাবেন।

৩. অভারহেড প্রজেক্টর বা পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করলে শ্রোতারা যেন ভালোভাবে দেখতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

৪. শ্রোতাদের আপনার আলোচনায় অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করবেন। আপনি যে বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন সে বিষয়ে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত জানতে পারেন। তবে শ্রোতারা লজ্জিত হবেন এমন প্রশ্ন করার উচিত নয়।

৫. সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিলে শ্রোতাদের মনে বিরক্তিকর ভাব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই নির্দিষ্ট সময়েই উপস্থাপনা শেষ করুন।

৬. মধ্যম ধরনের বাচনভঙ্গি উত্তম। খুব দ্রুত বা উচ্চস্বরে কিংবা একেবারে আস্তে আস্তে কথা বললে শ্রোতাদের কাছে ভালো লাগে না।

www.nagorikpathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বক্তৃতাদানের কৌশল

বক্তৃতাদানের গুরুত্ব : বক্তৃতা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে যারা বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের বক্তৃতা শুনেই মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে, জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করতে হলেও সাধারণ মানুষের মন-মননে নাড়া দিতে হবে, তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে সাড়া জাগানোর জন্য উত্তমভাবে দীনের কথা পেশ করা উচিত। কারণ যেকোনো আদর্শের সাথে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত আদর্শ প্রচারকদের বক্তৃতা মানুষের মন-মননে কতটুকু নাড়া দিতে পারে তা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ তাত্ত্বিক বই পড়ে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয় না, তারা আদর্শ প্রচারকদের কথা শুনেই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আল্লাহ সকলকে বক্তৃতা প্রদানের সমান যোগ্যতা দান করেননি : আল্লাহ তাআলা বক্তৃতার যোগ্যতা সকলকে সমানভাবে দান করেননি। কেউ সাধারণ একটি কথাও অল্প কথায়, মিষ্টি ভাষায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। আর কেউ অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে গিয়েও জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নবী-রাসূলদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সকল নবীকে একই দীনের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানোর পরও সকলের বক্তৃতা রাখার যোগ্যতা এক ধরনের ছিল না। হযরত দাউদ (আ)-এর কথা শোনার জন্য মাছেরাও নদীর কূলে ভিড় জমাতো। অপরদিকে হযরত মূসা (আ)-এর মুখের জড়তার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাই হারুন (আ)-কে তাঁর সহযোগী নবী করেন। হযরত মূসা (আ) তাঁর জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দোআ করেছিলেন :

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي -

"আমার রব, আমার বক্ষ প্রসারিত করে দিন। আমার কাজগুলো সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"[১]

কুরআনে উল্লিখিত হযরত মূসার উপরিউক্ত দোআ থেকে বোঝা যায়, উত্তমভাবে দীনের কথা তুলে ধরার জন্য বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করা ভালো, সুবক্তা হওয়া ভালো গুণ।

১. সূরা তোয়াহা ঃ ২৫-২৮।

www.nagorikpathagar.com

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বক্তৃতাদানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সালাম বিনিময় : বক্তৃতা শুরুর আগে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রোতাদের সাথে বক্তার ভাবের বিনিময় হয়ে যেতে পারে। হাদীস অনুযায়ী কারো সাথে কথা শুরুর আগে সালাম বিনিময় হওয়া সুন্নাত।

আবেগময়ী ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়া : বক্তৃতা বেশি দীর্ঘ করার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ করা দরকার। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতা পেশ করতেন। তাঁর বক্তৃতা হতো অতিশয় উদ্দীপনা দানকারী, যা শ্রোতাদের মনে আবেগ সঞ্চার করত। ফলে সাহাবায়ে কেরাম ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য উজ্জীবিত হতেন।

শ্রোতাদের মনোযোগ থাকলেই কথা বলা : শ্রোতাদের মনোযোগের প্রতি খেয়াল রেখে বক্তৃতা দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেন :

إِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَوَاتٍ وَإِقْبَالًا وَإِدْبَارًا فَأْتُوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا وَإِقْبَالِهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ -

"মানুষের মনের কিছু কামনা-বাসনা থাকে। আর কোনো কোনো সময় তা কথা শুনতে প্রস্তুত থাকে। আর কোনো সময় প্রস্তুত থাকে না। তোমরা মানুষের মনের সেসব আগ্রহ ও ঝোঁক-প্রবণতার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করো এবং তখনই তোমরা কথা বলো, যখন সে শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। কারণ মনের অবস্থা হলো যখন তার উপর জোর করা হয় তখন সে অন্ধ হয়ে যায়।"

শ্রোতাদের বয়স ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলা : শ্রোতাদের বয়স ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলা উচিত। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ -

"মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধি অনুপাতে কথা বল।"

শ্রোতারা বিরক্ত হবে ভাবলে বক্তৃতা না দেওয়া : বক্তৃতা শোনার প্রতি আগ্রহ না থাকলে বক্তৃতা দেওয়া উচিত নয়। হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ওয়াজ নসীহত করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি প্রতিদিনই ওয়াজ নসীহত করুন। আমি এটা চাই।" তিনি বলেন, আমি প্রতিদিন ওয়াজ-নসীহত করা অপছন্দ করি। তিনি আরও বলেন :

إِنِّىْ أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

"আমি কয়েক দিন বিরতি দিয়ে তোমাদের নসীহত করে থাকি। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরতি দিয়ে আমাদের ওয়াজ নসীহত করতেন। আর আমাদের বিরক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি এরূপ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম।)

www.nagorikpathagar.com

প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলা, কঠিন শব্দ প্রয়োগ না করা : শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলা এবং কঠিন শব্দ পরিহার করা উচিত। কেউ কেউ মনে করেন, খুব কঠিন শব্দ প্রয়োগ করলেই বক্তৃতা সুন্দর হয়, বিষয়টি তা নয়। শ্রোতারা কোনো কথা বুঝতে অপারগ হলে বক্তৃতা শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন : يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

"সহজ করে দাও, কঠিন করে তুলো না, সুখবর শোনাও, বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব সৃষ্টি কর না।" এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, মানুষের সামনে সহজ ভাষায় আলোচনা পেশ করা উচিত।

মূল পয়েন্ট পুনর্ব্যক্ত করা : প্রত্যেক বক্তাই বক্তৃতা দেওয়ার সময় অনেক কথা বলেন। এর মধ্যে কিছু মূল পয়েন্ট থাকে, আর কিছু কথা মূল পয়েন্ট ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হয়। তাই বক্তৃতা শেষ করার আগে মূল পয়েন্ট পুনরায় ব্যক্ত করা ভালো। তাহলে শ্রোতার মনে মূল কথা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স) সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতেন এবং মূল কথা মাঝে মধ্যে তিনবার উচ্চারণ করতেন।

عَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ -

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতেন তখন তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন মানুষ তাঁর কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে।" (বুখারী)

উদাহরণ দেওয়া : শুধু তত্ত্বকথা বেশিক্ষণ শুনতে ভালো লাগে না। এই কারণে বক্তব্যের মাঝে মধ্যে কিছু উদাহরণ দেওয়া ভালো। উদাহরণ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষের মনে রেখাপাত করে। উদাহরণ থেকে মানুষ সহজেই শিক্ষা নিতে পারে। আমরা মহাগ্রন্থ আল কুরআন অধ্যয়ন করার সময় দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উদাহরণ দিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের সামনে নসীহত পেশ করার সময় উদাহরণ, কাহিনী, ঘটনা, কৌতুক অথবা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বক্তৃতা বোঝাতেন। কখনও কখনও বিপরীত কথার সাথে তুলনা করে ভালো ও মন্দের পার্থক্য ভালোভাবে বোঝাতেন।

শ্রোতাদের অংশীদার করা : আলোচনায় শ্রোতাদের মাঝে মধ্যে অংশীদার বানানো দরকার। এতে তাদের মধ্যে মনোযোগ বেশি থাকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দেওয়ার সময় শ্রোতাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছেন, "আমি কি দীনের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌছিয়েছি" সকলেই জবাব দিয়েছেন, হ্যাঁ। আপনি যথাযথভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন। বর্তমানেও অনেক বক্তাকে শ্রোতাদের হাত উঁচিয়ে বক্তব্যের সমর্থন আদায় করতে দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.com

সকলেই শুনতে পায় এমন আওয়াজে কথা বলা : জনসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে সাধারণত লাউড স্পিকার থাকে। আবার কখনও কখনও ছোট হলরুমে প্রোগ্রাম হলে বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের একাডেমিক প্রেজেন্টেশানের সময় লাউড স্পিকার থাকে না। এই ধরনের প্রোগ্রামে সকলে শুনতে পায় এমন আওয়াজে কথা বলা দরকার। তবে খুব চিৎকার করে কথা বলা কিংবা মুখের ভেতর কথা রেখে নিম্নস্বরে কথা বলা ঠিক নয়। কারণ এটা শ্রোতাদের কাছে ভীষণ খারাপ লাগে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং খুব চিৎকার করে কথা বলার নিন্দা করে বলেছেন : إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"নিশ্চয়ই গাধার আওয়াজই হলো সবচেয়ে কর্কশ।" (সূরা লুকমান : ১৯)

মহানবীর গলার আওয়াজ খুব বড় বা ক্ষীণ ছিল না। তিনি মধ্যম পর্যায়ের আওয়াজে কথা বলতেন। তিনি পুরো বক্তৃতা পরিষ্কারভাবে পেশ করতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন বাক্যগুলোর শেষ বর্ণ পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে শোনা যেতো। প্রয়োজনমাফিক তাঁর আওয়াজ উঠানামা করতো। সুতরাং তাঁর কথায় অসাধারণ আকর্ষণ সৃষ্টি হতো। তাঁর কথার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না।

অনর্থক কথা না বলা : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলতেন, শব্দ চয়ন করতেন। তিনি অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলতেন না। এজন্য আমাদেরকেও কথা বলার সময়, বক্তৃতা দেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে।

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের মধ্যে যে ধরনের প্রভাবপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চাইতেন, সর্বপ্রথম তার প্রভাব নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতেন। তাঁর অনুরূপ অবস্থার প্রভাব শ্রোতাদের মধ্যে রেখাপাত করতো। আল্লাহর নবীর চেহারা-অবয়ব, জযবা, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের উঠানামা ও শব্দ কিংবা বাক্যের প্রতি জোর দেওয়ার মাধ্যমে বক্তব্যের গুরুত্ব শ্রোতাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যেতো।

নিদর্শন উপস্থাপন ও বাস্তব উদাহরণ পেশ করা : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দেওয়ার সময় এমন নিদর্শন পেশ করতেন যেন অদেখা জিনিসও শ্রোতাদের চোখের সামনে ভাসতো। তিনি অনেক সময় হাত ও আঙ্গুলের ইশারা করে বোঝাতেন, আবার কখনও বাস্তব উদাহরণ পেশ করতেন। যেমন নামায কীভাবে পড়তে হবে, বসতে হবে, খেতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েই শেষ করেননি, বাস্তবে করে দেখিয়েছেন।

মাটিতে রেখা অঙ্কন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা বোঝানোর জন্য মাঝে মধ্যে মাটিতে চিহ্ন ও রেখা অঙ্কন করতেন। সে সময় বর্তমান সময়ের মতো এত প্রযুক্তি ছিল না। তাই আল্লাহর রাসূল বক্তৃতা বোঝানোর জন্য মাটিতে রেখা অঙ্কন করতেন। এ থেকে বোঝা যায়, বক্তৃতা শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

বক্তব্যের সাধারণ টেকনিক

আমরা বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা শুনে থাকি, জনসভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, রিসার্চ স্টুডেন্টদের প্রবন্ধ উপস্থাপন, আলোচনা সভা ইত্যাদি। বক্তব্যের স্থান, শ্রোতা ও প্রোগ্রামের ধরনের পার্থক্যের কারণে বক্তৃতা রাখার টেকনিকেরও ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা পার্থক্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : দাওয়াতি সভা, জুময়ার খুতবা, শাহাদাতের আলোচনাসভা, প্রতিবাদ সভা, সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপনার টেকনিক এক নয়। তবে কিছু কিছু কমন বিষয় সকল বক্তাকেই খেয়াল রাখতে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। বিশেষত রিসার্চ স্টুডেন্টদের সেমিনার উপস্থাপনার সাথে সাধারণ বক্তৃতা উপস্থাপনার অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিচে রিসার্চ স্টুডেন্টদের সেমিনার উপস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এই আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : প্রস্তুতি পর্ব, বক্তৃতা রাখার সময়, বক্তৃতা রাখার পর পর্যালোচনা।

প্রস্তুতিপর্বের সাথে কয়েকটি বিষয় সম্পৃক্ত :

১. বক্তব্যের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ : কোনো সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার আগে বক্তব্যের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া বক্তৃতা অগোছালো হয়, এতে শ্রোতারা বেশি খোরাক পায় না।

বিষয়বস্তু নির্ধারণের আগে শ্রোতাদের অবস্থা জানা প্রয়োজন। শ্রোতাদের বয়স, একাডেমিক মান ও সমসাময়িক পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রোতাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতেন। তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেন, নামায। আরেক সময় একই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন পিতা-মাতার সেবা। আরেক সময় একই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

অন্য আরেক সময় একই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, প্রশ্নকারী কিংবা যে স্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই প্রশ্নের কয়েক ধরনের জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহর রাসূলের উপর উক্ত সুন্নাহ থেকে বোঝা যায়, শ্রোতাদের প্রয়োজনীয়তার আলোকে বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হয়।

২. বিষয়বস্তুর উপর ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ঃ আপনি যে বিষয়ে বক্তৃতা উপস্থাপন করবেন উক্ত বিষয়ের উপর ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। প্রস্তুতি গ্রহণের দু'টি দিক :

১. একাডেমিক প্রস্তুতি,

www.nagorikpathagar.com

২. উপকরণ যথা ওভারহেড, পাওয়ার পয়েন্ট, হ্যান্ড আউট ইত্যাদি। প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সেমিনারে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ১০ মিনিটের জন্য ৩০ মিনিটের বক্তৃতা প্রস্তুত করে রাখলে বক্তৃতা দেওয়ার সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলার সম্ভাবনা থাকে। তাই সময় অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। অতএব আগেই বক্তৃতা প্রস্তুত করে রাখা ভালো।

৩. বক্তৃতা মুখস্থ না করা ঃ মুখস্থ বক্তৃতা শ্রোতারা শুনতে চায় না, তাদের কাছে একঘেয়ে মনে হয়। শ্রোতারা কারো হৃদয় নিংড়ানো কথা শুনতেই ভালোবাসে। মুখস্থ বক্তৃতা শুনতে কৃত্রিম মনে হয়। অপরদিকে একাডেমিক প্রোগ্রামে মুখস্থ বক্তৃতা বেমানান। তাই বক্তৃতা মুখস্থ করার পরিবর্তে মূল পয়েন্টগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত।

৪. বক্তৃতা প্র্যাকটিস করা : বক্তৃতা প্রস্তুত করার পর পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সেমিনার বা আলোচনাসভায় বলার মৌলিক বিষয় কী। বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও নোট প্রস্তুত করার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা অনুশীলন করা দরকার। সম্ভব হলে অডিও/ভিডিও ক্যাসেটে ধারণ করে নিজের বক্তৃতা নিজে শোনা উত্তম। প্রথমত বক্তব্যের বিষয়বস্তুর আলোকে উপস্থাপিত বক্তব্যের পয়েন্ট ঠিক আছে কি না তার প্রতি খেয়াল করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত বক্তৃতা দেওয়ার সময় শরীরের অঙ্গভঙ্গি ঠিক ছিল কি না তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার :

১. পরিষ্কারভাবে শব্দচয়ন হয়েছে কি না, ২. স্বাভাবিক আওয়াজে কথা বলা হয়েছে কি না, ৩. খুব তাড়াহুড়া না করে আস্তে আস্তে বক্তৃতা রাখা ৪. বক্তৃতা দেওয়ার সময় চেহারা চিন্তামগ্ন ছিল কি না?

যদি কারো সামনে বক্তৃতা প্র্যাকটিস, করার সুযোগ হয় তাহলে শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার :

১. উপস্থাপিত কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন কি না? ২. বক্তৃতা দেওয়ার সময় সঠিক গতিতে বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়েছে কি না? ৩. বক্তৃতা আরও উন্নত করতে হলে কী করা দরকার?

প্রোগ্রামে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার প্রসঙ্গে

বক্তৃতা প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রোগ্রামে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। যেমন– ওভারহেড প্রজেক্টর কম্পিউটার প্রেজেন্টেশন ও হ্যান্ডস আউটের মধ্যে কোনটা করতে হবে তা আগেভাগেই জানা দরকার। কিছু দিন আগে লন্ডনে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে একজন আলোচক কম্পিউটার পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের সুযোগ নেন। এর ফলে বক্তার মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর তাঁর শ্রম ও সময় বৃথা যায়, শ্রোতারাও আধুনিক প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারেনি। তাই বক্তৃতা প্রস্তুতকালেই প্রোগ্রামে কোন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে তা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

www.nagorikpathagar.com

বক্তৃতা প্রদানের সময় লক্ষণীয় কতিপয় বিষয়

১. বক্তৃতা শুরুর আগে শ্রোতাদের দিকে তাকানো : বক্তৃতা শুরু করার আগে শ্রোতাদের প্রতি তাকিয়ে তাদের বসার পদ্ধতি এক নজর দেখে নেওয়া উত্তম।

২. ভূমিকাতেই মূল পয়েন্টগুলো বলা : ভূমিকা আকর্ষণীয় হওয়া দরকার যেন শ্রোতার মনে শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ভূমিকাতেই শ্রোতার মাঝে এই বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, আপনি যা বলছেন তা খুবই জরুরি।

৩. পর্যায়ক্রমে পয়েন্ট ব্যাখ্যা ও কথার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা : বক্তৃতা সাজানো-গোছানো হওয়া দরকার। তাহলে শ্রোতার পক্ষে বুঝতে সহজ হয়। এক্ষেত্রে পয়েন্টের ধারাবাহিকতা ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করা দরকার।

৪. নতুন কোনো তথ্য তুলে ধরা : বক্তব্যে এমন কিছু তথ্য তুলে ধরা যা শ্রোতাদের কাছে নতুন মনে হবে।

৫. উপসংহার : উপসংহারে হৃদয়গ্রাহী, চমৎকার কথা বলা। শেষ কথাগুলোই মানুষের মনে বেশি ভাসে। তাই কথা শেষ করার সময় মূল পয়েন্ট আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো।

৬. আত্মবিশ্বাস রাখা–নার্ভাস না হওয়া : অনেকেই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে নার্ভাস হয়ে পড়েন। এর ফলে জানা অনেক কথাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয় না। ইতঃপূর্বে সাজানো বক্তৃতা গুছিয়ে বলতে পারেন না। বক্তৃতা রাখার সময় নার্ভাস হয়ে পড়লে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা দরকার।

৭. হাসি-খুশি থাকা : সাধারণত বক্তৃতা রাখার সময় মুখে মিষ্টি হাসি থাকা দরকার। কিন্তু বক্তৃতা রাখার সময় কারো কারো মুখ এত ভারাক্রান্ত দেখা যায় যে, শ্রোতাদের মনে বক্তার প্রতি করুণা হয়।

৮. নোট ব্যবহার : সাধারণত বক্তব্যের বিষয়বস্তু অনুসারে বক্তব্যের আউটলাইন নির্ধারণ করা হয় এবং সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত করা হয়। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালে কখনও কখনও নতুন প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে বক্তব্যের নোট অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে যা বলার ইচ্ছা ছিল তা বলা হয় না, প্রদত্ত বক্তব্যের সাথে প্রস্তুতির মিল থাকে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে কখনও কখনও বক্তৃতা ভালো হয়, আবার কখনও খুবই খারাপ হয়। কারণ নতুনভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন হয়, তাই বক্তৃতা দেওয়ার সময় বক্তব্যের আউটলাইন ও নোট অনুসরণ করা ভালো। এই জন্য নোটের প্রতি মাঝে মধ্যে চোখ বুলাতে হয়, তবে নোট দেখে দেখে পড়া উচিত নয়। বই বা নোট দেখে দেখে পড়লে শ্রোতাদের শোনার আকর্ষণ কমে যাবে। অবশ্য সেমিনার কিংবা রিসার্চ স্টুডেন্টদের প্রবন্ধ দেখে দেখে পড়তে হয়।

www.nagorikpathagar.com

৯. শ্রোতাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা : বক্তৃতা দানকালে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা দরকার। এর ফলে শ্রোতাদের মতামত জানা যায় এবং শ্রোতাদের মনোযোগ কেমন ছিল তা-ও বোঝা যায়। এক্ষেত্রে একথা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, শ্রোতাদের কোনো প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে লজ্জিত হতে হবে। কোনো প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে শ্রোতাদের সামনে অকপটে এই কথা বলা ভালো যে, দুঃখিত! এই সম্পর্কে আমার জানা নেই।

১০. সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা : কাউকে কাউকে দেখা যায় সময়ের প্রতি আদৌ খেয়াল রাখেন না। বারবার স্লিপ দেওয়ার পরও বক্তৃতা সংক্ষেপ করেন না বা শেষ করেন না। ফলে শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তিভাব আসে। পরবর্তী বক্তাদের সময় কমে যায়। তাই প্রবন্ধ বা বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য আপনার সময় জেনে নিয়ে নিজে রেকর্ডিং করে সময় ভাগ করে নিন। কোনো সভা, সমাবেশ ও সেমিনার- সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা রাখার সময় সময়ের গুরুত্ব দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

১১. আগের বক্তার সাথে একমত/দ্বিমত পোষণ ঃ যেকোনো সেমিনার বা আলোচনাসভায় যারা বক্তৃতা রাখেন সকলের চিন্তা ও দর্শন এক হতে হবে এমনটি নয়। কখনও বক্তাদের পরস্পরের চিন্তার মিল থাকে। এই ক্ষেত্রে আগের বক্তার কথাকে সমর্থন করে নতুন কোনো তথ্য যোগ করতে হয়। তবে পুনরাবৃত্তি পরিহার করা উচিত। আবার কখনও পূর্ববর্তী বক্তার সাথে পরবর্তী বক্তাকে দ্বিমত পোষণ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আগের বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে হয় এবং দ্বিমত পোষণের কারণ যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে হয়।

১২. নিজেকে সবজান্তা মনে না করা : বক্তৃতা দেওয়ার সময় শ্রোতাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজে অনেক কিছু জানেন এমন ভাব প্রদর্শন করা ঠিক নয়। তবে আত্মবিশ্বাসের সাথে আবেদনময়ী ভাষায় বক্তৃতা উপস্থাপন করতে হবে।

১৩. নিজের গ্রেড নির্ধারণ ও নেতিবাচক কথা না বলা : নিজে অনেক কিছুই জানেন– এই ধরনের ভাব প্রকাশ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি বক্তৃতা প্রদানের সময় নিজের গ্রেড নিজে নির্ধারণ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : কেউ কেউ বক্তব্যের শুরুতে বলে থাকেন, আমি খুব একটা ভালো বক্তা নই, আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, বিভিন্ন ধরনের ব্যস্ততার কারণে বক্তব্যের প্রস্তুতি নিতে পারি নাই, প্রোগ্রামের আয়োজকরা আগেভাগে না জানানোর কারণে আমাকে উপস্থিত বক্তৃতা দিতে হচ্ছে ইত্যাদি। এসব বলা উচিত নয়।

১৪. সর্বশেষ কথা বারবার না বলা : সর্বশেষ কথা বলার পরই উপসংহার টানা উচিত। কেউ কেউ বক্তব্যের শেষে বলেন, "আমি এখন সর্বশেষ পয়েন্ট বলতে চাই"– এ কথা বলে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার পর আবার বলেন, "আমার সর্বশেষ কথা হচ্ছে।" এরপরও দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর যতবারই বলেন, শ্রোতারা আর বিশ্বাস করতে পারে না। সর্বশেষ কথা বক্তৃতা দেওয়ার শেষ লগ্নে একবারই বলা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

বক্তৃতা পর্যালোচনা : আপনি কোথাও বক্তৃতা রাখার পর শ্রোতাদের কারো মাধ্যমে বা নিজেই নিজের বক্তৃতা পর্যালোচনা করতে পারেন। ভবিষ্যতে আরও সুন্দরভাবে বক্তৃতা করার জন্য আত্মপর্যালোচনা জরুরি। পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি পয়েন্ট নিচে দেওয়া হলো :

বক্তব্যের বিষয় : স্থান : তারিখ :

আত্মপর্যালোচনার পয়েন্ট	রেটিং ১/২/৩/৪	ভবিষ্যতে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়
বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি কি নেওয়া হয়েছিল?		
বক্তৃতা রাখার সময় সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে কি না?		
যে সকল পয়েন্ট বলা হয়েছে তা কি বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত ছিল?		
বক্তৃতা রাখার সময় লজ্জা বা নার্ভাস হয়েছি কি না?		
শ্রোতারা কি মনোযোগের সাথে বক্তৃতা শুনেছে?		
শ্রোতাদের সাথে ভাবের বিনিময় হয়েছে?		
ভয়েস সুস্পষ্ট ছিল কি না?		
ওভারহেড বা অন্য ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে কি না?		
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করা হয়েছে কি না?		
সর্বশেষ উপসংহার টানা সম্ভব হয়েছে কিনা?		
বক্তৃতা রাখার সময় ভালো কোনো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কি না?		
শ্রোতাদের সাথে চোখের যোগাযোগ ঠিক ছিল কি না?		
একটি পয়েন্টের সাথে আরেকটি পয়েন্টের ধারাবাহিকতা ছিল কি না?		
শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর সন্তোষজনক ছিল কি না? ভিন্নমত পোষণকারীদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল কিনা?		
বক্তব্যের মূল কথা শ্রোতারা বুঝতে পেরেছে কি না?		
বডি ল্যাংগুয়েজ যথাযথ ছিল কি না?		

১. ভালো নয়, ২. মোটামুটি, ৩. ভালো, ৪. খুবই ভালো

www.nagorikpathagar.com

নবম অধ্যায়

পরীক্ষার টেকনিক

পরীক্ষা কী : ছাত্রজীবনে 'পরীক্ষা' শব্দটি খুবই পরিচিত। পরীক্ষা হচ্ছে মেধা যাচাই ও পড়াশোনার অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যম। যদিও কখনও কখনও সময় একজন ভালো ছাত্র পরীক্ষার সময় ঘাবড়ে গিয়ে খারাপ করে, অথচ তার চেয়ে কম মেধার ছাত্র ভালো রেজাল্ট করে।[১] এ ধরনের কিছু বাস্তব ঘটনা থাকলেও পরীক্ষার মাধ্যমেই অগ্রগতি মূল্যায়ন হয়। কেউ পরীক্ষায় পাস না করলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এ কারণে পরীক্ষাকে কেউ কেউ এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন :

The way people connected with schools or other aspects of your life evaluate your performance. Exams are also a way of informing you of your current progress and ability.[২]

পরীক্ষার প্রকারভেদ : পরীক্ষা অনেক ধরনের ও অনেকভাবে হতে পারে। একে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- Objective and Subjective Exams.

Objective Exams : যদিও আগে Subjective Exams-এর প্রচলন বেশি ছিল; কিন্তু বর্তমানে Objective Exam-এর প্রচলন বেশি। বিশেষত O Level, A Level, IELTS, TOFEL, GMAT -সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র Objective হয়। Objective প্রশ্নের ধরন নিম্নরূপ :

১. সত্য/মিথ্যা (True/False) : কোনো একটি স্টেটমেন্ট সত্য কি মিথ্যা তা শুধু টিক চিহ্ন দিতে হয়।

২. একাধিক উত্তর (Multiple Choice) : সাধারণত কোনো একটি প্রশ্নের সম্ভাব্য একাধিক উত্তর ক. খ. গ. ঘ. এভাবে দেওয়া থাকে। একাধিক উত্তর থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করে টিক চিহ্ন দিতে হয়।

৩. সঠিকভাবে শব্দ বা বাক্য সমন্বয় সাধন করা (Matching) : সাধারণত দু'টি লিস্ট দেওয়া থাকে। একটা লিস্টে যে প্রশ্ন থাকে, বিপরীত পার্শ্বে তার উত্তর থাকে। কিন্তু তা এলোমেলোভাবে থাকায় সঠিক উত্তর খুঁজে বের করে সঠিকভাবে শব্দ বা বাক্য সাজাতে হয়।

---

১. পরীক্ষা হলো ভাগ্যের ব্যাপার। পরীক্ষায় আদৌ পড়া হয়নি এমন প্রশ্নও আসতে পারে। পরীক্ষকের মানসিকতার উপর ভাল নম্বর পাওয়া না পাওয়া নির্ভরশীল।

২. Abid. Famanoff, Majorie Reinwald, P 118.

www.nagorikpathagar.com

৪. শূন্যস্থান পূরণ করা (Fill-in-the-blank) : সাধারণত নিজের স্মৃতি বা প্রশ্নপত্রে দেওয়া তালিকা থেকে সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়।

Subjective Exams : Subjective Exam-কে Essay exam বা রচনামূলক পরীক্ষাও বলা হয়। এতে কোনো একটি বিষয়ের উপর পড়াশোনা করার পর ব্যক্তি কতটুকু অনুধাবন করেছে সেটা তার স্মৃতিশক্তি থেকে লিখতে হয়।

এতে নিজের চিন্তা ও ধারণাও যোগ করার সুযোগ থাকে। Subjective Exams-এর প্রশ্নপত্রে কখনও কোনো বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা (Comprarative), কখনও বৈসাদৃশ্য (contrast), কখনও কোনো কিছু সংজ্ঞায়িত করা (define), কখনও বর্ণনা করা (describe), কখনও আলোচনা করা (discuss) কখনও ব্যাখ্যা করা (Explain), আর কখনও (Illustrate) আর কখনও Justify, কখনও Outline, কখনও Review কখনও সারাংশ লেখা (Summarize) আর কখনও পর্যালোচনা (Evaluate or analize) করতে দেওয়া হয়।

পরীক্ষার সফলতার জন্য প্রয়োজন

১. পরীক্ষায় সফলতা কেন প্রয়োজন তা পরিষ্কার থাকা ও ভালো করার পরিকল্পনা নেওয়া : পরীক্ষায় কেন সফলতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন তা পরিষ্কার থাকা দরকার। পরীক্ষায় সফলতা লাভের প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার থাকলেই সফলতা লাভ করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। পরীক্ষায় পাস না করলেও অসুবিধা নেই, এ ধরনের মানসিকতা কোনো ছাত্র-ছাত্রীর মনে থাকলে তার পক্ষে রাতদিন পরিশ্রম করে পরীক্ষা পাসের জন্য কাঙ্ক্ষিত মানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে পরীক্ষায় ভালো করার পরিকল্পনা নিন। কারণ পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। তাই বছরের শুরু থেকেই প্রস্তুতি নিন।

পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্যালোচনা : পরীক্ষার সফলতার জন্য পরীক্ষায় ভালো প্রস্তুতি নিতে হয়। এজন্য নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া দরকার :

পরীক্ষার বিষয় : পরীক্ষার তারিখ :	শিক্ষকের নাম : পরীক্ষার স্থান ও সময় :
পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ নির্দেশিকা	
যে সকল উপকরণ থাকা জরুরি	টেক্সট বই আগের পরীক্ষার প্রশ্নমালা লেসন নোট
পরীক্ষার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি দরকার	
স্টাডির সময়সূচি পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট উপকরণ কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হবে	
পরীক্ষায় কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত সময়
পরীক্ষার হলে যে সকল জিনিস নিতে হবে	কলম, পেন্সিল ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.com

২. আমি ভালো করবই এই আত্মবিশ্বাস থাকা : পরীক্ষায় ভালো ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী থাকা দরকার। আমার কাছে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমাজের প্রত্যাশা অনেক– "আমি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করবই ইনশাআল্লাহ।" বছরের শুরু থেকেই এই আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, "আমি পরীক্ষায় ভালো করবই।" কোনো কোনো ছাত্র সেশনের শুরু থেকেই মনে করে যে, পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে না। তাই আর ভালোভাবে পড়াশোনা করে না। নেগেটিভ মনোভাবের কারণে পরীক্ষায় ভালো, করে না। পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর দেখা যায় অল্প কয়েক মার্কের জন্য প্রথম বিভাগ পায়নি। যদি ভালো রেজাল্ট করার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে পড়াশোনা করতো তাহলে নিশ্চয়ই ভালো করতো।[৩]

পরীক্ষায় ভালো করার আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো তবে অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়া ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার পক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া সহজ হলে একটু চেষ্টা করলে প্রথম বিভাগ পেতে পারেন। কিন্তু সকল বিষয়ে স্টার মার্ক পাওয়া কঠিন হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি অনায়াসে প্রথম বিভাগ পাওয়ার মতো ছাত্র হন তাহলে ভালো করে চেষ্টা করলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারেন।

অতীতে যারা ভালো রেজাল্ট করেছেন তারাও আপনার মতো মানুষ। মাঝে মধ্যে তাদের কথা ভাবতে হবে। বিশেষত পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ ভালো রেজাল্ট করে থাকলে তাঁদের কথা স্মরণ করে চিন্তা করতে হবে, তাঁরা ভালো রেজাল্ট করতে পারলে আপনি কেন ভালো করতে পারবেন না? আপনাকে ভালো রেজাল্ট করে মেধার প্রমাণ দিতেই হবে।

কোনো কোনো ছাত্র মনে করে, গভীর জ্ঞান থাকলেই চলে, ভালো রেজাল্টের দরকার কী? আমি এই ধরনের কথার সাথে পুরোপুরি একমত নই। কারণ রেজাল্ট ভালো না থাকলে অনেক সময় ভালো জায়গায় চাকরির আবেদন করা যায় না। 'এ লেভেল' পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট না হলে ভালো সাবজেক্টে উচ্চ শিক্ষা নেওয়া যায় না। তাই রেজাল্টের গুরুত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারো মেধা আছে তার বাহ্যিক প্রমাণ হচ্ছে রেজাল্ট। তবে এ কথা ঠিক যে, যোগ্যতাবিহীন রেজাল্ট অনেক সময় ব্যক্তির জন্য অপমানজনক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভালো রেজাল্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করার পাশাপাশি ভালো যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

---

৩. আমার কয়েকজন বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র ছিল। যখন বয়োজ্যেষ্ঠ একজন তাদের প্রশ্ন করলো, "আপনারা কে কে ফার্স্ট হওয়ার জন্য পড়াশোনা করেন?" তখন তারা বলে উঠলেন, আমাদের মধ্যে অমুককে ফার্স্ট হওয়ার সুযোগ দিয়েছি। তাই আমরা ফার্স্ট হওয়ার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করছি না। এভাবে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ফার্স্ট হওয়ার সুযোগ দিয়ে কম পড়াশোনার ফল এই হলো যে, যিনি বললেন অমুককে ফার্স্ট হওয়ার সুযোগ দিয়েছি তিনি অল্প কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণী পাননি। আর যাকে প্রথম হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন তিনি প্রথম হতে পারেননি। যদি দুই বন্ধুই প্রথম হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন তাহলে দ্বিতীয় বন্ধু অল্প কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ থেকে বঞ্চিত হতেন না। হয়তবা দুই বন্ধুই প্রথম ও দ্বিতীয় হতেন।

www.nagorikpathagar.com

আপনাকে আপনার **জীবনের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে**। আপনি ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কিছু হতে চান। আপনি যা-ই হতে চান তা হতে হলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট না করলে মেডিক্যাল সাইন্স পড়ার সুযোগ পেয়েও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কারণ অনেক ছাত্রছাত্রী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর খারাপ রেজাল্ট করার কারণে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারে না। তাই জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্যই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

আপনি ভালো রেজাল্ট করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে মনে মনে ভালো ফল করার পুলক অনুভব করুন। মাঝে মধ্যে নিজের মনে নিজে ভালো রেজাল্ট করার পুলক অনুভব করা ভালো। সাধারণত যা পেলে মন উৎফুল্ল হয় তা পাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল থাকে। আপনি যদি ভাবেন, যারা ভালো ফল করে তাদের হাসিমাখা ছবি পত্রিকায় কীভাবে আসে, তাদের সাক্ষাৎকার পত্রিকায় ছাপা হয়, তাদের মা-বাবা কত খুশি হন। তাদের অনেক উপহার- উপঢৌকন দেন। আর যারা খারাপ ফল করে শুধু তাদের চেহারা মলিন থাকে না, তাদের পিতা-মাতার চেহারাও মলিন হয়ে যায়। তারা কাউকে রেজাল্ট বলতে চায় না।

আপনি আত্মবিশ্বাসী থাকুন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কোনো কোনো ছাত্র পরীক্ষা আতঙ্কে ভোগেন, দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতে হয়। পরীক্ষা আতঙ্কে ঘুম না হলে পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো হয় না। তাই পরীক্ষাভীতি কমিয়ে অধিক পড়াশোনা করতে হবে এবং পরীক্ষাকে সহজভাবে গ্রহণ করে সিরিয়াস প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩. পরিকল্পিত ও সাজানো-গোছানো জীবনযাপন করুন : পরীক্ষায় ভালো করতে হলে আপনার জীবন সাজানো-গোছানো হতে হবে। জীবন সুন্দর না হলে সুন্দরভাবে পড়াশোনা করা যায় না। আর ভালোভাবে পড়াশোনা করতে না পারলে ভালো রেজাল্ট করা যায় না। যেসব ছাত্রছাত্রী ভালো রেজাল্ট করে, তাদের জীবন খুবই সাজানো-গোছানো থাকে, তারা যথাযথভাবে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগায়। এ জন্য **বছরের শুরু থেকেই পড়াশোনা করতে হয়**। কাউকে কাউকে দেখা যায় বছরের শুরু থেকে হেসে খেলে সময় কাটায়। পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ আগে রাত জেগে পড়াশোনা শুরু করে। এমনকি খাওয়া, ঘুম সবকিছু ত্যাগ করে সারাদিন পড়তে থাকে। এর ফলে হঠাৎ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। অনিয়মিত ঘুম ও আহারের জন্য শরীর খারাপ হয়ে পড়ে।

৪. প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ থাকা : প্রয়োজনীয় বই ও আনুষঙ্গিক উপকরণাদি না থাকলে ইচ্ছা করলেও ভালোভাবে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। এর ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তাই সেশনের শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

৫. নিজেকে সবজান্তা মনে না করা : যারা যে বিষয়ে দক্ষ তাদের সে বিষয়ে সহযোগিতা চাওয়া দরকার। একজন ভালো ছাত্র সকল বিষয়ে ভালো না-ও হতে পারে। ক্লাসে কোনো ছাত্র কোন বিষয়ে ভালো তা জানা ও তার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে তার কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া দরকার। নিজেকে সবজান্তা মনে করা ঠিক নয়। এতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিপক্বতা থেকে যায়। তাই ভালো ছাত্রছাত্রীদের গর্ব-অহংকার থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। কারণ আল্লাহ্ তাআলা গর্ব-অহংকার পছন্দ করেন না। পড়াশোনায় ভালো বলে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের অবমূল্যায়ন করা ঠিক নয়। ক্লাসে যে ছাত্রটি বরাবরই খারাপ রেজাল্ট করে, হতে পারে অধিকাংশ বিষয়ে ভালো না করার কারণে সে আপনার চেয়ে খারাপ পজিশনে আছে, আর আপনি অধিকাংশ বিষয়ে ভালো করার কারণে ভালো রেজাল্ট করেছেন। কিন্তু যে ছেলেটি অধিকাংশ বিষয়ে খারাপ রেজাল্ট করে সে কোনো একটি বিষয় আপনার চেয়েও ভালো বুঝতে পারে এবং উক্ত বিষয়ে আপনার চেয়েও বেশি নম্বর পেতে পারে। তাই তার কাছ থেকেও আপনার শেখার অনেক কিছু আছে।

৬. অতীতে যারা ভালো রেজাল্ট করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা নেওয়া : অতীতে যারা ভালো রেজাল্ট করেছেন মাঝেমধ্যে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের অভিজ্ঞতা নেওয়াও ভালো ফলাফলের জন্য জরুরি। অনেক সময় দেখা যায় একটি বই দশবার পড়ে যা বোঝা যায় অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে উক্ত বিষয়ে দু-একটি কথা শুনলে তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতীতে যারা ভালো রেজাল্ট করেছেন তারা কোন টেকনিক অবলম্বন করেছেন, তাদের ভালো রেজাল্ট করার পেছনে মৌলিক কারণ কী ছিল তা জানা ও সে অনুযায়ী চেষ্টা করা দরকার। পড়াশোনার সময় তারা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে তা সমাধান করেছেন তাও জানা দরকার। এর ফলে নিজের সমস্যা সমাধান সহজ হয়।

৭. নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি ও মনোযোগ সহকারে লেকচার শোনা : নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি পরীক্ষায় ভালো করার জন্য খুবই জরুরি। ক্লাসে শিক্ষকের ক্লাস লেকচার মনোযোগ সহকারে শোনা দরকার। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে :

১. লেকচারের বিষয়,
২. কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন,
৩. কীভাবে উপসংহার টেনেছেন,
৪. কী ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন,
৫. কী কী মৌলিক পয়েন্ট বলেছেন। এক্ষেত্রে মূল পয়েন্ট ও সাব-পয়েন্ট কি ছিল তা জানা,
৬. বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মন্তব্য কী ছিল এবং তিনি অন্য কারো মতামত তুলে ধরলে কার কার মতামত তুলে ধরছেন এবং তারা কে কী বলেছেন। উল্লেখ্য, ক্লাস লেকচার বোঝার জন্য ক্লাসে যাওয়ার আগে উক্ত বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করা ভালো। এই জন্য কোনো বিষয়ের লেকচার শেষ

www.nagorikpathagar.com

হলে পরবর্তী লেকচারের বিষয় ভালোভাবে শোনা ও তা স্মরণ রাখা দরকার। শিক্ষকের লেকচার ভালোভাবে বোঝার জন্য ভালোভাবে শোনা দরকার। তারপরও কয়েক কারণে ক্লাসে নোট করার সাথে সাথে সম্ভব হলে রেকর্ডিং করা যেতে পারে। তাহলে ক্লাসের পর ক্লাস লেকচার আবার শোনা যায় এবং ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পরীক্ষায় ভালো করতে হলে ক্লাসে উপস্থিতির পাশাপাশি কোর্সওয়ার্ক ভালো করে করতে হবে এবং টিউটোরিয়ালে শিক্ষকের মন্তব্য ভালোভাবে পড়তে হবে। বিভিন্ন সময় ক্লাসের হোমওয়ার্ক করতে হয়। কখনও কখনও টিউটোরিয়াল লিখতে হয়। সাধারণত শ্রেণীশিক্ষক কোর্সওয়ার্ক ও টিউটোরিয়াল দেখে মার্ক প্রদান করেন এবং মন্তব্য লিখেন। এসব মন্তব্য পড়ে শিক্ষকের নির্দেশনানুসারে কাজ করা দরকার।

৮. ভালো রেজাল্ট করার জন্য চারটি জিনিস ভালোভাবে জানা থাকা : চারটি বিষয় হচ্ছে : ক. সিলেবাস, খ. মার্কিং স্কিম, গ. মডেল পরীক্ষা, ঘ. অতীতের প্রশ্নপত্রের ধরন। সিলেবাস না জানলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব নয়। আর মার্কিং সিস্টেম না জানলে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তা উপলব্ধি করা যায় না। এর ফলে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয় না।

ক. সিলেবাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা : এমন অনেক ছাত্র আছে তারা সিলেবাস সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল থাকে না। ক্লাসে যতটুকু পড়ানো হয় ততটুকুর উপরই নির্ভরশীল থাকে। ফলে কোনো প্রশ্ন ক্লাসে পড়া বইয়ের থেকে এলে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। পরীক্ষায় ভালো করতে হলে সিলেবাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকতে হবে। যেন জানার বাইর থেকে কোনো প্রশ্ন না আসে। সিলেবাসকে এ. বি. সি. –এইভাবে তিন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে পড়াশোনা করা উত্তম। এ- হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ- যে ব্যাপারে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। বি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ– যতটুকু সম্ভব ভালো প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। আর সি হচ্ছে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ– এ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকাই যথেষ্ট। এইভাবে পুরো সিলেবাসকে তিন ভাগে ভাগ করে পড়াশোনা করলে পরীক্ষায় সকল প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়।

খ. পরীক্ষার মার্কিং সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা থাকা : পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের ধরন ও মান সমান থাকে না। তাই পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও নম্বর দেওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। কখনও কখনও দেখা যায় ৫ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর যত গুরুত্বের সাথে ভালোভাবে শেখা হয় সে তুলনায় ২০ নম্বরের উত্তরের প্রতি খেয়ালই থাকে না। কখনও কখনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কয়েক ভাগে বিভক্ত থাকে। কোন ভাগে কোন ধরনের প্রশ্ন থাকে সে সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার থাকা ভালো।

গ. মডেল/ট্রায়াল পরীক্ষা : এক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ :

১. নির্দেশনা ভালোভাবে পড়া,
২. সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া,
৩. সঠিক প্রশ্ন বাছাই করা,

www.nagorikpathagar.com

৪. কোনো প্রশ্ন ভুল বুঝলে তা পরিষ্কার হওয়া,
৫. কোনো প্রশ্নোত্তর বেশি লম্বা বা খুব সংক্ষিপ্ত হলো কি না,
৬. কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ পড়েছে কি না,
৭. উত্তর শেষ করার আগে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কি না,
৮. উত্তর চেক করা হয়েছে কি না,
৯. রিভিশন না দেওয়ার কারণে স্মরণ থেকে হারিয়ে গেছে কি না,
১০. ভুল উত্তর দেওয়া হয়েছে কি না।

ঘ. প্রশ্ন ব্যাংক : আপনি যে বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন উক্ত বিষয় অতীতে পরীক্ষা হয়ে থাকলে সম্ভাব্য সকল প্রশ্নমালা সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। আপনি বিভিন্ন সময়ের প্রশ্নমালা সংগ্রহ করে একটি 'প্রশ্ন ব্যাংক' বানাতে পারেন। উক্ত প্রশ্ন ব্যাংক থেকে ধারণা নিয়ে নিজেই নিজের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করুন এবং উত্তর লেখার চেষ্টা করুন। এরপর নিজেই নিজের উত্তরমালা দেখে মার্কিং করুন। এইভাবে প্রশ্নমালা তৈরি করুন এবং উত্তর লেখার চর্চার মাধ্যমে পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালোভাবে নিতে পারেন। প্রশ্ন ব্যাংক দেখে যেসব প্রশ্নের উত্তর বের করা একটু জটিল তা বারবার চর্চা করা দরকার। আপনার সহপাঠী অন্য ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকেও প্রশ্ন তৈরি এবং আপনার চর্চা পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতে পারেন।

অতীতের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ যতটুকু সম্ভব দ্রুত সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে বছরের শুরু থেকেই পরীক্ষার প্রশ্নমালা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়। কোনো প্রশ্ন বুঝে না এলে তার জন্য চিন্তিত হবেন না। সময়ের ব্যবধানে সকল প্রশ্নই আপনার বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য প্রবলেম ব্যাংক ও প্রবলেম সলভিং সিন্ডেকেট করুন।

পরীক্ষার প্রশ্নমালা তৈরি করে নিজের পরীক্ষা নিজে নেওয়ার সময় আপনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা আলাদা কাগজে লিখে রাখুন। এইভাবে সমস্যাসমূহকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারেন : কিছু সমস্যার সমাধান পড়াশোনা করে নিজেই বের করতে পারবেন, আর কিছু সমস্যার সমাধান অন্য ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পেয়ে যাবেন, আর কিছু সমস্যা সমাধানে শিক্ষকের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। অন্য ছাত্রছাত্রীর সাথে আলোচনা করে যেসব সমস্যার সমাধান সম্ভব তার জন্য 'প্রবলেম সলভিং সিন্ডেকেট' তৈরি করা যায়। প্রবলেম সলভিং সিন্ডিকেট আলাদা কোনো সংস্থা নয়, এটা স্টাডি গ্রুপেরই আরেক নাম।

৯. রিভিশন : শুধু পরীক্ষার আগে নয়, সব সময় রিভিশন দেওয়া ভালো। তবে পরীক্ষার আগে রিভিশন ভালো ফলাফলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার পর্যাপ্ত সময় বাকি থাকতে রিভিশন শুরু করা দরকার। কারণ পরীক্ষার সামান্য সময় আগে রিভিশন শুরু করলে মানসিক চাপে থাকতে হয়। শিক্ষাবিদগণ রিভিশনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. ত্বরিত রিভিশন (Immediate revision) পড়ার পরপরই রিভিশন দেওয়া।

www.nagorikpathagar.com

২. ধারাবাহিক রিভিশন (Maintanance revision) ক্লাস ও পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে রিভাইজ করা। সাধারণত কোনো কিছু পড়ার পর চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরপর রিভিশন দেওয়া ভালো। তাহলে বিষয়টি মুখস্থ থাকে।

৩. ফাইনাল রিভিশন (Terminal Revision) পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে সর্বশেষ রিভিশন। পরীক্ষা একেবারে কাছে এলে ফাইনাল রিভিশন দিতে হয়। এই সময় শুধু মৌলিক পয়েন্টগুলো ভালোভাবে স্মরণ রাখার চেষ্টা করা উত্তম।

রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি পরামর্শ

১. রিভিশন শুরু করার আগে পরীক্ষা পর্যন্ত কত সময় হাতে আছে সে হিসাব কষতে হবে এবং কোন বিষয়/অধ্যায় কখন রিভিশন করতে হবে সেই পরিকল্পনা নিতে হবে। তারপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিভিশন শুরু করতে হবে।

২. প্রথমবার পুরো প্রশ্নোত্তর রিভিশন করা দরকার। তারপর মুখস্থ উত্তর লেখা ভালো। পরবর্তী সময় পুরো প্রশ্নোত্তর রিভিশন করার চেয়ে শুধু সারাংশ রিভিশন দেওয়া যেতে পারে। সর্বশেষ রিভিশনের সময় শুধু মৌলিক পয়েন্টসমূহ দেখাই যথেষ্ট।

৩. একা একা রিভিশন করার চেয়ে অন্য কোনো ছাত্রের সাথে মিলে রিভিশন করা ভালো। এভাবে রিভিশন করলে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং পরস্পরের দুর্বলতা নির্ণয় করা সহজ হয়।

৪. রিভিশনের সময় কোনো প্রশ্নের উত্তর হুবহু মনে থাকলে তার জন্য খুশি হওয়া উচিত।

৫. রিভিশনের সময় নিজেকে নিজে টেস্ট করা দরকার।

রিভিশন পর্যালোচনা

হ্যাঁ না		
পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি না?		
সর্বমোট কতটি অধ্যায়/প্রশ্ন রিভাইজ করতে হবে তার তালিকা আছে কি না?		
রিভাইজ করার জন্য বাস্তবসম্মত সময়সূচি করা হয়েছে কি না?		
অতীত পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নমালা আছে কি না?		
পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী উত্তর লেখার চর্চা করা হয়েছে কি না এবং লেখার গতি ঠিক আছে কি না?		
পরীক্ষার রাতে রিভাইজ করার জন্য মূল পয়েন্টসমূহ তৈরি আছে কি না?		
বন্ধুবান্ধবের সাথে রিভাইজ সেশন করা হয়েছে কি না?		
রিভাইজ দেওয়ার পর এখনও পরীক্ষাভীতি আছে কি না?		

www.nagorikpathagar.com

পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা

	হ্যাঁ	না	আবার দেখা দরকার
পরীক্ষার নির্দেশিকা ভালভাবে পড়া হয়েছে কি না?			
সঠিকভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রস্তুতি শেষ হয়েছে কি না?			
সময় অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর লেখার চর্চা হয়েছে কি না?			
কোন ধরনের প্রশ্ন কত সময়ে লিখতে হবে তা পরিষ্কার কি না?			
অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলির সর্বোত্তম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে কি না?			
পরীক্ষায় লেখার স্টাইল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে কি না?			
অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা যেন লেখা না হয় সেভাবে প্রশ্নোত্তর শেখা হয়েছে কি না?			
মডেল পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে কি না?			
মডেল টেস্টের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে কি না?			
পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ আছে কি না?			
পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে হবে এমনসব উপকরণ প্রস্তুত আছে কি না?			

পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কতিপয় পরামর্শ

১. পরীক্ষার স্থান জানা : পরীক্ষার স্থান ও রুম নম্বর আগেই জেনে নেওয়া উচিত। সম্ভব হলে পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখের আগে পরীক্ষার স্থান, পরীক্ষার হলের নিকটবর্তী টয়লেট রুম, পানি পানের ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখে আসা উত্তম। তাহলে পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হলের পরিবেশ স্বাভাবিক মনে হবে এবং একান্ত প্রয়োজন হলে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে সমস্যা হবে না।

২. পরীক্ষার সময় জানা : পরীক্ষার আগের দিন পরীক্ষার সময়সূচি আবার ভালোভাবে দেখে নেওয়া দরকার।

৩. পরীক্ষার রাতে অধিক না জাগা : পরীক্ষার রাত বেশি সময় জাগ্রত থাকার চেয়ে পরিমিত ঘুমানো উচিত, যাতেকরে পরীক্ষার সময় ঘুমের ভাব না থাকে এবং মস্তিষ্ক শান্ত থাকে। পরীক্ষার রাতে অধিক রাত জেগে পড়াশোনার কারণে কারো কারো বমি বমি ভাবও থাকে, যার কারণে ভালোভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৪. উদ্বেগমুক্ত ফাইনাল রিভিশন : সাধারণত পরীক্ষার রাতেই ফাইনাল রিভিশন দেওয়া হয়। ফাইনাল রিভিশন দেওয়ার সময় কোনো কিছু মনে না এলে অথবা অতি জানা কোনো বিষয় ভুলে গেলে কিংবা কোনো প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করা একেবারেই বাদ পড়ে

www.nagorikpathagar.com

গেলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া ঠিক নয়। এতে সময় অপচয় হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। উদ্বিগ্ন হলে অজানা বিষয় জানা হয়ে যায় না, বরং জানা বিষয় আরও ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরীক্ষার রাতে উদ্বেগমুক্ত রিভিশন দেওয়া উত্তম।

৫. পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম : পরীক্ষার আগের রাতে শরীর ও মনকে পরিমিত বিশ্রাম দেওয়া দরকার। পড়তে পড়তে মাথা জ্যাম করে পরীক্ষার হলে যাওয়ার চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষার হলে যাওয়া উত্তম।

৬. পারিবারিক বা অন্যকোনো সমস্যা না জানানো : পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর প্রতি পরিবার ও সহপাঠীদেরও দায়িত্ব রয়েছে। পরীক্ষার্থীকে এমন কোনো সমস্যার কথা জানানো উচিত নয়, যা শুনলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে কিংবা দুশ্চিন্তায় পড়াশোনা হবে না।

৭. খোলা ময়দান বা সবুজ আকাশের নিচে বসে মন প্রফুল্ল রাখুন : পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের শেষ পর্যায়ে কিছু সময় খোলা ময়দানে বসে সবুজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মনকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করা দরকার। কারণ মন যদি প্রফুল্ল না থাকে ভালো পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষার সময় মন-মেজাজ ভালো রাখার জন্য সকল ধরনের চেষ্টা করা উচিত।

পরীক্ষার দিন করণীয়

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে রাখা : পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে থাকা প্রয়োজন। কখনও কখনও শোনা যায়, কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী প্রবেশপত্র বা পরীক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাগজ বাসায় ফেলে চলে যায়। ফলে পরীক্ষার হলে ঢুকেই মানসিক বিড়ম্বনার শিকার হয়। কেউ কেউ একেবারে নতুন কলম নিয়ে পরীক্ষার হলে চলে যান। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর লেখা শুরু করতেই দেখা যায় যে কলমটি ব্যবহার উপযোগী নয়। এভাবে পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত উপকরণাদি ঠিকমতো না থাকলে পরীক্ষার্থীর মন-মেজাজ খারাপ হয়ে পড়ে। তাই পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে এইসব কিছু চেক করা ভালো। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলম, পেন্সিল, রাবারসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন– প্রবেশপত্র সাথে রাখা দরকার।

২. রুচিসম্মত খাবার : রুচিসম্মত খাবার খাওয়া দরকার। কোনো কোনো সময় দেখা যায় কেউ টেনশনে খেতে পারে না। আবার কেউ এমন জিনিস খায়, যার কারণে অস্বস্তি লাগে।

৩. আরামদায়ক পোশাক : এমন পোশাক পরিধান করা দরকার, যা পরতে আরামবোধ হয়। পরিধেয় পোশাক আরামদায়ক না হলে শরীরে অস্বস্তি লাগে, যার কারণে পরীক্ষার উত্তর লিখতে অসুবিধা হয়।

৪. টয়লেট ব্যবহার : পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে টয়লেট সেরে নেওয়া উত্তম, যাতে পরীক্ষার হলে যাওয়ার পর টয়লেটের প্রয়োজন না হয়। কারণ পরীক্ষার হলে টয়লেটের প্রয়োজন হলে অনেক মূল্যবান সময় অপচয় হবে।

৫. নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে পৌঁছা : পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের আধা ঘণ্টা আগে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছা উত্তম। তাহলে একটু রেস্ট নিয়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.com

পরীক্ষার হলে করণীয়

১. নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়ুন : সাধারণত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কিছু নির্দেশিকা দেওয়া থাকে। উক্ত নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়া প্রয়োজন। পরীক্ষার্থীকে রোল নম্বরসহ যে সকল তথ্যাদি লিখতে হয় তা ভালোভাবে লেখা দরকার এবং চেক করা দরকার। কখনও কখনও দেখা যায়, পরীক্ষার উত্তরপত্রে রোল নম্বর লেখা না থাকার কারণে অনেক ভালো পরীক্ষা দিয়েও নম্বর পাওয়া যায় না। আবার কখনও কখনও নিজের নম্বরের পরিবর্তে আরেক জনের নম্বর লিখে দেওয়া হয়। এর ফলে দু'জনেরই ফলাফল স্থগিত থাকে।

২. উত্তরপত্র দেখে নিন : আপনাকে যে উত্তরপত্র দেওয়া হয়েছে তা যথাযথ কি না তা আগেভাগে দেখে নিন। কোনো কোনো সময় উত্তরপত্র ছেঁড়া থাকে বা পিন খোলা থাকে। এই ধরনের উত্তরপত্র জমা দিলে অসদুপায় অবলম্বন করা হয়েছে বলে পরীক্ষক সন্দেহ করতে পারেন।

৩. প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ুন : আপনাকে কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা দেখে নিন। প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে, না অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে? অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকলে আপনার কাছে অধিক সহজ প্রশ্নগুলোতে টিক চিহ্ন দিন। প্রশ্ন দেখার সময় ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন এমন কোনো প্রশ্ন আছে কি না, যার জবাব দেওয়া বাধ্যতামূলক। কখনও কখনও দেখা যায়, ভালোভাবে প্রশ্নপত্র না দেখার কারণে বাধ্যতামূলক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়।

৪. উত্তর লেখার জন্য সময় বণ্টন : প্রশ্ন সিলেক্ট করার পর এবার সময় বণ্টন করুন। কারণ কাউকে কাউকে অল্প নম্বরের জন্য অধিক আর অধিক নম্বরের জন্য অল্প লিখতে দেখা যায়। আবার কখনও সময় বণ্টন না করার কারণে দু'একটি প্রশ্নোত্তর লিখতে অধিক সময় চলে যায়। ফলে অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব সংক্ষেপে লিখতে হয় কিংবা কোনো প্রশ্নের উত্তর লেখা বাদ পড়ে যায়। আপনাকে মনে রাখতে হবে, যে সকল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তার কোনো একটির উত্তর লেখা বাদ পড়লে আপনি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শূন্য পাবেন। আর কোনো প্রশ্নের উত্তর যতই ভালো লিখুন না কেন তাতে নির্দিষ্ট নম্বরের চেয়ে তো বেশি পাবেন না। মনে করুন পাঁচটি প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর। আপনি তিনটি প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে লেখার জন্য ৩০ নম্বরও যদি পান বাকি দুইটি প্রশ্নের জবাব না লেখার জন্য কোনো নম্বর পাবেন না। ফলে আপনার নম্বর হবে ৩০। তার বিপরীতে আপনার চেয়ে একটু খারাপ লিখেও আরেকজন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব লেখার কারণে গড়ে সাত নম্বর করে পেলেও ৩৫ নম্বর হয়ে যাবে। এজন্য সকল প্রশ্নের উত্তর লেখার চেষ্টা করুন।

৫. সহজ প্রশ্নের উত্তর প্রথম লিখুন : প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় কঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রথম লিখে সময় নষ্ট করার চেয়ে আপনার কাছে যে প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে ভালো জানা আছে তা প্রথম লিখুন। কারণ হচ্ছে কখনও কখনও পরীক্ষক প্রথম প্রশ্নের উত্তর পড়ে ছাত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করে নেন। যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তর খারাপ হয় তাহলে একটি নেগেটিভ ধারণা আপনার সম্পর্কে সৃষ্টি হবে। আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর চমৎকার হলে একটা পজেটিভ ধারণা সৃষ্টি হবে।

www.nagorikpathagar.com

৬. লেখা পরিষ্কারভাবে লিখুন : পরীক্ষার সময় লেখা খুব বেশি ঘন করে লিখবেন না, যেন আপনি প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় কোনো একটি প্রশ্নের জবাব লেখার সময় অনেক তথ্য মনে থাকে না। পরবর্তীতে চেক করার সময় স্মরণ হয়। পরীক্ষার উত্তরপত্রে জায়গা থাকলে সেই সময় প্রয়োজনীয় তথ্য যোগ করা যায়। তাই একটি প্রশ্নের জবাব লেখার পর কিছুটা জায়গা বাকি রাখা ভালো।

৭. উত্তর চেক করুন : পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগে পুরো উত্তরপত্র একবার দেখে নিন কোথাও মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে কি না। অনেক সময় দেখা যায় চেক না করার কারণে মারাত্মক ভুল রয়ে যায়। বিশেষত প্রথম যে প্রশ্নের উত্তর লেখা হয় তা ভালোভাবে চেক করা দরকার। কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর পড়েই পরীক্ষকের মনে পরীক্ষার্থী সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি উত্তর লেখা সম্পন্ন না হয় তাহলে সর্বশেষ যে প্রশ্নের উত্তর লেখা হচ্ছে তা কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে হলেও পুরো উত্তরগুলো চেক করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা ভালো।

৮. পরীক্ষার খাতায় অপ্রয়োজনীয় কিছু লিখবেন না : পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষককে লক্ষ্য করে কিছুই লিখবেন না। কখনও কখনও দেখা যায় কোনো কোনো ছাত্র পরীক্ষককে লক্ষ্য করে লেখে, "পরীক্ষক স্যার! আমার হঠাৎ করে মাথা ঘুরাচ্ছে, তাই লিখতে পারছি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পাস করিয়ে দেবেন। আমি পাস না করলে আত্মহত্যা করবো ইত্যাদি।" এসব লিখলে পরীক্ষকের মনে করুণা হয় না; বরং রাগ হয়। অনুরূপভাবে পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কথা লিখে অহেতুক সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পরীক্ষার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট করতে হলে শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলোই লেখা দরকার। আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি কতটুকু জানেন তা পরীক্ষককে বোঝানো আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ হচ্ছে প্রশ্নের সঠিক জবাব নির্ভুলভাবে লেখা।

পরীক্ষার সময়ের আরও কতিপয় পরামর্শ

১. লেখা সুস্পষ্ট ও সুপাঠ্য হওয়া : পরীক্ষার খাতায় লেখা সুস্পষ্ট এবং সুপাঠ্য হওয়া দরকার। অনেক সময় ভালো ছাত্র-ছাত্রীর লেখাও পড়তে কষ্ট হয়। তাই তারা ভালো লিখেও কম নম্বর পায়। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে ঃ

জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তিকে তার এক পরিচিত লোক একটি চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। জবাবে তিনি বলেন, আমার পায়ে অসুখ। পরিচিত লোকটি বললেন, আপনার পায়ে অসুখ তাতে সমস্যা কী, আপনি তো হাত দিয়ে চিঠি লিখবেন? তার জবাবে শিক্ষিত ভদ্রলোক বললেন, আমি কোনো কিছু লিখলে তা আমি ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। আমার পায়ে অসুখ হওয়ার কারণে চিঠি পড়ে দিয়ে আসতে যেতে পারবো না। এই জন্য আমি চিঠি লিখতে পারছি না।

২. কারো কাছ থেকে কপি করবেন না : পরীক্ষার হলে নকল করা বা কারো খাতা দেখে লেখা মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের অপরাধে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়।

www.nagorikpathagar.com

৩. প্রশ্ন কঠিন মনে হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন না : পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আপনার কাছে খুব কঠিন মনে হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন না। কারণ মনোবল ভেঙ্গে পড়লে আপনার জানা বিষয়ও ভালোভাবে লিখতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার হলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে আপনার জন্য প্রশ্নপত্র সহজ হয়ে যাবে না, বরং আপনার জানা সহজ বিষয়ও কঠিন মনে হবে। তাই কখনও মনোবল হারাবেন না।

৪. হঠাৎ কিছু মনে না এলে : আপনি কোনো প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় হঠাৎ কোনো তথ্য মনে না এলে তার জন্য চিন্তা করতে করতে সময় অপচয় করবেন না। লেখা চালিয়ে যাবেন। পরবর্তী সময় স্মরণে এলে উক্ত তথ্য যোগ করে দেবেন।

৫. কোনো প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে না পারলে জায়গা খালি রাখুন : আপনি একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে সময় বরাদ্দ করবেন উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে না পারলে জায়গা খালি রেখে পরের প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করুন। কারণ একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে আরেক প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শেষ করে ফেলা উচিত নয়। সকল প্রশ্নের উত্তর লেখার পর এইবার যে প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তা পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করুন।

৬. পরীক্ষার সময় বাকি থাকতে হল ছেড়ে বের হবেন না : যদি পরীক্ষার সময় থাকতে সকল প্রশ্নের উত্তর লেখা ও চেক করা সম্পন্ন হয়ে যায় তারপরও পরীক্ষার সময় বাকি থাকতে খাতা জমা দেবেন না। বসে বসে উত্তরগুলো বারবার পড়ুন। বানানসহ কোনো ধরনের ভুলত্রুটি আছে কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। পরীক্ষার খাতা জমাদানের পর আর ফেরত পাওয়া যাবে না, নতুন কোনো কিছু লেখার সুযোগ পাবেন না, কোনো কিছু সংশোধন করতে পারবেন না। তাই পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে বসে থাকা এবং লিখিত উত্তরগুলো বারবার ভালোভাবে দেখা উত্তম।

পরীক্ষার পর করণীয়

১. চিন্তা করবেন না : পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চিন্তা করবেন না, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন উত্তরপত্র পরীক্ষকের কাছে চলে যাবে। আপনার পক্ষে উত্তরপত্র দেখা ও কোনো কিছু যোগ করা সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষা খারাপ হলেও চিন্তা করবেন না। কখনও কখনও কোনো ছাত্রছাত্রী এক বিষয়ে খারাপ করার পর নিজেই নিজেকে 'অকৃতকার্য' ঘোষণা করে বাকি বিষয় পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। অথচ পরীক্ষার নম্বর পাওয়ার পর দেখা যায়, যে বিষয়ে তিনি নিজেকে অকৃতকার্য ধরে নিয়ে আর পরীক্ষা দেননি উক্ত বিষয়ে ভালোভাবে পাস করেছেন। কিন্তু পরের বিষয়গুলো পরীক্ষা না দেওয়ার কারণে সত্যিই অকৃতকার্য হয়েছেন।

২. আল্লাহর কাছে ধরনা দিন : সকল বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে হয়। আপনি আপনার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছেন ভালো করার জন্য। কিন্তু আপনার চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, আল্লাহর রহমত ছাড়া দুনিয়াতে কেউ কোনো উন্নতি করতে পারে না। তাই আল্লাহর রহমতের জন্য সব সময় দোআ করবেন।

www.nagorikpathagar.com

৩. একটু রেস্ট নিয়ে আবারও পড়াশোনা শুরু করুন : পরীক্ষার পর কেউ কেউ মনে করেন এখন তো 'অবসর', সে সময় কিছুই পড়ার চেষ্টা করেন না। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, পরীক্ষার পর কয়েক দিন একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে এক পরীক্ষার পর পরবর্তী ক্লাসের পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আপনি এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যাচ্ছেন আর আপনার পড়াশোনার পরিধিও বাড়ছে। তাই পরবর্তী ক্লাসের পড়াশোনা নিয়ে অবকাশকালে চিন্তা করুন। বিশেষত আপনি জীবনে যা হতে চান তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় ভালোভাবে পড়ুন কিংবা স্বল্প সময়ের কোনো কোর্স করুন।

৪. একাডেমিক সকল কিছু গুছিয়ে রাখুন : পরীক্ষার ব্যস্ততার জন্য আপনার শিক্ষা-উপকরণাদি এলোমেলো হয়ে থাকতে পারে। পরীক্ষাশেষে সকল কিছু গুছিয়ে রাখুন। হয়তবা পরবর্তী ক্লাসেও অনেক কিছু কাজে আসবে। যেসব কিছু আপনার আর প্রয়োজন হবে না তা-ও অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাজে আসবে। তাই আপনার একাডেমিক কোনো কিছু ফেলে দেবেন না।

৫. পরবর্তী পড়াশোনার পরিকল্পনা নিন : পরীক্ষার পর পরবর্তী কোর্স/টার্ম/ক্লাসের পড়াশোনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। আপনি কীভাবে আরও ভালো করতে পারবেন তার জন্য কোর্সের শুরু থেকেই সিরিয়াস হওয়া দরকার। তাই পরীক্ষার পরপরই পরবর্তী পড়াশোনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

পরীক্ষায় যে ধরনের ভুল হতে পারে

১. কোনো প্রশ্নের ভুল উত্তর লেখা : কোনো কোনো ছাত্র প্রশ্ন একবার দেখেই উত্তর লেখা শুরু করে দেয়। এর ফলে প্রশ্নের ভুল উত্তর লেখা হয়।

২. কোনো পয়েন্ট সঠিকভাবে না বোঝা : কোনো পয়েন্ট সঠিকভাবে না বোঝার কারণে উল্টা উত্তর দেওয়া হয়।

৩. বিশেষভাবে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার ছিল তা না দেওয়া।

৪. পরীক্ষার নির্দেশিকা সঠিকভাবে না পড়া : পরীক্ষার নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়লে কয়েকটি বিষয় জানা যায় : ক. পরীক্ষার পেপার কয় ভাগে বিভক্ত, খ. কতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা খেয়াল না করে কমবেশি উত্তর দেওয়া, গ. বাধ্যতামূলক কোনো প্রশ্ন আছে কি না তা না দেখার কারণে বাধ্যতামূলক প্রশ্নোত্তর বাদ যাওয়া।

পরীক্ষার জন্য স্ট্রেসে থাকা উচিত নয় : অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা-ভীতিতে ভোগেন। ফলে পরীক্ষা খারাপ করেন। তাই স্ট্রেসমুক্ত থাকা দরকার। পরীক্ষার স্ট্রেস দূর করার ছয়টি উপায় : ১. নিজেকে প্রস্তুত করা, ২. পজিটিভ চিন্তা করা, নিজের অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়া ও স্ট্রেস দূর করার অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া, ৩. নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, ৪. রিলাক্স করতে শেখা, ৫. নিয়ন্ত্রণ রাখা, ৬. কারো সাথে কথা বলা।

www.nagorikpathagar.com

মৌখিক পরীক্ষা (Oral Exam)

ইংরেজি 'ভাইভা' শব্দটি viva-voice থেকে এসেছে। একে বাংলায় মৌখিক পরীক্ষা বলা হয়। সাধারণত উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধাপে ছাত্রছাত্রীদের মৌখিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মৌখিক পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষার চেয়ে অধিক প্র্যাক্টিক্যাল। এতে পরীক্ষক সরাসরি পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী লিখিত পরীক্ষার চেয়ে মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করে। আর কেউ কেউ তার বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করে। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষায় ভালো না করলে ভালো রেজাল্ট করা যায় না। মৌখিক পরীক্ষায় কীভাবে ভালো রেজাল্ট করা যায় সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ নিচে দেওয়া হলো।

১. আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিন : এ কথা ভাববেন না যে, হঠাৎ করে মৌখিক পরীক্ষা দিয়েই ভালো রেজাল্ট করা যাবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য যেমন প্রস্তুতি নিতে হয়, অনুরূপভাবে মৌখিক পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুতি লাগে।

২. দুর্বলতা কাটিয়ে উঠুন : মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আপনার কী ধরনের দুর্বলতা আছে তার তালিকা তৈরি করুন এবং তা কাটিয়ে ওঠার পদক্ষেপ নিন।

৩. সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা তৈরি করুন : আপনি কী ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

৪. প্রশ্নোত্তর প্র্যাক্টিস করুন : প্রশ্নের তালিকা তৈরি করার পর উত্তর ঠিক করুন এবং তা প্র্যাক্টিস করুন। আপনার পরিচিত কাউকে আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

৫. উত্তরদানের সময় নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি করবেন না : কোনো প্রশ্নের উত্তর দানের সময় নতুন এমন কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি করবেন না, যার উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে কঠিন।

৬. মৌখিক পরীক্ষাকে পরীক্ষায় ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্য ব্যবহার করুন : আপনাকে মনে করতে হবে মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করার মাধ্যমে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করতে হবে।

৭. প্রশ্নকারীর বিরাগভাজন হবেন না : যিনি প্রশ্ন করেন তাঁর বিরাগভাজন হবেন না। কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তাঁর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না।

৮. আত্মবিশ্বাসের সাথেই উত্তর দিন : আত্মবিশ্বাসের সাথেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন।

৯. পরীক্ষককে কথা বলার সুযোগ দিন : কোনো প্রশ্নের উত্তর দানের সময় পরীক্ষককে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া ঠিক নয়।

১০. খুব বেশি কথা না বলা : পরীক্ষার সময় খুব বেশি কথা বলা ঠিক নয়। কোনো প্রশ্নের যতটুকু উত্তর দেওয়া জরুরি ঠিক ততটুকুই বলা ভালো। বেশি কথা বললে বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এর ফলে অহেতুক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

১১. চিন্তা না করেই হুট করে বলে ফেলা বা বেশি চুপ না থাকা : কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই হুট করে বলতে গিয়ে আটকে যাওয়ার চেয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে উত্তর শুরু করা ভালো। আবার কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে চুপ করে বসে না থেকে সরাসরি এই কথা বলাই উত্তম যে, দুঃখিত। এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করলেই ভেঙে পড়া ঠিক নয়

পরীক্ষা খারাপ করলে ভেঙ্গে পড়বেন না : পরীক্ষায় ফেল করা কিংবা খারাপ রেজাল্ট করাকে অনেকেই চরম লজ্জাকর মনে করেন। খারাপ ফলাফলের কারণে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীকে আত্মহত্যা করতেও দেখা যায়। কেউ কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েন। ফলে তাদের পক্ষে বিশেষ কোনো অবদান রাখা সম্ভব হয় না। তাই পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করলেও মন খারাপ করবেন না।

বিশ্ববরেণ্য অনেকেই পরীক্ষায় ফেল করেছেন : আমাদের মনে রাখতে হবে জগদ্বিখ্যাত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা বারবার পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন কিংবা পড়াশোনায় এত অমনোযোগী ছিলেন যে, এক সময় আনুষ্ঠানিক পড়ার সমাপ্তি টানেন। যেমন কবি নজরুল ইসলাম। স্কুলের ধরাবাঁধা নিয়মের ভেতর পড়াশোনা করতে তাঁর ভালো লাগতো না। তাই আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু কাব্যচর্চার মাধ্যমে সময়ের ব্যবধানে অতি পরিচিত হয়ে যান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের আপামর জনতার সবচেয়ে প্রিয় কবি। তাঁর পরিচয় নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। তাঁর পরিচয় সময় ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর কথা আমরা অনেকেই জানি। তিনি বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী রেনেসাঁর যে কাজ করে গেছেন তার প্রভাব শতাব্দীকাল ধরে থাকবে। কিছু দিন আগে লন্ডনের একটি পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর বারো জন সেরা ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করেছে। সেই বারো জনের মধ্যে মাত্র একজন হচ্ছেন মুসলিম। আর তিনি হচ্ছেন মাওলানা মওদূদী (র)।

উক্ত পত্রিকার মতে, পৃথিবীর এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের ও চিন্তার প্রভাব নেই। মাওলানা মওদূদীর জীবনী পড়লে দেখা যায়, তিনি রুশদিয়া পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করেন। অঙ্কে কাঁচা থাকার কারণেই মৌলভী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান দখল করেন। ১৯১৬ সালে দারুল উলুমে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। তখন দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা হামিদুদ্দীন ফারাহী। সে সময় তাঁর পিতা দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছয় মাস পরে সংবাদ আসে যে, তাঁর পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র

www.nagorikpathagar.com

বালক মওদূদী মাকে নিয়ে পিতার সেবা করার জন্য ভুপালে চলে যান। দারিদ্র্যের কারণে তখন থেকেই জীবিকা অন্বেষণের উপায় সন্ধান করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তাঁকে বিরাট অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। পিতার দুরারোগ্য ব্যাধি, জীবিকার্জনের নিষ্ঠুর তাড়না, সহায়হীনতা প্রভৃতির কারণে তিনি যথোপযুক্ত জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাননি। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে দিল্লীতে নিশ্চিত মনে সংবাদপত্র পরিচালনা ও জ্ঞানার্জনে মন দেন। তিনি তৎকালীন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। অতি অল্প সময়ে কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালের শেষ ভাগে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হলে হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যে, ইসলাম মুসলমানদের নরহত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। এমতাবস্থায় মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর দুঃখ করে বলেন, "আহা! আজ যদি এমন কোনো মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর বান্দা থাকতো যে তাদের এসব হীন প্রচারণার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।"

মাওলানা মওদূদী উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি আল জমিয়ত পত্রিকায় 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তা বিরাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।[৪]

মাওলানা মওদূদী রুশদিয়া পরীক্ষায় অংকে ফেল করার অর্থ এটা ছিল না যে, তার মেধা কম ছিল। তিনি কী ধরনের মেধাবী ছিলেন তা তার বহুমুখী কর্মই সাক্ষী। তাঁর জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করা বা অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অপরাগতা মানুষের প্রতিভা বিকাশে অন্তরায় হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম একজন প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও সাহিত্যিক। ভারতবর্ষে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর লেখনী ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে 'পদক' পান। তিনি জীবনের প্রথম দিকে ইসলামের গভীর অনুরক্ত হলেও কলেজ জীবনে নাস্তিক হয়ে পড়েন। আবার নাস্তিকতা থেকে তাওহীদের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কীভাবে দীনি খিদমত করেছেন সেটা তাঁর তাফসীর পড়লেই অনুধাবন করা যায়। তিনি ছাত্রজীবনে অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়েই বেশ ভালো ছিলেন। সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষায় সব বিষয়ে খুব ভালো করার পরও অঙ্কে ফেল করেন। জীবনে প্রথম কোনো পরীক্ষায় ফেল করে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তারপরও সব বিষয়ে খুব ভালো করার কারণে অষ্টম শ্রেণীতে প্রমোশন পান। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষায়ও তিনি অঙ্কে ফেল করেন। ফলে

৪. খান আব্বাস আলী, ১৯৯৭, মাওলানা মওদূদীঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা. পৃ-৩০-৪৪।

www.nagorikpathagar.com

দরিয়াবাদীর পিতা খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। এই কারণে ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনার পরিবর্তে আরবী পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। আর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র হিসেবে ইউনানী চিকিৎসা পেশার কথা ভাবতে থাকেন। পিতার এই ধরনের চিন্তা দেখে দরিয়াবাদী ভাবতে থাকেন, কী করবেন? কোন পথে জীবনের কল্যাণ নিহিত? এতদিন জীবন সম্পর্কে এক ধরনের চিন্তা করেছেন, এখন জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে।

যে বছর দরিয়াবদী অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা দেন সে বছর থেকে 'হাইস্কুল স্কলারশিপ সার্টিফিকেট' নামে একটা পরীক্ষা চালু হয়। দরিয়াবাদীসহ স্কুলের কিছু ছাত্রকে একজন নতুন শিক্ষক অতি যত্নে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন। পরীক্ষায় তিনি ভালো করেন। ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় তিনি স্কলারশিপপ্রাপ্ত হন। এর ফলে তাঁর পিতা পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরবী মাদরাসায় দেওয়ার পরিবর্তে স্কুলে পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন।

দরিয়াবাদী একজন ভালো ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকরা তাঁদের পাঠ ব্ল্যাক বোর্ডের মাধ্যমে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দরিয়াবাদীকেই ডাকতেন। এমনকি অঙ্কের শিক্ষকও তাঁকে বাছাই করতেন। মুসলমান ছাত্ররা তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতো। তিনি মুসলিম ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা রাখেন। বিশেষত জুমার দিন নামায পড়ার সুবিধাসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন করেন। প্রধান শিক্ষক দরিয়াবাদীকে খুবই ভালো জানতেন। তাঁর সব কথা তিনি শুনতেন।

নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় সকল বিষয়ে খুব ভালো ফল করলেও আগের মতো অঙ্কে ফেল করেন। এই কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র হওয়ার পরও কেন অঙ্কে ফেল করেন? এর জন্য প্রধান শিক্ষক বিশেষ তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। ১৯০৮ সালে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জুন মাসে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। দরিয়াবাদী ইংরেজিসহ সকল বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও অঙ্কে কোনোভাবে তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। এই কারণে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

তিনি ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে এমএ প্রথম পর্বের পরীক্ষা দেন। কয়েকটি কারণে[৫] পরীক্ষা ভালো হয়নি। তাই এমএ প্রথম পর্বে ফেল করেন। পরীক্ষায় ফেল করার পর ভাবেন, কী করবেন? অনেক কষ্টে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন কীভাবে সামনে অগ্রসর হবেন? অবশেষে স্থির করেন, যেভাবেই হোক না কেন, তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু সে সময় তিনি অর্থনৈতিকভাবে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর পিতা পিপলস ব্যাংকে টাকা জমা রেখে যান। এই ব্যাংকটি হঠাৎ দেউলিয়া হওয়ার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কীভাবে পড়াশোনার খরচ পরিচালিত হবে এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। অবশেষে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।

---

৫. যেসব কারণে দরিয়াবাদীর পরীক্ষা ভাল হয়নি তা হচ্ছে : ১. দর্শনের একটি বই বাজারে না পাওয়া, ২. কোর্স দরিয়াবাদীর পছন্দমতো হয়নি, ৩. শিক্ষক মহোদয়ের উপস্থাপনা এমন ছিল যে, বিষয়টি বুঝে আসা কঠিন ছিল।

www.nagorikpathagar.com

উল্লেখ্য যেসব কারণে দরিয়াবাদীর মাস্টার্স পরীক্ষা ভালো হয়নি তা হচ্ছে : ১. দর্শনের একটি বই বাজারে না পাওয়া, ২. কোর্স দরিয়াবাদীর পছন্দমতো হয়নি, ৩. শিক্ষক মহোদয়ের উপস্থাপনা এমন ছিল যে, বিষয়টি বুঝে আসা কঠিন ছিল। বর্তমানেও দেখা যায় উপরিউক্ত কারণে তথা বই না পাওয়া, সাবজেক্ট পছন্দ না হওয়া বা শিক্ষকের খারাপ উপস্থাপনার কারণে অনেক ছাত্রই রেজাল্ট খারাপ করে। তাদের রেজাল্ট খারাপ করার অর্থ এই নয় তাদের মেধা কম। যদি দরিয়াবাদীর মেধা কম হতো তাহলে তাঁর সাহিত্য বিশেষত তাফসীর বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগাতো না।

বিশ্বে অনেক সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, যাঁরা একাডেমিক পরীক্ষায় খারাপ করলেও অন্য ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। আপনি হয়তো একবার-দু'বার বা তিনবার পরীক্ষায় খারাপ করেছেন, এতে জীবনের সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেন মনে করাটা ঠিক নয়। মনে করতে হবে আল্লাহ আপনাকে যেক্ষেত্রে যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে আপনি এখনও চেষ্টা করেননি। আল্লাহ আপনাকে যেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন আপনি সেই ক্ষেত্রের সন্ধান এখনো পাননি। তাই এবার ক্ষেত্র একটু পরিবর্তন করে আবার চেষ্টা করুন। ফিল্ড পরিবর্তন করার আগে ভালোভাবে যাচাই করুন আল্লাহ আপনাকে কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মতো যোগ্যতা দিয়েছেন। এবার ইস্তেখারা করে সিদ্ধান্ত নিন, আপনি কোন ক্ষেত্র বেছে নেবেন। এভাবে ক্ষেত্র বেছে নিয়ে অব্যাহতভাবে চেষ্টা করতে থাকুন। একবার ব্যর্থ হলে আবারও চেষ্টা করুন। দেখবেন এমন এক সময় আসবে আপনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আমি এমন অনেক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানি, যাঁরা একাডেমিক পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গবেষণা ও প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমাদের বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন মুফাসসিরে কুরআন আছেন। যিনি একাডেমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে তার বক্তৃতা শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের ভিড় জমে। শুধু এই শতাব্দী নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশে বিগত কয়েক শতাব্দীতে তার মতো জনপ্রিয় বক্তা আর দেখা যায়নি।

আমাদের এলাকায় একবার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে একজন চেয়ারম্যান প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেননি। তার কিছু দিন পরেই উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হল। উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। তার জয়ের পর আমার এক শিক্ষক কৌতুক করে বললেন, "আল্লাহ তাকে উপজেলা চেয়ারম্যান বানাবেন। সে কেন ইউপি নির্বাচন করলো, এজন্য সে পাস করতে পারেনি। আর যদি সে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পাস করতো হয়তবা উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করতো না।"

এজন্য আপনি আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন না। তাই কোনো পরীক্ষায় ফেল করেই মন খারাপ করবেন না।

পরীক্ষায় সফলতা আর ক্যারিয়ারে সফলতা এক নয় : এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ছাত্রজীবনে সব সময় ক্লাসে ফার্স্ট হতেন। কিন্তু তিনি কর্মজীবনে গিয়ে ভালো করতে পারেননি। তাঁর বিপরীতে একই ক্লাসে কোনো রকম পাস করেছেন বা জীবনে প্রথম

www.nagorikpathagar.com

বিভাগ পাননি এমন ছাত্রও বেশ ভালো করেন। সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করে। এর কারণ কী? ভালো রেজাল্ট না করেও জীবনে সফলতা অর্জন করা যায়। অতএব খারাপ রেজাল্ট করার কারণে হতাশ হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় সফলতা আর ক্যারিয়ারেও সফলতা এক কথা নয়। অতএব ভালো রেজাল্টধারী ছাত্রছাত্রীরা চাকরি শুরু করার পর এই ধারণা করা ঠিক নয় যে, রেজাল্ট ভালো আছে, চাকরিতেও ভালো করা যাবে। চাকরিজীবনে ভালো করতে হলে প্রফেশনালিজম সৃষ্টি করতে হবে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

একবার না পারিলে দেখো শতবার : আমরা ছোটবেলায় পড়েছি 'একবার না পারিলে দেখো শতবার' সত্যিই একবার না পারলে বারবার চেষ্টা করতে করতে একসময় সফলতার মুখ দেখা যায়। একবার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট করতে না পারলে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করুন, হয়তবা সফলতার মুখ দেখবেন।

জনৈক ছাত্র মাদরাসায় ফাযিল পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী বছর সে মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। আমার এক বন্ধু ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাস করার পর অনেক দিন বেকার ছিলেন। ওষুধ কোম্পানি, বেসরকারি কলেজ, প্রাইমারি স্কুলসহ অনেকখানেই পরীক্ষা দিয়ে চাকরি হয়নি। এরপর তিনি বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন। দুই-তিনবার বিসিএস পরীক্ষায় অকৃতাকার্য হওয়ার পরও আশা ছেড়ে দেননি। খুবই কষ্টে ছিলেন। বিয়ে করার মতো অর্থ জোগাড় করতে না পারায় অনেক ভালো প্রস্তাব হাতছাড়া হয়ে যায়। মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন তিনি। মানসিক যন্ত্রণাসহ বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনি বিসিএস প্রশাসনে উত্তীর্ণ হন এবং বর্তমানে সরকারি চাকুরিরত আছেন।

শুধু চাকরির ক্ষেত্রে নয়, স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনেও বারবার চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যায়। আমার পরিচিত এক বড় ভাইয়ের কথা জানি। তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়েকবার ফেল করেন। কিন্তু তার ইচ্ছা, তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হবেনই। তাই জনসংযোগ অব্যাহত রাখেন। সর্বশেষ নির্বাচনে তিনি ভোটারদের প্রতি একটাই আবেদন রাখেন, "আমি আপনাদের সন্তান, আপনাদের ভাই। আপনাদের কাছে ইতঃপূর্বে যতবারই ভোট চেয়েছি, আপনারা আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি এবার আবার এসেছি। আমি আপনাদেরই ছেলে। আপনারা এবার যদি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন বলুন, আমি কোথায় যাবো?' এই কথা বলে তিনি কান্না শুরু করে দেন। পুরো জনসভায় কান্নার রোল পড়ে যায়। যারাই তার কথা শুনেছে সকলেরই হৃদয়ে তার প্রতি মায়া হয়। নির্বাচনী জনসভার এই চিত্র দেখে তার বিরোধী পক্ষই বলা শুরু করলো, এবার অমুকই পাস করবে। কারণ সে মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে।

সত্যিই নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি যদি দুই বার ফেল করার পর তৃতীয়বার আর নির্বাচন না করতেন তাহলে তার পক্ষে এমপি হওয়া সম্ভব ছিল না। আর পরীক্ষার টেকনিকের মতই নির্বাচনেও তিনি মানুষের মন কীভাবে জয় করতে হয় সে টেকনিক রপ্ত করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.com

কেন একজন ছাত্র ফেল করে বা খারাপ রেজাল্ট করে

কখনও কখনও দেখা যায়, অনেক ছাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রতিদিনের হোমওয়ার্ক প্রতিদিন সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপরও পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল করতে পারেন না। আর বিপরীতে কিছু ছাত্র আছে যারা অত পরিশ্রম না করেও ভালো রেজাল্ট করেন। এ ধরনের ছাত্রদের 'লাকি স্টুডেন্ট' বলা হয়। সৌভাগ্যক্রমে খারাপ পরীক্ষা দিয়েও আশ্চর্যজনক রেজাল্ট হতে পারে। আবার দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভালো পরীক্ষা দিয়েও কখনও খারাপ রেজাল্ট হতে পারে।

পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করার কতিপয় কারণ : অনেক কারণে একজন ছাত্র ফেল করে :

১. নেগেটিভ প্রত্যাশা : কোনো কোনো ছাত্রকে পরীক্ষার আগেই বলতে শোনা যায়, আমি এবার পাস করবো না। কিংবা তার শিক্ষকরা আগাম মন্তব্য করেন, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না। যদিও কথাটি ভালোভাবে পড়াশোনার জন্য বলা হয়, কিন্তু এ ধরনের নেগেটিভ মন্তব্য করা ঠিক নয়। এর ফলে ছাত্রের মনে প্রথম থেকেই একটা দুর্বলতা কাজ করে। কেউ কেউ তো মনে করেন, পাস যখন করতেই পারবো না তখন কষ্ট করে পড়ে লাভ কি?

২. অনুপযোগী প্রশ্নপত্র : কখনও কখনও দেখা যায়, প্রশ্নমালা তৈরি করার সময় একটা নেগেটিভ মনোভাব কাজ করে। কেউ কেউ তো এমনভাবে প্রশ্ন করেন যেন ছাত্ররা উত্তর দিতে না পারে। এটাকে বিশেষ ক্রেডিট মনে করা হয়।

৩. প্রস্তুতির অভাব : অনেক সময় দেখা যায় খুবই মেধাবী ছাত্র কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে না। তাই পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করার অর্থ এ নয় যে, তার মেধা কম।

৪. বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ কম থাকা : আমাদের দেশে দেখা যায় একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়ে পড়তে চায় সে বিষয়ে পড়ার চান্স পায় না। আবার কখনও কখনও দেখা যায় ছাত্রের ইচ্ছা আর পিতামাতা বা অভিভাবকদের ইচ্ছা এক হয় না। এর ফলে অভিভাবকের চাপে এমন এক বিষয়ে পড়াশোনা করে যে বিষয় পড়তে আদৌ আগ্রহী নয়। ফলে রেজাল্ট খারাপ করে। কখনও কখনও দেখা যায় একজন ছাত্র এক বিষয়ে ফেল করে অথচ আরেক বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পায়। এর অর্থ এই যে, যে বিষয়ে সে খারাপ করছে সে বিষয় পড়ার প্রতি তার আকর্ষণ কম। কিংবা সে অন্য বিষয় পড়তে অধিক আগ্রহ অনুভব করছে।

কারো কারো কাছে পরীক্ষার প্রস্তুতির চেয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে ব্যস্ত থাকা আনন্দদায়ক। একবার আমার পরিচিত এক ছাত্র পরীক্ষার আগের রাত আমাকে নিয়ে কিছু সামাজিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। আমি তখন জানতাম না যে, পরের দিন তার

www.nagorikpathagar.com

পরীক্ষা আছে। সন্ধ্যার পর কথা প্রসঙ্গে জানলাম যে, তার পরীক্ষা আছে। অথচ সেই ছাত্রটি সামাজিক কাজ নিয়ে যত বেশি পেরেশান ছিল পরীক্ষার জন্য তার মোটেও পেরেশানি ছিল না। কারণ হচ্ছে, যে বিষয়ে সে পড়াশোনা করছে তার প্রতি তার মোটেই আগ্রহ ছিল না। তার অভিভাবকদের চাপেই সে উক্ত বিষয়ে পড়ছে।

৫. পরীক্ষকের ভুল : কখনও দেখা যায় পরীক্ষক ৭২ লেখার স্থলে ২৭ লেখে ফেলেন। এটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার চেক করার সময় কখনও ধরা পড়ে আর কখনও ধরা পড়ে না। এই কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভালো পরীক্ষা দিয়েও খারাপ রেজাল্ট করে।

৬. পরীক্ষার আগে বা পরীক্ষার সময় অসুস্থতা : আমার অতি পরিচিত একজন ছাত্রের কথা জানি, যিনি খুবই ভালো ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনাও প্রচুর করেছেন। কিন্তু পরীক্ষার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে কেউ কেউ তো পরীক্ষা দিতে পারেন না। আর কেউ কোনো রকমে পরীক্ষা দিলেও ভালো ফল করতে পারেন না বা ফেল করেন। যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলেও মন খারাপ করবেন না। মনে করতে হবে, দুনিয়ার একটি পরীক্ষার সময়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ করে আল্লাহ তাআলা আখিরাতের পরীক্ষা করতে চান। কারণ অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আল্লাহর শানে এমন কথা বলেন, যা একজন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। আল্লাহ তাআলা যদি জুনিয়র পরীক্ষার সময় অসুস্থতা দিয়ে আখিরাতের পরীক্ষায় পাস করাতে চান, তাহলে দুনিয়ার পরীক্ষায় পাসের জন্য পেরেশানি থাকা ঠিক নয়। কারণ দুনিয়ার পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার আগেই আখিরাতের পরীক্ষার জন্য ডাক এসে যেতে পারে। আমি একজন ছাত্রের কথা জানি, যিনি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল যেদিন প্রকাশিত হল তার আগের দিন তিনি মারা যান। যার কারণে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, অমুকের পরিবারে আনন্দের পরিবর্তে বিষাদের ছায়া।

৭. একই সাথে অনেক বিষয় ধরা : কোনো কোনো ছাত্রকে দেখা যায় একই সাথে অনার্স, বিএ পাস কোর্স, মাদরাসার সমমানের পরীক্ষা ও ভোকেশনাল কোনো কোর্সের পরীক্ষা দিতে। এ কারণে সে কোনো বিষয়েই ভালো করতে পারে না। অনেক জ্ঞানীর বক্তৃতা হচ্ছে, সকল কিছু জানার চেয়ে কোনো এক বিষয়ের সব জানা ভালো। উন্নত বিশ্বে দেখা যায়, যিনি যে বিষয়ে পড়ান ঐ বিষয়েরই স্পেশালিস্ট। কিন্তু আমাদের দেশে সব বিষয়ের কিছু কিছু ধারণা আছে এমন লোকের সংখ্যা অনেক। সে তুলনায় বিষয়ভিত্তিক স্পেশালিস্টের সংখ্যা কম।

৮. পরীক্ষার খাতা অদল-বদল হয়ে যাওয়া : মার্কিং শেষে ফাইনাল শীটে গ্রেড লেখার সময় একজনের রেজাল্ট আরেকজনের নামে উঠানো হয়। এ ধরনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটলেও একেবারে যে ঘটে না বিষয়টি এমন নয়। শুধু পরীক্ষার রেজাল্ট অদল-বদল

www.nagorikpathagar.com

হয় না, কখনও কখনও দেখা যায় হাসপাতালে একজনের ওষুধ আরেকজনকে দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বলে পত্রিকায় এসেছে। একবার এক রোগীর পরিবর্তে আরেকজনকে নিয়ে পা কেটে ফেলেছে। যার পা অপারেশান করার জন্য কেটে ফেলা হলো তিনি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, আমার পা নয়, সম্ভবত অন্য কারো পা কাটার কথা। কিন্তু তারা শুনলোই না। পা কেটে ফেলার পর খবর হলো যে, ভুল ব্যক্তির পা কেটে ফেলা হয়েছে। এজন্য তারা 'স্যরি' বলে ক্ষতিপূরণ দিলেও উক্ত ব্যক্তির পা আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

আরেক ঘটনার বিবরণে জানা যায়, একজনের পরিবর্তে আরেকজনকে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়। ফলে ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার কারণে রোগীটি মারা যায়। আমাদের দেশে অনেক ছাত্র ভুলে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে আর পড়াশোনা করে না। এভাবে তার শিক্ষাজীবনের অপমৃত্যু ঘটে। আবার কখনও কখনও পরীক্ষায় খারাপ করার দুঃখ সইতে না পেরে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যায়। কয়েক বছর আগে এ ধরনের একটি খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ছাত্রটি ফেল করেছে এই সংবাদ শুনে সে মারা যায়। তারপর মার্কশিট আসার পর দেখা যায় সে প্রথম বিভাগে পাস করেছিল।

৯. শিক্ষকদের অসাধুতা বা পক্ষপাতমূলক আচরণ : কখনও দেখা যায়, একজন ছাত্রকে ফেভার করে আরেকজন ছাত্রের প্রতি অবিচার করা হয়। তাকে কম নম্বর দেওয়া হয় কিংবা সে যেন ভালো রেজাল্ট করতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কখনও দেখা যায়, একজন ছাত্র যে মানের টিউটোরিয়াল লিখে সর্বোচ্চ নম্বর পায় আরেকজন ছাত্র তার চেয়ে অনেক ভালো লিখেও কোনো রকম পাস করেন। এর কারণ হচ্ছে হয়তবা দ্বিতীয় ছাত্রটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বাসায় উপঢৌকন নিয়ে কম যেতো কিংবা কোনো ছাত্র কী লিখেছে তা না দেখেই নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ খাতার পরিবর্তে চেহারা দেখে নম্বর দেওয়ার কারণে একজন ছাত্র সত্যিই ভালো লিখেও কম নম্বর পেল। বিশেষত মৌখিক পরীক্ষায় চেহারা দেখে নম্বর দেওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। একটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের একজনকে দেওয়া হয় ৯৬% নম্বর আর অপরজনকে দেওয়া হয় ৮০% নম্বর। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মৌখিক পরীক্ষায় যদি উভয়ের মধ্যে ১৬% নম্বর ব্যবধান থাকে তাহলে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করেও সে ভালো ফল করতে পারবে না। কখনও কখনও দেখা যায়, একজন ভালো ছাত্রকে মেয়ের জামাই করার টার্গেট নিয়েই নম্বর দেওয়া হয়। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল করতে পারে না।

পরীক্ষা খারাপ করার আরও কিছু কারণ

১. স্টাডি ও পরীক্ষার টেকনিক জানা না থাকা : কীভাবে পড়লে বা পরীক্ষা দিলে ভালো রেজাল্ট করা যায় অনেক ছাত্র তা জানে না। এ কারণে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে।

www.nagorikpathagar.com

২. পারিবারিক ঝামেলায় মানসিক অশান্তি : পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিক অশান্তিতে কেউ কেউ পড়াশোনা করতে পারে না, যার কারণে রেজাল্ট খারাপ করে।

৩. একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হওয়া।

৪. অটো প্রমোশন : হাঁটার আগে দৌড়ানোর চেষ্টা করলে পড়ে যেতে হয়। কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী অটো প্রমোশন নিয়ে পড়া বুঝতে কষ্ট হয়, যার ফলে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে।

৫. পড়াশোনার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব : অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারার কারণে খারাপ রেজাল্ট করে।

৬. পরীক্ষার ভয় : পরীক্ষার টেনশনে অনেক ছাত্র পড়াশোনা করতে পারে না। তাই অধিক টেনশনের কারণে তারা ফেল করে।

৭. হতাশা : কারো মধ্যে এ ধরনের হতাশা থাকে যে, পড়াশোনা করে কী হবে, ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়া যাবে না ইত্যাদি। এই ধরনের হতাশায় পড়াশোনা না করার কারণে রেজাল্ট খারাপ করে।

৮. খুব বেশি আবেগপ্রবণ হওয়া : অনেক ছাত্র অতি আবেগপ্রবণ। সামান্য সমস্যা বা কথাতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। এই ধরনের আবেগের কারণে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে রেজাল্ট খারাপ হয়।

প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণেও রেজাল্ট খারাপ হতে পারে : কখনও কখনও দেখা যায়, পরীক্ষার খাতা বা টিউটোরিয়ালে নম্বর দেওয়ার সময় রাজনৈতিক মতাদর্শ বিচার করা হয়। ছাত্র-শিক্ষক একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হলে টিউটোরিয়াল না লিখেও সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া যায়। আর বিপরীত আদর্শের হলে যথাযথভাবে লিখে নির্দিষ্ট সময়ের টিউটোরিয়াল জমা দিয়েও নম্বর পাওয়া যায় না। প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে রেজাল্ট খারাপ করার অনেক উদাহরণ আছে। এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরছিঃ

বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পরীক্ষায় জনৈক ছাত্র ফার্স্ট টার্মে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের চেয়ে ২৪ নম্বর বেশি পায়। ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষার পর সাধারণত রেজাল্ট প্রকাশ করা হয় না। ফাইনাল টার্মের পরই একসাথে রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। ফাইনাল পরীক্ষার পর পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান (তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান) প্রথম টার্মের নম্বর দেখে কীভাবে তার পছন্দের ছাত্রকে ফার্স্ট করা যায় সে ফন্দি আটতে থাকেন। তিনি কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

১. প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় ছাত্রের রাজনৈতিক আদর্শকে কাজে লাগান। একজন ছাত্র তৎকালীন সরকারি দলের সমর্থক ছিল। আরেকজন ছাত্র অপর আরেকটি ছাত্রসংগঠনের সাথে

www.nagorikpathagar.com

ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে উক্ত ছাত্র ভাইস চ্যান্সেলরের বিরোধী বক্তৃতা-বিবৃতিও প্রদান করতো। এমতাবস্থায় ভিসিকে সহজেই উক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

২. পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে মাত্র ৪% নম্বর ব্যবধান হওয়ার পরও একটি খাতা তৃতীয়বার পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়।[৬] ভিসির প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে পরীক্ষকের প্যানেলবহির্ভূত একজন ব্যক্তিকে তৃতীয় পরীক্ষক করা হয়। এভাবে কয়েকটি বিষয় অবৈধভাবে তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে কম নম্বর দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারে এমন একজন ছাত্রকে মাত্র দ্বিতীয় বিভাগেও পাস করানো সম্ভব। উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝে আসবে। মনে করুন একজন ছাত্র প্রথম পরীক্ষকের কাছে ৭৬ আর দ্বিতীয় পরীক্ষকের কাছে ৬০ পেল। এখন গড়ে তার নম্বর হবে ৬৮। উভয় পরীক্ষকের মধ্যে ২০% নম্বর ব্যবধান না হওয়ার কারণে একাডেমিক অ্যাক্ট অনুযায়ী তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর নিয়ম নেই। এখন নিয়মবহির্ভূতভাবে তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠালে যেকোনো ভালো ছাত্রের রেজাল্ট খারাপ করা সম্ভব। তার বিপরীতে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কারো রেজাল্ট ভালো করানোও সম্ভব।

৩. যখন দেখা গেল নিয়মবহির্ভূতভাবে তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়েও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না যে ছাত্রটির ফার্স্ট হওয়া ঠেকানো যাবে কি না, তখন উক্ত ছাত্রের একটি কোর্সের পরীক্ষার লুজ ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছয়টি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর ছিঁড়ে ফেলা হয়।

নিয়মবহির্ভূতভাবে তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর বিষয়টি খুবই গোপনীয়। এটা পরীক্ষা কমিটি, কন্ট্রোলার ও ভিসি ছাড়া জানার কথা নয়। কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশের আগেই ছাত্রটির কাছে এই ধরনের পদক্ষেপের কথা কয়েকটি সূত্রে চলে আসে। তৎকালীন সরকারি ছাত্র সংগঠনের এক গোপন মিটিংয়ে এ বিষয়ে মত পোষণ করা হয় যে, উক্ত ছাত্রকে ফার্স্ট হতে দেওয়া যাবে না। কারণ সে ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট হয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করবে, এটা রাজনৈতিকভাবে তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। অপরদিকে ভিসি একদিন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রক্টরকে উক্ত ছাত্রের নাম ধরে বলেন, "অমুক যদি ফার্স্ট হতে না পারে কিংবা প্রথম বিভাগ না পায় তাহলে বলবে ভিসি অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছে" এভাবে আরও কিছু কথা বলে। প্রক্টর বিষয়টি বুঝতে না পেরে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে ডেকে ভিসির মন্তব্য শোনায়। তখন ছাত্রটি বললো, নিশ্চয় ভিসি এমন কোনো ষড়যন্ত্র করছে। 'চোরের মনে পুলিশ পুলিশ' এই জন্যই এই কথা বলেছে।

---

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পরীক্ষক ও দ্বিতীয় পরীক্ষকের মধ্যে ২০% নম্বর ব্যবধান হলে তৃতীয় পরীক্ষকের মাধ্যমে খাতা আবার দেখা হয় এবং এমতাবস্থায় কাছাকাছি দু'জনের নম্বর গড় করেই নম্বর দেওয়া হয়।

www.nagorikpathagar.com

উল্লেখ্য, ভিসি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই ছাত্রটি তার রাজনৈতিক কমিটমেন্টের কারণে ভিসিবিরোধী ছিল। প্রক্টর ও কন্ট্রোলার ভিসিকে নানাভাবে সাহায্য করতো। তারা উভয়েই ছিলেন স্থানীয়। একদিন স্থানীয় কিছু লোককে চাকরি দেওয়ার প্রশ্নে ভিসির সাথে প্রক্টর ও কন্ট্রোলারের মতবিরোধ হয়। ভিসি তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। ভিসির খারাপ আচরণের ফলে তারা ভিসির উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে যান।

ছাত্রটির পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে ভিসি ও চেয়ারম্যানের ভূমিকা কন্ট্রোলারের জানা ছিল। প্রক্টর ও কন্ট্রোলারের মধ্যে খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল। কন্ট্রোলার বিষয়টি প্রক্টরকে জানান। প্রক্টরের সাথে ছাত্রটির দেখা হলে প্রক্টর বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। ছাত্রটির রাজনৈতিক দর্শন ও প্রক্টর মহোদয়ের রাজনৈতিক দর্শন বিপরীত হলেও প্রক্টর তৎকালীন সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন। এছাড়া ছাত্রটির সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। তারপর ছাত্রটির সাথে কন্ট্রোলার ও প্রক্টরের মিটিং হয়। যেহেতু পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপন দলিল তাই চেয়ারম্যানের অবৈধ সুপারিশ ও ভিসির অবৈধ অনুমোদনের কাগজপত্রের ফটোকপি প্রথমত ছাত্রকে সরবরাহ না করে প্রক্টরের কাছে রাখা হয়। তারা উভয়েই বিষয়টি সিরিয়াসভাবে দেখার জন্য ছাত্রকে পরামর্শ দেন। ইতোমধ্যে এসব বিষয় ছাত্রটির শুভাকাঙ্ক্ষী কিছু শিক্ষক জেনে যান। এ নিয়ে সকলের ভেতরেই ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু ছাত্রটি রেজাল্ট প্রকাশের আগে কোনো কিছু করা সমীচীন মনে করেনি। তাই বিষয়টি কিছু শিক্ষকের মধ্যে গোপন থাকে।

৬ ডিসেম্বর রেজাল্ট প্রকাশের কথা। ৫ ডিসেম্বর পরীক্ষা কমিটির সদস্যরা চূড়ান্তভাবে নিরীক্ষণের জন্য বসেন। পরীক্ষা কমিটির তিন সদস্যের মধ্যে দু'জনই উক্ত ছাত্র ফার্স্ট হোক তা মনে-প্রাণে চাইতেন না। আরেকজন শিক্ষক কোনো রাজনৈতিক সংগঠনকে পছন্দ করতেন না। তিনি মনের দিক থেকে তাবলীগ জামায়াতকে পছন্দ করতেন। রেজাল্ট টেবুলেটিং করতে গিয়ে তিনি যখন দেখলেন ছাত্রটির একটি কোর্সের ইন্টারনাল পরীক্ষক ছয়টি প্রশ্নের মার্ক দিয়েছেন অথচ বহিরাগত পরীক্ষক (যাকে চেয়ারম্যান পরীক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়া পরীক্ষকের প্যানেলে বাইরে থেকে পরীক্ষক করেছেন) তিনটি প্রশ্নের মার্ক দিয়েছেন। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, সে তো ছয়টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, তাহলে তার বাকি তিনটি প্রশ্নের উত্তর গেল কোথায়?

উল্লেখ্য, মৌখিক পরীক্ষার দিন উক্ত ছাত্রকে ৫০-এর মধ্যে ৪০ আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রকে ৪৬ নম্বর দেওয়া হয়। তার বক্তৃতা ছিল, যেহেতু দু'জনই ভালো ছাত্র আর তাদের মধ্যে কে ফার্স্ট হয় বলা যায় না, তাই দু'জনকেই মৌখিক পরীক্ষায় সমান নম্বর দেওয়া হোক। কিন্তু তার কথা কর্ণপাত করা হয়নি। তাই এক পর্যায়ে তিনি স্বাক্ষর না করেই বাইরে চলে যান। উক্ত ছাত্র সম্পর্কে চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা কমিটির অপর সদস্যের বিমাতাসুলভ আচরণ তার জানা ছিল। তাই তিনি পরীক্ষার খাতার লুজ ছেঁড়ার ঘটনা দেখে সহ্য করতে পারেননি।

www.nagorikpathagar.com

তিনি তাদের বললেন, যেহেতু তার লুজ ছেঁড়া তাই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের নম্বর ধরে কিংবা বাকি তিনটি প্রশ্নের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক ও বহিরাগত পরীক্ষকের গড় নম্বর ধরে নম্বর দিয়ে রেজাল্ট প্রকাশ করা হোক। তারা এতে সম্মত হননি। কারণ এভাবে নম্বর যোগ করলে উক্ত ছাত্র ফার্স্ট হয়ে যায়। যখন তিনি দেখলেন উক্ত ছাত্রের এককভাবে প্রথম হওয়াকে তারা মেনে নিতে পারছেন না তখন প্রস্তাব দিলেন, বিষয়টি এখনও আমাদের মধ্যে সীমিত, উভয় ছাত্রকেই প্রথম বানিয়ে রেজাল্ট প্রকাশ করা হোক। তাতেও তারা রাজি হননি। তারা বললেন, তিনটি প্রশ্নের যে মার্ক পেয়েছে তার ভিত্তিতেই ফল প্রকাশিত হবে।

একথা শোনার পর তার বিবেক নাড়া দেয়। তিনি জরুরি প্রয়োজনের কথা বলে বাইরে গিয়ে বিষয়টি আরো কিছু শিক্ষককে জানান। উক্ত শিক্ষকরা এ ধরনের চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে ছাত্রকে জোর তাগিদ দেয়। তারা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, "এটা তোমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, এটা মারাত্মক অন্যায়, তাই এর বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখা দরকার।"

কিন্তু ছাত্রটি রেজাল্টের সাথে অন্য বন্ধুবান্ধব বা রাজনৈতিক সহকর্মীদের সংশ্লিষ্ট করতে চায়নি। তাই রাত এভাবে কেটে যায়। পরের দিন রেজাল্ট দেওয়ার কথা। ইতোমধ্যে এই বিষয়টি ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। ভোরবেলা ছাত্রটির রাজনৈতিক সহবন্ধুরা বৈঠকে মিলিত হয়ে ক্যাম্পাস অচল করে রাখার পক্ষে মতপোষণ করেন। কিন্তু তার নীরব ভূমিকার কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সময় বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়। তাদের নির্দেশেই ক্যাম্পাস অচল করে দেওয়া হয়। এরপর ছাত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ছাত্রের ছয়টি অভিযোগ ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে তদন্ত করার পর তদন্ত কমিটির কাছে সকল অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণিত হয় (তদন্ত রিপোর্ট ও এই সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র লেখকের কাছে আছে)।

লুজ ছেঁড়ার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "সংশ্লিষ্ট উত্তরপত্রটি পরীক্ষা করে দেখা যায় উত্তরপত্রটির যে কোণে পিন মারা সেই কোণা ছেঁড়া এবং অমসৃণ। উত্তরপত্রটিতে তিনটি পিন মারা আছে। পিন মারার বিষয়টি কমিটির কাছে যথেষ্ট সন্দেহের অবতারণা করেছে। খুব সহজেই কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরপত্রের অংশবিশেষ কোনো স্তরে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে তিনি সংশ্লিষ্ট ছাত্রের উত্তরপত্রে ছয়টি প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। আবেদনকারী ছাত্রের উত্তরপত্রের অংশবিশেষ যে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যাচাই ও নিরীক্ষা করে তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে একমত।[৭]

---

৭. ১৬২ তদন্ত রিপোর্ট, পৃষ্ঠা–১।

www.nagorikpathagar.com

উক্ত ঘটনা দেখে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, কীভাবে প্রশাসনিক অবৈধ হস্তক্ষেপ বা শিক্ষকদের অনৈতিক ভূমিকার কারণে ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন ছাত্রের ফার্স্ট হওয়া ঠেকানোর জন্য কত অনিয়ম করা হলো। উক্ত শিক্ষাবর্ষের রেজাল্ট প্রায় এক বছর পর প্রকাশিত হলো। কিছু ছাত্রের চাকরি পেতে বিলম্ব হয়েছে আর কিছু ছাত্র চাকরি পাওয়ার পরও সার্টিফিকেটের অভাবে চাকরি হারিয়েছে। মেধার যথাযথ বিকাশ সাধন করতে হলে মেধার রাজনৈতিককরণ করা যাবে না। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে সকলকেই দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পুনঃপরীক্ষা দিতে হলে

কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় খারাপ করার কারণে এক বা একাধিক বিষয় কিংবা পুরো পরীক্ষা পুনরায় দিতে হয়। পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ শুধু দুনিয়াতেই আছে। আখিরাতের পরীক্ষায় কেউ একবার খারাপ করলে দ্বিতীয়বার দেওয়ার সুযোগ নেই।

আপিল করার সুযোগ : পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার উত্তরপত্র যথাযথভাবে দেখা হয়নি তাহলে আপনি উত্তরপত্র পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য আবেদন জানাতে পারেন। তবে এই ধরনের আবেদন জানানোর আগে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনি পরীক্ষা ভালো দিয়েছেন। পরীক্ষক যথাযথভাবে মার্কিং না করার কারণেই আপনি ফেল করেছেন। অনেক ছাত্রছাত্রী এইভাবে পরীক্ষার খাতা পুনরায় নিরীক্ষণ করার আবেদন জানিয়ে ভালো রেজাল্ট করার প্রমাণ আছে।

পুনঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে কতিপয় পরমার্শ

১. পুনঃপরীক্ষাকে সহজভাবে গ্রহণ করুন : যদি কোনো কারণে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে মন খারাপ করবেন না। বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করুন। আপনাকে মনে করতে হবে, প্রথমবারের প্রস্তুতিতে যেসব ঘাটতি ছিল এবার সকল ঘাটতি পূরণের সুযোগ পেয়েছেন। ফলে আপনার একাডেমিক গভীরতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন।

২. খুব ভালো করার পরিকল্পনা নিন : প্রথমবার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কারণে এবার ভালো করতে পারবেন না, বিষয়টি এমন নয়। পুনঃপরীক্ষায় বেশ ভালো রেজাল্ট করার পরিকল্পনা নিন এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা করুন।

৩. প্রথমবারের রিভিশনে কী ভুল ছিল : দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় চিন্তা করুন, প্রথমবারের প্রস্তুতিতে কী কী ত্রুটি ছিল। উক্ত ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য সিরিয়াস পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

৪. সময় অপচয় না করে রিভিশন শুরু করুন : পরীক্ষা খারাপের সংবাদ শোনার পর সময় অপচয় না করে রিভিশন শুরু করে দিন। পুনঃপরীক্ষার তারিখের আগে কয়েকবার রিভিশন করার চেষ্টা করুন ।

www.nagorikpathagar.com

৫. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভালোভাবে দেখুন : পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভালোভাবে দেখুন। কোনো প্রশ্নের কারণে আপনার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে তা বের করার চেষ্টা করুন এবং উক্ত প্রশ্ন ভালোভাবে শিখে নিন। পুনঃপরীক্ষার সময় আগের পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু না এলেও কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। তাই অজানা প্রশ্নোত্তর জানার চেষ্টা করুন।

৬. প্রশ্নমালা তৈরি করে চর্চা করুন : আপনি আপনার পরীক্ষক হয়ে যান। নিজে নিজে প্রশ্নমালা তৈরি করুন এবং পরীক্ষা দিন। পুনঃপরীক্ষা দেওয়ার আগে এইভাবে কয়েকবার চর্চা করুন ।

৭. অন্য পরীক্ষার্থীদের সাথে পড়াশোনা করুন : পুনঃপরীক্ষার্থী আরও কোন ছাত্রছাত্রী আছে কি না তার খোঁজ নিন। অন্য কোনো ছাত্রছাত্রী পুনরায় পরীক্ষা দিলে তার সাথে মিলে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন।

www.nagorikpathagar.com

দশম অধ্যায়

ল্যাংগুয়েজ স্কিলস

মাতৃভাষার বাইরে আরও কিছু ভাষা শিখুন

সকল প্রাণীরই ভাষা আছে

ভাষা যোগাযোগের বাহন। আল্লাহ্ তাআলা প্রাণী সৃষ্টি করার পর তাদের ভাষা দান করেছেন। আল্লাহ্ শুধু মানুষকে বাকশক্তি দান করেননি, অন্যান্য প্রাণীরও ভাষা আছে। তারা ভাষা প্রয়োগ করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। যেমন কাক 'কা কা' করে ডাকে, কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করে আর 'মিঁউ মিঁউ' করে বিড়াল ডাকে। ছোট ছোট মোরগের বাচ্চা তাদের মায়ের ডাকে অনেক দূর থেকে দৌড়ে আসে। কোথাও মধু, চিনি বা কোনো খাবার পড়ে থাকলে কোনো একটি পিঁপড়া তা দেখলে মুহূর্তের মধ্যে অনেক পিঁপড়ার ভিড় জমে যায়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্যান্য প্রাণী শুধু নিজের কথা বোঝে না, মানুষের কথাও বোঝে। আপনার বাড়িতে যদি গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল বা এই ধরনের কোনো প্রাণী থাকে তাহলে দেখবেন একটি কুকুর যদি ঘরে ঢুকতে চায়, আপনি দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করে কিছু বললে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আবার হাতে কোনো খাবার নিয়ে পাখপাখালিকে ডাকলে দূর থেকে কাছে চলে আসে।

আল্লাহর প্রিয় নবী-রাসূলদের কেউ কেউ প্রাণীদের কথাও বুঝতেন। যেমন হযরত সোলাইমান (আ) পাখির সাথে কথা বলতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শোনার জন্য মাছেরাও ভিড় জমাতো। আর হযরত মুহাম্মদ (স) মসজিদে নববীতে একটি খেজুর গাছের শাখায় ভর দিয়ে খুতবা দিতেন। মসজিদের মিহরাব তৈরি হওয়ার পর তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া শুরু করেন। ফলে খেজুর গাছটি আল্লাহর রাসূলের হাতের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এ কারণে সে কান্না শুরু করে দেয়। আল্লাহর রাসূল (স) তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার পর তার কান্না বন্ধ হয়। এইভাবে নবী ও রাসূলদের অনেক মোজেযা দেখা যায়।

ভাষা শিখুন—সকল ভাষা আল্লাহরই সৃষ্টি

আপনি যদি দেশ ও জাতির জন্য অবদান রাখতে চান তাহলে মাতৃভাষার বাইরে অন্তত আরও দু'টি ভাষা জানার চেষ্টা করুন। আর তা হচ্ছে আরবী ও ইংরেজি। এছাড়া

www.nagorikpathagar.com

ফরাসি, জার্মানসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা জানা দরকার। কোনো ভাষাকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলাই সকল ভাষা সৃষ্টি করেছেন। তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ পয়দা করেছেন এবং সকলকে বাকশক্তি দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।" (সূরা রাহমান : ৩-৪)

এ কারণে একথা বলা যায় যে, সকল ভাষা আল্লাহরই সৃষ্টি। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, অমুক ভাষা ইসলামিক আর অমুক ভাষা অনৈসলামিক। সকল ভাষাভাষী মানুষকেই আল্লাহ ভালোবাসেন। তাই অতীতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছ তাদের ভাষাভাষী নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। এ কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ -

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।'

এই আয়াতের আলোকে বলা যায়, সকল ভাষাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত। পৃথিবীতে মানুষের গায়ের রং ও ভাষার পার্থক্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের নির্দশনাবলির অন্যতম নিদর্শন। এ কথা আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

(সূরা রূম : ২২)

তাই কোনো ভাষাকে ঘৃণা করা ঠিক নয়।[১] সব ভাষা মহান আল্লাহ থেকে এসেছে। তাই সব ভাষাকেই সম্মান করা এবং সব ভাষাতেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা উচিত।

কেন ভাষা শেখা জরুরি : বিভিন্ন কারণে ভাষা শেখা জরুরি :

১. দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য : বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য উক্ত ভাষা জানা দরকার। এজন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাউকে কাউকে সুরিয়ানী ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষা শেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ শুধু

১. কাউকে কাউকে দেখা যায়, আরবীতে লেখা (কুরআন-হাদীস ও কিতাবপত্রের বাইরে) কোনো কিছু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে মহব্বতের সাথে তুলে চুমো দেন। আর ইংরেজি ভাষায় লেখা কোনো কিছু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলে তার উপর জুতা মাড়িয়ে চলাকে নেকির কাজ মনে করেন। এ ধরনের মানসিকতা ইসলাম সমর্থন করে না।

www.nagorikpathagar.com

আরবী ভাষাভাষী মানুষের জন্য নয়, এটা সকল ভাষা, সকল বর্ণ, সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য। আল্লাহর রাসূলের সুমহান আদর্শ সকল ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছানো মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের উপর অপরিহার্য। এ কারণে মুসলমানদের একটি অংশের বিভিন্ন ভাষায় পরদর্শী হওয়া জরুরি।

২. বিভিন্ন দেশে নিজ দেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য : কোনো মানুষ একা চলতে পারে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে কোনো দেশ একা চলতে পারে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক দেশ আরেক দেশের উপর নির্ভরশীল থাকে। এজন্য এক দেশের সাথে আরেক দেশের সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্কোন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। এক দেশের সাথে আরেক্ দেশের সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম কাজ। এজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সফর করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশে হাইকমিশন, দূতাবাস স্থাপনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা রাষ্ট্রীয় রেওয়াযে পরিণত হয়েছে। কূটনৈতিক মিশনগুলো নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। কূটনৈতিক মিশনের সদস্য হিসেবে যারা কাজ করেন তারা যে দেশে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন যদি তারা ঐ দেশের ভাষা জানেন তাহলে অতি সহজেই উক্ত দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক মহল ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, যা দেশে শিল্পকলকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় সহায়ক হয়। যদিও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষায় অফিসিয়াল যোগাযোগ হয় কিন্তু প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধির সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[২]

৩. ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনের জন্য : যারা শুধু নিজ মাতৃভাষা জানে তারা দেশের বাইরে গেলে বোবা। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলা ও কথা শোনার চেয়ে সরাসরি কথা বলার মধ্যে আনন্দ ও তৃপ্তি বেশি। বিদেশে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরির সুযোগ-সুবিধার জন্যও ভিন দেশী ভাষা শেখা প্রয়োজন। এ কারণে ছোটবেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার তিনি ভবিষ্যতে কী করতে চান? সেজন্য নিজ মাতৃভাষার বাইরে আর কোনো ভাষা শেখা জরুরি। ভাষা জানা না থাকলে একে অপরের সাথে থাকলেও ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব হয় না। একে অপরের ভাষা না বোঝার কারণে সামান্য জিনিস নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হয়।

---

২. ২০০৪ সালে বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিসেবে যাকে নিযুক্ত করা হয় তিনি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। তিনি ১০ বছর বয়সে বিলেত পাড়ি দেওয়ার পর আর দেশে আসেননি। দীর্ঘদিন সরকারি বিভিন্ন পদে চাকরি করার পর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত করার পেছনে সম্ভবত এটাও বিবেচনা করা হয়েছে যে, তিনি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অন্য কারো তুলনায় বা অন্য কোনো দেশে তাকে নিযুক্ত করার চেয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত করলে অধিক দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

www.nagorikpathagar.com

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি :

একবার একজন আরব, একজন ইরানি, একজন তুর্কী এবং একজন রোমীয় একত্র হলো। একজন লোক তাদের একটি 'দিনার' দিলেন। উক্ত দিনার দিয়ে কী কেনা হবে এ নিয়ে সবার মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। ইরানি বললো, 'আনজির' কেনা হোক। আরব বললো 'উনুব' আমার পছন্দ। রোমীয় বললো 'এস্তাকিল' কেনা হোক। তুর্কী বললো, 'আযাম' কেনা হোক। কেউ কারো ভাষা জানে না। তাই তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। অথচ এই চারটি শব্দের অর্থই 'আঙ্গুর'। কেউ যদি তাদের সামনে একটি 'আঙ্গুর' নিয়ে উপস্থিত হতো তাহলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো না।[৩]

আরবী কেন শিখবেন : কয়েক কারণে আরবী ভাষা বিশেষভাবে জানা দরকার :

১. আরবী রাসূলের ভাষা ও কুরআনের ভাষা। মহান আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবী ভাষাতেই নাযিল করেছেন। কুরআন বুঝতে হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস জানতে হবে। আর আল্লাহর রাসূলের ভাষা ছিল আরবী। অতএব কুরআন-হাদীস বুঝতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে।

২. কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা আরবী ভাষাতেই বেশি। কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাও আরবী ভাষাতেই সবচেয়ে বেশি রয়েছে। তাই ইসলামী শরীআহ ভালোভাবে জানতে হলে আরবী ভাষা জানার বিকল্প নেই।

৩. আরবী না জেনে ইসলামের ব্যাখ্যা দীনের ক্ষতিকারক হতে পারে। আরবী বাকরীতি ও আরবী ভাষার খুঁটিনাটি বিষয় না জেনে ইসলামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হন। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করতেও দেখা যায়।

৪. কুরআনের ভাষায় কুরআন বোঝার মধ্যে যে মজা তা অন্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে পাওয়া যায় না। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার জন্য আরবী ভাষা জানা দরকার।

ইংরেজি কেন শিখবেন : ইতঃপূর্বে বর্ণিত দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো, দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনের কারণ ছাড়াও আরেকটি প্রয়োজনে ইংরেজি শিখতে হবে। আর তা হচ্ছে, ইংরেজি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ। ইংরেজি না জানলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্ভব নয়। এক দেশ থেকে আরেক দেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি গেলে সাধারণত ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ হয়। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়ার ভাষা ইংরেজি। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ইংরেজি ভাষাতেই বেশি। ব্রিটিশ কলোনি ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির কারণে ইংরেজি ভাষা অতি দ্রুত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আসীন হয়। বর্তমানে

---

৩. এই গল্পটি মাওলানা রুমীর মসনবীতে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.com

ইংরেজি শুধু রাজনৈতিক কারণে শক্তিশালী ভাষা নয়, এর সাংস্কৃতিক প্রভাবও লক্ষণীয়। এক সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের কিছুসংখ্যক আলেম ব্রিটিশ সরকারের এমন কট্টর বিরোধী ছিলেন যে, তারা ইংরেজি শেখাকেও হারাম মনে করতেন। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সম্মানিত উলামায়ে কেরামের ত্যাগ ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় এ দেশ ইংরেজদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁরাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজি ভাষার বিরোধিতার ফল মুসলমানদের জন্য লাভজনক হয়নি।[৪] মুসলমানরা ইংরেজি ভাষা না জানার কারণে সরকারি বিভিন্ন দায়িত্বে অন্যরা এগিয়ে যায়। তাই পরবর্তী সময়ে ওলামায়ে কেরাম শুধু ইংরেজি শেখাকে জায়েয মনে করেনি; বরং এমন অনেক আলেম আছেন, যারা ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেছেন।

কীভাবে ভাষা শিখবেন

সাধারণত যেকোনো ভাষা শেখার সময় তিন ধরনের লক্ষ্য থাকে : ১. কোনোমতে বই-পুস্তক পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন। ২. মোটামুটি ভালোভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা। ৩. চমৎকারভাবে লেখা, বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

কোনো ভাষা আয়ত্ত করার জন্য প্রথমে নির্ধারণ করা দরকার যে, আপনি উক্ত ভাষায় কেমন দক্ষ হতে চান এবং কেন দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভাষা চর্চায় সময় ও শ্রম ব্যয় করা দরকার। যারা শুধু কোনোরকমে কারো সাথে যোগাযোগ করতে ভাষা শিখতে চান আর যারা একটি ভাষার উপর দক্ষতা লাভ করে উক্ত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চান– এই দুই শ্রেণীর মানুষের ভাষা শেখার মেহনত এক ধরনের হবে না।

ভাষা ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসে : এটা এমন কোনো পানীয় নয় যে, ইচ্ছা হলে গ্লাস হাতে নিয়ে প্রয়োজনমাফিক পান করা যায়। ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হলে চেষ্টা করতে হয়, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ভাষার উপর আপনার বর্তমান দক্ষতা যাচাই করুন : কোনো ভাষা শিখতে হলে এ ভাষার উপর আপনার দক্ষতা কতটুকু তা আগে যাচাই করা দরকার। আপনার লেভেল উপলব্ধি করার পর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোন লেভেলে পৌঁছতে চান। নিজেই ভাষার লেভেল যাচাই করুন, নিচের টেবিল পূরণ করুন, যথাস্থানে টিক চিহ্ন দিন।

---

৪. এমন অনেক আলেম আছেন, যারা ইংরেজদের এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, ইংরেজি লেখা বিস্কুটও খেতেন না। অমার বড় ভাইও প্রথম পর্যায়ে ঐ ধরনের মানসিকতা পোষণ করতেন, যা আমার জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

www.nagorikpathagar.com

	খুব ভালো	ভালো	কোনোরকম জানা আছে	মোটেই ভালো নন
গ্রামার				
স্পিকিং				
রিডিং স্কিলস্				
রাইটিং স্কিলস্				
শব্দভাণ্ডার				
বানান				
শোনা ও বোঝা				
একাডেমিক				
ল্যাংগুয়েজ				

ভাষা শেখার লক্ষ্য পরিষ্কার থাকা : আপনি কেন ভাষা শিখতে চান তা পরিষ্কার থাকা দরকার। কারো সামনে যদি সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে তাহলে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে সিরিয়াস হয়। আর যদি কোনো লক্ষ্য না থাকে তাহলে ভাষা শেখার জন্য বেশি সিরিয়াস হয় না। বিভিন্ন কারণে মানুষ ভিনদেশী ভাষা শেখে : যেমন–

১. ভিনদেশীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

২. বিদেশে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য। অনেক ছাত্র আছে তারা বিদেশে এলে ভাষা না জানার দরুন শিক্ষকের লেকচার বুঝতে পারে না।

৩. কারো রাইটিং স্কিলসের অভাবে পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না, তাই ভাষা শেখার চেষ্টা করেন। ভাষা শেখার লক্ষ্য নির্ধারণের পর কত দিনের মধ্যে এবং কীভাবে ভাষা আয়ত্তে আনবেন তার পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। যেমন মনে করুন, আপনি দুই বছরে ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে চান। এজন্য প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বিকেলে কোনো কোর্স করতে চান। উক্ত কোর্স করা ছাড়াও সপ্তাহে আরও পাঁচ ঘণ্টা ব্যয় করতে চান।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার আগেই ভাষা শিখুন : আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগেই টার্গেটকৃত ভাষা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি যদি মাদরাসার ছাত্র হন তাহলে আরবী ভাষায় ভালো দক্ষতা অর্জন করা দরকার। এজন্য দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষার পর ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগের সময়কে ভালোভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। আপনি যদি স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করেন তাহলে ইংরেজি ভাষার উপর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পরবর্তী সময় ভালোভাবে কাজে লাগানো দরকার। মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ভাষাচর্চার সময় নয়, ভাষা শেখার সময় আরও আগে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ভাষা শেখা যাবে না। অবশ্যই শেখা যাবে। কিন্তু লক্ষ্য আরও আগে রাখা দরকার।

www.nagorikpathagar.com

সঠিক কোর্স নির্বাচন করা : ভাষা শেখার জন্য প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন কোর্স চালু আছে। উক্ত কোর্সসমূহ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। তারপরে আপনার জন্য সঠিক কোর্স কোনটি তা বেছে নিন। সঠিক কোর্স বাছাই করতে ভুল করলে ভাষা প্রসেস বিলম্বিত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও ভাষা শেখানোর পদ্ধতি সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে। সবকিছু খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, যে কোর্স আপনি করতে চান তা আপনার লেভেল অনুযায়ী ঠিক আছে কি না। কোর্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও খেয়াল রাখা দরকার যে, আপনি কত মাসের কোর্স করতে ইচ্ছুক এবং কোর্সের ফি কত?

কোর্স না করেও ভাষা শেখা যায় : অনেক মানুষ আছেন যারা কোনো কোর্স না করেও ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করেছেন। যেমন একজন মানুষ আরবের কোনো দেশে কিছু দিন থাকলে আরবী কথোপকথন তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। সে জন্য সেলফ লার্নিং সেন্টার করতে পারেন। কোনো গ্রুপ করে কিংবা কোনো কোর্স করে ভাষা শেখার সুযোগ না থাকলে সেলফ লার্নিং সেন্টার গড়ে তুলুন। অর্থাৎ নিজে নিজেই ভাষা শেখার চেষ্টা করুন। আপনার সেলফ ল্যাংগুয়েজ স্কুলে প্রয়োজনীয় বই, অভিধান, অডিও, ভিডিও রাখার চেষ্টা করুন এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ভাষা শেখার কাজে ব্যয় করুন।

উন্নত বিশ্ব যেমন ইংল্যান্ডে কোনো কোনো ল্যাংগুয়েজ একাডেমিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাংগুয়েজ সেন্টার থাকে। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা যায় এবং নিজের সুবিধামতো সময়ে ল্যাংগুয়েজ বুক, অডিও শোনে বা ভিডিও দেখে। সেখানে সকল লেভেলের কোর্স উন্মুক্ত থাকে। ব্যক্তি নিজের পছন্দমতো তা ব্যবহার করতে পারে।

ওয়ান টু ওয়ান নেটিভ স্পিকিং : মনে করুন, আপনি আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে চান, তাহলে আরব কোনো দেশের কারো সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন এবং তার সাথে আরবীতে কথা বলার চেষ্টা করুন। আর যদি ইংরেজি শিখতে চান তাহলে friendship with native speaking people. নেটিভ কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা খুব জরুরি।

অনলাইন কোর্সও করতে পারেন। বর্তমানে অনলাইন অনেক কোর্স চালু আছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অপর প্রান্তের যেকোনো অন লাইন কোর্স করা যায়। এর জন্য সহায়ক কয়েকটি ওয়েবসাইটের তালিকা দেওয়া হলো :

www.englishtown.com
www. bellenglish.com
www.eslcafecom/search/online–English–Courses

এছাড়াও অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং শোনা এবং অনলাইন সংবাদপত্র পড়া যায়।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা কোর্স করা : বিদেশে প্রায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাংগুয়েজ কোর্স আছে। আমাদের দেশেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনস্টিটিউট অব ল্যাংগুয়েজ' আছে। এই ধরনের কোনো ল্যাংগুয়েজ কোর্স করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.com

স্টুডেন্ট লার্নিং সাপোর্ট সেন্টার : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টুডেন্ট লার্নিং সাপোর্ট সেন্টার থাকে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হয়ে থাকে। লার্নিং সাপোর্ট সেন্টারে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকও থাকেন। তারা ছাত্রছাত্রীদের বছরের শুরুতেই একটি ফরম পূরণ করে চাহিদার কথা জানান।

Peer Teaching : অনেক সময় পরস্পরের সহযোগিতায় ভাষা শেখা যায়। এজন্য আপনারা পাঁচজনের একটি গ্রুপ করুন। নিজেরা বসে ভাষা শেখার আকর্ষণীয় কোনো পদ্ধতি বের করুন এবং সব সময় চর্চা করুন। গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। একে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি : আপনি যদি ইংরেজি শিখতে চান তাহলে ভাষার উপর কিছুটা দক্ষতা আসার পর ইংরেজি ভাষার পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে চিঠিপত্র কলামে লিখুন। তারপর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক লেখা শুরু করুন। বিষয়ভিত্তিক লেখা শুরু করলে ভাষার উপর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ : কোনো ভাষা যদি বোরিং মনে হয় তাহলে তা শেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি যদি শেখার ক্ষেত্রে আনন্দ পান তাহলে অল্প সময়েই ভাষা শিখতে পারবেন।

ওয়ান-টু-ওয়ান টিচিং : অনেক সময় কোনো একজন ভালো শিক্ষকের কাছে ওয়ান-টু-ওয়ান পড়ার মাধ্যমে দ্রুত ভাষা আয়ত্তে আনা যায়। এজন্য ভালো কোনো শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকা দরকার এবং তার কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া দরকার। ভালো শিক্ষকের সন্ধান পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের কালচারাল সেন্টার বা অ্যাম্বেসির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ল্যাংগুয়েজ এক্সচেঞ্জ : কখনও কখনও দেখা যায় আপনি যে ভাষায় কথা বলেন তা শেখার জন্য ভিন্ন দেশী একজন ব্যক্তি আগ্রহী আর আপনি তার ভাষা শিখতে আগ্রহী। এই ধরনের সুযোগ পেলে একে অপরের শিক্ষক হয়ে 'ল্যাংগুয়েজ এক্সচেঞ্জ' করতে পারেন। অর্থাৎ আপনার মাতৃভাষা তাকে শেখাবেন আর তার মাতৃভাষা আপনি শিখবেন।

ভাষা শিখতে হলে 'শব্দভাণ্ডার' (Vocabulary) বৃদ্ধি করতে হবে

কয়েক কারণে শব্দভাণ্ডার বাড়ানো দরকার :

১. আলোচনায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য।
২. যুক্তিতর্কে সাহায্য করে।
৩. রিপিটেশান থেকে বিরত থাকার জন্য।
৪. যা বলতে চান তা ভালোভাবে উপস্থাপন করা যায়।
৫. বিভিন্ন বই বুঝতে সাহায্য করে।
৬. বই পড়ার গতি সঞ্চার করে।

শব্দ শেখার পাগল হতে হবে : প্রতিদিন কিছু নতুন শব্দ শেখা। কোনো ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলে উক্ত ভাষার শব্দসংখ্যা অধিক জানতে হবে। এজন্য প্রতিদিনই কিছু

www.nagorikpathagar.com

নতুন শব্দ শেখার চেষ্টা করা দরকার। এক্ষেত্রে এমন শব্দ প্রথম শেখা দরকার, যা প্রতিনিয়তই শোনেন বা দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় প্রয়োজন হয়; কিন্তু আপনার জানা নেই। যেমন, রাস্তায় চলতে ফিরতে যা দেখা যায়, যা শোনা যায় তার ইংরেজি বা আরবী কী তা জানার চেষ্টা করতে হবে। মনে করুন, রাস্তায় চলার সময় গাছগাছালি, পাখপাখালি, জিনিসপত্র দেখা যায়। এসব কিছুর ইংরজি বা আরবী অমরা জানি না। যদি কেউ একদিন একটা নতুন কিছুর অর্থ শেখে তাহলে দেখা যাবে বছরে ৩৬৫টি নতুন শব্দ শেখা হয়ে যাবে। পাঁচ বছর ব্যবধানে দুই হাজার নতুন শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে যোগ হবে। এজন্য আমাদেরকে শব্দ শেখার পাগল হতে হবে। রাস্তায় চলতে ফিরতে একটি ছোট নোট বুক হাতে রাখা যায়। প্রতিদিন কিছু শব্দ লিখে নেওয়া যায়। আবার পথ চলার সময় নতুন কোনো শব্দ শেখার কথা মনে হলে তা নোট করে পরবর্তী সময়ে অভিধান দেখে শব্দটি শিখে নিতে হবে। এছাড়া নতুন শব্দ শেখার জন্য নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারেন :

1. Choosing words to learn আপনি নতুন শব্দ শিখতে চাইলে প্রথমেই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন কোন ধরনের শব্দ আপনাকে শিখতে হবে। প্রথম পর্যায়ে আপনার সব ধরনের শব্দ শেখার প্রয়োজন নেই। আপনার পড়াশোনার বিষয় বা চাকরির সাথে সম্পৃক্ত শব্দসমূহ শেখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা দরকার।

2. Remembering new words : নতুন শব্দ মনে রাখতে হলে বারবার স্মরণ করতে হয়। কোনো শব্দ কয়েকবার পড়লে বা শুনলে মুখস্থ হয়ে যায়, কিন্তু বারবার স্মরণ না করলে তা কিছু দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কোনো নতুন শব্দ শেখার পর বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন। এজন্য শব্দ শেখার পর আপনার নিজের মতো করে তার অর্থ মনে গেঁথে নিন। তারপর উক্ত শব্দকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করুন।

3. Learing words from electronic articles : ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও প্রতিনিয়ত অনেক শব্দ শোনা যায়। যেমন রেডিও বা টিভি অন করলেই এমন অনেক শব্দ শোনা যায় যার অর্থ জানা নেই। এভাবে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে শব্দ শোনার পর তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা দরকার।

Starting to use the new words : নতুন শব্দ শিখলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, কোনো শব্দ শেখার পর তা প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করতে হবে। কথা বলার মতো কাউকে না পেলে নিজের সাথে নিজে কথা বলুন এবং ঐ শব্দটি ব্যবহার করুন।

ডিকশনারির সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে (Using dictionary or thesaurus) : মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক বন্ধু আছে। আমরা সুখে-দুঃখে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করে থাকি। আপনি যদি কোনো ভাষা শিখতে চান তাহলে ঐ ভাষার অভিধান আপনার বন্ধু হতে হবে। কোনো কিছু পড়তে গিয়ে যখনই কোনো শব্দের অর্থ জানবেন না, অভিধান খুলে তা জানার চেষ্টা করবেন। কেউ কেউ অভিধান দেখে দেখে মুখস্থ করা শুরু করেন। এই পদ্ধতি খুব বেশি ফলদায়ক নয়। কেউ কেউ Bilingual অভিধান ব্যবহার করেন। আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে তা করতে পারেন, কিন্তু ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করতে

www.nagorikpathagar.com

হলে যে ভাষা শিখতে চান ঐ ভাষারই অভিধান দেখা ভালো। মনে করুন আপনি ইংরেজি শিখবেন, তাহলে ইংরেজি-বাংলা অভিধানের চেয়ে ইংরেজি টু ইংরেজি অভিধানই বেশি ব্যবহার করবেন। এতেকরে একটি শব্দের অর্থ জানতে গিয়ে আরও অনেক শব্দ জানা হয়ে যাবে।

Make a vocabulary sheet -**শব্দ কার্ড করা :** আপনি একটি শব্দ কার্ড তৈরি করতে পারেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ঐ কার্ডে লিখে রাখবেন। বিশেষত রাস্তায় পথ চলার সময় তা দেখে শব্দ মুখস্থ করা যায়। কারণ ভারি অভিধান সব সময় সাথে নেওয়া যায় না এবং যেখানে সেখানে খোলাও যায় না। শব্দ কার্ড তৈরি করলে সহজেই শব্দ দেখে মুখস্থ করা যায়।

To know synonyms and antonyms : Synonyms, Antonyms, Phrasal verbs, group verbs জানা থাকলে ইংরেজি কোনো ড্রাফট করতে বা কোনো বিষয়ে ইংরেজিতে কথা বলতে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়। তাই শুধু কিছু শব্দ জানলেই সুন্দর করে ইংরেজিতে কথা বলা যায় না, উক্ত ভাষা আয়ত্ত করতে হলে প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ জানা থাকাও দরকার।

নিয়মিত quality newspaper **পড়তে হবে :** ইংরেজি জানতে হলে ইংরেজি পত্রিকা বেশি করে পড়তে হবে। ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজি পত্রিকা নিয়মিত রাখা সম্ভব হলে ভালো কথা। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে কযেকজন মিলে দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা যায়। তবে প্রথম পর্যায়ে দৈনিক পত্রিকার চেয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখাই ভালো। এক্ষেত্রে নিজ দেশের ইংরেজি পত্রিকার পাশাপাশি ইংল্যান্ডের কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করা ভালো। কারণ ইংলিশ স্পিকিং দেশের পত্রিকার ভাষা আর যাদের ফার্স্ট ল্যাগুয়েজ ইংরেজি নয় তাদের ইংরেজির মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে The Times, The Guardian, Economist The Indepedent পড়ার চেষ্টা করা ভালো। এছাড়া ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত মাসিক/দ্বিমাসিক কিছু ইংরেজি ম্যাগাজিন আছে, তার গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা পড়ার সময় কঠিন শব্দের নিচে দাগ দিয়ে রাখতে হবে। প্রথমত পত্রিকার সংবাদ বা প্রবন্ধের পূর্বাপর থেকে শব্দার্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে চেষ্টার পরও বুঝে না এলে অভিধানের সাহায্য নিতে হবে।

ইংরেজি গল্প ও উপন্যাস পড়া : প্রথম পর্যায়ে ছোটদের জন্য লিখিত গল্পের বই পড়া ভালো। কারণ ছোটদের জন্য লিখিত গল্প ও উপন্যাসের ভাষা সহজ থাকে। তা পড়লে শব্দ ও বাক্যবিন্যাসের স্টাইল জানা যায়।

Listening Radio and watching television - **রেডিও-টেলিভিশনের সংবাদ শোনা :** যেকোনো ভাষা আয়ত্ত করতে হলে সে দেশের রেডিও-টেলিভিশনের সংবাদ শোনা জরুরি। আপনি যদি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান তাহলে আপনাকে বিবিসির ইংরেজি সংবাদ শোনা এবং সম্ভব হলে টেলিভিশন দেখার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত বিবিসি চ্যানেল ফোর-এর সংবাদ শোনা খুবই জরুরি।

www.nagorikpathagar.com

Attending seminars and symposiam–**সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করা** : আমাদের দেশেও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজিতে সেমিনার- সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভব হলে এসব সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করলে স্পিকিং স্টাইল আয়ত্ত করা সহজ হয়।

Specialized and General vocabulary : সাধারণ শব্দ জানার পাশাপাশি আপনি যে বিষয়ে পড়াশোনা করছেন ঐ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কিছু শব্দভাণ্ডার আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আইনের ছাত্ররা আইন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আর মেডিক্যাল সাইন্সে যারা পড়াশোনা করেন তারা উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, ইসলামী শরীআয় যারা পড়াশোনা করেন তাদের ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষার জ্ঞান থাকা জরুরি।

Prefixes ও Suffix **জানা** ঃ Prefixes ও Suffix-এর কারণে শব্দের অর্থের মধ্যে যে পার্থক্য হয় তা জানলে অনেক শব্দ নিজেই তৈরি করা যায়। Prefixes[৫] হচ্ছে মূল শব্দের শুরুতে যা যোগ হয়, আর Suffix[৬] হচ্ছে মূল শব্দের শেষে যা যোগ হয়।

Self test – **আত্মপরীক্ষা** : মাঝে মাঝে নিজে নিজের শব্দভাণ্ডার পরীক্ষা করা যায়। আপনি নিজেই কিছু শব্দ নিয়ে তার ইংরেজি বা আরবী অনুবাদ করতে পারেন। কখনও কখনও পত্রিকা বা কোনো বইয়ের কিছু অংশ মাতৃভাষা থেকে আরবী বা ইংরেজি ভাষায় আর কখনও কখনও আরবী বা ইংরেজি থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করুন।

Read more Learn more -**বেশি পড়লে বেশি জানবেন** : আপনি যে ভাষা শিখতে চান সেই ভাষায় লিখিত বই যত বেশি পড়বেন তত বেশি উক্ত ভাষার দক্ষতা বাড়বে। এজন্য হাতের কাছে আরবী ও ইংরেজি কোনো বই পেলেই পড়ার চেষ্টা করুন। পড়ার সময় এ কথা চিন্তা করবেন না যে, আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না তাই পড়ে লাভ কী? আপনি না বুঝলেও তা পড়া অব্যাহত রাখুন। তবে চেষ্টা করুন পূর্বাপর পড়ে কিছু বোঝা যায় কি না? এভাবে পড়তে থাকলে এমন এক সময় আসবে তখন আপনার কাছে যে বইটি খুব কঠিন মনে হতো সেই বইটি খুবই সহজ মনে হবে।

Accent ও Pronunciation **বা শব্দোচ্চারণ প্রসঙ্গে** : প্রত্যেক ভাষার বিশেষ Accent আছে। আবার একই ভাষার একাধিক Accent ও Dialogue থাকে। আপনি যে ভাষা শিখতে চান সে ভাষার স্টান্ডার্ড Accent আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে। যেমন ইংরেজি ভাষার মধ্যে আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজিতে পার্থক্য আছে। বাংলা ভাষাতেও শুদ্ধ বাংলা আর সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুরের

---

৫. A prefix is a syllable or a word which, when placed in front of a word, adds to, or changes its meaning. For example. annual/bi-annual, national/multi-national, form/deform.

৬. Suffixes are single letter or group of letters which, when added to the end of a word, form another word, e. g. disappoint becomes disappointment with the addition of ment.

www.nagorikpathagar.com

ভাষায় পার্থক্য আছে। এ কারণে বলা হয় যে, বাংলা ভাষার জন্ম নদীয়ায়, তার মৃত্যু হয় চট্টগ্রামে, জানাজা হয় নোয়াখালীতে আর দাফন হয় সিলেটে।

বানান কীভাবে নির্ভুল করবেন– Methods তমর spelling : অনেক সময় দেখা যায় কোনো শব্দ সঠিকভাবে বলা যায়, কিন্তু লেখার সময় বানান ভুল হয়; বানান ভুল করলে পরীক্ষক নম্বর দেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাই অনেকে পরিশ্রম করে শেখার পরও শুধু বানান ভুলের কারণে ভালো নম্বর পায় না। এজন্য বানান শুদ্ধ করাও গুরুত্বপূর্ণ। বানান শুদ্ধ করার কিছু কিছু টেকনিক আছে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

১. Look দেখা ঃ কোনো শব্দ পড়ার সময় ভালো করে দেখা দরকার, তার বানান কী। তারপর শব্দকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে উচ্চারণ করা দরকার। যদি শব্দটি খুব কঠিন হয় তাহলে বারবার দেখে বানান নির্ভুল করার চেষ্টা করা উচিত।

২. Say বলা : কোনো শব্দ শুধু চোখ দিয়ে দেখলেই উক্ত শব্দের উচ্চারণ নির্ভুল হয়ে যায় না। এজন্য বারবার ঐ শব্দটি পড়তে হয়। মুখে জোরে জোরে বা মৃদুস্বরে কয়েকবার উচ্চারণ করে শব্দটি কণ্ঠস্থ করার চেষ্টা করবেন, তাহলে অল্প সময়েই উচ্চারণ ও বানান বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩. Write the word শব্দ লেখা ঃ কোনো শব্দ মুখে কয়েকবার উচ্চারণ করলেই বানান নির্ভুলের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শব্দটি না দেখেই লিখতে হবে। তাহলে অন্তরে গেঁথে যাবে।

৪. Using Memory Trick (Mnenmonics) মুখস্থ করার বিশেষ কৌশল : কীভাবে বানান সহজেই মুখস্থ রাখবেন তার কিছু কৌশল আছে, ইংরেজিতে একে Memory trick[৭] বলা হয়। যেমন একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে : There is a common rule 'I' before 'e' except 'c' অর্থাৎ সব সময় 'e' এর পূর্বে 'অ' বসবে কিন্তু 'ড' বর্ণের পর এ দুইটি বর্ণ এলে 'I-এর আগে 'ণ' বসবে। যেমন received ও relief.

৫. Using Syllable শব্দকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে—বড় কোনো শব্দকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে বানান মুখস্থ করা সহজ হয়, এটাকে ইংরেজিতে syllable বলে। যেমন Lieutenant শব্দকে এইভাবে ভাগ করা যায় : = lie/u/ten/ant.

৬. To learn at least five spellings every day—প্রতিদিন পাঁচটি শব্দের বানান শেখা : ইংরেজি কিছু শব্দ আছে, যা লিখতে সাধারণত বানান ভুলের সম্ভাবনা থাকে।

---

৭. Memory trick is something that will make remembering spelling easier. The trick is that if you forget how to spell, it makes you remember it. For examples : C : Change, A : Accountabilty, T : Trust, H : Honest, E : Excellent, R : Reliable, I : Intelligent, N : Noble, E : Equality.

www.nagorikpathagar.com

এই ধরনের শব্দসমূহের তালিকা করে প্রতিদিন কয়েকটি শব্দের বানান মুখস্থ করা প্রয়োজন। আর ঐ শব্দসমূহকে কোনো কাগজে লিখে পড়ার টেবিলে রাখা, যাতেকরে সব সময় চোখে পড়ে। নিচে এই ধরনের কয়েকটি শব্দ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হলো :

there, their or they are	two, too, to
all together & altogether	inquiry & enquiry
bath & bathe	were, where
accept & except	affect & effect
emigration & immigration	

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ও আমেরিকার ইংরেজির মধ্যে বানানের পার্থক্য আছে। যে সকল শব্দে এই ধরনের পার্থক্য আছে তা জানার চেষ্টা করুন।[৮]

ভাষা শিখতে ল্যাংগুয়েজ ক্লাব বন্ধন

আপনারা কয়েকজন মিলে একটি ল্যাংগুয়েজ ক্লাব করতে পারেন। ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে আরবী-ইংরেজি ভাষা শিখতে আগ্রহীদের পৃথক তালিকা হতে পারে। ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের এক এক ইউনিটের সদস্য সংখ্যা ৮-১০ জন হতে পারে। একসাথে বেশি সদস্য হলে ভাষাচর্চার চেয়ে গল্পচর্চার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। ক্লাবের আরবী ইউনিট ও ইংরেজি ইউনিট।এভাবে বিভিন্ন ভাষার পৃথক ইউনিট হতে পারে। ক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশ্য থাকবে পরস্পরের সহযোগিতায় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ভাষা শেখা। এজন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি থাকতে পারে :

১. ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের সদস্যরা বার্ষিক একটি পরিকল্পনা করে ভাষা শেখার জন্য কত ঘণ্টা ব্যয় করবে তা ঠিক করবে। উক্ত পরিকল্পনার অধীনে প্রত্যেক সপ্তাহ বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্টসংখ্যক নতুন শব্দ শিখতে হবে।

২. সপ্তাহে অন্তত তিন-চার দিন নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয়ে অন্তত এক ঘণ্টা ভাষা চর্চা করবে। উক্ত সময়কে 'ল্যাঙ্গুয়েজ আওয়ার' হিসেবে অভিহিত করে সে সময়ে মাতৃভাষায় কথা বলা নিষিদ্ধ থাকবে। উক্ত সময়ে ভাষাচর্চার জন্য এক একদিন একেক ধরনের কর্মসূচি থাকতে পারে।

২. ল্যাংগুয়েজ ক্লাবে মিলিত হওয়ার আগে নির্দিষ্ট ইংরেজি বা আরবী পত্রিকা পাঠ করবে। পত্রিকার যেসব শব্দ বোঝা যায়নি তা দাগ দিয়ে রাখবে। ল্যাংগুয়েজ ক্লাবে মিলিত হয়ে একজনে তা সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, বাকিরা তার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেবে। প্রয়োজনে অভিধান থেকে সহযোগিতা নেবে। এজন্য বিভিন্ন ভাষার অভিধান সাথে রাখবে।

---

৮. এ সম্পর্কে পরিশিষ্ট দেখুন।

www.nagorikpathagar.com

৩. নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সকলে ২-৩ মিনিট করে বক্তৃতা দেবে। মনে রাখতে হবে একজন শিশু যখন মাতৃভাষায় কথা বলে তখন দুই-একটি শব্দ বলে। দিন দিন তার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে শুনতে শুনতে বলতে বলতে সে ভাষা শেখে। প্রথম পর্যায়ে শিশুর অশুদ্ধ কথা শুনে সবাই হাসে, মজা পায়। পাশের লোকজনের হাসির কারণে কোনো শিশু কথা বলা বন্ধ করে না। তেমনিভাবে নিজেকে ভাষা শেখার শিশু মনে করতে হবে। নিশ্চিত ভুল শব্দ প্রয়োগ হচ্ছে জেনেও কথা বলা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. কখনও রেডিও বা টিভিতে একসাথে সকলে ইংরেজি নিউজ শুনবে। নিউজ শেষে যে কোনো একজন সংবাদ পাঠক হয়ে আবার নিউজ পাঠ করবে। এজন্য নিউজ শোনার সময় নোট বই সাথে রাখবে।

৫. মাঝে মধ্যে 'ল্যাংগুয়েজ সেশন' হতে পারে। প্রতি মাসে সাপ্তাহিক বন্ধের সময়ে ৩-৪ ঘণ্টার সেশন হতে পারে। এতে গ্রামার, স্পিকিং, রাইটিং-এর স্কিলস ডেভেলপ করার কর্মসূচি থাকতে পারে।

৬. ক্লাবের উদ্যোগে লম্বা ছুটির সময় 'ভাষা সপ্তাহ বা ভাষা পক্ষ' পালন হতে পারে। কোনো সময় সকলে চাঁদা দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক রেখে ভাষা শেখার কোর্স করা যেতে পারে।

৭. ক্লাবের সদস্যরা প্রত্যেক সপ্তাহে একজন একেক বিষয়ে ১৫০-২০০ শব্দ করে লিখবে। তা ক্লাব মিটিং-এ পেশ করবে এবং শ্রোতারা তা শুনে সংশোধন করবে।

ক্লাব পরিচালনা : ক্লাব সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিচয়মুক্ত রাখতে হবে। নামের বর্ণের ক্রমধারা অনুযায়ী প্রতি অধিবেশন বা প্রতি মাসের জন্য একজনকে পরিচালক করা যেতে পারে। তার দায়িত্ব থাকবে উক্ত অধিবেশন বা মাসের প্রোগ্রামগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করা।

www.nagorikpathagar.com

একাদশ অধ্যায়

কর্মজীবন : ছাত্রজীবনেই প্রস্তুতি নিন

ছাত্রজীবনের শেষ লগ্নে কর্মজীবনের প্রস্তুতি নিন

ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার শেষ লগ্নে কর্মজীবনের পেশা সম্পর্কে ভাবতে হয় এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হয়। সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার আগেই কর্মজীবনের লক্ষ্য সামনে রেখে বিষয় নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও বাস্তবতার আলোকে কর্মজীবনের পেশা ও ছাত্রজীবনের পড়াশোনার বিষয়ে মিল থাকে না। আবার কখনও কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে কর্মজীবন শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ে অন্যকোনো ক্ষেত্রে কিছু সময় কাজ করতে হয়। তাই ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই কর্মজীবনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। ছাত্রজীবন শেষ হলে কোন ধরনের কাজের সূচনা করবেন তা আগেভাগে ঠিক করে না রাখলে হতাশ হতে হয়।[১] আর হতাশার কারণেই শিক্ষিত যুবসমাজের একটি অংশ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজ দূষিত হয়। তবে ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবন সম্পর্কে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রয়েছে।

পেশা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উম্মাহর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিন : কর্মজীবনে পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মেধা ও ঝোঁক-প্রবণতার সাথে উম্মাহর প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রাখা উচিত। দুনিয়ার যশ-খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন বিবেচনায় রাখা ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ কেউ বিসিএস পরীক্ষায় কাস্টমস এক নম্বর চয়েস দেন। এর কারণ কাস্টমসে প্রচুর অবৈধ উপার্জনের সুযোগ থাকে। কর্মজীবনে পেশা নির্বাচনের সময় এই ধরনের অনৈতিক উদ্দেশ্য দূর করা উচিত।

কর্মজীবনের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্তর্বর্তীকালীন চাকরি নিন : অনেকেই ছাত্রজীবন শেষ করে জীবনের উদ্দেশ্যের আলোকে চাকরি পায় না। তাদেরকে

---

১. হতাশায় কেউ কেউ আন্দোলন সংগঠন সম্পর্কেও নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। মূলত এটি আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা।

www.nagorikpathagar.com

অন্তর্বর্তীকালীন বিভিন্ন চাকরি করতে হয়। তবে কর্মজীবনের মূল লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হয় অন্তর্বর্তীকালীন এমন চাকরি নেওয়াই উত্তম। মনে করুন একজন ব্যবসায়ী হওয়া আপনার লক্ষ্য। কিন্তু আপনি এখনও পুঁজি সঞ্চয় করতে পারেননি। তাই সাময়িকভাবে চাকরি করা দরকার। তাহলে ছাত্রজীবনশেষে কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কিছুদিন চাকরি করুন। যদি কয়েক স্থানে চাকরির প্রস্তাব থাকে, যেমন– ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিসিয়াল কাজ– এক্ষেত্রে আপনি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকেই অগ্রাধিকার দেবেন। কারণ আপনার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হচ্ছে ব্যবসায়ী হওয়া।

অভিজ্ঞতা অর্জন হয় এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিন : অধিক অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের মানুষের সাথে মেশা, কথা বলা ও ভাবের আদান-প্রদান হয় এমন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন চাকরি করা ভালো। তাহলে দুনিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ হয়। ইহুদিরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করার আগে অন্যদের প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন চাকরি করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনের আলোকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করে।

ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত করবেন না : বাংলাদেশে সেশনজটের কারণে অনেক উচ্চ শিক্ষার্থীর ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত হয়। এর ফলে বিয়ে ও চাকরি বিলম্বিত হয়। আবার কেউ কেউ পরীক্ষায় খারাপ করার কারণেও যথাসময়ে ছাত্রজীবন শেষ করতে পারেন না। আর কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত করেন। বিশেষ কারণ ছাড়া ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। ছাত্রজীবন যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ এবং উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা উত্তম।

সংগঠনের পরামর্শ নিন : মুসলিম তরুণ সমাজের পড়াশোনার বিষয় নির্বাচন ও কর্মজীবনের ক্ষেত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাই ছাত্রজীবনের শেষ লগ্নে কর্মজীবনের পরিকল্পনা সংগঠনের কাছে পেশ করা প্রয়োজন। আর সংগঠনের পক্ষ থেকেও কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে গাইড লাইন দেওয়া দরকার। ছাত্রজীবনে ক্যারিয়ার এডভাইসে'র মতো কর্মক্ষেত্র সম্পর্কেও উপদেশ দেওয়া জরুরি। কারণ অনেক সময় দেখা যায় একজন ছাত্র যে বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে উক্ত বিষয়ের চেয়ে অন্য ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ বেশি থাকে। তাই বাস্তব জীবনে প্রবেশের মুহূর্তে ছাত্রদের সঠিক গাইড করা অপরিহার্য। আবার কখনও কখনও দেখা যায় কেউ কেউ অনেক ক্ষেত্রে চাকরির অফার পান। সে সময় সাধারণত উপস্থিত টাকা-পয়সার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে যেখানে বেশি বেতন পাওয়া যাবে সেই ধরনের চাকরিতে প্রবেশ করতে অনেককে দেখা যায়। উম্মাহর প্রয়োজন ও চাকরির ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি গৌণভাবে দেখা হয়। তাই কর্মক্ষেত্র বাছাই ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই হওয়া উচিত। তবে সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার আগে ব্যক্তির অবস্থা ও পরিবারের

www.nagorikpathagar.com

অন্য সদস্যদের চাহিদার কথা জানা প্রয়োজন। কারণ কখনও কখনও ব্যক্তির অবস্থা ভালোভাবে উপলব্ধি না করে শুধু সংগঠনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ফলে ব্যক্তি, সংগঠন ও পরিবারের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

কর্মজীবনে যারা প্রবেশ করবেন এমন জনশক্তির জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। উক্ত প্রশিক্ষণে কর্মজীবনের বাস্তব অবস্থা কী হতে পারে তা তুলে ধরে আলোচনার পাশাপাশি চাকরির ইন্টারভিউ, বায়োডাটা লেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে।

জব সেন্টার : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে 'জব সেন্টার' করা যেতে পারে। এই ধরনের সেন্টারে চাকরিপ্রার্থীদের বায়োডাটা এবং চাকরিদাতা সংস্থাগুলোর তালিকা থাকবে। কোথায় কোন ধরনের চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তা সংগ্রহ করে রাখবে এবং চাকরিপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে।

জব অ্যাডভাইস ও ট্রেনিং সেন্টার : জব অ্যাডভাইস সেন্টারের কাজ হবে কোনো ধরনের চাকরিতে ঢোকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া এবং শর্ট টার্মের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা। পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি টিম থাকতে হবে। তাদের সাথে চাকরিপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেওয়াটাই সেন্টারের দায়িত্ব থাকবে। এজন্য সেন্টার নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি নিতে পারে কিংবা বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তি থেকে সেন্টারের খরচ বহনের জন্য প্রয়োজনীয় আয় নিশ্চিত করে ফ্রি সার্ভিস দিতে পারে।

নিজেই চাকরির সন্ধান করুন : আপনাকে কেউ চাকরি দিয়ে দেবে-এ আশায় বসে থাকবেন না। নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের সন্ধান করুন। আপনি যে ধরনের কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেন সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন। দুই-এক জায়গায় চাকরি না হলেও হতাশ হবেন না। মেধা ও যোগ্যতা থাকলে আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা করুন। তাহলে শুধু নিজের কর্মসংস্থানই হবে না, আরও অনেকের চাকরি দেওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব হবে।

কীভাবে চাকরি হয় : বিভিন্নভাবে চাকরি হয় :

১. সরাসরি যোগাযোগ : সাধারণত আবেদনকারী ও চাকরিদাতা সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অনেকেরই চাকরি হয়।

২. পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন : পত্র-পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই আবেদন করেন। এরপর সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়। তারপর ইন্টারভিউ নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়।

৩. এজেন্সি : উন্নত বিশ্বে অনেক এজেন্সি রয়েছে যাদের কাছে চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগদাতা সকলেই তাদের চাহিদার কথা জানায়। এজেন্সির কাজ হচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

চাকরিদাতা সংস্থার চাহিদার আলোকে যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বের করা এবং তাকে উক্ত চাকরির জন্য আবেদন করতে সাহায্য করা। আমাদের দেশে এই ধরনের এজেন্সি খুব একটা বেশি না থাকলেও ঢাকা শহরে টিউশনি দেওয়ার জন্য অনেক এজেন্সি রয়েছে।

চাকরি পাওয়ার কয়েকটি ধাপ : আপনার ছাত্রজীবন শেষ, কর্মজীবনের সন্ধানে ঘুরছেন। এমতাবস্থায় প্রথমত, আপনার সাথে আপনার ব্যক্তিগত বায়োডাটা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বায়োডাটা চাকরি পেতে আপনাকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, চাকরির আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। তৃতীয়ত, ইন্টারভিউ ভালোভাবে দিতে হবে।

ব্যক্তিগত বায়োডাটা লেখা

কোথাও চাকরি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত বায়োডাটা প্রয়োজন হয়। আবার কখনও কখনও পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের জন্যও বায়োডাটার দরকার হয়। ব্যক্তিগত বায়োডাটা চাকরির ইন্টারভিউর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বায়োডাটার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ছাড়াই তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ কারণে বায়োডাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে চাকরির বায়োডাটা সম্পর্কে আলোচনা করবো। সাধারণত বায়োডাটাতে দুই ধরনের তথ্য থাকে : ১. ফ্যাক্ট : যেমন নাম, বয়স, ঠিকানা, যোগ্যতা, দক্ষতা। ২. ব্যক্তিগত তথ্য : যেমন ব্যক্তির ঝোঁক-প্রবণতা, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ইত্যাদি।

বায়োডাটা তৈরির ক্ষেত্রে কতিপয় পরামর্শ

১. বায়োডাটাতে কী উল্লেখ করতে চান বা বায়োডাটাতে আপনার ব্যক্তিগত, একাডেমিক ও অভিজ্ঞতার কোন কোন তথ্য দিতে চান তা আগে নোট করুন।

২. ফ্যাক্ট তথ্য দিয়ে শুরু করা : যেমন নাম, জন্মতারিখ, বয়স, ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, ফোন নম্বর, ই-মেইল প্রথমেই উল্লেখ করা।

৩. শিক্ষাগত তথ্য : বায়োডাটার দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা দরকার।

৪. অভিজ্ঞতা : আপনার যদি কর্ম অভিজ্ঞতা থাকে তা উল্লেখ করুন। অভিজ্ঞতা উল্লেখ করার সময় অতীতে কোথায় কোন্ পদে চাকরি করেছেন এবং আপনার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কী ছিল তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরুন।

৫. ক্যারিয়ার লক্ষ্য : আপনার কর্মজীবনে ক্যারিয়ার লক্ষ্য কী তা তুলে ধরুন। ক্যারিয়ার লক্ষ্য তুলে ধরার সময় এই কথা উল্লেখ করা দরকার যে, আপনি শুধু অর্থের জন্যই এই চাকরি খুঁজছেন না। এই চাকরি আপনার কর্মজীবনের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.com

৬. শখ ও বিশেষ আকর্ষণ : আপনার ব্যক্তিগত শখ ও বিশেষ আকর্ষণের কথা উল্লেখ করা ভালো।

৭. বায়োডাটা সময়োপযোগী করা : পুরাতন বায়োডাটা ব্যবহার করার পরিবর্তে সব সময় নতুন বায়োডাটা ব্যবহার করা প্রয়োজন। আপনার ব্যক্তিগত তথ্যাবলি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কিছু তথ্য যোগ-বিয়োগ হতে পারে। যেমন– বর্তমান ঠিকানা, ফোন নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

৮. বায়োডাটা দেখতে সুন্দর হওয়া : বায়োডাটা দেখতে যেন সুন্দর লাগে সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

৯. বায়োডাটাতে ব্যক্তিগত রেফারেন্সের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা দিতে হয়। রেফারি হিসেবে আপনার অতি পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ এমন দু-একজন ব্যক্তির নাম দেওয়া উত্তম, যারা আপনার সম্পর্কে ভালো রেফারেন্স প্রদান করবে।

১০. বায়োডাটাতে সকল তথ্য সঠিক হওয়া দরকার।

১১. কোনো কিছু বারবার উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই।

১২. বায়োডাটা সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। কারণ যারা আপনার বায়োডাটা পড়বেন তারা খুবই ব্যস্ত মানুষ। দীর্ঘ বায়োডাটা দেখলে অনেকেই পড়তে চান না।

চাকরির আবেদনপত্র

আবেদনপত্র প্রেরণে কতিপয় সাধারণ ভুল : চাকরির জন্য আবেদনপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর আবেদনপত্রে সাধারণ কিছু ভুলের কারণে শর্টলিস্টেড করা হয় না। ভুলগুলো নিম্নরূপ :

১. যার বরাবরে আবেদনপত্র পাঠানো হচ্ছে তার নাম লিখতে ভুল করা, ২. রেফারেন্স ঠিকমতো না দেওয়া। কখনও কখনও এমন ব্যক্তিদের রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হয় যাঁরা জানে না যে, তার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে তাদের কাছে যখন জানতে চাওয়া হয় তখন তারা নেতিবাচক মন্তব্য করেন, ৩. প্রথম ড্রাফট না করেই আবেদনপত্র সরাসরি পূরণ করতে গিয়ে কাটা-ছেঁড়া হওয়া, ৪. কখনও কখনও স্বাক্ষর ও তারিখ দেওয়া ছাড়াই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ৫. ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে না দেওয়া, ৬. যে পদের জন্য আবেদন করা হচ্ছে উক্ত পদের সাথে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতা না থাকা।

কী কী কারণে কারো আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হয় : কয়েক কারণে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হতে পারে :

১. পূর্ব থেকে কাউকে ঠিক করে রাখলে।

২. ইন্টারভিউ খারাপ হলে।

৩. পদের সাথে সম্পৃক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকলে।

www.nagorikpathagar.com

চাকরির আবেদনপত্র পূরণ সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ : চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নির্ধারিত ফরম পূরণ করেই আবেদন করতে হয়। ফরম পূরণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা দরকার :

১. ফটোকপি করে তা আগে পূরণ করা : মূল আবেদনপত্রকে ফটোকপি করে তা প্রথম পূরণ করা দরকার। কারণ প্রথমবার পূরণ করার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চাকরির আবেদনপত্র নির্ভুলভাবে পূরণ করা উচিত। আবেদনপত্র পূরণ করতে ভুল হলে আবেদনপত্র দেখেই আবেদনকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

২. প্রয়োজনীয় তথ্য থাকা : চাকরির আবেদনপত্র পূরণ করার সময় আপনার সর্বশেষ তথ্যসমূহ আপনার কাছে থাকা দরকার।

৩. নির্দেশিকা ভালোমতো দেখা : চাকরির আবেদনপত্রে কিছু নির্দেশিকা থাকে। কোনো কোনো আবেদনপত্রে কালো কালি দ্বারা বা পেন্সিল দ্বারা পূরণ করতে বলা হয়। নির্দেশিকা ভালোমতো না পড়ার কারণে কেউ কেউ বড় অক্ষরে লেখার কথা থাকলেও ছোট অক্ষরে লিখে ফেলেন কিংবা কালো কালি ব্যবহারের পরিবর্তে সবুজ কালি ব্যবহার করেন। এর ফলে আবেদনকারীকে শর্টলিস্টেড করা হয় না।

৪. সুন্দর ও সাজানো হওয়া দরকার : আবেদনপত্রে যেসব বিষয় লেখা হয় তা সুন্দর ও সাজানো হওয়া দরকার।

৫. দায়িত্ব ভালোভাবে লিখুন : যে পদের জন্য আবেদন করছেন উক্ত পদের সাথে সম্পৃক্ত অতীতের দায়িত্বাবলি ভালোভাবে লিখুন।

৬. বক্সের ভেতর তথ্য ঠিকমতো লেখা : অনেক সময় ফরমে বক্স থাকে। উক্ত বক্সের ভেতরেই প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা দরকার। বক্সের সাইজ অনুযায়ী কথা তুলে ধরতে হলে পয়েন্ট আকারে তথ্য তুলে ধরতে হবে।

৭. আবেদনপত্র থেকেই ইন্টারভিউর প্রশ্নমালা বের করা : আবেদনপত্রের বিভিন্ন কলাম থেকে ইন্টারভিউর প্রশ্ন খুঁজে বের করতে হবে। কারণ আবেদনপত্রে জিজ্ঞাসিত বিষয়াদিই ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করা হয়।

৮. মূল আবেদনপত্র নিখুঁতভাবে পূরণ করা : খসড়া ফরম পূরণ করার পর তা দেখে মূল ফরম নিখুঁতভাবে পূরণ করা দরকার। পূরণ করার সময় বানান যেন নির্ভুল হয়, কাটাছেঁড়া যেন না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৯. আবেদনপত্রের ফটোকপি রাখা : মূল আবেদনপত্রের ফটোকপি আপনার কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউর সময় তা পুনরায় দেখে নিন। আবেদন করার সময় ফরমে যা লেখা হয় তার সাথে মিল রেখেই ইন্টারভিউতে প্রশ্ন করা হয়।

www.nagorikpathagar.com

ইন্টারভিউ

চাকরির জন্য ইন্টারভিউ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি হয় না। ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রস্তুতি দরকার। শারীরিক, মানসিক ও একাডেমিক। এখানে ইন্টারভিউ সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ঃ

১. ইন্টারভিউ চর্চা করা : আপনার পরিচিত কারো সাথে ইন্টারভিউ চর্চা করুন। তাহলে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য যখন যাবেন তখন সহজ মনে হবে।

২. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া : ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ভয়ে তটস্থ থাকা বা অহেতুক টেনশনে ভোগা ঠিক নয়। আপনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন, তাহলে ইন্টারভিউ ভালো দিতে পারবেন।

৩. আপনার নিজের সম্পর্কে কী বলবেন তা পরিষ্কার থাকা : আপনি যে পদের জন্য আবেদন করছেন উক্ত পদের জন্য আপনার ব্যক্তিগত কী কী যোগ্যতা আছে তা তুলে ধরতে হবে। এ কথা ঠিক যে নিজের প্রশংসা নিজে করা ঠিক নয়। তবে ইন্টারভিউতে আপনার যোগ্যতার কথা বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরা প্রয়োজন।

৪. সংশ্লিষ্ট সংস্থা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা : আপনি যে সংস্থা বা বিভাগে চাকরির জন্য আবেদন করেছেন উক্ত সংস্থার কার্যাবলি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকা জরুরি।

৫. আপনি কী জিজ্ঞাসা করতে চান : ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার কোনো জানার বিষয় আছে কি না? সেই সময় কী জিজ্ঞাসা করবেন তা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা।

৬. চাকরি পাওয়ার আপনিই সবচেয়ে যোগ্য : আপনি যে পদে আবেদন করেছেন উক্ত পদের জন্য আপনিই সবচেয়ে যোগ্য মানুষ তা আপনার ইন্টারভিউর সময় ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৭. আবেদনপত্র দেখে নেওয়া : আবেদনপত্রে কী উল্লেখ করেছেন তা ইন্টারভিউর দিন আবার দেখে নিন। কারণ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে আপনি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হবেন।

৮. যথাসময়ে পৌঁছা : যথাসময়ের আগেই ইন্টারভিউর জায়গায় পৌঁছানো দরকার। রাস্তায় লম্বা ট্রাফিক জ্যাম হতে পারে কিংবা অন্যকোনো সমস্যায় বিলম্ব হতে পারে–এসব কথা ভেবেচিন্তে আগেভাগে রওয়ানা দেওয়া উত্তম।

৯. ইন্টারভিউর স্থান পরিদর্শন : ইন্টারভিউর স্থান সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা নেওয়া উত্তম। সম্ভব হলে ইন্টারভিউর স্থান আগে একবার দেখে আসা উত্তম। জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, ইন্টারভিউর স্থানে গিয়ে প্রস্রাব-পায়খানার স্থানও দেখে আসা ভালো। কারণ অনেক সময় ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের দরকার হয়। সে সময় স্থান খুঁজে পেতে সমস্যা হলে মানসিক চাপ অনুভব হয়। এর ফলে ইন্টারভিউ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.nagorikpathagar.com

১০. উপযোগী পোশাক : আপনি যে পদের জন্য আবেদন করেছেন উক্ত পদের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কোনো ড্রেস কোড আছে কি না তা জানার চেষ্টা করতে হবে। যদি ড্রেস কোড থাকে তাহলে ঐ ধরনের পোশাকই পরিধান করতে হবে। আর যদি ড্রেস কোড না থাকে তাহলে সুন্দর ও মানানসই পোশাক পরিধান করার চেষ্টা করতে হবে।

ইন্টারভিউ চলাকালীন কতিপয় পরামর্শ

১. নম্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ থাকা : ইন্টারভিউর সময় নিজেকে ভদ্র ও নম্র হিসেবে উপস্থাপন করে ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কথা বলা জরুরি।

২. প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকে কম যোগ্য বলে উপস্থাপন না করা : আরও অনেকের সাথে ইন্টারভিউর জন্য অপেক্ষা করার সময় নিজেকে কম যোগ্য ভেবে হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না।

৩. ইন্টারভিউর কক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করুন : ইন্টারভিউর জন্য যখন ডাকা হবে তখন কক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করবেন। এ সময় তাড়াহুড়া করা উচিত নয়।

৪. আই কন্টাক্ট : ইন্টারভিউর সময় ইন্টারভিউ বোর্ডের সকলের সাথে আই কন্টাক্ট রাখা দরকার। কেউ কেউ আছেন, নিচের দিকে কিংবা আসমানের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, এটা উচিত নয়। ইন্টারভিউর সময় যখন যিনি প্রশ্ন করেন শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে জবাব দেওয়ার পরিবর্তে ইন্টারভিউ বোর্ডের সকল সদস্যের দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

৫. আত্মবিশ্বাসী থাকা : যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবেন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলিষ্ঠভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বললে ঠিক উত্তর দিলেও ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা মনে করবেন বিষয়টি আপনার সঠিকভাবে জানা নেই।

৬. দীর্ঘ সময় নীরব না থাকা : কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলেও দীর্ঘ সময় নীরব থাকা ঠিক নয়। সঠিক উত্তর জানা না থাকলে গোঁজামিলের আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি বলা উচিত, দুঃখিত! আমার জানা নেই। না জেনেও জানার ভান করলে আপনার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে।

৭. কথার মধ্যে কথা না বলা : ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা যখন কোনো কথা বলেন তা ভালোভাবে শুনবেন। তাদের কথার মাঝখানে কোনো কথা বলা উচিত নয়।

চাকরি না হলে হতাশ হবেন না : কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ প্রথম ইন্টারভিউতেই চাকরি পেয়ে যান। কিন্তু সাধারণত চাকরি পাওয়ার জন্য সব জায়গায় আবেদন করতে হয়, একাধিক ইন্টারভিউ দিতে হয়। তাই আপনি কোথাও ইন্টারভিউ দেওয়ার পর চাকরি না হলে হতাশ হবেন না। আপনি মনে রাখবেন, চাকরির ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাওয়াটাই আপনার যোগ্যতার স্বীকৃতি। আর ইন্টারভিউর মাধ্যমে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে কাজে আসে।

www.nagorikpathagar.com

পরিশিষ্ট : ১

Prefixes - Suffixes

Some common prefixes and their meaning

Prefix	meaning
dis	the opposite of, fail to, or take away e.g advantage disadvantage, appear disappear, approval disapproval, charge discharge, disregard-to overlook
mis	badly or wrongly e.g. adventure misadventure, behave misbehave, conduct misconduct, fortune misfortue, fitmisfit; misunderstand-to understand poorly
sub	under, below, or subordinate to e.g.committee subcommittee, conscious subconscious, title subtitle, tropical subtropical; subway-a path or way below ground
un	not or reversing some action e.g able unable, cover uncover, lock unlock, decided undecided, conscious unconscious; unreadable-notreadable
under	below, lower, insufficiently or subordinate to e. g. carriage undercarriage, coat undercoat, paid underpaid, value undervalue
re	again or back again e. g direct redirect, appear reappear, build rebuild, call recall, assure reassure
extra	beyond what is usual, or outside of
ex	out of, or former-e.g.: ex-wife; ex-member; exit-to go out
with	take away, keep back, or to put up with e.g withdraw
co, con,	jointly, together, with; co-exist-to live with; collect-to gather together;
col, com	computer - to calculate with; connect - fasten together
in	not, lack of
fore	at the front of, before
pre	before; prepayment-payment beforehand
super	above or extremly

www.nagorikpathagar.com

ad	to, towards; advance - to go ahead
ante	before; anteroom-before the room
anti	against; anti-freeze-against freezing
be	intense; beloved-intense love
bi	two; bifold-two folds
circum	around; circumference - the area around a circle
trans	across; transmit-to send across
syn	same; synonym-same name
post	after; postwar-after war; postpone-to put off until later
pro	moving forward or ahead; proceed - to go forward
of	against; offend - to act against
im. in	in; import-to bring in from another country
inter	between, among-interplay-play between or among people
il,im,in,ir	not; illegal-not legal; irrelevant-not relevant
micro	small; microscope-an instrument used to make small objects look larger
uni	one; unison-with one voice
auto	self; autobiography-self
alter	another; alternative-another choice
anthro	human, man; anthropology-the study of mankind
chron	time; chronicle-a historical record arranged in order of time
bio-	life; biology-the study of life
manu	hand; manuscript-a document written by hand

Suffixes

When a suffix is added to a stem word this can result in the word changing its class. Most of the examples below result in noun changing to adjectives or in verb changing to nouns.

Suffix	example
-ion	accommodate accommodation, confuse confusion, elect election
-ous	danger dangerous, marvel marvelous
-ious	mysterymysterious, gracegracious
-eous	courage courageous, advantage advantageous
-able	favour favourable, comfort comfortable
-ible	sense sensible, response responsible
-al, ical	belonging to; magicmagical, music musical; practical

www.nagorikpathagar.com

ally	mechanic mechanically, physical physically
ful	beauty beautiful, care careful
ment	agree agreement, advertise advertisement
ance	disappear disapperance, maintain maintenance
ence	depend dependence
ation	examine examination
ing	run running
ive	create creative
ly	beautiful beautifully
less	care careless, clue clueless
-ed	wish wished, consult consulted
ship	state of being, condition; friendship, assistanship
tion	act, state of; attention
ism	belief or practice of; elitism, racism
ish	of nateure of; boyish
hood	state, condition; brothehood
fy	to make, to form; satisfy
ation	act, state of; celebration
ance	act of doing; attendance

পরিশিষ্ট : ২

Linking words বা Phrasal words

Addition	**Result**	**Conclusion/Summary**
and	therefore	last
or	consequently	finally
nor	accordingly	in conclusion
also	hence	to conclude
in addition	thus	to summarize
again	for this reason	in summary
first, second	trully	to sum up
besides	as a result	in brief
further	then	in short
furtheremore	in short	on the whole
next		
moreover		
equally important		

www.nagorikpathagar.com

Contrast	**Emphasis**	**passage of time**
but	in fact	afterwards
on the other hand	indeed	all length
after all	in any event	immediately
however	more important	in the meantime
nevertheless	most important	meanwhile
on the contrary	specially	soon
still	in particular	after a short time
yet		while
notwithstanding		thereupon
at the same time		thereafter
in pite of the fact that	temporarily	
for all that		until
although true		presently
in contrast		Simultaneously
apparently		

Example	**comparison**	**concession**
for example	in the same way	of course
for instance	likewise	after all
in this manner	similarly	naturally
that is		although this may be true
		I admit

Place	**Purpose**
here	for this reason
beyond	to this end
opposite to	with this purpose
on the opposite side	
above	
below	
beside	
in the distance	
adjacent to	
there	
shortly	
since	
later	

www.nagorikpathagar.com

পরিশিষ্ট : ৩

Abbreviation

নিচে ইংরেজিতে কিছু Common Symbol ও useful common abbreviation দেওয়া হলো :

Common Symbol	Common abbreviation
& (+) and	c.f-(confere) compare
+ plus, more	e.g (exempli gratia) for example
> greatermore thanbatter than	etc.-(et cetra) and others, and so on
< smallerless than	i.e. (id est) that is to say, in other words
= is the same asequal to	NB (nota bene) note well
= is not the same as	no -(nemero) number
* most importantly	
Esp-especially	
ff-following	
w-with	
wo-without	

> Increase, greater then <decrease, is less than
= equals ex example
জtherefore
def-defination, ie-that is
ৰ caused, led to v-versus
w/with হ্হ্ identical to
≠ unequal, imp-important
+ plus, add, - take away, minus, subtract
x times, multiplied by, Q. ? question, query
% percentage * special note
W/o without sig significant
O individul
Mn-main, bkgd-background
Unnec-unnecessary
Abv.-abbreviation
Subc-subconcious, ct- computer terminal
Ad-Anno Domineafter the birth of Christ

www.nagorikpathagar.com

etc-etceteraand so on	No -number
viz-namely	pro-tem for the time being
pp-former pro	
pa-per anum	App-appendix
cf-compare with	

পরিশিষ্ট : ৪

Subjective Exam প্রশ্নপত্রে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা

Compare	Examine the characteristics in order to determine the similarities
contrast	examine the characteristics in order to discover the differences
define	give clear and concise definition
describe	relate exactly what happened or what something is like, using descriptive writing
diagram	illustrate the answer with an accurately labled graphic aid
discuss	analyze all sides of the question in detail, using expository writing
explain	Answer the why? How? Where? And who? and give relevant differences of opinion
illustrate	draw a graphic aid or else give a clear, concise example
justify	give proof or cite evidence to support and idea
outline	organize your answer, then make and outline of the facts or information you have
review	analize the material by giving an organized presentation of the main ideas
summarize	connect all of the major supports or facts, using transitional words or phrases

পরিশিষ্ট : ৫

Punctuation Mark

Punctuation is also very important in the language. Most people do mistake due to wrongly use of punctuation. Now I would like to define rules for use of problematic grammatical marks.

Commas

www.nagorikpathagar.com

Reasons for using a comma :

* To separate independent clause when they are joined by any of these seven common conjunctions: and, but, for, or, nor, so, yet. For Example: The game was over, but the crowd refused to leave.
* After introductory (a.) clause, (b) phrase, or (c) words that come befor the main clause. Common words for introductory clauses that should be followed by a comma include: after, although, as, because, if, since, when, while.
* Where sentence would be unclear without it because the sentence would be too long.
* To show where you've inserted a phrase or clause. If we removed the part of the sentence between the commas, the reminder would sitll make sense. For example, 'The cat, whose favorite food was fresh fish, finished off the plateful.'
* To separate three or more words, phrases or clasuses written in a series.
* To set all geographical names, items and dates (except the months and day), addresses (except the street number and name), and titles in names. For example; December 22, 1965, was a momentous day in his life.
* To shift between the main discourse and a question, e.g. Jihn said without emoition, 'I will see you tomorrow.'
* To prevent possible confusion or misreading, e.g. To George, harrison had been a sort of idol.
* Use a comma in a date whose order is month, day, and year. If such a date comes in the middle of a sentence, include a comma after the year e.g Martin Luther King, Jr., was born on January 15, 1929, and died on april 4, 1968. but commas are not used with dates whose order is day, month, and year. Martin Luther, jr., was born on 5 January 1929 and died on 4 April 1968. do not use a comma between a month and a year or between a season and a year. E.g. I passed my oral exams in spring 2003.

Note : There is no comma before a defining relative clause. The pronouns that we use in these clauses are who, whom, that, and which, For example:

* When the object is a person, e.g. the man who came in late
* When the subject is a persons e.g. the girl that I saw

www.nagorikpathagar.com

* When the subject is a thing, e.g. the chair that is in the corner
* When the object is a thing, e.g. - the book that I am reading

Apostrophe

An apostrophe shows either that a letter is missing, in short form such as hasn't, don't etc. or that a person or things belong to somebody, e.g. Jane's mother.

The apostrophe is probably the most frequently misused piece of punctuation in the English language. For example :

* Pick your own tomato's
* Back in the 1980's

Both examples are wrong, for the wrong use of apostrophe. In the first example, 'tomatos' is plural.

The basic rules of possessive apostrophe :

1. When the noun is singular, the apostrophe goes before the s. For example, "The tutor is marking the student's work.
2. When the noun is plural, the apostrophe goes after the s. There are two exceptions of these rules :

* The case of possessive pronouns, like yours, hers, its, theirs, ours etc.
* Irregular plurals do not end, e.g children, women etc.

Missing letters, contractiosn, s

We also use an apostrophe to show that one or more letters have been left out as in; isn't, 'shouldn't, what's (meaning what is and so on).

When we talk, and when we write informally, we tend to use quite a lot of contractions, such a I'II, 'won't', 'hadn't', and so forth.

Colons

It is often used to introduce a complete list, and to sing the next piece of text. For example, 'several departments contributed to this report; production, marketing, accounts, distribution and personnel'.

If the list is incomplete, do not use a colon, it is better to use words like 'such as' 'including' or 'like', in which case do not use the colon at all. For example:

'Several departments contributed to this report, including production, distribution and accounts.'

The colon is use between two parts of a sentence when the first part creates a sense of anticipation about what follows in the second.

Semi-colons

A semi-colon is use to separate two contrasting parts of a sentence.

www.nagorikpathagar.com

John wanted to go- I did not. Use a semicolon between independent clauses not lik ned by a conjunction. E.g. The coat is tattered beyond repair; still, Akaky hopes the tailor can mend it. Use a semicolons between items in a series when the items contain commas. Present at the symposium were Henrie Guillaume, the art critic; Sam Broan, the Daily Tribune reporter; and Maria Rosa, the conceptual artist.

These have two functions: firstly, if you want more than a comma and less than a full stop. Secondly, to break up lists, which already contain commas. But if the items in the list already have commas in them, this can become very confusing for the reader.

For example: ...government departments such as health; education; agriculture, food and fisheries, the foreign office and employment.

Parenthesis

A parenthesis is a word, phrase or sentence inserted in a passage independent of grammatical sequence which is usually indicated by brackets, dashes or commas. Do not use dashes unless the meaning is unclear without them, the more there are the harder it becomes to read the text.

Exclamation marks

Exclamation is used in the formal writing in the form of sentences to express extreme feelings of joy, anger, sympathy, disgust, despair etc. such as Oh! Ah! harrah! etc.

Question marks

A question mark is written at the end of a direct question. e.g. what do you want? Indirect question do not ask a question directly, but indicate that a question has been asked e.g. I asked him whether he had done his homework.

Full stop

A full stop is used at the end of a sentence, e.g. sit down.

Hyphens

A hyphen is used to join two words which together from one idea, e.g. a ten-ton truck, anti-British, and thirty-four.

Dash

A dash can be used to separate a phrase from the rest of a sentence. It can be used near the end of the sentence before a phrase which sums up the rest of the sentence. The burglars had taken the furniture, the TV and the Stereo-absolutely everything. A dash can also show that the speaker has been interrupted in the middle of a sentence. Have

www.nagorikpathagar.com

you seen 'look out!'

Use a dashes or parentheses to enclose a sentence element that interrupts the train of thought. Use a dash to introduce words that summarize a preceding series. Do not use a hyphen in a compound adjective beginning with an adverb ending in-ly or with too, very, or much. Use a hyphen in a compound adjective endidng with the present participle-sport-loving throng. Use a hyphen in a compound adjective formed by a number and a noun when the adjective preceeds a noun. Twelfth-floor apartment, second-semester courses.

Brackets

Brackets are also used to keep extra information separate from the rest of a sentence: Two of the runners (John and Smith) finished the race in under an hour.

Dots/ellipsis

Dots/ellipsis are used to show that words have been left out, especially from a quotation or at the end of a conversation e.g. please help me, I can't.

Quotation marks

Quotation marks or inverted commas are used to show the words that somebody said:

'Come and see', said Martin.

They are also used around a title, for example of a book, play, film etc. Have you read "Emma"? he asked.

Confusaing spelling

Absorb	verb	affect	to influence
absorption	noun	effect	result
allowed	premitted	aloud	out loud; audible
accept	to receive	except	not including; to omit
all right	O.k; completely correct	alright	O.k-should only be used informally
advice	noun	advise	verb
altogether	completely	all together	all at the same time
allusion	reference	illusion	false image or idea
amend	to change	emend	to improve
ascent	upward climb	assent	agreement
associate	to connect	dissociate	to discounnect

www.nagorikpathagar.com

aural	heard	oral	spoken
awesome	inspiring awe	awful	inspiring awe
bought	past tense of buy	brought	past tense of bring
brake	copse; to stop or slow	break	interval; to shatter, fracture
callous	indifferent to others suffering	cruel	actively enjoying others' suffering
check	to restrain; examine	to cheque	money order
climatic	pertaining ot the climate	climactic	pertaining to a climax
coarse	rough	course	track; meal; series
complement	a full number	compliment	praise
comphrehensible	able to be understood	comprehensive	including much or all
		infectious	communicating disease
	disease by physical contact		by air or water
council	assembly	counsel	lawyer; advice
curb	to restrain	kerb	edge of the road
currant	berry	current	flow; contemporary; now
dairy	as in milk product	diary	daily record
decease	death	disease	illness
definite	distinct; precise	definitive	decisive; unconditional
dependant	noun-one who depends on someone else	dependent	adjective-dependi ng on
disc	recorded	disk	computer
dose	portion of medicine	doze	sleep
dual	of two; double	duel	a fight between two

www.nagorikpathagar.com

adible	able to be eaten	eligible	suitable
legible	able to be read	illegible	unable to be read
elicit	to bring out	illicit	illegal
imminent	impending	eminent	distinguished
ensure	to make sure	insure	to take out insurance
envelop	to wrap out, surround	envelope	wrapper
excite	to stimulate	exit	to go out
faint	swoon	feint	shame move
formally	in a formal manner	formerly	previously
genius	sprit, extra ordia nrytalent	genuine	authentic
guerilla	raiding soldier	gorilla	ape
here	in this place	hear	listen
hoped	aspired	hopped	sprang on one foot
human	of our species	humane	benevolent, compassionate
immoral	knowingly flouting morality	amoral	unconcerned with or not recognizing morality
ingenious	imagenitive, inventive	ingenuous	artless
irate	angry	irritable	touchy
its	belonging to it	it's	it is
leant	past tense of lean	lent	past tense of lend
licence	noun	license	verb
lightening	becoming lighter	lightning	flash of an electric storm
liqueur	sweet strong drink	liquor	any alchoholic drink
lose	to be defeated	loose	free, undisciplined
rain	precipation	rein	control
reign	rule		

www.nagorikpathagar.com

plain	flat country, clear	plane level; tool	
moral	proper	morale	confidence
personal	private	personnel	staff
pray	to worship	prey	hunted creature
principle	code	principal	chief
review	to revise	revue	a light-threatrical entertainment
role	actor's part	roll	all others senses
sever	to cut	severe	harsh
shining	luminous	shinning	scrambling
sight	vision, thing seen	site	place
stationary	not moving	stationery	notepaper etc
story	narrative	storey	floor of a building
suit	of clothes	suite	of rooms or furniture
taught	past tense of teach	taut	tight
thorough	complete	through	from one end to another
to	towards	too	also
ther's	there is	theirs	belonging to them
there	in that place	the're	they are
vain	physically conceited	vein	blood chanel
weather	climatic conditions	whether	if
wave	to gesticulate	waive	to forget
vicious	brutal	viscous	sticky

American and British English

American English	British English
He just went home	He's just gone home
Do you have a problem	Have you got a problem
It's important that he be told	It's important that he should be told
Hellow, is this Susan	Hellow, is that Susan
He looked at me real strange	He looked at me really

www.nagorikpathagar.com

Vocabulary

British	American	British	American
holidays	vacation	fortnight	two weeks
queue	stand in line	shop	store
doctor's surgery	doctor's office	lorry, van	truck
sweets	candy	underground	sub way
taxi	cab	road surface	pavement
barrister, solicitor	attorney, lawyer	trousers	pant
biscuit	cookie	handbag	pocket bag
dailing code	are code	railway	railroad
aero plane	airplance	jug	pitcher
anywhere	ayplace	single ticket	one way ticket
flat	apartment	return	round trip
nappy	diaper	timetable	schedule
mad	crazy	public toilet	rest room
rubber	eraser	film	movie
ground floor	first floor	tin	can
torch	flashlight	engaged	busy
chips	french fries	stupid	dumb
rubbish	trash	lift	elevator
petrol	gas	dustbin	trashcan
post	mail	motorway, main	highway, freeway
travelled	Traveled	road	
Cancelling	Canceling	metre	meter
Centre	Center	Colour	Color
Honour	honor	defence	defense
Licence	License	Dialogue	Dialog
Catalogue	Catalog	aluminium	aluminum
analyse	analyze	cheque	check
defence	defense	labour	labor
programme	program	pyjamas	pajamas
theatre	theater	paralyse	paralyze
tyre	tire		

www.nagorikpathagar.com

তথ্যপঞ্জি

কুরআন ও তাফসীর

১. কুরআনুল কারীম।

٢. محمد فؤاد عبد الباقي - المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم - دار م المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة -

৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর।

৪. জাসসাস-তাফসীর আহকাম আল কুরআন।

৫. কুরতুবী-তাফসীর আহকাম আল কুরআন কুরতুবী।

৬. মুহাম্মদ আল আস সাবনুনী, তাফসীর রাওয়াহে আল বায়ান, দার আল ইহইয়া ওয়া তুরাস আল আরাবী বৈরুত, লেবানন।

৫. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী–তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ), আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত. নভেম্বর ১৯৯৬, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ-ফী যিলালিল কোরআন (বাংলা অনুবাদ), হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরেফ আল কুরআন (বাংলা অনুবাদ), মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত ও অনূদিত।

অন্যান্য গ্রন্থ

১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, ৭ম সংস্করণ ১৯৯৬) তাফহীমুল কুরআন ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯শ খণ্ড সূরা আল আসরের তাফসীর।

2. David, B Pirie, 1985, How to write critical essays—A guide for students of literature. Methuen & Co. Ltd.

3. Leader, W G, 1990, How to pass Exams. Principal, London City College, Stanley Thorns (Publishers) Ltd, England.

1. Mancy V. Wood, 3rd edition, 978. College Reading and Study Skills. A guide to improving academic communication lyolt, Rinehart and Winston, New York.

4. Sue Drew and Rosie Bingham, 2nd edition, 2001. Student Skills Guide, Gower Publishing limited.

5. Baxter, Ray, 1995, Studying Successfully. Aldrough St John Publications.

6. Redman, Peter, 2001, Good essay writing A social Sciences Guides Sage Publications, London.

7. Collins Educational. 1995 Essential Research Skills. An imprint of Harper Collins Publishers

8. Phil Race, 1992. 500 Tips for Students. Blackwell Publishers

9. Lyons, Liz Hamp and Heasley, Ben. 987. Study writing, Cambridge University press

10. Ramanoff, Majorie Reinwald, 1991, Language and Study Skills for Learners of English, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, ISBN 0-13-847229-7

11. Gough, Jacqui, 1998, Developing Learning Materials. Wiltshire, Great Britain, Institute of Personnel and Development. ISBN 0-85292-639-1

www.nagorikpathagar.com

12. Palmer, Richerd. 2002. Write in Style. London and New York. Routedge, Falmer. ISBN 0-415-25263-6
13. Palmer, Richerd. (2nd edition 1996). Brain Train Studying for success. London–New York. E & FN SPON, An Imprint of Champman & Hall
14. Papert, Seymour. 1980. Mind Stroms. Sussex. John Spiers and Margaret A. Boden
15. Cottrell, Stella 1999. The Study Skills Handbook. New Yourk. Palgrave. ISBBN 0-333-75189-2
16. Packerd, Emma, Nick and Borwn Sally. 1997. For Primary Teachers. London. Kogan Page
17. Tracy, Eilleen. 2002. The Student's guide to Exam Success. Buckingham. Open University Press.
18. খান, আব্বাস আলী, ১৯৯৭, মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা।
19. Lewis. M and Reindrs. 2003. Study Skills for Speakers of English as a Second language. New Yourk. Palgrave macmillan.
20. Marshall. L. A & Rowland. 1989 F. A. Guide to learning independently. The Open University Press. England
21. Caise. F. W & Constantine. T. 1977 Macmilan press ltd
22. Casey. F. 1993. How to Study 2nd edn. London. The Macmilian Press Ltd
23. Barrass. R. 1984 Study! A guide to effective Study, revision and examination Techniques
24. Barness. R. 1993 Successful Study for Degrees. London; Routjedge
25. Haynes. LJ & others. 1977 Effective Learning–A practical Guide for Students. Surry : Tetradon Publication Ltd
26. Freem. R. 1991 How to Study Effectively. Cambridge: The National Extension College.
27. Inglis. J & Lewis. Roger : 1993. Clear Thinking. Cambridge : Collins Educational.
28. Howe, Anne. 1986. How to Study London : Kogan Page Ltd
29. Rownntree. Derek 1988. Learn How to Study. London: Sphere Books Ltd
30. Johson. Roy. 1996. Study Skills-guidance notes for students. Lodnon : Clifton Press.
31. Huxley. Mike. 1985. Writing Laboratory Reports. London : Nelson Wardsworth
32. Fry. Ron. 1996. Getting Organised. USA : The Career Press.
33. Lashely. Conrad. 1995 Improving Study Skills. London : Wellington House
34. Orpet. Brian 1997. How to Pass FCE. cambridge : Burlington Press
35. More. Nick. 1978. How to do Research. London : Library Association Publishing LTD
Innovation in Higher Education
37. Orna. Elizabeth & others. 1995 Managing Information for Research. Buckingham : Open Unversity Press

www.nagorikpathagar.com

38. Research Methods. Edited by Tony Greenfield. 1996 London: Arnold
39. The Open University. 1979. Preparing to Study. London : The Open University Press.
40. Oxford Medical Publications. 2003. Health for all Children. Edited by David M. B. Hall, David Eliman. Oxford : Oxford University press.
41. Roy Johnson 1993. Revision and Examination. Manchesyer : Clifton Press
42. Acres. David. 1992. How to pass Exams without Anxiety. UK : How to Books.
43. George Waston. 1978. Writing A Thesis. London : Longman
44. Brien. O Teresa & Jordan. R.R. 1985. Developing Reference Skills. London : Collins ELT
45. Jones. Leo. 2002. Progress to proficiency. Cambridge : Cambridge University Press.
46. Turabian Kate L. 1996 A Manual for writers. Lodnon : The Unveristy of Chicago Press
47. Bell. Judith. 1999. Doing your Research project. Buckingham : Open University Press
48. Berry. Ralph. 1989. How to write a Research Paper. Oxford. Pergamon press
49. Blaxter. L, Hughes C & Tight M. 1996. How to Research. Buckingham : Open University Press
50. Hawkes. D. L 1990 Research Getting Started. UK : The Technology Centre
51. Hawkes. D. L. 1990 Research Communicating your results. UK : The Technology Centre
52. Sharp. A. J, Peters. J & Howard. K. 2002. the Management of a Student Research Project. England : Gower Publishing Company.
53. Crystal. David. 1997. English as a GLOBAL LANGUAGE. Cambirdge : Cambridge University Press
54. Gould. W.T.S. 1993. People and Education in the Third World. UK : Longman Scientific & Technical
55. Bracegridle. B. 1995. The Family Guide to Education in the Nineties. Bucks :L The Bracegirdle Associates.
56. Gibaldi. Joseph. MLA Handbook for writers of Research Pepers 4th edn. New York : The Modern Language Association of America. 1995
57. Howard. Keith & Sharp. John A. The Management of A Student Reseach Project. Hants : Cower : 1983
58. Rowntree Derek. Learn How to Study- a Realistic Approach. London & Sydeny : Warner Books. 1998
59. Casy francis. How to Study A practical Guide 2nd edn. Hongking : Macmilan. 1985
Basingtone : The Macmilan Press Ltd. 1977

www.nagorikpathagar.com

61. আল তালিব, হিশাম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রশিক্ষণ গাইড, ড. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অনূদিত, বাংলা প্রথম সংস্করণ, মানব উন্নয়ন সিরিজ নং ১, ঢাকা। দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ১৯৯৭।
62. মওদূদী, সা. আ. আ. (১৯৯৫) ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলি. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, ঢাকা , বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনী।
63. Clanchy. J, Ballard. B. 1992. How to write Essays A practical guide for students. Australia : Longman Cheshire Pty Limited.
64. Greetham, B. 2001. How to write Better Essays. New York: PALGRAVE
65. Weisman. H. M. 1962 Basic Technical writing 4th edn. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Co.
66. Turabian. K.L. 1996. A Manual for Writers of Term Papers, Thesis, and Dissertation. 5th edn. Chicago and London : The University of Chicago Press.
67. Bord of researchers 1996. Muslim Contribution to Science and Tecnology. Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.
68. আব্দুস সাত্তার ১৯৮০, মাওলানা রুমী, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
69. ডেল কার্নেগী ১৯৮৮, বড় যদি হতে চান, অনুবাদ : তারিকুল ইসলাম, বাংলাবাজার ঢাকা, বিউটি বুক হাউস।
70. হাসান আহমদ ১৯৮৪. আর ইজতিহাদ ফী আল শরীয়াত আল ইসলামিয়্যাহ, রিয়াদ, ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ।
71. সিকদার আবুল বাশার ১৯৯৪. ছোটদের বিজ্ঞানের বর্ণমালা, ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

প্রবন্ধ

১. ওবায়দুল্লাহ আ. জ. ম, ২০০২ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ডায়েরী ২০০২, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।
২. হারুনুর রশীদ, ২০০৪ তথ্যসন্ত্রাস বাংলাদেশের অবস্থা, সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা, ১৫ মার্চ-২১ মার্চ, লন্ডন।

ম্যাগাজিন

1 Study Abroad—A guide for Bangladeshi Studetns, 1st edition 2004. Bangladesh development initiative (BDI), UK

Electronic Source :

1. www. tower.aco.uk/2003 prospectus
2. www 2.umist.ac.uk/management/resources/ethics. html
3. U/Access/report–temple/9

Other Sources

1. Simon Leyden. Academic skills, class notes 2002-2003. London. Tower Hamlets College
2. Martin Campton. Academic skills, class notes 2002-2003. London. Tower Hamlets College
3. Les Clensy. Academic skills, class notes 2002-2003. London. Tower Hamlets College
4. ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল, ২০০৩ HEALTHY LIVING লন্ডনে একটি শিক্ষাশিবিরে উপস্থাপিত আলোচনা।

www.pathagar.com

ISBN: 978-984-8927-03-8
9 789848 927038

sobujpatropublications.com
facebook.com/sobujpatrobd